আলোর পথে সিরিজ ॥৪॥

ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত

লোমহর্ষক আত্মকাহিনী

হিন্দু থেকে মুসলমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

দা'য়ীয়ে ইসলাম

হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব দা. বা.

খলিফা, মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

পরিচালক, জামি'আতুল ইমাম ওলিউল্লাহ আল-ইসলামিয়া, ফুলাত (ইউ. পি) ইন্ডিয়া

সংকলন

মুফতী মুহাম্মদ রওশন শাহ কাসেমী

মুহতামিম, দারুল উলূম সুনূরী, মহারাষ্ট্র, ভারত

অনুবাদ

মুফতি যুবায়ের আহমদ

পরিচালক, ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ।

মান্ডা শেষমাথা, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

☎ ০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী

১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪

০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১

www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং.

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪ ইং

হিন্দু থেকে মুসলমান

আলোর পথে (সিরিজ-৪)

* **প্রকাশক. আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী**

* **স্বত্ত্ব.** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ এই বইটি প্রকাশ করতে পারবে

* **কম্পোজ.** আবু আমাতুল্লাহ *

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট

মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪

পরিবেশনায়

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার ১১, বাংলাবাজার ঢাকা।

মূল্য : ৩৪০ টাকা মাত্র

উৎসগ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে যারা ইসলামের শীতল হাওয়া পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত ও মাকাম বুলন্দে, বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, শায়েখ মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী রহ.-এর খলীফা দা'ঈ-এ ইসলাম হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুমের নেক হায়াতের প্রত্যাশায়।

বিনীত

যুবায়ের আহমদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করো।" –সূরা আলে-ইমরান : ১১০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	৭
অনুবাদকের কথা	৮
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর বাণী	১০
মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা.বা.-এর অভিমত	১২
ভূমিকা	১৩
মাওলানা মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী সাহেব দা.বা. -এর সাক্ষাৎকার	১৭
জনাব মুহাম্মদ নাঈম (উত্রপাল সিং চোহা)-এর সাক্ষাৎকার	৭৩
জনাব রেজওয়ান আহমদ (রাজন)-এর সাক্ষাৎকার	৮১
জনাব মুহাম্মদ আহমদ (রামকৃষ্ণ শর্মা)-এর সাক্ষাৎকার	৯০
বোন আয়েশার (বেলোন্দ্র কোর) সাক্ষাতকার	৯৯
মাস্টার আব্দুল ওয়াহিদ (সঞ্জয়)-এর সাক্ষাৎকার	১১২
মুহাম্মদ ইসহাক (অশোক কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	১২১
মুহাম্মদ সালমান (বানাওয়ারী লাল)-এর সাক্ষাৎকার	১২৯
ভাই হাসান আবদাল (জয় বর্ধন)-এর সাক্ষাতকার	১৪১
ভাগ্যবতী আমেনা (অঞ্জু দেবী)-এর সাক্ষাৎকার	১৫২
হাকীম আব্দুর রহমান (অমিত কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	১৬৪
মুহাম্মদ সালামান (রাম বীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার	১৭২
চৌধুরী আব্দুল্লাহ সাহেবের সাক্ষাতকার	১৮১
মুহাম্মদ উমর (গৌতম)-এর আত্মজীবনী	১৯৩
ভাগ্যবতী বোন যায়নাব (চৌহান)-এর সাক্ষাৎকার	১৯৯
মুহাম্মদ শাহেদ (রামধন)-এর সাক্ষাৎকার	২১১
শামীম ভাই (শিয়াম চন্দ্র)-এর সাক্ষাৎকার	২১৮
মুহাম্মদ আসজাদ (বিনদ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	২২৭
আবদুল হালিম (নির্মল কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	২৩৬
ডা. মুহাম্মদ উমর (রাজবীর ঠাকুর)-এর সাক্ষাৎকার	২৪২
মুহাম্মদ আকবর (মহেশচন্দ্র শর্মা)-এর সাক্ষাৎকার	২৫১
আব্দুর রশিদ দুস্ড়েম (সুনিত কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	২৬০
মুহাম্মদ আকরাম (বিক্রম সিং)-এর সাক্ষাৎকার	২৬৮
শেখ মুহাম্মদ উসমান (সতীশ চন্দ্র গোয়েল)-এর সাক্ষাতকার	২৭৫
আলাউদ্দীন(রাজেশ্বর)-এর সাক্ষাৎকার	২৮৫
মুহাম্মদ আকবর (জতিন্দ্র কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	২৯৩
শেঠ মুহাম্মদ উমর (রামজী লাল গুপ্তা)-এর সাক্ষাৎকার	৩০২
নওমুসলিম ডাক্তার উর্মির সাক্ষাৎকার	৩০৯
সফিয়্যা (সরোজ শালনী)-এর সাক্ষাৎকার	৩১৯
মুহাম্মাদ লিয়াকত (চৌবল সিং)-এর সাক্ষাৎকার	৩৩০
মুহতারামা খাইরুন নিসা (শালিনী দেবী)-এর সাক্ষাৎকার	৩৪০

মুহাম্মদ মুহসিন (রমেশ সেন)-এর সাক্ষাৎকার	৩৪৬
মাওলানা উসমান কাসেমী (সুনীল কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	৩৫৬
জনাব বেলাল আহমদ (হীরালাল)- এর সাক্ষাৎকার	৩৬২
মাস্টার মুহাম্মদ আসলাম (প্রমোদ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	৩৬৯
আব্দুর রহমান সাহেব (রঘুবীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার	৩৭৬
এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সাদেক (সত্যেন্দ্র মল্লিক) সাহেবের সাক্ষাৎকার	৩৮৪
জনাবা আয়েশা রাজী সাহেবা (নওমুসলিম)-এর সাক্ষাৎকার	৩৯৫
কাজী মুহাম্মদ শুরাইহ সাহেব (সামীর)-এর সাক্ষাৎকার	৪০২
মুহাম্মদ উমর সাহেব (আদেশ)-এর সাক্ষাৎকার	৪০৯
ডাঃ মুহাম্মাদ আসআদ সাহেব (রাজকুমার)-এর সাক্ষাৎকার	৪১৫
মুহাম্মদ হাসান (রবীন্দ্র মালিক)-এর সাক্ষাৎকার	৪২৪
ডাক্তার আসমা আলী (কল্পনা)-এর সাক্ষাৎকার	৪৩৩
একজন নিরক্ষর একনিষ্ঠ দা'য়ী ফাতেমার সাক্ষাৎকার	৪৪৩
মুহাম্মুদ মহিব্বুল্লাহ (স্বামী আনন্দ) এক সময়ের খোদা এখন মানুষ	৪৫১
আমার অবস্থা	৪৫২
মানুষ কে?	৪৫২
ঝাড়-ফুঁক ও কেরামতি	৪৫৩
বুদ্ধের পুনর্জন্ম	৪৫৪
ইসলাম আমাকে ঘিরে নিল	৪৫৬
যেভাবে ঘুরে গেল জীবনের বাঁক	৪৫৬
মানুষ কি দেবতা?	৪৫৭
গুরুর অভিশাপ	৪৫৭
কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকারোক্তি	৪৫৯
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত	৪৬০
কুরআন আমাকে বদলে দিয়েছে	৪৬২
গৌতম বুদ্ধ ও বুদ্ধমত	৪৬২
বুদ্ধমতের কতিপয় মূলনীতি	৪৬৩
মুক্তির পথ	৪৬৩
হজ্জের সফর	৪৬৪
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমার পয়গাম	৪৬৫
মৌলবী মুহাম্মদ ইউনুস (সুভাষ শংকরলাল)-এর সাক্ষাৎকার	৪৬৬
মুহাম্মদ ত্বহা (জনি)-এর সাক্ষাৎকার	৪৭২
ইকবাল আহমদের সাক্ষাৎকার	৪৭৮
মুহতারামা কমলা সুরাইয়া (কমলা দাস)-এর সাক্ষাৎকার	৪৮৪
মাইকেল জ্যাকসনের ভাই জর্মন জ্যাকসনের সাক্ষাৎকার	৪৯০
ভাই উবাইদুল্লাহ (বিনোদ কুমার গোয়েল)-এর সাক্ষাৎকার	৪৯৫
অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ ইকবাল (রাজেন্দ্র মালিক)-এর সাক্ষাৎকার	৫০৫
ভাই মুহাম্মদ রঈস (রমেশ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	৫১৪
সালমান সিদ্দিকী (অরুণ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার	৫২৩

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় আলোর পথে ৪র্থ সিরিজ প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেতে উদ্দ্যমী হন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়দান করেন। সেইসাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

ইতোমধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-কে। তিনিই 'আলোর পথে সিরিজ ১-২' এর সম্পাদনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূরে নূরান্নীত করুন ও তাঁর মাকাম বাড়িয়ে দিন। আমিন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা– পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী

১৫-০২-২০১৪ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ড় প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনীষীদের প্রতি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ২০০৩ ইংরেজি সনে দারুল উলুম দেওবন্দে (ইন্ডিয়া) ভর্তিপরীক্ষা শেষে মনে করলাম, ফলাফল বের হবার আগে আমাদের বুযুর্গদের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে আসি। সেই নিয়তেই প্রথমে নির্বাচন করলাম মুজাফফরনগর জেলার খাতুয়াল্লি থানার ফুলাত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামটি। সেখানে রয়েছে শাহ-ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.–এর জন্মভূমি। যেই ঘরে শাহ ওলিউল্লাহ রহ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও সেভাবে বিদ্যমান। আরো রয়েছে দেখার মত বহুকিছু।

সেখানে গিয়ে একটি খানকায় অবস্থান করলাম। একজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। আমার মনে হচ্ছিল, এমন মানুষ ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। যেমন তাঁর নূরানী চেহারা, তেমনি তাঁর সুন্নতের এত্তেবা। তাঁর অন্তরে ছিল একরাশ বেদনা আর হৃদয়ে তপ্তজ্বালা। এটা তাঁর আলোচনা থেকেই বুঝতে পারছিলাম। পরে জানতে পারলাম, তিনি হলেন একজন বড় দা'য়ী ও শায়খ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী। আরও জানতে পারলাম, তাঁর মাধ্যমে এপর্যন্ত লক্ষাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমার খুবই পছন্দ হলো। এমন একজন শায়খকেই সন্ধান করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করলাম এবং যাওয়া-আসা করতে থাকলাম।

ফুলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'জমিয়াতুল ইমাম শাহ-ওলিউল্লাহ' থেকে 'আরমুগান' নামে উর্দূ ভাষার মাসিক একটি দাওয়াতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের সাক্ষাৎকার প্রচার হয়। পুরুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী এবং মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাঁরই

কন্যা আসমা আমাতুল্লাহ। ২০০৭ সালে এ'তেকাফ করতে ও এসলাহের জন্য হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি 'আরমুগানের' সাক্ষাতকারগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে দিন। আশা করি মানুষ অনেক উপকৃত হবে। সে সূত্রে আহমদ আওয়াহ ভাই আমাকে ২৫টি সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে দেন। পরবর্তীতে ২০১০ইং মুফতী রওশন কাসেমী সাহেব এই সাক্ষাৎকারগুলি একত্র করে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে' নামে বই আকারে তিনখন্ডে প্রকাশ করেন। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব অধমের কাছে একসেট কিতাব পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, এগুলোর অনুবাদ হলে মানুষের মাঝে দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! এই সাক্ষাৎকার গুলো সিরিজ আকারে বের করা শুরু করি প্রথম আমরা ২০০৮ সনে সিরজ-১ প্রকাশ করি। এর পর ২০০৯ সালে সিরিজ-২ প্রকাশ করি। ২০১১ সনে সিরিজ ১-৩ একত্রে বের করি। এরপর ঈমান জাগানিয়া সাক্ষাৎকার বের হল, এর পর বের হল, মসজিদ থেকে মন্দিরে (আল্লাহ সব গুলোকে কবুল করুন।) আমি ওমরার সফরে হযরত মাও. কালিম সিদ্দিকী দা.বা.-কে বললাম হযরত! আলহামদুলিল্লাহ এর অনুবাদ তো আরো অনেক হয়ে গেছে তো আমার অনুবাদ বন্ধ করে দিই। হযরত বললেন না আপনি আপনার মতো অনুবাদ করতে থাকেন। সেই বইগুলো হযরতের কাছে পেশও করলাম । আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যায়ে আলোর পথে সিরিজ-৪ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এই সিরিজ -৪ অনুবাদ করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুবাদেরও সাহায্য নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাদের কবুল করুন।

এই বইটিতে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের দুই একজনের নাম না বলেই পারছি না। তাঁরা হলেন ভাই তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী, সহ আরো অনেকেই আলাহ তা'আলা সকলের এখলাস ও সৎ নিয়তকে কবুল করে দীনের দা'য়ী হিসেবে কাজ করার তাওফিক দান করুন।

সেইসাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরয, মানুষ হিসাবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাদের চোখে কোন ভুল ধরা পড়লে জানাবেন, খুশি হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের তাঁর দিকে ডাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
বাইতুল হাদী জামে মসজিদ ও মাদরাসা
মান্ডা শেষ মাথা, সবুজবাগ, ঢাকা–১২১৪

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাও. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর সুযোগ্য খলিফা ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের সাবেক পরিচালক **হযরত মাও. আবুসাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর**

বাণী

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস;নির্মম জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস। নিষ্ঠুর অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাস। ইসলাম গ্রহণের পথে ঈমান আনয়নের পথে অধিকাংশকেই এপথ মাড়াতে হয়েছে। এপথ না পেরিয়ে কেউ তার আকাঙ্ক্ষিত মনযিল জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছতে পারেনি। আল্লাহর নৈকট্যলাভে সক্ষম হয়নি। হযরত আবু বকর রাযি.কে নির্যাতন সইতে হয়েছে। হযরত উসমান গণি রাযি.-কে নিপীড়ন বরদাশত করতে হয়েছে। হযরত বেলাল রাযি.-ও হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযি.-কে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। সাহাবী আম্মার রাযি.-কে নির্মম নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে গিয়ে তাঁর পিতা ইয়াসির ও মা সুমাইয়া রাযি.-কে কাফেরদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করতে হয়েছে। শাহাদতবরণ করতে হয়েছে আরও অনেককে। হযরত খুবাইব ও হযরত যায়দ ইবনে দাছানা রাযি.-কে শূলীকাষ্ঠে আরোহণের মাধ্যমে কাফেরদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদতবরণ করতে হয়েছে। এ ইতিহাস যেমন করুণ ও বেদনাদায়ক, তেমনি দীর্ঘ।

তবে এ-ও সত্য যে, এসব নির্যাতন-নিপীড়ন বৃথা যায়নি। হযরত ওমর রাযি.-এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রাযি.-এর প্রহারের ফলে শরীর নিঃসৃত রক্ত আল্লাহর দরবারের কেবল তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধিরই কারণ হয়নি, ওমর-এর মত বীর কেশরীর হেদায়াত লাভেরও মাধ্যম হয়েছিল। হযরত খুবাইব রাযি.-এর শাহাদাত লাভ হযরত সাঈদ ইবনে আমের-এর ইসলাম গ্রহণের উছিলা হয়েছিল। এরূপ অনেকের ইসলামের জন্য নিপীড়ন ভোগ যে আরও অসংখ্য লোকের ঈমান নসিবের কারণ ছিলো তাই বা কে অস্বীকার করবে?

'আলোর পথে' সিরিজের প্রথম পুস্ড়িকায় ইসলাম গ্রহণের জন্য এমনই নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা, অবশেষে শাহাদতপ্রাপ্তা এক কিশোরীর বেদনাদয়ক চিত্র পেশ করা হয়েছিল। তাতে এ-ও বিবৃত হয়েছিল যে, তাঁর সেই আত্মদানও বৃথা যায়নি। তাঁর সেই আত্মদানই অবশেষে তাঁর ঘাতক পিতা ও পিতৃব্যসহ গোটা পরিবারের ইসলাম গ্রহণের উসিলায় পরিণত হয়েছিল।

সিরিজের বর্তমান পুস্ড়কেও ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান কয়েকজন আল্লাহর বান্দার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারে এমন দু'জনের

কথাও বিবৃত হয়েছে, যারা ভারতের বুকে অবস্থিত অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ শাহাদতে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এর ধ্বংসে কোদাল হাতে তুলে নিয়েছিল। আল্লাহর ঘর ধ্বংসে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী আমাদের জানা মতে, এ পর্যন্ত ছ'জন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর এ ধরনের হতভাগা ও পাপিষ্ঠ লোকেরাই যদি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে মাহরূম না হন, তাহলে এদের তুলনায় হৃদয়বান লোকদের হেদায়াত লাভের ব্যাপারে আমরা নিরাশ হবো কেন?

তাই আজ প্রয়োজন ইসলামের প্রচার-প্রসারে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের পেছনে নিরলস শ্রম ও মেহনত, অব্যাহত প্রয়াস ও প্রয়োজনীয় কুরবানী। আল্লাহর যমিনের কোটি কোটি বান্দা আজ আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াতের মুহতাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে, হেদায়াতের বাণী, দীনের পয়গাম পাওয়া তাদের অধিকার । আর এই বাণী ও পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছানোর আমরা জিম্মাদার। অতঃপর তা গ্রহণ করা না করা তাদের এখতিয়ার। এই দায়িত্ব ও যিম্মাদারী আদায়ে আবহেলার কারণে যদি আল্লাহর একজন বান্দাও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থেকে জাহান্নামী হয়, তবে সেজন্য কাল কেয়ামতে আল্লাহর মহা দরবারে আমাদের পাকড়াও হতে হবে। তার সামনে জওয়াবদিহি হতে হবে।

বর্তমান পুস্তিকা সংকলন ও প্রকাশের পেছনে এর সংকলক মুফতী যুবায়ের আহমদ এবং এর প্রকাশক জনাব তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে ইলাহীর উপরিউক্ত লক্ষ্যই কাজ করছে। এঁরা উভয়েই আমার পরম স্নেহভাজন। মেহেরবান মালিকের দরবারে একান্ত মুনাজাত, আল্লাহ! তুমি এঁদের শ্রম কবুল করো এবং আমাকেও এদের সাথী হবার তৌফিক দান করো। সেই সাথে এর পাঠককেও এই দায়িত্বপালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করো। আর সাহায্য ও তৌফিক দানের মালিক একমাত্র তো তুমিই।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
০২-০২-২০১০ ইং

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাও. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর সুযোগ্য খলিফা ও দারুর রাসাদ মাদরাসার প্রিন্সিপাল **হযরত**

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা.বা.-এর অভিমত

ইসলাম দীনে হানিফ, পরশমানিক। এ পরশের ছায়াতলে এসে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়েছেন। এসব ঈমানদ্বীপ্ত নওমুসলিমদের জীবন কাহিনী পড়লে আমাদের কমজোর ঈমানও তাজা হয়। ইসলামের শুরু থেকে মাঝে মধ্যে বহু অমুসলিম ভাইয়েরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এ ইসলাম গ্রহণের কাহিনীগুলি অনেকে কলমের কালি দিয়ে কিতাবের পৃষ্টায় স্থায়ীরূপ দিয়েছেন। তাই নওমুসলিম ভাইদের পূর্ব ইতিহাস সম্বলিত অনেক বই আমরা বাজারে দেখতে পাই। এ ব্যাপারে অমুসলিম ভাইদের মাঝে যেভাবে কাজ করা দরকার, সে তুলনায় অন্যান্য দেশে কাজ হলেও আমাদের দেশে এ কাজে বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের অংশ গ্রহণ খুবই সীমিত। বর্তমান শতাব্দিতে ভারত উপমহাদেশে মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব অমুসলিমদের মাঝে বেশ জোরে-শোরে কাজ শুরু করেছেন। তিনি তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করা নওমুসলিম ভাইদের জীবন কলমবন্দ করেছেন। তাঁরই কয়েকজন যোগ্য বাংলাদেশি শাগরেদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর অন্য আর একজন বাংলাদেশি খলিফা জনাব মাওলানা আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর যোগ্য রাহবারিতে এদেশের অমুসলিমদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছেন। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের এসব বাংলাদেশি শাগরেদদের মধ্যে বিশিষ্ট দা'য়ী আলেম মাওলানা যুবায়ের আহমদ সাহেবকে আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি হযরত কালীম সিদ্দিকী সাহেবের মিশনকে এ দেশে চালিয়ে নিচ্ছেন। আশা করি তাঁর সংকলিত **'আলোর পথে–৪'** নামক ঈমানদ্বীপ্ত এ বইখানি উম্মতের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মেহনতকে কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালমান
মাদরাসা দারুর রাশাদ মীরপুর ঢাকা
২৬/৫/২০১১

ভূমিকা

পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, মানবদরদী, দা'য়ীয়ে ইসলাম

হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা.

[খলিফায়ে মাজায. মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও আরিফ বিল্লাহ. হযরত মাওলানা আহমদ প্রতাবগড়ী রহ.]

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সত্য কালামে স্পষ্ট বর্ণনা করেন–

هُوَ الَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।' –সূরা আস সফ : ৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জীবদ্দশায় পবিত্র হিজায ভূমির সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ড় বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম বিজয়লাভ করেছিল। বিশ্বব্যাপী ধর্ম পুরো বিশ্বে বিজয়ী হওয়ারই কথা। আল্লাহর সত্য নবী এই খবরও দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। কেয়ামতের অধিকাংশ আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে। খতমে নবুওয়াতের মধ্যে ইসলামের পয়গামকে পুরো বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জিম্মাদারী আমাদের দেয়া হয়েছে। এই মহান জিম্মাদারী পালনে উদাসীনতার কারণে মানুষ (বিশেষভাবে অমুসলিমরা) সত্যধর্ম ইসলামের পরিচয় পায়নি। পুরো বিশ্বে ইসলামের সঠিক পরিচয় না জানার কারণে অথবা ভুল ধারণা থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডার জোয়ার বইছে। কিন্তু আল্লাহর শান যে, ইসলাম ও কুরআনের বিরোদ্ধে প্রোপাগান্ডার দ্বারা সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ বাড়ছে। আগের যুগে মানুষ ইসলামকে জানতো মুসলমানদের আখলাক-চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ করে ইন্টারনেটের আবিষ্কারে ইসলামকে মানুষের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে পুরো বিশ্বে মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পশ্চিমা বিশ্বেই বেশি। বিশেষত; যেখান থেকে ইসলামের প্রোপাগান্ডা বেশি ছাড়ানো হচ্ছে, সেখানে আত্মিক ও বাহ্যিকভাবে ধর্মের জন্য পাগল এমন অনেক নওমুসলিম রয়েছেন, যাঁরা

ইসলামের শুরু যামানার নওমুসলিমদের মতো জীবন উৎসর্গকারী। আমাদের দেশ হিন্দুস্ড়ানেও ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা কম নয়।

যদি পুরো বিশ্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের বড় একটি সংখ্যার অবস্থার উপর চিন্তা করা যায়, তাহলে খুব আশ্চর্যের সাথে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রথমত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের হেদায়াত লাভে আমাদের মুসলমানদের দাওয়াতী চেষ্টার প্রভাব খুবই কম। ইসলামের কোন জিনিসের উপর আকৃষ্ট হয়ে কিংবা ইসলাম বিরোধী কোন প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে তাদের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতপর ইসলামের উপর লেখাপড়া করে মুসলমান হয়। অথবা নিজ ধর্মের কোন রীতি-নীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে তুলনামূলক ধর্মের উপর লেখাপড়া ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়।

দ্বিতীয়ত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের ঈমান, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ধর্মের জন্য কুরবানী এবং দাওয়াতের স্পৃহা দেখে খাইরুল কুরুনের মুসলমানদের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم.

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।' -সূরা মুহাম্মদ

ইসলাম প্রচারের অধিকতর এই ঘটনাগুলির সাথে পুরো বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অপর দিকে যেভাবে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করছে, তদ্রূপ মুসলমান ব্যাপকহারে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। কখনো তো সংখ্যা ও মানের দিক থেকে প্রায় সমান সমান পরিবর্তন দেখা যায়। কোনো এলাকায় যেই পরিমাণ মানুষ ইসলাম কবুল করে, ঠিক সেই পরিমাণ মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। এমনকি যেই মানের অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে, ঠিক সেই মানের মুসলমানও মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীসমূহ আমাদের রসমী এবং বংশীয় মুসলমানদের অলসতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রতকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী হয়। এর থেকে একদিকে নিরাশা ও হতাশার মঝে আশা-ভরসার আলোকরেখা দেখা দেয়। অপরদিকে নিজেদের দাওয়াতী জিম্মাদারীর গাফলতের কারণে পরিবর্তনের ওয়ার্নিং শোনা যায়। কোন

না কোনভাবে ইসলাম প্রচারের এই ঘটনাবলী ঈমানী সজীবতা সৃষ্টি করে এবং অলসতা ও কাজের স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দেয়।

সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীগুলো পড়ে মুসলমানদের মাঝে যেন ঈমানী আত্মমর্যাবোধ সৃষ্টি হয় ও দাওয়াতী কাজের আগ্রহী ব্যক্তিগণের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবনী থেকে দাওয়াতী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এই উদ্দেশ্যে মাসিক 'আরমুগান' কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে'র শিরোনামে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের আত্মজীবনী সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছিল। এই প্রকাশনা নিজ উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই সাক্ষাতগুলো প্রকাশ করেছে। উর্দূ ভাষা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা দেশ-বিদেশের মুসলমানদের মঝে দাওয়াতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে। শত বছরের বাঁধা ভেঙেছে।

এই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন এই অধমের পুত্র আহমদ আওয়াহ নদভী এবং তার বোন আসমা যাতুল ফাওযাইন আমাতুল্লা ও মুছান্না যাতুল ফাওযাইন সিদরা। এই আত্মজীবনীগুলোর কিছু সাক্ষাৎকার বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর উপর পরিপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য আমাদের একজন দুঃসাহসী সাথী দা'য়ী ইলাল্লাহ খাদেমে কুরআন ওয়াস সুন্নাহ স্নেহ ভাজন জনাব মুফতি রওশন শাহ কাসেমী সাহেব নতুন বিন্যাসে একত্রে প্রকাশ করার দায়িত নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুফতি সাহেবকে অনেক হিম্মত ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি তাবলীগের মুখপাত্র হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.-এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদের তাবলিগের আকাবিরদের বক্তৃতা-বিবৃতির সংকলন ও প্রকাশের মুবারক কাজ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে নিয়েছেন। খুবই কম সময়ে তিনি আলহামদুলিল্লাহ নিজ এলাকায় ঈর্ষণীয় খেদমত তাঁর দ্বারা নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন ও দাওয়াতের খেদমতের জন্য অনেক জযবা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি আরমুগানে প্রকাশিত নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকারগুলোকে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ পর্যন্ত চারখন্ডে 'দাওয়াতের উপহার' হিসেবে জাতির সামনে পেশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই চারখন্ডের মুবারক সংগ্রহটি পাক-ভারতের বহু লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বই বিক্রেতাদের মতে, এটি ছিল গত বছরের সর্বাধিক বিক্রি বইগুলির অন্যতম। এ বই পাঠে দেশ-বিদেশের অনেক পাঠকের মাঝে দাওয়াতি চেতনা সৃষ্টি হয়েছে।

এটা শুধু সাধারণ শ্রেণীর লোকদের নয় বরং শিক্ষিত সমাজের দাওয়াতি কর্মোদ্দীপনার উৎস হয়েছে এবং অনেক পথহারা মানুষের অন্তর কম্পিত করে দ্বীনের পথে ফিরে আসার উসিলা হয়েছে। এ সমস্ড় অর্জনকে সামনে রেখে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে' (আলোর পথে)-এর এই পবিত্র উপহার দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি খন্ড আসামি, তামিল, গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হচ্ছে। এধারাবাহিকতায় কিছু পুস্ড়িকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আমার একনিষ্ট বন্ধুপ্রতিম, স্নেহভাজন মুফতি যুবায়েরের (আল্লাহ তাকে নিরাপদে রাখুন) বাংলাভাষার অনুবাদ প্রচেষ্টা এগুলির অন্যতম। উল্লেখ্য মুফতি সাহেব বাংলাদেশে দাওয়াতে দীনের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর প্রচেষ্টার আশাব্যঞ্জক ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি এই অধমের একজন আস্থাভাজন ও সমব্যাথী বন্ধু। তিনি খুব আবেগ নিয়ে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে' এর চার খন্ডের অনূবাদ করেছেন এবং এই মুবারক উপহার বাংলাভাষীদের খেদমতে পেশ করেছেন। বাঙালি জাতি খুবই সরল-সহজ, কোমলপ্রাণ জাতি। ইতিহাস সাক্ষী যে, সৌহার্দপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপনকারীকে এ জাতি যেভাবে ঐক্য ও আগ্রহভরে স্বাগত জানিয়েছে তার জুড়ি মেলা ভার! আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.-এর বিশিষ্ট খাদেম হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী রহ.-এর হাতে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এতে আশ্চর্যের কী যে, ''নাসিম হেদায়াতকে ঝুঁকে'' (আলোর পথে)-এর মাধ্যমে জাতির মাঝে দাওয়াতের ব্যাপারে প্রচেষ্টা এবং এই দেশের দাওয়াতী আন্দোলনের 'দ্বিতীয় সংস্করণের' উসিলা হয়ে যাবে। যার কর্মীরা অযোগ্য ও দুর্বল ঠিক, কিন্তু বদনাম করার জন্য এই মহৎ অন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং এতে গর্বিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটি মুফতি সাহেবের জন্য আখেরাতের পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করুন এবং এক কর্মঠ ও কোমলপ্রাণ জাতিকে পুরো বিশ্বের জন্য ভালোবাসার পয়গাম নিয়ে দাঁড়াবার মাধ্যম বানিয়ে দিন। (আমিন)

দীনের নগন্য খাদেম

মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

জামিয়তে শাহ ওলিউল্লাহ, ফুলাত

মুজাফ্ফর নগর, (ইউ,পি) ইন্ডিয়া

দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)-এর একান্ত সাক্ষাৎকার

(আরমোগানের পাঠকদের জন্যে শুভ সংবাদ। বহুদিন থেকে পাঠকদের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছিল যে, দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী সাহেব দা.বা. এর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হোক। কিন্তু তিনি বারবার বিষয়টি এড়িয়ে যান। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তরুণ আলেম নিষ্ঠাবান দা'য়ী মাওলানা উমর নাসেহী নদভীকে। তিনি ১৪৩০-এর বরকতময় রমযান মাসে হযরত মাওলানার সাথে একান্তে কথা বলেন। তাদের সে কথোপকথন রেকর্ড করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ রওশন শাহ-এর পীড়াপীড়িতে অবশেষে হযরত মাওলানা তা প্রকাশের অনুমতি দেন। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। –সম্পাদক)

> আমরা যদি ভাবতে থাকি আর বলতে থাকি যে, অমুকের এই কাজ করা উচিত অমুকের এই কাজ করা উচিত নয়, তাহলে কাজ সামনে এগোবে না। এর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এই যে, আপনি তাদের সামনে একটি নমুনা পেশ করুন। প্রথমে আমি যখন কাজ শুরু করি এবং 'এই দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে কথা বলতে ছিলাম তখন দেওবন্দের বড় বড় উলামায়ে কেরাম এবং তাবলীগের মরুব্বীদের মধ্যে অনেকে আমাকে কিছুটা পথভ্রষ্ট মনে করতো। অথবা এমন দলের সদস্য মনে করতো যারা তাদের নিকট সঠিক নয় ... ,

প্রশ্ন. দীর্ঘদিন থেকে বন্ধুদের পীড়াপীড়ি- আপনার বাল্যকালের অবস্থা, বুযুর্গদের সাথে আপনার সম্পর্ক; অতপর দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিষয় যেন গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। আপনি যদি এ বিষয়ে অনুমতি দান করেন তাহলে আমরা সকলেই উপকৃত হবো।

মাওলানা সিদ্দিকী : আমার মতো একজন অযোগ্যের জীবন-বৃত্তান্ত জেনে তোমাদের লাভ কী? তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার জীবনের নানা বৃত্তান্তও বলে থাকি। আর তুমি তো আমার পরিবারেরই একজন সদস্য। এসব বিষয় তো তোমার জানাই আছে।

প্রশ্ন : স্মৃতির পুনরুদ্ধারের চেয়ে আপনার মুখ থকে পুনরায় শুনতে পরলে খুবই ভালো লাগবে। প্রথমেই আপনার জন্ম, বাল্যকাল এবং আপনার বংশ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

মাওলানা সিদ্দিকী : হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগে। যখন আমি আমার প্রতি করুণাময় প্রভুর অসামান্য অনুগ্রহের কথা আলোচনা করি, তখন মনে হয় আমার আল্লাহ এই পাপী বান্দার প্রতি জন্ম বরং জন্মেরও আগে থেকেই তাঁর করুণার অবিরাম বর্ষণের সূত্রপাত করেছেন। এই অধম যখনই বড়দের খেদমতে আবেদনপত্র পেশ করে তখন ঠিক নিজেকে এই কবিতার প্রতিচ্ছবি মনে হতে থাকে-

لکھا ہے داور محشر نے میری فرد عصیاں پر
یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا

'কপালে আমার লিখে দিয়েছেন ন্যায়বিচারক হাশরপতি
এ বান্দা আমার- যাকে নিয়ে গর্ব করে আমার অনুগ্রহ'

এই অধমের প্রতি আল্লাহ তায়ালার যে অসামান্য অনুগ্রহ; যা যোগ্যতা ও প্রার্থনা ছাড়াই দান করেছেন, তার মধ্যে একটি ঈর্ষনীয় বিষয় হলো- এই অধমের জন্ম হয়েছে ৯ রবিউল আউয়াল ১৩৭৭ হিজরী সোমবার ভোরে। অর্থাৎ, আমার জন্মের দিক দিয়েও কিভাবে যেন প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ এবং দিন ও ক্ষণের সাথে মিলে গিয়েছিল। অন্তত পৃথিবীতে আগমনের ক্ষেত্রে প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাদৃশ্যতা কম সৌভাগ্যের কোথায়।

এই অধমের জন্ম ফুলাতে। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী আমাদের এই ফুলাতকে ভারতের 'আল্ বাদু' - বেদুঈননিবাস বলেছেন। ফুলাত এমন একটি জনবসতি যার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো- ৮৬২ হিজরীতে এখানে একটি বাবলা গাছের ছায়ায় দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে স্বীয় শিষ্যদের পাঠদানের মাধ্যমে পাঠশালার ভিত্তি রেখেছিলেন আরিফে রব্বানী হযরত কাজী ইউসুফ নাসেহী। তিনি ছিলেন বাদশাহ সেকান্দর লোধীর উস্তাদ ও মুরুব্বী এবং শাহ বাহলুল লোধীর সম্মানিত পীর। হিজরী ৮৬২ থেকে সেই পাঠশালা নানারূপে নানানামে আজও চালু আছে। আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর নির্দেশে আজ সেই প্রাচীন পাঠশালাটিই জামেয়া ইমাম ওয়ালীউল্লাহ নামে পরিচিত।

এ পাঠশালা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী রহ.-এর আত্মিক পাঠশালা এবং গুরুগৃহ। এর আরও বড় বৈশিষ্ট্য হলো- এই পাঠশালার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় যারা যুগে যুগে স্নাত হয়েছেন, উজ্জ্বল করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের উপমাময় ঐতিহ্যকে তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী রহ., তার পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ রহ., ইতিহাসখ্যাত মোহাদ্দেস শায়েখ আলী মোত্তাকী বুরহানপুরী রহ.- যিনি কাজী ইউসুফ নাসেহীর প্রপৌত্র, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর সম্মানিত পিতা শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী এবং তাঁর দাদা হযরত শায়েখ অজিহুদ্দীন শহীদ রহ. যিনি তার পীর ও মুর্শিদ শাহ আবুল ফাতাহ রহ. খলীফা ও জানশীন হযরত নেজাম নারনোলভী রহ.-এর ইঙ্গিতে রুহাতক থেকে হিজরত করে ফুলাত এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই জনবসতি আমিরুল মোমিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর বিপ- বের সূচনাকেন্দ্র হওয়ার গৌরবও লাভ করেছে। মূলত হযরত কাজী ইউসুফ নাসেহী রহ.-এর বংশধর মাশায়েখে কেরামের নিবাস এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী রহ.-এর মাতুলালয় হওয়ার গৌরবে উজ্জ্বল এই অঞ্চলকে অনেকটা কলংকিত করার জন্যেই এর সাথে যুক্ত হয়েছে এই অধম বান্দার সম্পর্ক।

আমার পিতা জনাব হাজী মুহাম্মদ আমিন সাহেব রহ.। তিনি তাঁর ছেলেবেলায় দাদাজানের সাথে গিয়ে হযরত শায়েখ বাহাউদ্দীন রহ.-এর হাতে মুরীদ হোন। তিনি ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সিলসিলার একজন অন্যতম বুযুর্গ। পরবর্তিতে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.-এর হাতে বাইয়াত হোন। হযরত থানভী রহ.-এর সাথে তাঁর চিন্তার মিল ছিল গভীর। তাছাড়া হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ রহ., হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এবং হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদারদের একজন। খুবই সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু চিন্তা চেতনা ছিল খুবই উঁচু । কৃষিকর্মও করতেন খুব মানসম্মত। পশ্চিম ইউপিতে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ড থেকে দুটি ট্রাক্টর এনেছিলেন। এই ট্রাক্টর ব্যবহারের নির্দেশনার জন্য দু'জন ইংরেজ আমাদের ঘরে দুই মাস থেকেছিল। এলাকার মানুষ তাকে মিয়াজী বলে ডাকতো। এ

অঞ্চলের অমুসলিমরা তাঁর আন্তরিকতা ও দান-দক্ষিণার কারণে নানা উপাধিতে ডাকতো। অজিফা পাঠে এবং আমলের রুটিনে ছিলেন কঠিন নিয়মতান্ত্রিক। জীবনের শেষ ষাট বছরে সম্ভবত কখনও তাহাজ্জুদ এবং অজিফা ছুটেনি। সুখ-দুঃখে মানুষের কাছে থাকতেন। তাঁর সরলতা, ক্ষমা এবং হৃদ্যতার অগণিত কাহিনী সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। লেনদেনের স্বচ্ছতার কারণে অনেক বড় মানুষ পর্যন্ত তাঁকে অসামান্য সম্মান করতো। আমাদের দাদাজী জহুরুল্লাহ রহ. ছিলেন হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর মুসতারশিদগনের মধ্যে অনেক পরকালমুখী ও অত্যন্ত সাদামনের একজন সুফী ব্যক্তিত্ব।

এই অধমের মাতা মুহতারামা জুবাইদা খাতুন। নাসিরপুর মুজাফফরনগরের এক সম্মানিত বংশের কন্যা। তিনি আমার বাবার তৃতীয় স্ত্রী। আমার বাবা প্রথম বিয়ে করেছিলেন তাঁর এক বিধবা মামীকে। তিনি বয়সেও আমার বাবার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা ফুলাতেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনিও মারা যান। তৃতীয়বারে আমার মাকে বিয়ে করেন। আমার মা বয়সে আমার বাবার চাইতে অনেক ছোট ছিলেন। তবে চরিত্রে ছিলেন এক অসামান্য বিদূষী নারী। অসহায় দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর টান ছিল স্বভাবজাত। জীবনভর তিনি ছিলেন এই হাদীসের জীবন্ত নমুনা-

صل من قطعك واعف عمن ظلمك وات من حرمك واحسن من اساء اليك

যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক তৈরী কর। যে তোমার প্রতি অবিচার করে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করো। আর যে তোমার প্রতি অশোভণ আচরণ করে তুমি তার প্রতি উত্তম আচরণ করো।

আমার মা প্রায়ই আদর করে আমার ভাই-বোনদের কাছেও আমার প্রশংসা করতেন। বলতেন- আমার কালিম সেই ছোটবেলায়ও আমাকে কখনও পেরেশান করেনি। এটাও এই অধমের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক মহান নেয়ামত। আমার বড় দুই ভাই ও তিন বোন। আমার ছোট এক ভাই ও দুই বোন।

যে ঐতিহাসিক মাদরাসার উপর ফুলাতের ভিত্তি, হযরত গঙ্গুহী রহ. তাঁর এক মুরীদ মাওলানা ফয়েজ আহমদ ফুলাতীর নামে যার নাম রেখেছিলেন

ফয়জুল ইসলাম এবং এখন যেটা জামেয়া ইমাম ওয়ালীউল্লাহ - সেখানেই আমি প্রাথমিক পড়াশোনা করি।

এই প্রতিষ্ঠানে ১৯২৯ সালে গান্ধীজী এসেছিলেন। পরিদর্শন বইয়ে তিনি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী লিখেছিলেন। আমার বড় ভাই যখন আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করতে নিয়ে যান, তখন আমার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়নি। আইন ছিল পাঁচ বছরের কমে কোনো শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। আমার বড় ভাই তখন আমার বয়স এক বছর বাড়িয়ে ভর্তি করে দেন। এক মাসে কায়দা এবং আমপারা পড়ে শেষ করি। তারপর কুরআন মাজীদ পড়ার আগ্রহ জাগে। চার দিনে পুরো কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ে শেষ করি। পঞ্চম দিন আমার উস্তাদকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনাই। খুশিতে আমার পরিবার বাতাসা বিতরণ করে। পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে কুরআন শরীফ হেফয শুরু করি। সে বছর সাত পারা মুখস্থ করেছিলাম। খাতুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। প্যাক্ট ইন্টার কলেজ থেকে বিজ্ঞানে দ্বাদশ শ্রেণী পাস করি। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখন ফুলাতে একটি আরবদের জামাত এসেছিল। সেই জামাতের আমীর ছিলেন আফ্রিকাপ্রবাসী একজন গুজরাটি। আমি তাঁর অনুমতিতে সেই জামাতে তিন দিন কাটাই। তারপর তাবলীগ জামাতের সাথে আমার স্বভাবের মিলের কারণেই জীবনের তরে মিশে যাই।

হযরত মাওলানা আলাউদ্দিন নামে ফুলাতে এক বুযুর্গ বাস করতেন তিনি ছিলেন আমার মায়ের পীর ও মুরশিদ এবং আমার বাবার ধর্মীয় পরামর্শক ও একান্ত বন্ধু । তিনি আমার এবং আমাদের সব ভাই-বোনদের নাম রাখেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাঁর তাবলীগী মেহনত শুরু করার সূচনাকালে তিনবার এই বুযুর্গের সাথে ফুলাতে এসে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত থানভী রহ.-এর কাছেও তাঁর অনেক গুরুত্ব ছিল। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা মাওলানা আলাউদ্দিন রহ.-কে বড় মওলবী বলে ডাকতো। মূলত তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়েই তাবলীগ জামাতের প্রথম নিয়ম ছিল এমন- ফুলাতে এসে তাবলীগের কোনো তাশকীল হতো না। পরে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এখানকার অধিবাসীরা মনে করতে থাকে- ফুলাতের লোকদের জামাতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ফলে এখানে তাবলীগের কাজ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ কারণে আমার মনে চরম কষ্ট ছিল। একবার আমি ছেলেদের নিয়ে একটি জামাত শুরু করলাম। কাজ শুরু করলাম। মাঝে

মধ্যে এক দু'জন মুরুব্বী আমাদের প্রতি মমতার কারণে জামাতে এসে শরীক হতেন। গাশতে সহায়তা করতেন। জামাতের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে স্কুলে আমার মাঝে মধ্যে অনিয়ম হতে লাগলো। প্রথম দিকে স্কুলের শিক্ষকগণ আমার প্রতি কিছুটা মন্দ ধারণাও করে বসেন। তারপর যখন প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে লাগলাম তখন আমার প্রতি আমার শিক্ষকদের আস্থা গড়ে ওঠে। ইন্টার মিডিয়েট করার পর মিরাঠ কলেজ থেকে বিএসসি করি। তারপর এমবিবিএস-এর ভর্তি পরীক্ষা পিএমটিতে অংশগ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ! পুরো রাষ্ট্রে আমি ৫৭তম স্থান দখল করি। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা হয়। তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আমার প্রতি তখন আল্লাহ তায়ালার দয়া বর্ষণ শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের দরবারে বার বার উপস্থিতি, নেক বান্দাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, বিশেষ করে মা-বাবার অসামান্য সৎকর্মের উসিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কদমের কাছে পৌঁছে দেন। মূলত তাঁর সম্পর্কের বরকতেই আমি নদওয়ার বিশেষ জামাতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। এমবিবিএস করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। প্রথমে বিষয়টি আমি আমার পরিবারকে জানাইনি।

তাছাড়া আমি যে পিএমটিতে অংশগ্রহণ করেছি, সেটাও কাউকে বলিনি। পরে যখন আমার ভাইয়েরা জানতে পেরেছে তখন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা বলেছে- তুমি আমাদের এতটাই দুনিয়াদার ভেবেছো! তুমি দুনিয়াকে ছেড়ে দীনকে বেছে নিয়েছো- এটা আমাদের জন্যেও অনেক বড় সুসংবাদ। আমার হযরত নদভী রহ. হযরত মাওলানা আরেফ সাম্বালী রহ. ও হযরত মাওলানা শাহবাজ ইসলাহীকে এই অধমের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে বলেন। তাঁরা নদওয়াতুল উলামার মসজিদে এই অধমকে বিশেষভাবে সময় দিতেন। এই অধম নদওয়ায় থেকে কেবল নদওয়ার রুটিই খেয়েছে। মুজাফফরনগরের এক গ্রাম্য ছেলের আর করারই বা কী ছিল! সে যাই হোক, সেখানে এক পরিবেশ ছিল।

হযরত মাওলানা নদভী রহ. হরিয়ানায় মুসলমানদের ধর্মত্যাগী হওয়ার বেদনাদায়ক ঘটনায় ব্যথিত হয়ে আমাকে সেখানে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। ফলে নদওয়ায় থেকে পড়াশোনা শেষ করার সুযোগ আমার আর হয়নি। আমাকে বঞ্চিত অবস্থায়ই ফিরে আসতে হয়। এদিকে মানুষ আমাকে

মাওলানা বলতে শুরু করে। প্রথম দিকে বাধা দিতাম। পরে অনুভূতিহীনের মতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

প্রশ্ন : একবার হযরত মাওলানা রহ. আপনাকে 'মওলবী' বলেছিলেন- এমন কী যেন একটা ঘটনা আছে, ঘটনাটি জানতে পারি?

উত্তর : আমি তখন ফুলাতে। মহল্লার লোকজন বিশেষ করে আমাদের কৃষিকর্মের যেসব নিয়মিত শ্রমিক ছিল তারা আমাকে এক সময় ভাই সাহেব বলে ডাকতো। নদওয়ায় ভর্তি হওয়ার আগে আমি একবার খানকা শাহ আলামূল্লাহয় হযরত রহ.-এর খেদমতে কিছুদিন থাকি। সেই সময়কার কথা। মসজিদ থেকে বাংলোয় এসেছি। হযরত মাওলানা রহ. সেখানে আগেই উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন- আসুন মওলবী কালিম সিদ্দিকী সাহেব। তারপর যখন আমি ফুলাত ফিরে এলাম তখন যার সাথেই দেখা হতো সেই আমাকে মাওলানা সাহেব, মওলবী সাহেব বলতে শুরু করে। প্রথম দিকে খুবই লজ্জিতবোধ করতাম। নিষেধ করতাম। কিন্তু কত দিন এভাবে পারা যায়? অবশেষে আমাকে হার মানতে হয়। আমার হযরতের মুবারক মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটি কিভাবে যেনো সকলের মুখে চালু হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। তো কিভাবে আপনার বিয়ে হলো, বলবেন?

উত্তর : ১৯৮০ সালের কথা। হযরত রহ.-এর কৃপায় রাজকীয় নিমন্ত্রণে হযরতের সাথে হারামাইন শরীফাইন-এর জিয়ারতের উদ্দেশে হজ্বে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। মাত্র তের দিনের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসি। তখন সৌদী আরবের বাদশাহ ছিলেন শাহ খালেদ। তিনি আমাদের অনেক সম্মান করেছিলেন। ফিরে এসে আমি তাঁকে একটি কৃতজ্ঞতা পত্র লিখি। তাতে খুব দ্রুত ফিরে আসার কারণে আমার আক্ষেপের কথাও বলি। আমার এই চিঠি পেয়ে তিনি আমাকে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারি, সেখানকার শাহী খান্দানের কেউ নাকি বিয়ের প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এই সময়েরই ঘটনা। মেওয়াতের একটি জামাত। তাদের আমীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তারা খুব পেরেশান ছিল। আমি তখন তাদের চিল্লা পূরণ করার জন্যে তাদের নিয়ে ঝানঝানাই যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। এক ঘনিষ্ঠজনের মাধ্যমে একটি

দীনদার পরিবারের নানা সংকটের কথা জানতে পারি। এই অধম একটি দীনদার পরিবারের যদি কোনো উপকারে আসে- সেই মানসে বিয়ের ইচ্ছা করি। আলহামদুলিল্লাহ! অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বিয়ে সম্পাদিত হয়। যখনই কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করেছি, দেখেছি আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর নেয়ামতে সিক্ত করেছেন। এখানেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন উপমাময় হাফেযা, কারিয়া, পবিত্র স্বভাবের অধিকারী জীবনসঙ্গিনী দান করেছেন। আমার ঘরের বরং খান্দানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে কুরআনের সুবাস পৌঁছে দিয়েছে। খান্দানের শিশুদের মধ্যে কুরআনে কারীমের প্রতি আকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তারই অসামান্য সহযোগিতায়– এই ঋণ সত্যিই অনুপম। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন : আপনি এক দুইবার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার কথাও বলেছেন। বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত বলবেন কি?

মাওলানা সিদ্দিকী : ছেলেবেলা থেকেই পত্র লেখাটা ছিল আমার পরম আগ্রহের বিষয়। বরং যদি এভাবে বলি তাহলে ভালো হয়- আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই পৃথিবীর সবকিছুর সাথে যুক্ত করে আবার সবকিছু থেকে আলাদা করে এনে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পায়ের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। আমার জীবনের শুরুর দিকে কবিতা উৎসবের প্রতি অসামান্য ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে কবিতা আবৃত্তি ছিল আমার একান্ত সখের বিষয়। আমার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। পঞ্চাশ জনেরও বেশি কবির কবিতা তাদেরই সুরে তাদেরই ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শোনাতে পারতাম। ঘরে বিশেষ কোনো অতিথির আগমন হলে আমাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে ডেকে তোলা হতো। বলা হতো, কবিতার জলসা হবে। আমি অনায়াসে আনওয়ার জালালপুরী, মহেন্দ্র সিং বেদী প্রমুখের স্টাইলে সেই কবিতা-জলসা উপস্থাপন করতাম। বিভিন্ন কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম। একসময় আমি নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করি। গল্প লেখায় হাত দিই। 'খাতুনে মাশরিক' এবং 'বিসওবিঁসদী' তে আমার অনেক গল্প প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু নাটকও লিখেছি। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আমার কোনো কোনো নাটক প্রচারিতও হয়েছে। গানও গেয়েছি। সামান্য চেষ্টায় কিছু মিউজিকও শিখেছিলাম। অল্প কসরতেই ছবি আঁকা শিখেছিলাম। কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রাদেশিক

পুরস্কারও জিতেছি। আল্লামা শামস নাভীদ উসমানীর 'কিয়া হাম মুসলমান হেঁ?' গ্রন্থটি আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। এই বইটি পড়ার পর ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গল্প লিখতে শুরু করি। আমার সেসব গল্প বিশেষ করে রামপুর থেকে প্রকাশিত 'নূর' 'বাতুল' এবং 'জিকরা' প্রভৃতি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময় নূর পত্রিকায় কলাম লেখক হিসেবে আমার একটি ইন্টারভিউও ছাপা হয়েছিল।

বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-কে চিঠি লিখি। চিঠিতে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে- আমার বয়স এখন সতের ইত্যাদি উল্লেখ করি। আমার চিঠি যখন সাহারানপুর পৌঁছায়, হযরত শায়খুল হাদীস রহ. তখন মদীনার উদ্দেশে রওনা হচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক খাদেমকে চিঠিটির প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে আমাকে উত্তর লেখার দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই খাদেম তখন আমার বয়স বিবেচনা করে জবাবী চিঠিতে পছন্দসই স্ত্রী-প্রাপ্তির একটি তাবিজও লিখে পাঠান। এই বয়সে ভাই-বোনদের মধ্যে চিঠিপত্র সংরক্ষিত থাকা মোটেও সহজ কথা নয়। আমার ছোট বোন জয়নব চিঠি পেয়েই খুলে ফেলে। চিঠি পড়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। বলতে থাকে- ভাই মিয়া! আপনি কাকে বিয়ে করতে চান? তাবিজের কী দরকার ছিল? আমাকে বলুন, আমি আম্মুকে বলে দিই। আমি তো ভয়াবহ লজ্জায় পড়ে গেলাম। এই রকমের বিষয়ে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করাও সহজ কথা নয়। আমার মন ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত পুনরায় চিঠি লেখার আর হিম্মত হয়নি।

তারপর যখন আমি মিরাঠ কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করছি, হযরত শায়খুল হাদীস রহ. মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাহারানপুর আগমন করেন। আমার বড় দুলাভাই স্বভাবে যেমন কোমল তেমনি অসামান্য বিনয়ী মানুষ। তিনি আমাকে বললেন- কালিম! হযরত শায়েখ সাহারানপুর তাশরিফ এনেছেন, চলো সাক্ষাৎ করে আসি। আমি বললাম- খুব ভালো। আমি তখন নতুন একটি বেলবটম প্যান্ট এবং একটি আধুনিক ফ্যাশনের শার্ট বানিয়েছি। নতুন কাপড় পড়লাম। ভাই সাহেবের সাথে আসর নামাযের পূর্বেই সাহারানপুর গিয়ে হাজির হলাম। মাজাহেরে উলুম-এর পুরনো মসজিদে আসর নামায আদায় করলাম। নামাযের সাথে সাথেই মজলিস হলো। সকলেই নিজ নিজ আসন দখল করে নিলো। আমরা বাইরে জুতা রাখার স্থানে কোনো রকম দাঁড়াবার

জায়গা পেলাম। কোনো একটি কিতাব পাঠ করা হচ্ছিল। কিতাবপাঠ শেষ হওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ঘোষণা করলো- যারা চলে যাবেন তারা মোসাফাহা করুন। আর যারা এসেছেন তারা সকালে মোসাফাহা করবেন। আগেই উল্লেখ করেছি- আমার দুলাভাই অসামান্য বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন– আমরা পাপী মানুষ এত বড় বুযুর্গের সাথে কিভাবে হাত মিলাই। আমি এখান থেকেই জিয়ারত করে নিচ্ছি। তুমি গিয়ে হাত মিলিয়ে এসো। আমি বললাম– আমি বিদায়ীদের সাথে মোসাফাহা করবো এবং আগতদের সাথেও মোসাফাহা করবো। লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন আমার পালা এলো তখন হযরত আমার হাত চেপে ধরলেন। পরম মমতায় হাত চেপে রেখেই সামান্য হেসে ভরাট কণ্ঠে বললেন- এসো প্রিয়, আজ তোমার সাথে হাত মিলানোর জন্যেই বসেছি। তুমি আগতদের সাথেও হাত মিলাবে, বিদায়ীদের সাথেও হাত মিলাবে। আজ প্রাণভরে মোসাফাহা করে নাও। তিনি এ কথা বলছিলেন আর মিটিমিটি হাসছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমার হাত চেপে ধরে রাখেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত মোসাফাহার লাইন দাঁড়িয়ে থাকে। মাওলানা নাসির সাহেব- যার সাথে পরে পরিচয় হয়েছে- আমার হাত ছাড়াবার জন্যে হযরতের কাছে সুপারিশ করতে থাকেন। তার অনুরোধ তখন আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। আমি ভাবছিলাম, মোসাফাহা যত দীর্ঘ হয় ততই আমার জন্যে আনন্দদায়ক।

প্রশ্ন : হযরত শায়খুল হাদীস রহ. যে বললেন- তুমি আগতদের সাথেও হাত মিলাবে এবং বিদায়ীদের সাথেও হাত মিলাবে- তো তিনি কি আপনার কথা শুনে ফেলেছিলেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : তখন তো আমার কাছে এমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন চিন্তা করি এতটা দূর থেকে আমার কথা শোনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাশফ বা অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত হয়তো জেনে ফেলেছিলেন।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

মাওলানা সিদ্দিকী : কিছুক্ষণ পর হযরত আমার হাত ছেড়ে দিলেন। সেই মোসাফাহার স্বাদ এখনও আমি অনুভব করি। এশার নামাযের কিছুক্ষণ পর ভাই সাহেব বললেন- এখন খাতুলির ট্রেন আছে। হযরতের সাথে সাক্ষাৎ তো হলোই, মোসাফাহাও হলো। চলো, এখনই চলে যাই। সকালের ট্রেনে প্রচুর ভীড় হবে। আমরা চলে আসি। তারপর আমি এক দুটি চিঠি লিখেছি। উত্তরও

এসেছে। এই সময়ে মিরাঠের একজন কারী সাহেব যিনি ফুলাতে থাকতেন- তার ক'জন মুক্তাদি এবং মিরাঠের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সাহারানপুর যান। ফুলাতের সাথে হযরতের ছিল মনের সম্পর্ক। ফুলাতের কেউ গেলে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ডাকতেন। তাঁদেরকেও ডাকলেন। হযরত শায়েখ রহ. তাদেরকে বললেন- ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন হযরত! আমি তো দীর্ঘদিন হলো মিরাঠে আছি। তো ফুলাতে আপনার বন্ধু কে? হযরত বললেন- কালিম। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মিরাঠ ফিরে যান। পরে আমার বড় ভাই এডভোকেট মুহাম্মদ আলীম সিদ্দিকীকে- যিনি তখন ওকালতি করতেন- জিজ্ঞেস করেন, ফুলাতে কালিম সাহেব কে? হযরত তার কথা আলোচনা করছিলেন। বড়ভাই বললেন- ফুলাতে কালিম তো আমার ছোট ভাই। মিরাঠে পড়াশোনা করতো। কারী সাহেব বললেন- না, সে কোনো ছেলে মানুষ নয়। কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি হবেন। কারণ, হযরত বলছিলেন ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন।

হযরত শায়েখের সেই মমতাপূর্ণ মোসাফাহাকে আমি আমার জীবনের বাঁক পরিবর্তনের বড় একটি ভিত্তি মনে করি। আমাদের ফুলাতে হাফেয আবদুল লতিফ নামে এক ব্যক্তি কাসেমপুরী মাদরাসায় পড়াতেন। তিনি ছেলেবেলাতেই হযরতের কাছে মুরীদ হয়েছিলেন। সেকালে হযরতের দরবারে ভীড় ছিলো না। একবার তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হযরতের কাছে চিঠি লিখলেন। তার চিঠির উত্তরে হযরত তাকে লিখেছিলেন- ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন। তার সাথে গিয়ে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করবে। উত্তরে হাফেয সাহেব লিখেছিলেন, ফুলাতে তো কালিম নামে একজন ছেলে থাকে। সে কলেজের ছাত্র। তার উত্তরে হযরত এই অধমের সাথে সম্পর্ক রাখতে আদেশ দেন। ভেবে আমি এখনও বিস্মিত হই- সেকালে হুক্কা এবং বিড়ির গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। বমি হয়ে যেতো। হাফেয সাহেব আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছিলেন- হযরত লিখেছিলেন- সে হুক্কা এবং বিড়ির গন্ধ মোটেও সহ্য করতে পারে না। বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখবে। এদিকে হাফেয সাহেব ছিলেন হুক্কা এবং বিড়ির পাগল।

পরে ধীরে ধীরে শায়খের সাথে বন্ধন গভীর হতে থাকে। তারপর মসীহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান রহ. মাজাহেরুল উলুম মাদরাসার নাজেম মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর দরবারেও গিয়েছি। তাদের সাথে একাধিক পত্রালাপ হয়েছে। হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর দরবারে আসা যাওয়া হতো। প্রথম দিকে হযরত আমাকে মানুষের সামনে পরিচয়

করিয়ে দিতেন। আমি স্বভাবগতভাবেই খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ। কিছুটা হীনমন্যতারও শিকার। হযরতের এ জাতীয় সম্মানপ্রদর্শনমূলক মমতা আমি অনেকটা বোঝা অনুভব করতে থাকি। একবার হযরতের কাছে নিবেদন করলাম- মন চায়, বার বার আসি। কিন্তু মানুষ আঙুল তুলে তাকায়। লজ্জাবোধ করি। যদি লাইনে দাঁড়িয়ে মোসাফাহা ও সাক্ষাতের অনুমতি হয় তাহলে বার বার উপস্থিত হওয়ার সাহস পাই। হযরত আমার নিবেদন কবুল করলেন। কিন্তু একবার বললেন- ভালোবাসা কাজে লাগে এই পরিচয়ও কাজে লাগবে।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানার সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক কিভাবে হলো?

মাওলানা সিদ্দিকী : এই অধম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বইপত্র নিয়মিতই পাঠ করতো। আমাদের ছোট ভগ্নিপতি সাইয়েদ সাঈদ আক্তার সাহেব একবার এক ব্যক্তির পারিবারিক লাইব্রেরী কিনে নেন। সেখানে হযরত মাওলানার অনেক বইপুস্তক পেয়ে যাই। তারীখে দাওয়াত ওয়া আজীমত, সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, তাযকেরা শাহ ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী প্রভৃতি। কিন্তু বুযুর্গ হিসেবে আমাদের অঞ্চলে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না। ফুলাতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ঘটনাবলী তো ঘরের বৃদ্ধা মহিলারা বরকতের জন্যে এমনিতেও বাচ্চাদের শুনিয়ে থাকে। একদিন একটি ঘটনা পড়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে যায়। আমি তখন হযরতের 'নুকুশে ইকবাল' গ্রন্থটি পাঠ করছিলাম।

শিরোনাম ছিল 'ইকবাল দারে দৌলত পর'। এই শিরোনামের অধীনে ইকবালের ভালোবাসা এবং গভীর প্রেমস্নাত মদীনা জিয়ারতের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। হযরত রহ.-এর হৃদয়ের ভাষায় অংকিত সেই কাহিনী পড়ে এই অধমের মনের অবস্থা ছিলো অন্য রকম। মনে হচ্ছিল যেনো, সেই মদীনার কাফেলায় এই অধমও উপস্থিত। সেই সময়টাতে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারতের আবেগও ছিল মর্মস্পর্শী। তাঁর জিয়ারত লাভের প্রত্যাশায় কত রকমের আমল করেছি। ক্রমাগত আমার তৃষ্ণা বেড়েছে। এই অধমের প্রতি আল্লাহ তায়ালার মমতা জেগেছে। এত শত বুযুর্গের সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আমার আল্লাহ এই অধমকে হযরত মাওলানার কদমের সামনে এনে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : বিষয়টা আসলেই আশ্চর্য হওয়ার মতো। এখানে এই এলাকায় এত বড় বড় ব্যক্তি। সকলের সাথেই আপনার পরিচয় এবং সম্পর্ক সবই ছিল। হযরত মাওলানার সাথে কোনো পরিচয় ছিল না। তো তাঁর কাছে পৌঁছালেন কিভাবে?

উত্তম : আসলে একটি স্বপ্নে আমাকে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে মাওলানা আলী মিয়ার মধু চেটে খাওয়ার নির্দেশ করা হয়েছিল। আমি হযরত মাওলানাকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী নামে জানতাম। স্বপ্নে দেখলাম মাওলানা আলী মিয়া। মাওলানা আলী মিয়া কে? সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি অস্থিরতায় ব্যাকুল। পরে নাঈম ভাই বললেন, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী-ই মাওলানা আলী মিয়া। এ কথা জানার পর আমি তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখি। হযরত স্নেহভরা ভাষায় তার জবাব পাঠান। জবাবী চিঠিতে এই কবিতাটিও ছিল-

بہر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر
جو بوقت نازؔ کچھ جنبش ترے ابرو میں تھی

অফুরন্ত হৃদয়তৃপ্তি তুলে রেখেছে - ভেবে মহাধন
প্রণয়কালে ভুরুতে তোমার যে সামান্য আন্দোলন॥

চিঠির সাথে ভাড়ার জন্যে মনিঅর্ডারও পাঠান। আলহামদুলিল্লাহ! আমি হযরতের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে খানকায় সেদিন গিয়ে উঠি যেদিন ইন্দিরা গান্ধী হযরতের সাথে দেখা করার জন্যে খানকায় এসেছিলেন। বাংলোর বাইরে দেখি সারি সারি গাড়ি। পরিচয় বলার পর হযরত আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমরণ তিনি এই গ্রাম্য গোঁয়ার ছেলেটিকে তাঁর পায়ের সাথে জড়িয়েই রেখেছেন। আমি এখনও ভেবে বিস্মিত হই, কত বুযুর্গের সাথে আমার গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক। হযরত মুফতী মাহমুদ সাহেব রহ., হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ., হযরত মাওলানা কারী সিদ্দিক আহমদ রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম জৌনপুরী রহ., হযরত মাওলানা এনামূল হাসান কান্দালভী রহ., হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান কান্দালভী, হযরত মাওলানা মোকাররম হুসাইন সংসারপুরীসহ কত বুযুর্গের সাথে এই অধমের গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সম্পর্ক! তাঁদের দরবারে আসা-যাওয়া আছে। আছে পত্র যোগাযোগ। কিন্তু এই অধমের প্রতি আল্লাহ তায়ালার কত বড় করুণা, তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর কিছু বঞ্চিত বান্দার হেদায়েতের উসিলা হিসেবে এই পাপীকে কবুল করবেন। তাই তিনি আমাকে

অন্য সকলের মধ্যে হযরত মাওলানার সাথে জুড়ে দেন। সত্যিই সেটা ছিল আমার জীবনে এক অসামান্য বরকতময় মুহূর্ত।

উমর নাসেহী : হযরত মাওলানার হাতে আপনি কত সালে মুরীদ হন এবং কখন খেলাফত লাভ করেন? আপনি কি হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর কাছেও মুরীদ হওয়ার দরখাস্ত করেছিলেন? শুনেছি তিনি আপনাকে খেলাফতও দিয়েছিলেন। আসলে ঘটনাটা কী?

মাওলানা সিদ্দিকী : আসলে বুযুর্গদের পক্ষ থেকে খেলাফত তিন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত মুরীদের প্রতি পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে তাকে যোগ্য মনে করে আল্লাহর বান্দাদের এসলাহ তরবিয়ত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে খেলাফত দান। এটাই প্রকৃত খেলাফত। এটা একটা একান্ত নিয়ামত। একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণই এই নিয়ামত প্রাপ্ত হোন। দ্বিতীয় আরেকটি হলো- কোনো অঞ্চলের পশ্চাতপদতার প্রতি লক্ষ করে সেই এলাকায় কাজ করার জন্যে দীনের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোনো ব্যক্তিকেও অনেক সময় শায়েখ খেলাফত দান করেন। তারপর দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করেন। তৃতীয় আরেকটি প্রকার হলো- আমাদের মতো লোকদের খেলাফত দান। উদ্দেশ্য- খেলাফতের নামে অন্তত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। ভাববে, চলো, খলিফা যখন হয়েছি তখন পাপ থেকেও বেঁচে থাকি। তোমার জানা থাকার কথা, হযরত গঙ্গুহী রহ. একবার এক বাঙ্গালীকে হাদীসের সনদ দিয়েছিলেন। সনদটি লেখা ছিল আরবি ভাষায়। সেখানে সেই ব্যক্তির নামের সাথে বাঙ্গালী কথাটিও লেখা ছিল। আরবিতে বাঙ্গালী শব্দটি 'বান্‌জালি' লেখা হয়। তখন তার এক বন্ধু তাকে বললো- কিছুটা দুষ্টুমি করেই- হযরত তোমাকে নামের সাথে গালি লিখে দিয়েছেন। সে হযরতের কাছে ফিরে আসে। হযরত বুঝিয়ে দেন আরবিতে বাঙ্গালী কথাটি এভাবে লেখা হয়। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব রহ. হযরতকে বললেন- এমন একজন বেকুবকে আপনি হাদীসের সনদ দিলেন? হযরত এর উত্তরে বলেছিলেন- এই সনদের কারণে সে নিজেকে মাওলানা ভাববে। মসজিদে পড়ে থাকবে। নইলে চুরি ডাকাতি করে দীনদারদের বদনাম করবে। আমার হযরতও হয়তো এই উদ্দেশ্যেই আমাকে খেলাফত দিয়েছেন। ভেবেছেন, হয়তো এই সম্পর্কের সম্মানে নিজেকে রক্ষা করে চলবে।

প্রশ্ন : জানতে চাচ্ছিলাম- আপনি হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর কাছে বাইয়াতের দরখাস্ত করেছিলেন?

উত্তর : আসলে বিষয়টা ছিল এই- স্বপ্নটি দেখার পর আমি অস্থির হয়ে পড়ি। জালালাবাদে হযরত মসীহুল্লাহ খান রহ.-এর মজলিসে আমি বরাবরই যেতাম। প্রথমেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বাইয়াত হওয়ার দরখাস্ত করি। তিনি বললেন- আপনি মাওলানা আলী মিয়ার কাছে বাইয়াত হোন। জালালাবাদ থাকতেই আমার মনে হলো- হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব তো মদীনা মুনাওয়ারা চলে যাচ্ছেন। সাহারানপুর গিয়ে হযরতের সাথে দেখা করে আসি। আমি যখন গিয়ে পৌঁছাই তখন সাক্ষাৎদান বন্ধ হয়ে গেছে। খাদেমগণ সাক্ষাৎ করতে দর্শনার্থীদের নিষেধ করে দিয়েছে। আমি আমার ক্ষুদ্রতার কারণেই মূলত মনে করেছি, আমার দেখা হওয়া উচিত এবং অনেকটা অধিকার মনে করেই এক খাদেমকে বললাম- হযরতকে গিয়ে বলুন, ফুলাত থেকে কালিম এসেছে। হযরত আমাকে ঘরে ডেকে নিলেন। অত্যন্ত মমতার সাথে নিজ হাতে কলা ছিলে আমাকে খেতে দিলেন। আমি আরয করলাম- হযরত! আমাকে মুরীদ করুন। হযরত বললেন- প্রিয় কালিম! তুমি মুরীদ হবে মাওলানা আলী মিয়ার কাছেই। আর খেলাফত আমি দিচ্ছি। হযরত মাওলানা সানী হাসানী হযরতের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন- দেখ সানী! কেউ যদি মুরীদ হতে চায় তাহলে যেন কালিমের হাতে মুরীদ হয়। আমি আগে থেকেই হীনমন্যতার শিকার ছিলাম। তখন মনে মনে ভাবলাম- মুরীদ হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করারও নিশ্চয় কোনো আদব আছে। বিশেষ কোনো নিয়ম আছে। আমি গ্রাম্য গোঁয়ার ছেলে বিধায় হযরত আমার সাথে রসিকতা করছেন। তারপর আমি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করি। বলতে থাকি- হযরত! আমি তো আদব জানি না। আপনাকে আমি কিভাবে বলবো- আমার তো জানা নেই। হযরত বললেন- প্রিয়, তোমাকে আমি ভালোর জন্যেই বলছি। মুরীদ তুমি আলী মিয়ার হাতেই হও। খেলাফত আমি দিচ্ছি।

প্রশ্ন : আপনি কি হযরতের কাছে আপনার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন?

উত্তর : না, এটাই তো বিস্ময়ের বিষয়। উভয় বুযুর্গ কোথা থেকে একথা বললেন- মুরীদ তোমাকে আলী মিয়ার হাতেই হতে হবে।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

মাওলানা সিদ্দিকী : এটা ১৯৭৭ সালের কথা। তারপর আমার মামা সাইয়েদ মুহাম্মদ আরেফ আমাকে হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেবের খেদমতে নিয়ে যান। তাঁর সাথে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং স্মরণীয় সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সাক্ষাতের কিছু কথা এবং তার বরকত এই অধম জীবনভর উপব্ধি করেছে এবং বিস্মিত হয়েছে।

প্রশ্ন : তারপর হযরত মাওলানার হাতে বাইয়াত কিভাবে হলেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : আমি রায়বেরেলী খানকায় গেলাম। হযরত মাওলানা অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমাকে গ্রহণ করলেন। মাওলানা মুহাম্মদ সানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন- এ হলো কালিম মিয়া। যার কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সানী হযরতকে বললেন- এই কয়েকদিন আগে এঁর সাথে হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর দরবারে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার দিকে ফিরে বললেন- আপনিই তো, নাকি? হযরত যে কাঁচা ঘরে ডেকে সাক্ষাৎ করলেন। আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। আমি হযরতের কাছে মুরীদ হওয়ার দরখাস্ত করলাম। খানকার মসজিদে হযরত আমাকে মুরীদ করে নিলেন। আসরের পর অনুষ্ঠিত মজলিসে আমার উদ্দেশে আশাব্যঞ্জক নানা কথা বললেন। বললেন- আল্লাহ তায়ালার ভান্ডারে কোনো কিছুর অভাব নেই। বিশেষ কারণে আল্লাহ তায়ালা নবুওয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন। কুতুব, ওলী এবং আল্লাহ তায়ালার মারেফাত ও মাহবুবিয়ত-এর পথ এখনও খোলা। প্রয়োজন শুধু বান্দার পক্ষ থেকে সাধনা। এর জন্যে নিজেকে পরিপূর্ণ কাঙালরূপে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা চাই। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

আর তোমার প্রভুর দান সীমাবদ্ধ নয়।

তারপর আমি নদওয়ায় ভর্তি হয়ে গেলাম। এমনিতেই গ্রাম্য এবং গোঁয়ার ছিলাম। কিতাবপত্র পড়ার আগ্রহ ছিল প্রচুর। দেওবন্দের মনীষীদের ইতিহাস এবং ওয়ালীউল্লাহী খান্দানের বুযুর্গগণের জীবনী পড়তাম। স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল। হযরত যখন কোনো কিছু বলতেন প্রতিটি কথার পিঠেই আমি কিছু না কিছু বলতাম। মানুষ মনে করতো, এ কেমন বেতমিজ ছেলে! কথার পিঠে কথা বলে। হযরতের মমতার কথা ভেবে এখনও কৃতজ্ঞতায় সংকুচিত হই- এই কারণে তিনি কখনও আমাকে কিছু বলতেন না। শাসাতেনও না। বরং

উৎসাহ দিতেন। কখনও কখনও অজ্ঞতাবশত নিজেকে জ্ঞানী মনে করেও অনেক কথা হযরতের সামনে তুলে ধরতাম। এখন যখন সেসব কথা মনে পড়ে তখন লজ্জায় মুখ লুকাতে ইচ্ছা করে। তারপর হযরতের সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকার পর হযরতকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। পরে আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে- সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত, আগমন ও প্রস্থানের দুটি সালাম ছাড়া আর কোনো কথা বলারও হিম্মত হতো না।

প্রশ্ন. হযরত আপনাকে খেলাফত দিয়েছিলেন কখন?

উত্তর. বার বার সেই খেলাফতের কথা। বলতে ও শুনতেও লজ্জাবোধ হয়। আসলে আমি ২৭ মার্চ হযরতের হাতে মুরীদ হই। সে বছরই ১২ আগস্ট হযরত রহ. ফজর নামাযের পর মসজিদেই আমাকে কাছে ডাকেন। কাছে যাওয়ার পর বলেন- আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি তোমাকে একটি কথা বলছি। আল্লাহর কোন বান্দা যদি আমাদের সিলসিলায় তোমার কাছে মুরীদ হতে চায় তাহলে তুমি তাকে মুরীদ করে নিও। আমি তোমাকে খেলাফত দিচ্ছি। আমি অনেক আশা নিয়ে হযরতের কাছে মুরীদ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হয়তো কিছুটা সৎ এবং নেক হতে পারবো। আমার জীবনে হয়তো সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মতো নামায নসীব হবে।

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সাথে সংশিণ্টষ্ট হওয়ার পর যেভাবে তাঁর মুরীদদের নসীব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, আমি আমাকে চারিত্রিক সকল মন্দগুণ থেকে পবিত্র করতে পারবো। হযরতের এই বাণী শোনার পর মনে হলো যেন আমার উপর বজ্রপাত হলো। মনে হলো, একজন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী! চিকিৎসক অবশেষে নিরাশ হয়ে তাকে বলে দিয়েছে- তুমি এখন স্বাধীন। সবকিছু খেতে পারবে। তোমার আর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হলো, আমাকেও ঠিক তেমনিভাবে নিরাশ হয়ে রেফার করে দিয়েছেন। মনে প্রচন্ড আঘাত পেলাম। হযরতের পা জড়িয়ে ধরলাম। খুব কাঁদলাম। বললাম- আপনি কখনও এমনটি করবেন না। আমাকে এমন কথা বলবেন না। আমি যদি এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাই, তাহলে আমার সংশোধন হবে কোথায়? হযরত আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

সে সময়টা ছিল আমার জন্যে চরম কষ্টের। তিন দিন আমি থাকলাম। নানা রকমের দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ভীড় করছিল। বিষয়টি হযরত অনুভব করতে পারেন। আমাকে ডেকে বললেন- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছে কি তোমার যাতায়াত আছে? আমি বললাম- হ্যাঁ, যাই। তিনি

বললেন যাওয়া উচিত। আমাদের বুযুর্গ। আমি তখন নিজের অবস্থা খোলামেলাভাবে আলোচনা করার জন্যে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে সফর করলাম। ভাবলাম, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছ থেকে কোনো সুপারিশ লিখে নিয়ে আসবো। এলাহাবাদ গিয়ে জানতে পারলাম তিনি সেখানে নেই। প্রতাবগড়ে আছেন। গেলাম প্রতাবগড়ে। শুনলাম দু'দিন আগেই সেখান থেকে চলে গেছেন। গেছেন রানীগঞ্জে। গেলাম সেখানে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, একদিন আগে সেখান থেকে তাঁর বাড়ি ফুলপুরে চলে গেছেন। মাগরিব নামাযের পর রওনা হলাম ফুলপুরের উদ্দেশে। বর্ষাকাল। বৃষ্টির মওসুম। কোনো রকমের যানবাহন নেই। এরই মধ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে এশার সময় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

হযরত অসুস্থতা ও দূর্বলতার কারণে ঘরেই নামায পড়ছিলেন। মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ঘরে গেলাম। হযরত যখন জানতে পারলেন, আমি এলাহাবাদ, সেখান থেকে প্রতাবগড়, রানীগঞ্জ হয়ে পায়ে হেঁটে ফুলপুর পৌঁছেছি, তখন খুবই খুশি হলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখা চিঠিপত্রেও তাঁর একান্ত মমতা এবং ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আমার প্রতি যে আন্তরিকতা কৃপা ও স্নেহের আচরণ করেছেন সে কথা ভাবতে গেলেও লজ্জায় সংকুচিত হই। রায়বেরেলীর খানকা এবং হযরত রহ.-এর নামই ছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছে পরম তৃপ্তির বিষয়। তারপর প্রচন্ড গরমের মধ্যে সফরের সামান্য কষ্টভোগ হযরতকে আরও আপ-ুত করেছিল। অধমের প্রতি তাঁর মমতা উথলে উঠেছিল। খানাপিনা এবং নামাযের পর আমাকে দ্র ত আরাম করার নির্দেশ দেন। বলেন, সকালে কথা হবে।

প্রশ্ন. এই সফরে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবও কি আপনাকে খেলাফত দিয়েছিলেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : খেলাফতের কথা কী বলবো, হযরতের ঘর ছিল ছাপড়ার মতো। অত্যন্ত সাদাসিধা খাটিয়া বিছানো। আমি হযরতের কাছে আমার মুরীদ হওয়ার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত পেশ করি। এ-ও বলি- বড় আশা ছিল হযরতের কাছে মুরীদ হলে আমার আত্মার সংশোধন হবে। কিন্তু হযরত আমার প্রতি নিরাশ হওয়ার কারণে আমাকে মসজিদে ডেকে এ কথা বলে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রহ. তখন বললেন- অদৃশ্যের

ইশারাতেই বুযুর্গানে দীনের ফয়সালা হয়ে থাকে। তারপর বললেন- হযরত আলী মিয়াকে আসলে মানুষ বুঝেনা। একটু পরে বললেন- আসলে সকলেই তার প্রিয় ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখতে চায়। আলী মিয়াকে এলেমের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ থেমে থেমে বললেন- আলী মিয়া যদি নিজেকে প্রকাশ করেন তাহলে এই সময়ের পীর সাহেবরা মুরীদ পাবেন না। আমি তখন আমার অবস্থা এবং নিরাশার কথা বলি। এর পিঠে তিনি বলেন- আচ্ছা, কোনো একটি বিষয় প্রমাণ করার জন্যে কয়টি সাক্ষীর প্রয়োজন? আমি বললাম- স্বাভাবিক বিষয়ে তো দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য চারজনেরও প্রয়োজন পড়ে। মাওলানা বললেন- আচ্ছা, আমার সাক্ষী কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমি বললাম- আপনার সাক্ষ্যই যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে কার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে? তিনি তখন বললেন- আমিও আপনাকে খেলাফত দিচ্ছি। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি আপনার কাছে আসে তাহলে তাকে আমাদের সিলসিলায় মুরীদ করে নিবেন।

হযরতের মুখে একথা শুনে আমার নিরাশার অন্ধকার আরও ঘনীভূত হলো। সেখান থেকে ফিরে চললাম ফুলাতের উদ্দেশে। পথজুড়ে আমার চিন্তায় নানা দুশ্চিন্তার উড়াউড়ি। মিয়া উমর! প্রতিটি মানুষই তার নিজের অবস্থান থেকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। ছোট মানুষের চিন্তাও ছোট হয়। আমার বারবার মনে হতে থাকে, আমাদের এলাকায় হযরতের পরিচিতজন খুবই কম। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা যদি জানতে পারে কালিম হযরত মাওলানার খলিফা, তখন তাদের মনে হযরতের মর্যাদা কমে যাবে। ভাববে, মাওলানা আলী মিয়ার খলিফা এমন! আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, আচ্ছা! বিষয়টি হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং শরাফত খান সাহেব ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাদের দু'জনের পা জড়িয়ে ধরবো। তাদের থেকে ওয়াদা নিবো- বিষয়টি যেন তারা কাউকে না বলেন। এতে আমাদের হযরত অন্তত বদনাম থেকে বেঁচে যাবেন। আমি ঠিক এই ধরনের সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফুলাতে গিয়ে উঠি।

আমার বড় বোন– যার হাতে আমার লালন-পালন হয়েছে- এশার নামাযের পর আমাকে এসে বললেন, কালিম! আমি মুরীদ হতে চাই। আমি বললাম- আপু! তুমি হযরতের কাছে চিঠি লেখ। চিঠির মাধ্যমেই মুরীদ হয়ে যাও। তারপর যখন সাক্ষাৎ হবে তখন বাইয়াত নবায়ন করে নিও। তিনি

বললেন- না। আমি তো তোমার কাছে মুরীদ হতে চাই। আমি তার কথায় কিছুটা আশ্চর্যও হলাম এবং কিছুটা রসিকতা করে বললাম- দেখ, মানুষ তো মুরীদ হয় বুযুর্গদের হাতে। কারও সামনে কিন্তু এমন কথা বলবে না। তাহলে মানুষ আমাকে নিয়ে রসিকতা করবে। বলবে, কালিমের বড় বোনের এতটুকু বুদ্ধিও নেই- কার কাছে মুরীদ হতে হয়! আমার বোন জেদ ধরে বসলো। ফলে আমার আশ্চর্যের সীমা রইলো না। মনে মনে খুব পেরেশান হলাম। তারপর আমার মনের ভাব এবং সফরের পুরো কাহিনী হযরত রহ.-কে লিখে পাঠালাম। হযরত এর জবাব পাঠালেন। জবাবে এই কবিতাটিও লিখেছিলেন–

داداورا قابلیت شرط نیست
بلکه شرط قابلیت داداوست

আল্লাহর দানের জন্যে যোগ্যতা কোনো শর্ত নয়
তবে যোগ্যতার জন্যে আল্লাহর দান শর্ত।

এ-ও লিখেছিলেন- আমরা আমাদের শায়খের অনুসরণে যারা আসে তাদের মুরীদ করে নিই। আশায় থাকি, হয়তো তার হাতের কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করে দিবেন। তুমিও এই নিয়তেই কেউ আসলে মুরীদ করবে। এতে মনে কিছুটা সান্ত্বনা এবং ভরসা পাই। তারপরও নানা দুশ্চিন্তা ভেতরে উড়াউড়ি করতেই থাকে। এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা যাচ্ছিল। আমি তখন তার হাতে হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর উদ্দেশে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখি। আমার এই দুরবস্থার জন্যে হযরতের কাছে দুআ প্রার্থনা করি। উত্তরে হযরত শায়খুল হাদীস রহ. লিখেন- এই অধম তো প্রথমেই তোমাকে খেলাফত দিয়েছে। হয়তো নিজের অবস্থার কারণে তোমার পেরেশানী হচ্ছিল। বিষয়টি তুমি এভাবে বুঝ- খেলাফত এটা চিকিৎসার সনদ। সুস্থতার সনদ নয়। সুতরাং এখন নিজেরও চিকিৎসা করো, অন্যেরও চিকিৎসা কর। হযরতের এই বাক্যটি পাঠ করার পর মনে অনেকটা সান্ত্বনা পাই। তারপর যখন এই খেলাফতদানের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে নানা ধরনের পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হয়, তখন বুঝতে পারি এর মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। সুতরাং এই খেলাফতদান হলো কাউকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এবং এটা তৃতীয় স্তরের খেলাফত।

প্রশ্ন : এর বাইরেও শাম এবং মদীনার দু'জন বুযুর্গ আপনাকে খেলাফত দিয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানতে পারি?

মাওলানা সিদ্দিকী : ভাই! কথা ছিল দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা হবে। তুমি আর কতক্ষণ খেলাফত খেলাফত করবে?

প্রশ্ন : মানুষের মধ্যে ভুল তথ্য জানাজানি হওয়ার চাইতে সঠিক তথ্য সংরক্ষিত হওয়া কি ভালো নয়?

মাওলানা সিদ্দিকী : তার মানে তুমি এসব কথা সংরক্ষিতও করতে চাচ্ছো?

প্রশ্ন : এখন আমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। পরে হয়তো কাজে লাগবে। আচ্ছা, সেই দু'জন বুযুর্গের পরিচয় কি জানতে পারি?

উত্তর : তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শায়েখ আহমদ মুজতাবা আলাভী মালেকী কাদেরী। তিনি শায়েখ আলাভী মালেকীর আপনজন। ইনি আসলে শায়েখ আবু তাহের কুরদী মাদানী রহ.-এর শিষ্য ও খলিফা। শায়েখ মুহসিন মুকবিল আলাভী- হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর সহপাঠী'র ষষ্ঠ পুশতের- কাদেরিয়া সিলসিলার বুযুর্গ। তিনি আমাকে সিলসিলার খেলাফতদানের সময় একটি খান্দানী পাগড়িও দান করেছিলেন। পাগড়িটি সম্পর্কে নানা ধরনের কথা মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। হযরত শায়েখ আলাভী মালেকী রহ. মানুষের মাঝে প্রচারিত সেইসব বরকত হাসিল করার জন্যে পাগড়িটি আমার কাছ থেকে কয়েক দিনের জন্যে নিয়ে নেন। আমি তাঁকে স্থায়ীভাবেই পাগড়িটি হাদিয়া করে দেই। কারণ, আমার দৃষ্টিতে তিনিই এর যথাযোগ্য অধিকারী।

দ্বিতীয়জন হলেন- হিজবুল বাহার- এর লেখক শায়েখ আবুল হাসান শাযালী রহ.-এর সিলসিলার বুযুর্গ শায়েখ সালেহ হামুদী শাযালী। তিনি আমাকে হেরেম শরীফের রুকনে ইয়ামানীর সামনে মাতাফে খেলাফত দান করেছেন। তবে এ সবই হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খেলাফত।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানা রহ.-এর সান্নিধ্যে আপনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। এ সম্পর্কিত আমাদের জন্যে উপকারী কোনো কথা?

উত্তর : এর জন্যে চাই ভালোবাসা এবং পারস্পরিক চিন্তার মিলবন্ধন। আলহামদুলিল্লাহ! আমার আল্লাহ আমাকে এই দুটো জিনিসই দান করেছেন। হযরত রহ.-এর প্রতি আমার ভালোবাসা ছিলো এমন- তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এসে আরেকটি চিঠি লিখতে বসতাম। তেইশ বছরের সম্পর্কের

পরিসরে হয়তো এক-তৃতীয়াংশ সময় আমি হযরতের দরবারে আসা-যাওয়ার মধ্যে খরচ করেছি। আমার কাছে হযরত রহ.-এর ৪৩২ টি চিঠি সংরক্ষিত আছে। তারপরও মন সদা অস্থির থাতো। মুনাসাবাত ও মানসিক মিলের বিষয়টি ছিল এমন- হযরতের পক্ষ থেকে এসলাহ ও সংশোধনের সাধারণ রীতির বাইরে আমাকে বিভিন্ন বুযুর্গের দরবারে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। যে কোনো বুযুর্গের দরবারে হাজির হতাম, তাঁর প্রতি আমার ভক্তি বৃদ্ধি পেত। সেই সাথে বার বার মনে হতো-

آفا قہا گر دیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

ঘুরেছি পৃথিবী, হেরেছি তার রূপ রূপসী যত
হাজার সৌন্দর্যের ভিড়ে তুমি 'তোমারই মত'

হযরত রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে সবচে' গভীরভাবে যে যিনিসটি আমি অর্জন করেছি তা হলো- আমার অযোগ্যতার উপলব্ধি। অনেক সময় তো এই চিন্তা আমাকে চরমভাবে পরাজিত করে রাখতো। হযরত রহ. তাঁর অধিকাংশ চিঠিতেই এমনকি সাক্ষাতেও আমাকে বার বার বলতেন- চিঠিতে তোমার অবস্থা পড়ে নিজের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জিত হই। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কত উত্তম আত্মিক অবস্থায় ভূষিত করেছেন। আর আমি এসব বাক্য পড়ে যারপরনাই লজ্জিহ হতাম। ভাবতাম শায়খুল আরব ওয়াল আজম যিনি, তিনি নিজেকে কিভাবে চিন্তা করেন! আর আমাদের অবস্থা কী! লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ গলে যেতো। আক্ষেপ হতো- আমাদের প্রতি এমন যাদের করুণা, তাদের করুণার উপলব্ধিই বা কোথায়?

প্রশ্ন : হযরত শায়খুল হাদীস রহ. কি আপনাকে ফুলাত মাদরাসার খেদমতে নিযুক্ত করেছিলেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : আসলে হযরত শায়খুল হাদীস রহ. ফুলাতকে গভীর ভালোবাসতেন। হযরত মাওলানা এহতেশামূল হাসান কান্ধলভী রহ.- এর সাহেবজাদা হযরত মাওলানা এহতেরামূল হাসান ফুলাত থাকতেন। ফুলাতে তার অবস্থানের কথা জেনে হযরত আনন্দিত ছিলেন। কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তিনি এখান থেকে চলে যান। যখনই প্রসঙ্গটি উঠতো হযরত শায়খুল হাদীস রহ. বলতেন– এহতেরাম! তুমি কাজটি ভালো করোনি। ফুলাতের কাছে আমার অনেক আশা ছিল। তারপর হযরতের দরবারে আমার যাতায়াত শুরু হয়। এদিকে দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষ-উদযাপন উপলক্ষে

অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনের পর সেখানে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমি আমার হযরতের সাথে দেখা করার জন্যে দেওবন্দ যাই। দেওবন্দে তখন মজলিসে শুরার বৈঠক হচ্ছিল। আসলে আমি আগে মনে করতাম- আলেমগণ হলেন মাসুম এবং নিষ্পাপ শ্রেণী। তাই আলেমগণের মাঝে যখন মতের বিরোধ দেখতে পেলাম তখন আমার বিস্ময় এবং আক্ষেপের সীমা রইলো না। মূলত সে সময় আমি আমার হযরতকে পানিহীন মাছের মতো ছটফট করতে দেখেছি। আমি একবার হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-কে বিষয়টি বলি। আমি বললাম- হযরত আমি বুঝিনি! হযরত বললেন- গোড়া হলো ফুলাত। আর সবই হলো শাখা-প্রশাখা। কয়েকবারই এধরনের কথাবার্তা হয়। একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ প্রতাবগড়ী রহ.-ও এ বিষয়ে আমাকে নির্দেশনা দেন। আমি তখন মাদরাসার জন্যে চেষ্টা শুরু করি। তারপর যখন দারুল উলূম দেওবন্দে বিরোধ সৃষ্টি হলো, তখন আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। ভাবতে লাগলাম, এমন মুখলেস আওলিয়ায়ে কেরামের হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ এত সংকট, আমার মতো ভেতরে বাইরে উভয় বিচারে অন্ধকার ব্যক্তিত্ব যদি কোনো প্রতিষ্ঠান করে তাহলে তো সেখানে মন্দ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই চিন্তা থেকে আমি হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর খেদমতে ফেব্রুয়ারী মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় একটি চিঠি লিখি। চিঠিতে আমার অপারগতার কথা বলি। হযরত শায়খুল হাদীস রহ. সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিঠির জবাব দেন। চিঠিতে তিনি লিখেন- প্রকৃতকর্তা তো আল্লাহ। বান্দার কাজ সামান্য চেষ্টা করা। সে চেষ্টার দ্বারাই পুরস্কারের অধিকারী হয়। জীবনের এই সন্ধায় এসে যখন আমার পা মৃত্যুর সিঁড়িতে তখন প্রতিনিয়তই পূর্বসুরীদের প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমাগত বাড়ছে। ফুলাতের পূর্বসুরীগণ হলেন আমাদের পূর্বসুরী কাফেলার অগ্রপথিক। আমার মনের একান্ত কামনা- সৎলোকদের নিবাস ফুলাতের ইলমী ঐতিহ্য পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। এ বিষয়ে করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমার অনেক আশা।

এই অধম মনে করে, যদি কোনো অমুসলিমও এই মোবারক জনবসতিতে কোনো দীনি কাজ করার জন্যে সচেষ্ট হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকেও বঞ্চিত করবেন না। এই ধরনের সাহস জাগানিয়া পত্র পাওয়ার পরও মূলত হীনমন্যতার কারণে আমি হিম্মত করতে পারছিলাম না। কিন্তু যখন সে বছরই এপ্রিলে হযরত শায়খুল হাদীস রহ. এন্তেকাল করলেন তখন আমার মনোকষ্টের আর সীমা রইলো না। বার বার হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর

কথা মনে পড়াতে হযরতের চিঠিগুলো বের করে পড়লাম। চিঠি পড়ে আবেগে উদ্দেলিত হলাম। মাদরাসার জন্যে আবার চেষ্টা শুরু করলাম। শুনে আমাদের হযরত খুবই খুশি হলেন। সাহস দিলেন। মাদরাসার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন- জামিয়াতুল ইমাম ওয়ালীউল্লাহ । হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর রাখা নামের সম্মানে ফয়জুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ রাখা হয়।

উমর নাসেহী : দাওয়াতী কর্মে কিভাবে এলেন? দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আপনি ধর্মত্যাগী মুসলমানদের মাঝে কাজ করছেন। তারপর কিভাবে অমুসলিমদের মাঝে কাজ করতে শুরু করলেন, জানতে পারি?

মাওলানা সিদ্দিকী : এখন তুমি ঠিক জায়গায় এসেছো। আমাদের হযরত কিভাবে যেন জানতে পারলেন- সুনিপথের কাছে ভারত বিভাগ এবং বস্তি বদলের সময় লড়াই দাঙ্গায় প্রভাবিত হয়ে অনেক মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে বসে। হযরত রহ. আমাকে প্রকৃত বিষয়টি জানার জন্যে আদেশ দেন। সুনিপথ ফুলাত থেকে অনেক দূরে নয়। আমি আমার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক মসজিদ এখন মন্দির গুরুদুয়ার এমনকি জানোয়ারের বসতিতে রূপান্তরিত। এই অবস্থা দেখে আমরা অনেকটা উন্মাদের মতো হয়ে যাই। বিষয়টি হযরতকে জানাই। হযরত আমাদের কাজ করার আদেশ দেন। নানাভাবে সহযোগীতা করেন। দুই বছর পর্যন্ত আমরা সেখানে সার্ভে করতে থাকি। নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকি। ১৯৯০ সালের কথা। আদভানীর রথযাত্রার কালে আমাদের দু'জন বন্ধু মাষ্টার জিয়াউদ্দীন বিজনূরী এবং হাফেয নাসিম দিনাজপুরীকে এলাকার ডাকাতদের একজন সরদার মসজিদের মধ্যে শহীদ করে ফেলে। তারপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়। হত্যায় অংশগ্রহণকারী খুনিদের চারজনের তিনজন স্বপ্নে মাষ্টার জিয়াউদ্দীন সাহেবের দাওয়াতে মুসলমান হয়ে যায়। এই দু'জনের শাহাদাতের পর আলহামদুলিল্লাহ- ৪৭-এ যারা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলো তারা আবার মুসলমান হতে থাকে। সেখানে ইসলামের জয়ের ধার উন্মোচিত হতে থাকে।

এখানে কাজ করার সময় হযরত আমাদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। অন্তত দু'বার বলেছেন- সুনিপথে খুবই সস্তায় জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তারপর আল্লাহ তায়ালা পাঞ্জাব, রাজস্থান, মথুরা, আগ্রা, দিল্লি, হিমাচল প্রভৃতি অঞ্চলে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। স্কুলের নামে নানা মাদরাসা গড়ে ওঠে। এসব অঞ্চলে দীনি দাওয়াতের জন্যে সবচে' উপযুক্ত পন্থা ছিল এটা। আলহামদুলিল্লাহ! গ্রামের পর গ্রাম তাওবা

করে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে। এসবই ছিল আমাদের হযরতের বরকত। প্রথম দিকে হযরত যখন আমাকে সুনিপথে কাজের নির্দেশ দেন তখন আমি নিজেও ছিলাম বিস্ময়-বিভোর। আমার মতো একজন গোঁয়ারকে দিয়ে এ কাজ! কিন্তু হযরত রায়পুরী রহ.-এর একটি বাণী শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন- মুরীদ হওয়ার মজা হলো ফুটবল হওয়ার মধ্যে। এই বাণীটি স্মরণ করলাম। সাহস সঞ্চার করলাম। তারপর ফুটবল হওয়ার বরকত নিজ চোখে দেখতে লাগলাম।

প্রশ্ন : অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ কিভাবে শুরু করলেন? কিভাবে এ পথে এলেন- একটু বিস্তারিত জানতে পারি?

মাওলানা সিদ্দীকী : আসলে এর পিছনে দুটি কারণ ছিল। একটি জাহেরী আরেকটি হাকিকী। হাকিকী এবং প্রকৃত কারণ হলো- আমার হযরতের মা হযরত খাইরুননেসা রহ. ছিলেন একজন মুসতাজাবুত-দাওয়াত ওলী। তিনি আমার হযরতকে নানা রকমের দুআ দিয়েছেন। তিনি আমার হযরতের জন্যে সবচে' বেশি যে দুআটি করতেন তা হলো- আলী! তোমার হাতে যেন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আমার হযরতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই দুআ কবুল করেছিলেন। একটি মাধ্যম হয়ে সেই দুআর অধিকারী হই আমি। ছয় সাতটি চিঠিতে হযরত আমাকে লিখেছেন। দু'বার মুখে বলেছেন।

একবার দিল্লি বাওয়ানায় ৪ হাজার ডোম মুরতাদ নর-নারী রাত একটা বাজে দলবদ্ধভাবে তাওবা করে নতুন করে ঈমান আনে। তাদের নাম পরিবর্তন ইত্যাদি শেষ করতে করতে রাত আড়াইটা বেজে যায়। আমার আনন্দের আর সীমা থাকে না। এটাই ছিল এত বড় জনগোষ্ঠীর দলবদ্ধভাবে ঈমান নবায়নের প্রথম ঘটনা। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে হযরত রহ.-এর জননীকে দেখতে পাই- তিনি একটি পালঙ্কে উপবিষ্ট। মাথায় সম্রাজ্ঞীর তাজ। আমি কাছে যাই। মাথায় হাত রেখে দুআ করার জন্যে অনুরোধ করি। তখন তিনি কোমরে হাত রেখে বলেন- তুমি কি মনে করছো! এ তো আমার দুআর ফসল। তোমার দাওয়াতের জয় নয়। স্বপ্নটি আমি হযরত রহ.-কে লিখে জানাই। হযরত রহ. জবাবী চিঠিতে লেখেন- আমার মা আমার জন্যে সবচে' বেশি এই দুআটি করতেন– আলী! তোমার হাতে যেন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আমার মাধ্যম হয়ে আল্লাহ তায়ালা এই দুআ তোমার জন্যে কবুল করেছেন।

আমার অভিজ্ঞতা হলো, আমি কয়েকজন বড় মানুষকে দেখেছি। তারা দাওয়াত শেখার জন্যে, দাওয়াতের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে এসেছেন। কয়েকজন তো এ পথে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একজনও তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেনি। কারও কারও ক্ষেত্রে এমনটিও ঘটেছে- স্বেচ্ছায় তাদের কাছে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে এসেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কালেমা পড়াননি। তারপর তাঁরাই যখন হযরত রহ.-এর সিলসিলাভুক্ত হলেন তখন মানুষ তাঁদের হাত ধরে মুসলমান হতে লাগলো। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে মূল উৎস হলো আমাদের হযরত এবং তাঁর মায়ের মনের দুআ। আমার হযরতও আমাকে অনেক দুআ দিয়েছেন। এক বছর তো রমযান মাসব্যাপী নাম নিয়ে আমার জন্যে সম্মিলিতভাবে দুআ করেছেন। হযরত আমাকে এ-ও বলেছেন- আমি অজিফা মনে করে নিয়মিত নাম নিয়ে তোমার জন্যে দুআ করি।

এ পথে আসার আমার আরেকটি কারণ হলো- যেটাকে আমি জাহেরী কারণ বলেছি– সে আমার কন্যা। এমনিতে যাকে দিয়ে যে কাজ হবে তার কোনো না কোনো লক্ষণ আগে থেকেই দেখা যায়। আমার ছেলেবেলাতেই এক কুমার ছেলেসহ কয়েক ব্যক্তি এই অধমের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে এই কাজের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে আমার মেয়ে আসমা। ঘটনাটি আমাদের হযরতও তাঁর কয়েকটি আলোচনায় বলেছেন।

১৯৯০ সালের ৩০শে অক্টোবর। আদভানীর ডাকে রাম মন্দিরের রথযাত্রার আন্দোলন চলছে। চারদিকে ভয়াবহ দাঙ্গা। সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমাদের ঘরে একজন মহিলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মিত আসতো। তার নাম ছিল বালা। সে নিজেও খুব পঙ্কিার পরিচ্ছন্ন থাকতো। তার সাথে ঘরের শিশুদের ভালো সম্পর্ক ছিল। একটি কক্ষে বসে আমি কোনো একটি বই পড়ছিলাম। আমার মেয়ে আসমার বয়স তখন হয়তো আট বছর হবে। বৃষ্টির কারণে কাঁচা ফলমূল এক পাশে রেখে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছিল বালা। ঠিক গ্যালারিতেই আমার মেয়ে অত্যন্ত গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে তার সাথে একান্তে আলাপ করতে লাগলো। বিষয়টি আমার নজরে পড়লো। ভাবলাম- চারদিকে পরিবেশ খুবই ভয়াবহ। কোন্ কথা থেকে আবার কী হয়ে যায়- এই ভয়ে আমি কান পেতে তাদের কথা শুনতে

লাগলাম। শুনলাম- আসমা বালাকে বলছে- বালা, তুমি একজন কত্ত ভালো মানুষ! তুমি আরেকটু ভালো হয়ে যাও না! বালা বললো- সেটা কিভাবে? আসমা বললো- বালা, তুমি কার পূজা করো? বালা বললো- ভগবানের মূর্তির। আসমা বললো- এই মূর্তি কি তোমাকে কিছু দিতে পারবে? তোমার কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারবে? আমার তো ভয় হয়, তুমি যদি হিন্দু অবস্থায় মারা যাও, তাহলে নরকে জ্বলবে। বালা তুমি নরকের আগুন কিভাবে বরদাশত করবে?

আমি শুনে আশ্চর্য হই, এমন একজন ছোট্ট শিশু কিভাবে কুরআনের ভঙ্গিতে একজন মেয়েকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছে! আমি তখন অলক্ষে বাইরে চলে আসি। বালা আমাকে দেখে সেখান থেকে চলে যায়। আমি আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে পানি। আমি একান্ত মমতায় তাকে প্রশ্ন করি- আসমা! তুমি বালার সাথে কি কথা বলছিলে? সে আমাকে বললো- আব্বু! বালা কত ভালো মেয়ে। আমাদের কত ভালোবাসে! সে দোযখে জ্বলবে? আব্বুজি, তার কত কষ্ট হবে! এ কথা বলে সে আমার বুকে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। আমি দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত কুরআন পাঠ করি। তার এই অবস্থা দেখে কে যেন আমার ভেতর থেকে তেলাওয়াত করে উঠলো-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

আপনি হয়তো তারা ঈমান আনছে না বলে নিজেকে
ধ্বংস করে দিবেন। –শুআরা :৩

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবন-চরিত ভিডিওর মতো আমার আত্মায় আমার চেতনায় ভেসে উঠতে থাকে। মনে হতে থাকে, আমরা কেবল ডানদিক থেকে জুতা পরিধান করা, মিষ্টি খাওয়া এবং লাউ খাওয়ার অনুসরণ করেই নিজেদের সুন্নতের অনুসারী বলে দাবী করে বসছি। আসল সুন্নাত তো হলো নব বী দরদ। ওফাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও যে দরদ থেকে মুক্ত হতে পারেননি তিনি আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁর কেমন অনুসারী হলাম! আমাদের মাঝে সেই দরদের বিন্দুমাত্র নেই।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.-এর বার বার পড়া একটি বাণী মনে হতে লাগলো। বাণীটি হযরত থানভী রহ. বর্ণনা করেছেন।

উলামায়ে কেরামের মজলিসে একবার হযরত হাজী সাহেব রহ. বলেছিলেন- ভাই! তোমরা কুতুব হতে চাও? উপস্থিত লোকেরা বললো- অবশ্যই। হযরত তখন বললেন- আমি তোমাদের কুতুব হওয়ার একটি সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। যখন কোনো অমুসলিম মারা যায় তখন সামান্য সময় একাকী বসে কাঁদবে। ভাববে, আমাদের এক ভাই অনন্তকালের জন্যে দোযখে চলে গেলো। আমরা তার জন্যে একটু চিন্তাও করতে পারলাম না। যদি এটা করতে পারো, তাহলে কুতুব হয়ে যাবে। মনে হলো, কুতুব হওয়াই তো নবুওয়াতের উত্তরাধিকার। সেই তো নবীর উত্তরাধিকারী, যার মধ্যে রয়েছে নব বী দরদ। আমার চিন্তা-চেতনা স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। পরের দিন আমার হরিয়ানা সুনিপথে যাওয়ার কথা। এক যুবক আমাকে খুব ভালোবাসতো। এক পূজারীর পুত্র রাজকুমার। আমি রাজকুমারকে বললাম- তুমি আমাকে এতো ভালোবাস! যদি কালেমা না পড় তাহলে তো এই ভালোবাসা অর্থহীন! আট-নয় মিনিট আমি তাকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে বললাম। সে কালেমা পড়ার জন্যে রাজি হয়ে গেলো। কালেমা পড়লো। আরেক শর্মাজি আসার কথা ছিল। তিনিও এলেন। সামান্য কথা বলার পর তিনিও মুসলমান হওয়ার জন্যে রাজি হয়ে গেলেন। সন্ধায় এক গ্রামে প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে গাড়িতে ফুঁ নিতে আসা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি সামান্য কথা বলার পর মুসলমান হয়ে গেলো। অল্প সময়ের ভেতরে তিন জন ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলো। ঘটনাটি আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিলো। তারপর আমি নতুন করে কুরআনে কারীম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত পড়তে শুরু করি। বিষয়টি যখন মানুষকে বলতে শুরু করি, তখন তারাও কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা তারপর আরও কয়েকবার আমার আবেগের স্পন্দন ও সঞ্চালন সৃষ্টি করার জন্যে আসমাকে উপলক্ষ বানিয়েছেন। দুই-তিন বছর পরের কথা। শাবান মাসে মাদরাসার দায়িত্বশীলদের প্রত্যয়নপত্র দেয়ার জন্যে আমি ঘরে লেটারপ্যাড নিতে এসেছি। আসমা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। বললো- আব্বুজি! আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে। ছয় মাস হলো আপনার কাছে কথা বলার কোনো সুযোগই পাচ্ছিনা। তার কথাটি আমার মনে দাগ কাটলো। আমি আবেগের সাথে বললাম- মা, তুমি কী বলতে চাও? এখনই বলো। সে বললো- অত্যন্ত দরকারি কথা। আমি খুবই পেরেশান। আমাকে নিরিবিলি সময় দিতে হবে। আমি বললাম- এখনই

বলো। সে বললো- না, এখন তো আপনি অপেক্ষমান মেহমানদের কাছে যাচ্ছেন। আমি বললাম- না, এখন যাবো না। তুমি ধীরে সুস্থে তোমার কথা বলো। এক-দুই দিন আমি তোমাদের কাছে থাকবো। সে বললো- আব্বুজি, বলুন তো এই কাফের-মুশরিক এবং অমুসলিমরা কি চিরকাল দোযখে জ্বলবে? আমি বললাম- হ্যাঁ, চিরকাল দোযখে জ্বলবে। সে বললো- আব্বু! চিরকাল জ্বলবে না। দুই বছর তিন বছর একশ' বছর অথবা তিনশ' বছর হয়তো জ্বলবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা হয়তো বলবেন- যাও, মাফ করে দিলাম। আমি বললাম- না, তারা চিরকাল দোযখে জ্বলবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামেই বলে দিয়েছেন। সে বলল- আল্লাহ তায়ালা বলুন আর নাই বলুন, তারা চিরকাল দোযখে জ্বলবে না। আল্লাহর নাম রহমান এবং রহীম নয়কি? মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশি মমতা আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা শেষমেশ বলবেন- চলো, এবার মাফ করে দিলাম। একশ' বছর, দুইশ' বছর কিংবা পাঁচশ' বছর পর আল্লাহ তায়ালা তাদের দোযখ থেকে বের করে দিবেন। আমি বললাম- আল্লাহ তায়ালা তো মিথ্যা বলেন না। তিনি তাঁর কালামে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যাকে খুশি ক্ষমা করে দিবেন। –নিসা : ৪৮

এখন সে কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে। কুরআনে কারীমের আয়াত শুনে সে খুবই হতাশ হলো। বললো- এদের কী দোষ? আমাদের আল্লাহই তো তাদের হেদায়েত দেননি। এমন একজন ছোট্ট খুকিকে আমি তাকদীরের কথা কিভাবে বুঝাবো? কথার বাঁক ঘুরাবার জন্যে আমি তাকে বললাম- মা, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন। তোমার উচিত সে জন্যে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। আমার কথায় সে খুবই চিন্তিত হলো। আবেগে দরদর করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। বলতে লাগলো- আব্বু, একথা মাঝে মধ্যেই আমার মনে জেগে ওঠে। আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দুআ করি। অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। আমি কাঁদি- হে আল্লাহ! তুমি কাউকে দোযখে জ্বালিও না। সকলের পরিবর্তে আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ো। এই নিষ্পাপ শিশুর চোখের পানি আমার পুরো অস্তিত্বকে চরমভাবে ঝাঁকুনি দেয়। ঘুরেফিরে বার বার তার এই কথাটি 'সকলের পরিবর্তে আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ো'- আমার

চিন্তায় অন্তরে অনুরণিত হতে থাকে। এ তো এক অবুঝ শিশুর কথা। তার মূল প্রার্থনা হলো একজন মানুষও যেন দোযখে না যায়। এটাই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচে' বড় দরদ। এই দরদ ছাড়া কোনো ঈমানদার রহমতের নবীর সত্যিকারের অনুসারী হতে পারে না। এরপরও বিভিন্ন সময় এই শিশুকন্যা আমাকে আমার সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। দৃশ্যত কারণ হিসেবে আমি আমার এই কন্যাকে মনে করি- সেই আমার দাওয়াতি সংগ্রামের মহান শিক্ষক।

প্রশ্ন. এ পর্যন্ত আপনার হাতে কতজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলতে পারেন?

মাওলানা সিদ্দিকী. যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সংখ্যা তো অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারি-প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি । এরা সকলেই আমাদের রক্তের ভাই। হাজার হাজার রক্তের ভাই প্রতিদিন কালেমা ছাড়া মৃত্যুবরণ করছেন। সে তুলনায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা অনেকটা শূন্যের কাছাকাছি। অমুসলিম যারা রয়ে গেছে তাদের তুলনায় এটা কোনো উল্লেখ যোগ্য সংখ্যা নয়।

প্রশ্ন. মানুষ বলে, প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে আপনি দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। তারা আশ্চর্য হয়, এ বিষয়ে আপনি কিছু বলুন।

মাওলানা সিদ্দিকী : আমি প্রায় প্রতিটি মজলিসে একথা বলি- এখন দাওয়াতের পরিবেশ প্রতিকূল নয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে বলে দিয়েছেন-

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

যেন তিনি সকল দীনের উপর ইসলামকে জয়ী করতে পারবেন ...। –সফ : ৯

এটা আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার। আমাদের সত্যবাদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছাবে। আমার মনে হয়- সেই সময় এখন উপস্থিত। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েত নেমে এসেছে। মানুষ কাজে নেমে পড়েছে। দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। রমযানের এই বরকতপূর্ণ প্রহরে আল্লাহর ঘরে বসে একশ' ভাগ সত্য প্রকাশের খাতিরে আরজ করছি এবং এটা কোনো বিনয় কিংবা নিজেকে ক্ষুদ্র করে প্রকাশ করার মানসিকতা থেকে বলছি না- এই অধম দাওয়াতের অ-আ-ও জানে না।

এক সময় আমার স্মৃতিশক্তির খ্যাতি ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে-সর্দি কাশি হাঁচি এসব কারণে স্মৃতিশক্তি অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। যখন নদওয়ায় পড়তে যাই তখন মাওলানা শাহবাজ সাহেব এবং মাওলানা আরিফ সাহেব রহ. বলতেন- এই নাহু সরফ তো তোমার পড়াই আছে। এখন আবার আমাদের সময় নষ্ট করছো কেন? অথচ এখন আমার অবস্থা হলো- কুরআন শরীফের আয়াতগুলোর বৈকারণিক বাক্য বিন্যাসও আমার কাছে জটিল মনে হয়। মাঝে মধ্যেই পাকে পড়ে যাই। যবর পড়বো না যের পড়বো। একসময় আমার ইংরেজি ছিল উপমা দেয়ার মতো। আর এখন হলো ছোট ছোট শব্দও ভুলে যাই। স্বভাবগতভাবে আমি অত্যন্ত ভীতু এবং দুর্বল চিত্তের মানুষ। অলসতা দুর্বলতা আমার এতটাই গভীরে প্রোথিত, মানুষের নাম শুনেও ভয় পাই। অন্ধকার কামরায় বাক্সের উপর বিছানাপাতা। তার উপর যখন চাঁদর বিছিয়ে গরমের মধ্যে রুদ্ধকক্ষ ঘরে শুই তখন কিছুটা নিশ্চিত হই- এখন হয়তো আর কেউ আসবে না। কোথায় যেন এক আল্লাহ ওয়ালার দুআ শুনেছি, কি পড়েছি- ''তিনি পনের বছর পর্যন্ত মকবুল অজিফা এবং দুআর মতো এই প্রার্থনা করেছেন- হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে না জানে। আর আমিও যেন আপনাকে ছাড়া আর কাউকে না জানি।''

বলবার উদ্দেশ্য হলো, আমি সব বিচারেই অযোগ্য। তারপরও দাওয়াতের সুবাদে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। আরমোগানে ভাগ্যবান নওমুসলিমদের রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। তাদের সাক্ষাৎকার সংকলন আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। তাতেও সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই অধম লিখেছে- যাদের ইসলাম গ্রহণের সাথে আমাদের নামও প্রকাশিত হয়েছে, আসলে তাদের ইসলাম গ্রহণের মধ্যে আমাদের দাওয়াতী চেষ্টা কিংবা যোগ্যতার কোনো হাত ছিল না। আমাদের অপরাধ শুধু এইটুকু- বছরের পর বছর যারা ইসলামের পিপাসাই নানা দুআরে উপেক্ষিত হয়েছে আমরা তাদের কালিমা পড়িয়ে দিই। আমরা বরং ভেবেছি, এতে করে আমাদের একাউন্ট ভারী হবে। এই ভাবনা থেকেই আমরা কালিমা পড়িয়েছি। আইনি কাগজপত্র তৈরির পথ দেখিয়ে দিয়েছি। সুতরাং নিজে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা অসংখ্য। এই পরিস্থিতে পরিবেশকে প্রতিকূল বলা কোনোভাবেই সঙ্গত নয়।

প্রশ্ন. অমুসলিম সংগঠনসমূহ কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আপনি কোনো সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন?

মাওলানা সিদ্দিকী. আমাদের দেশ বরং পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সংবিধান যে কাউকে যেকোনো ধর্ম কবুল করার, মানার এবং ধর্মের দাওয়াত দেয়ার অধিকার দিয়েছে। সুতরাং আমাদের এই কাজ অসাংবিধানিক এবং বেআইনি নয়। তাহলে সংকটের মানে কী? অমুসলিমদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা- এ বিষয়ে হযরত রহ.-এর ভাষায় বলবো এক্ষেত্রে আমরা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এমন একটি দেশে দীনের দা'য়ী বানিয়েছেন যেখানকার লোকেরা তাদের অন্তরের ভালোবাসার টানে তাদের কল্যাণকামীকে ভক্তিতে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ জাতি তাদের কল্যাণকামীকে দেবতা বানিয়ে পূজা করতেও ছাড়ে না। এখানে কোনো দা'য়ী কিংবা কল্যাণকামীর বিরোধীতা হয়েছে এমন কোনো নজীর আমাদের ইতিহাসে নেই। প্রায় পাঁচ বছর হলো আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্যে নানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করছি। এর মধ্যে আমাদের বিরোধীতা হয়েছে- এমন একটি ঘটনাও আসেনি। একটি ঘটনাও এমন পাইনি- যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সে মুখে 'উফ্' শব্দ বলেছে। বরং যতটুকু আমাদের গোচরে এসেছে, আমাদের দা'য়ী বন্ধুরা মন্দিরে ধর্মীয় সাংগঠনিক অফিসে এবং থানায় যায়। সকলেই তাদের ভক্তির সাথে গ্রহণ করে। মাঝে মধ্যে ইনকোয়ারিও আসে। যারা জানতে পারে- এরা মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করছে। প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়। তারপর যখন মমতা এবং ভালোবাসার সাথে তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়, তারাও মুসলমান হয়ে যায়। এরকমের অনেক ঘটনা আরমোগানে ছাপা হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা ভয় ও আশঙ্কা থেকে বাঁচার উপায় কুরআনে কারীমের মধ্যেই বলে দিয়েছেন–

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

যারা আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা, হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। –আহযাব : ৩৯

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন-

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আল্লাহ তায়ালাই তোমাকে মানুষের হাত থেকে হেফাযত করবেন।

সুতরাং হেফাযতের অঙ্গীকার তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই রয়েছে।

প্রশ্ন : মানুষ বলে, পরিবেশ প্রতিকূল। এটাও সত্য, ইসলামের বিরুদ্ধে যতটা প্রোপাগান্ডা চলছে, ঠিক ততটা দ্রুততার সাথেই পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : ওয়াশিংটন পোস্টের একজন প্রতিনিধি হুবহু এই প্রশ্নটিই আমাকে করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম এবং বাস্তবতাও তাই- একটা সময় ছিল যখন মানুষ মুসলমানদের দেখে ইসলাম বুঝতো। কিন্তু প্রচার মাধ্যমের ব্যাপকতার কারণে বিশেষ করে ইন্টারনেট আসার পর কুরআনের ইসলাম মানুষের বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে মানুষ ইসলামের প্রকৃত রূপকে জানতে পারছে এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হতে পারছে।

প্রশ্ন. এখনও অনেক মানুষ বিশেষ করে আমাদের আলেমগণ দাওয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নন। এর জন্যে কী করা উচিত বলে মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : এটা আসলে শয়তানের একটা ফাঁদ। শয়তান চায় মানুষকে এই বলে পাঁকে ফেলে রাখতে- অমুক এটা করেনি, তমুক ওটা করছে না। হযরত মসীহুল উম্মত রহ.-এর একটা কথা বার বার মনে পড়ে, তিনি বলতেন- অতীতের চিন্তা নেই। ভবিষ্যতের কথাও ভাবি না। চাই বর্তমানে কাজ। আসলে শয়তান মানুষের সময় ও যোগ্যতাকে বিনষ্ট করার জন্যে সদাই মানুষকে এই পাকে ফেলে রাখতে চায়- অমুক এটা করেনি, আমরা এই সুযোগ হাত ছাড়া করছি। অতীতে আমাদের কোনো অর্জন নেই। ভবিষ্যতে এটা হওয়া উচিত। আর এইসব ভাবনার ফাঁকে আমাদের বর্তমান হারিয়ে যায়। তোমার জানা থাকবার কথা, কয়েক বছর আগেও যখন আমরা বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছে দাওয়াতের প্রার্থনা নিয়ে কিংবা ছবক শোনানোর উদ্দেশ্যে যেতাম তখন মানুষ আমাদের এমন এমন দলের সদস্য মনে করতো- যেসব দল তাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত। কিন্তু আমরা আমাদের পথে চেঁচিয়ে যেতে লাগলাম। কিছু যোগ্য লোক কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে গেল। কাজের রিপোর্ট গোচরীভূত হতে লাগলো। সেই সুবাদে আমাদেরও নাম হয়ে গেল। আমাদের সেই চেঁচামেচির ফলে কিছুটা নাম ছড়িয়ে পড়ার কারণে এখন বড় বড় আলেম এবং আমাদের মুরব্বীগণ আমাদের তাদের ডানায় বসাতে প্রস্তুত। এই জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত, যতটুকু কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব তা শুরু করে দেয়া। একটি কবিতা পুরো জাতির কাছে পৌঁছে

দেয়ার জন্যে আমি জমিয়তে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডারে ছেপে দিয়েছিলাম। কবিতাটি ছিল এই-

منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتیں
راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں

শিকার কভু দেয় না ধরা ঘরে এসে
পথ কি কভু রুদ্ধ থাকে চেষ্টা হলে!

আমি আমার জীবনের টার্গেট নির্ধারণ করার জন্যে একদা এই কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম–

نہیں جن میں تمہارا عکس شامل
وہ نقشے ہیں مٹادینے کے قابل

যাতে নেই তোমার সাধনার ছাপ
সেই চিহ্ন হোক চিরনিশ্চিহ্ন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর নবীর প্রধান সুন্নতটি বুঝতে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন. অন্যান্য সংগঠন এবং দাওয়াতি কর্মকান্ডের সাথে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আপনার কী মত? এ বিষয়ে কিছু বলুন!

মাওলানা সিদ্দিকী: আমি আমার সহকর্মীদের টার্গেট নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে জমিয়তে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ-এর পরিচিতির সাথে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল–

دین کے ہر کام کرنےوالے کے رفیق بنو، فریق نہیں

দীনের সকল কর্মীর বন্ধু হও, প্রতিপক্ষ নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এভাবেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা সকলের সাথে বন্ধু পরিচয়ে কাজ করতে চাই। প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়।

উমর নাসেহী : তাবলীগ জামাতের সাথে আপনার সম্পর্ক?

মাওলানা সিদ্দিকী : আমি মনে করি, অমুসলিমদের মাঝে এই যে সামান্য ক্ষুদ্রকারে চেষ্টা সাধনা চলছে এটা মূলত তাবলীগ জামাতের মহান মুরব্বী মনীষীদের কর্মকৌশল এবং তাঁদের স্বপ্নেরই ব্যাখ্যা। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাধনা ছিল- আমাদের এই কাজের-আলিফ-বা আর আমরা

এখন যা করছি সেটা হলো, তারই ধারাবাহিক-তা-ছা। তারপরও তাবলীগি মারকাযের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও কর্মপন্থা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের পরামর্শ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ করা এবং একে উৎসাহিত করা সঙ্গত মনে করি। আমার একশ' ভাগ বিশ্বাস, বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকে যে আওয়াজ ওঠেছে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মানুষের কাছে ঈমানের বাণী পৌঁছার আওয়াজ সেটাই। ইনশাআল্লাহ! পৃথিবীর সর্বত্র এই মারকায থেকেই এই বাণী পৌঁছে যাবে। এই অধমও সেই বিপ- বেরই একজন ঝাড়ুদার। এখন যে চেষ্টা সাধনা করছি, এটাও তাবলীগি প্রচেষ্টারই দান।

প্রশ্ন : দীনি মাদরাসা এবং দীনি শিক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই!

মাওলানা সিদ্দিকী : দীনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো মাদরাসা। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষক করে পাঠিয়েছিলেন। তাবলীগ হলো তালীম শিক্ষারই একটি বিভাগ। আমাদের জন্যে নমুনা হলো- হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদরাসা- মাদরাসাতুস সুফফা। এই মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা মাদরাসা এবং মাদরাসার সাথে সম্পৃক্তদের দীনি সেবাকে আমাদের জন্যে সৌভাগ্য মনে করি। মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন দাওয়াতি মেজাজ গড়ে ওঠে সে জন্যে চেষ্টা করছি। সেই সাথে মাদরাসার বিরুদ্ধে ভুল ধারণা, মন্দ ধারণা, মাদরাসাকে তুচ্ছ করে দেখা এই অধমের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতির আত্মহত্যার শামিল। 'দীনি শিক্ষার অবদান' শিরোনামে ইন্টারনেটে আমার একটি লেখা রয়েছে। লেখাটি পড়া উচিত। এই অধম বিভিন্ন দীনি মাদরাসায় যায়। অনেকেই দয়া করে আমাকে পরিদর্শন বইয়ে কিছু লিখতে বলেন। তখন আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে নিজের পরিচয়ে একথা লিখি- 'খাকে পায়ে খুদ্দামে দীন'-দীনের সেবকদের পায়ের ধুলি' এটা কোনো বিনয় থেকে নয়; বরং আমি আশাবাদী, যদি আল্লাহ তায়ালার কোনো নেক বান্দার নজর পরিদর্শন বইয়ের এই শব্দের উপর পড়ে আর সেটা যদি হয় কোনো দুআ কবুলের মুহূর্ত অনন্তর আল্লাহ তায়ালা যদি এই কথাটুকু কবুল করে নেন, তাহলেই মনে করি আমার জীবন সার্থক। সার্থক আমার পরকাল।

প্রশ্ন : নওমুসলিমদের সংকট ও তা থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

মাওলানা সিদ্দিকী : আসলে 'খাইরুল কুরুন' তথা ইসলামের প্রশংসিত প্রথম যুগে নওমুসলিম বলতে কোনো পরিভাষা ছিল না। আমার মনে হয়, যে কোনো বিষয় খাইরুল কুরুন থেকে গ্রহণ করার মেজাজ যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা অনেক আপদ থেকেই রক্ষা পাবো। আমাদের দাওয়াতী সঙ্গীগণ যখন কোথাও কোনো দাওয়াত বিষয়ক কেন্দ্র গড়ে তুলেন তখন আমরা 'দারে আরকাম', 'দারে আবু আইয়ূব' ইত্যাদি নাম রাখি। এই অধমের ধারণা, এতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত হয়। আমি মনে করি, এই নবাগতদের যদি আমরা নওমুসলিম না বলে মুহাজের ভাই বলি, তাহলে অধিক সঙ্গত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আরমোগানের মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকেই একথা বলা হচ্ছে। তা ছাড়া কুরআন সুন্নাহ এবং ইতিহাসের আলোকে বার বার এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে- কেবল মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং পুরো মানব বিশ্বের ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সব বিষয়ের সমাধানের একমাত্র পন্থা হলো হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের আলোকে দাওয়াত দেয়া। দাওয়াতই এ সকল সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ এবং সহজতম পথ। দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে যেসকল সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তন্মধ্যে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের বক্তব্য হলো- সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো নওমুসলিমদের সংকট। ইসলাম গ্রহণ করার পর অনেককেই বাড়িঘর ছাড়তে হয়। দয়া করে যাদের আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দান করেছেন সেই ভাগ্যবানদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হতে হয় দাওয়াতকর্মীদের। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে তাদের জামাতে পাঠানো হচ্ছে। মাদরাসায় থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এক কথায় এক্ষেত্রে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তারপরও দৃশ্যত যা বুঝা যাচ্ছে, এর হক আদায় করা তো দূরের কথা, প্রয়োজনের একদশমাংশও পূরণ হচ্ছে না।

সারা পৃথিবীর দায়ীগণের অভিজ্ঞতা হলো- নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যদি অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হতো এবং যদি তাদের কাছে এমন কোনো ব্যবস্থা হতো- যাতে করে তারা পরিবার আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদেরকে নিজেদের ঘরে কয়েক দিনের

জন্যে অতিথি হিসেবে রাখতে পারে, তাহলে হয়তো ধীরে ধীরে খুব সহজেই তার পরিবার, ভাই-বোন, মা-বাবা এবং বন্ধু-বান্ধবরা মুসলমান হয়ে যেতো। এর বিপরীতে এই নওমুসলিমগণ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয়, প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের কাছে হাত পাততে হয় তাহলে তারা অন্যদের আর কী দীনের দাওয়াত দেবে! বরং অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আমাদের ঘরে বসে থেকে একজন মুহাজির নওমুসলিম ভাইয়ের ব্যাথা উপলব্ধি করতে পারবো না।

মানুষ একটি সামাজিক জীব। জীবনের প্রতিটি আত্মীয়তা এবং বন্ধনই তার জন্যে অপরিহার্য। আমরা যদি আমাদের কোনো একটি আত্মীয়তার দিককে শূন্য কল্পনা করি তাহলেই তার সংকীর্ণতা মনের ভেতর অনুভব করতে পারবো। যেমন- বড় বোন আছে কিন্তু ছোট বোন নেই। খালা আছে তো ফুফু নেই। আত্মীয়তার কোনো একটি শাখা নাই হয়ে গেলে আমাদের দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারি না। যখন একজন নওমুসলিম সব কিছু ছেড়ে মরু বিয়াবানে এসে ওঠে তখন তার মন জয় করা, তাকে সান্ত্বনা দেয়া কতটা প্রয়োজন তা আমরা এখান থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যারা ঘরে পরিবার পরিজনের সাথে আজন্ম সুখের জীবন-যাপন করছে তাদের পক্ষে এই বেদনা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়। আমরা এই নওমুসলিমদের জন্যে কী করি? খুব বেশি হলে শুরুর দিকে কিছু পয়সা ভিক্ষে দেই। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথমবার যখন কোনো নওমুসলিমকে তার প্রয়োজন সারার জন্যে কিছু পয়সা দেয়া হয়, তখন তার চোখ পানিতে ঝাঁপসা হয়ে ওঠে। ভাবে, মানুষ আমাকে অভাবী মনে করছে। অথচ এই ব্যক্তিটিকেই পরে প্রয়োজনের তাড়ায় অন্যের কাছে বাধ্য হয়ে হাত পাততে হয়। ক্রমাগত তার সেই অনুভূতিশীল অন্তর প্রয়োজনের নীচে চাপা পড়ে যায়। ভিখেরির মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। জীবন সংকটের পাকে পড়ে তারা দীনি শিক্ষাদীক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকে। কখনও বা জামাতে উপযুক্ত আমীর না পাওয়ার কারণে নানা বিপদের মুখোমুখি হয়।

আমরা যদি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের আলোকে তাদের এই মানবিক অর্থ৪নৈতিক ও সামাজিক সংকটের সুরাহা খুঁজি, তাহলে দেখি- এর পরিপূর্ণ এবং সহজতম সমাধান হলো আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। বর্তমানকালে আমাদের মুসলিম সমাজে

এ এক উপেক্ষিত সুন্নত। অথচ নওমুসলিমদের সংকট সমাধানের এটা ছিল স্থায়ী পরিপূর্ণ এবং সহজ সমাধান।

কোনো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে যদি একসাথে পাঁচশ' মুহাজের অতর্কিতভাবে এসে উপস্থিত হয় তাহলে দেখা যাবে অনেক বড় দাতা বরং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এই সংগঠন তাদের বিয়েশাদী এবং আয়-রোজগারের সমাধান দিতে পারবে না। এর বিপরীতে আমরা যদি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হারানো সুন্নত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আলোকে এই সমস্যার সুরাহা করতে চাই, তাহলে কেবল এক ভারতেই যদি এক কোটি মুহাজের আমাদের কাছে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়, আর এক কোটি মুসলমান যদি তাদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের টানে বুকে তুলে নেয়, মুহূর্তে এক কোটি মানুষের সব সমস্যা মিটে যেতে পারে। একজন মুসলমান আগত একজন মুসলমানকে নিজের ভাই কিংবা পুত্র হিসেবে তার দেখাশোনা, তার বিয়ে-শাদী এমনকি আয়-রোজগারের সুরাহা করাও কোনো ব্যাপার নয়। যার চারজন পুত্রসন্তান রয়েছে, সে যদি আর একজন নওমুসলিমকে পুত্র হিসেবে বরণ করে নেয় এবং চারের জায়গায় পাঁচজনকে লালন-পালন দেখাশোনা এবং বিয়ে- শাদীর ব্যবস্থা করে তাহলে এটা কোনো বড় বোঝা নয়। যদি এভাবে এক কোটি নওমুসলিমকে দুই বছর পুরনো মুসলমানগণ তাদের বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারে তাহলে এই নবাগতরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অনন্তর তারাই তাদের পরিবার-পরিজনের হেদায়েতের পথ উন্মোচিত করতে যথেষ্ট হবে। দেখা যাবে, এই এক কোটি কয়েক বছরে কয়েক কোটির ভ্রাতৃত্ব গ্রহণের জন্যে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো- আপনি যতই যত্নবান হোন না কেন, একজন নওমুসলিমের হয়তো এক দুই সপ্তাহ খবর রাখবেন। অথচ তাদের কিছু সংকট এমনও থাকে যা প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ রাখার মতো। কেউ কেউ কখনও কখনও প্রতিটি মুহূর্তেই আশ্রয়ের মুখাপেক্ষি থাকে। আপনি যদি তাকে আপনার ঘরের সদস্য করে নেন, তাহলে সে সর্বদা আপনার ঘর উপস্থিত থাকবে।

আমাদের নবীর জীবনে এ বিষয়ে আমাদের জন্যে চমৎকার নির্দেশনা রয়েছে। একদিকে তো মানুষের বংশ পরিচয় পরিবর্তনকে চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা তাদের বংশ-পরিচয় বদলে ফেলে তারা বেহেশতের সুবাস থেকেও বঞ্চিত হবে। অথচ কেউ যদি ইসলামী

ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কাউকে নিজের বংশের অন্তর্ভূক্ত করে নেয় তাহলে আমাদের ফকীহগণ বলেছেন- এই নবাগত আশ্রয়দানকারীর বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে। ইমামূল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী রহ.-এর বংশগত পরিচয় হলো- জুফী ইয়ামানী। তাঁর পরদাদা মুগীরা মুসলমান হয়ে যাঁর ভ্রাতৃত্বে ছিলেন এটা মূলত তাঁরই বংশপরিচয়। অভিজ্ঞতা সাক্ষী- বংশগত কোনো মুসলমান পরিবার যদি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের টানে কোনো মুহাজেরকে বরণ করে নেয়, আর এই নবাগত যদি দীনদার নাও হয়; তবুও ক্রমাগত এই সুন্নতের বরকতে দীনদার হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে এমন উদাহরন অসংখ্য।

এই কয়েকদিন আগের কথা। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিখ্যাত শহরের নিকটস্থ একটি গ্রামে একজন ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছে। পরিবারের লোকেরা তাকে চাপ দিয়েছে। যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এলাকার লোকেরা মুসলমানদের উপর হামলা করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সেখানকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে ফোন এসেছে। আমি তাদের বলেছি, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন- 'আল্লাহই তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন' সুতরাং তোমরা মোটেও চিন্তা করবে না। ইনশাআল্লাহ 'কাফা বিল্লাহি হাসিবা-আল্লাহই যথেষ্ট। তোমাদের কিছুই হবে না।

দেখা গেল, কয়েকজন লিডার মাঝখানে এসে বিষয়টি তাদের হাতে নিয়ে নিল। তারা ছেলেটিকে ডেকে পাঠালো। যখন দেখলো, ছেলেটি মরতে রাজি কিন্তু কুফরীতে ফিরে যেতে রাজি নয়; তখন তারা রাগে ক্ষোভে-ছেলেটিকে রেখে চলে গেলো। সেখানকারই একজন মুসলমান লিডার ব্যক্তিগতভাবে চরম ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মের সাথে তো নেই-ই; বরং কিছুটা ঘৃণা রয়েছে। সামাজিকতার কারণে হয়তো ঈদের নামায পড়ে। দেখা গেল, এই বিষয়টির প্রতি তার বেশ আগ্রহ। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সে বিষয়টির সাথে সংশি- ষ্ট থেকেছে। আমি তাকে খবর দিলাম। আসার পর বললাম- আপনার ছেলে কয়জন। তিনি বললেন চারজন। আমি বললাম- চারজন তো খুবই কম। এই পঞ্চম ছেলেটিও আপনার। এই নওমুসলিম ছেলেটি সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে

এসেছে। তাকে আশ্রয় দেবে কে? তার আবেগ জ্বলে উঠলো। বললো- এটা আমার পঞ্চম ছেলে নয়; এটাই আমার প্রথম ছেলে। বাকি চারজন পরে।

আলহামদুলিল্লাহ! তারপর তিনি ছেলেটিকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। ছেলেটি হাফেয হওয়ার পর এখন আলেম হওয়ার কাছাকাছি। দেখা গেছে, এখন সেই ধর্মনিরপেক্ষ লিডারের অবস্থা হলো- সপরিবারে হজ্ব করে এসেছে। শুধু তার মুখেই নয়; ছেলেদের মুখেও দাড়ি। ঘরের নারী-পুরুষ সকলেই নামায পড়ছে। কিছুটা তাহাজ্জুদও পড়ছে। এই ধরনের ঘটনা অসংখ্য আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে কথা বলছিলাম, একটি পরিবার যদি একজন ব্যক্তিকে তাদের ঘরের প্রকৃত সদস্য করে নেয়, তারপর তার শিক্ষাদীক্ষা বিয়ে-শাদী এবং আয়-উপার্জনের তত্ত্বাবধান করে তাহলে এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়। এখন সবচে' বড় প্রয়োজন হলো- মুসলমানদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলা।

এখন তো সময়টা এমন, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে হেদায়েত পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় যারা মুসলমান হচ্ছে তাদের সংখ্যা অসামান্য। সেই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই। ইসলামের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার চলছে ততই মানুষের মধ্যে ইসলামকে জানবার আবেগ ও আকুতি তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ইসলামকে জানবার চেতনা ইসলামের পথকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। আজ প্রয়োজন এই চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্যে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করা। যদিও নওমুসলিমদের সংকটকে খুব কঠিন করে দেখা হচ্ছে। আমরা মনে করি, যদি আমাদের নবীর সীরাতের আলোকে এর সমাধান চিন্তা করা হয়, তাহলে এটা মোটেও কোনো কঠিন সংকট নয়।

প্রশ্ন : আপনি 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি কিভাবে লিখেছেন? কী কারণে পুস্তিকাটি এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : আসলে এর মূল শক্তি হলো- আমার হযরত রহ. ও তাঁর মায়ের দুআ। কিছু মুখলেস বন্ধুর পক্ষ থেকে আবেদন ছিল- আমরা যখন দাওয়াত দিতে যাই, তখন অনেক সময় মনের মধ্যে বাধা অনুভব করি। কিভাবে কথা শুরু করবো, কোন কথাকে বেশি গুরুত্ব দেবো- এসব বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখে দিন। সম্ভবত শুভাকাঙ্ক্ষীদের হুকুম তামিলের

বরকতেই এই কিতাব আজ এই অসামান্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নইলে এর মধ্যে তো কিছুই নেই। অথচ এ পর্যন্ত এই কিতাব পাঠ করে কেউই প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি। আমাদের ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে।

উমর নাসেহী : অন্যান্য দেশে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে আপনি কিছু করছেন কি?

মাওলানা সিদ্দিকী : আসলে আমরা কে, যে কিছু করতে পারি? আমরা তো আসমান থেকে নেমে আসা হেদায়েতকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিজেদের মতলব সিদ্ধ করছি। তিনবার হারামাইন শরীফাইনের সফর করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগতদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! বিভিন্ন দেশে কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে। দাওয়াতি মানসিকতা গঠনের উদ্দেশে আরবিতে 'আল খায়ের' প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্যে ইংরেজিতেও চেষ্টা চলছে। মানুষ প্রতিদিনই প্রস্তুত হচ্ছে। বিশেষ করে আরমোগানের ধ্বনি তো এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক প্রান্তকে স্পর্শ করেছে।

প্রশ্ন : যারা দাওয়াতের কাজ করছে সকলের কর্মপদ্ধতি এক নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

মাওলানা সিদ্দিকী : আমাদের হযরত তাঁর বক্তৃতা এবং রচনায় বার বার এ কথা বলেছেন- দাওয়াতের বিষয়টি কুরআন এবং হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু তার পদ্ধতি কী হবে কুরআন-হাদীসে বলা নেই। দাওয়াতের পদ্ধতি দাযী'র অন্তরে প্রতিনিয়ত উদিত হয়। এই অধমের ধারণা হলো, একজন দাঈ'র মাধ্যমে যখন আল্লাহ তায়ালা হাজার হাজার মানুষকে হেদায়েত দান করেন তখন দেখা যায়, এই দা'য়ী প্রতিটি ব্যক্তির সাথে একই স্টাইলে একই ভাষায় কথা বলেনি। এখন মানুষ বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করছে। যে যে পদ্ধতিতে কাজ করছে সেই পদ্ধতি তার কাছে স্পষ্ট এবং উপযুক্ত।

তাছাড়া কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতায় দাওয়াতের মূল মর্মও তার আয়ত্বে এসেছে। সুতরাং বৈধ যে কোনো পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করা যেতে পারে। এতে কারও কিছু বলবার নেই।

প্রশ্ন : অন্য ধর্মের গ্রন্থাবলীর রেফারেন্সে দাওয়াত দেয়াটা কেমন?

মাওলানা সিদ্দিকী : এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমেই স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি বিষয়ের প্রতি এগিয়ে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না। –আলে ইমরান : ৬৪

হযরত থানভী রহ. বলেছেন- যতটুকু ইসলাম আহলে কিতাবের গ্রন্থাবলীতে আছে, তারা যদি ততটুকু মেনে নেয় তাহলেই তারা নাজাত পেয়ে যাবে। তবে দাওয়াতের এই পদ্ধতির জন্যে দায়িকে দক্ষ আলেম হতে হবে। তার যোগ্যতা এবং পড়াশোনা হতে হবে গভীর এবং ব্যাপক। অন্যথায় এক ধর্মের জায়গায় বহু ধর্মের ঐক্য এসে ঠাঁই নেবে। অনেকবার অনেককে বলতে শুনেছি- এই ব্যক্তি তো আমাদের ধর্মেই চলে আসবে দেখি! আসল কথা হলো, মানুষকে কাছে টানবার জন্যে তাদের পরিভাষা দিয়ে কথা শুরু করা যায়। এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত বিষয়। চেনা এবং পরিচিত বিষয়ের প্রতি মানুষ এমনিতেই দুর্বল থাকে। তবে এজন্যে শিরক কিংবা শিরকি কোনো রেওয়াজের মধ্যে দা'য়ী ঢুকে যেতে পারবে না। যত্নের সাথে লক্ষ রাখতে হবে, একজনকে দাওয়াত দিতে গিয়ে তাকে খুশি করার জন্যে এমন কিছু করা যাবে না, যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টিকে ডেকে আনে।

প্রশ্ন : আজকাল ইসলামকে পরিচয় করানোর জন্যে অনেকেই কুরআন মাজীদ পবিত্র সীরাত ইত্যাদি বিষয়ে রচনা লিখিয়ে এবং কুইজ প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করছে। এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : এটাও একটি উপযুক্ত এবং মুবারক পন্থা। কোনো সন্দেহ নেই, ইসলাম এবং ইসলামের নবী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নানা ভুল ধারণা রয়েছে। ইসলামের পৃথিবীব্যাপী যে বিরোধিতা হচ্ছে এর প্রধান কারণই হলো- ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা। সুতরাং এটা একটা ভালো পদ্ধতি। এর প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় আকারে কাজ করা উচিত। যারা কাজ করছে তাদের সাহায্য এবং সেবা করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের যোগ্যতা এবং সামর্থ মাফিক কাজ করবে। এমনিতে প্রতিটি মানুষই তার শক্তি অনুযায়ী ব্যবসা-

বাণিজ্য করে। আমরা ছোট পুঁজির কাঙাল ধরনের ব্যবসায়ী। যারা ক্ষুদ্র পুঁজিতে বাণিজ্য করে তারা অল্প পরিশ্রমে অনেক মুনাফা করতে চায়। আমাদের ধারণা হলো, যারা ইসলাম প্রচারের জন্যে এভাবে বড় বড় পুঁজি বিনিয়োগ করছেন তাদের চিন্তা হলো- অনেক সময় ও সাধনার পর যদি কিছু লোকও ইসলামে চলে আসে তাহলে সেটা কম কোথায়? তবে ইসলামকে পরিচিত করানোটাই শেষ কথা নয়। আমাদের কেবল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দ্বায়িত্ব দেয়া হয়নি। দাওয়াত দেয়াটাও আমাদের কর্তব্য। পরিচয় এক জিনিস, দাওয়াত আরেক জিনিস। যাই হোক, এটা এই অধমের ধারণা।

উমর নাসেহী : প্রচার মাধ্যম, যেমন- টিভি ইন্টারনেট ইত্যাদি দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করাটা কেমন? বর্তমানে ডাক্তার জাকির নায়েক পিচ টিভির মাধ্যমে যে কাজ করছেন এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মাওলানা সিদ্দিকী : আমি প্রচার মাধ্যমগুলোকে তাবলীগেরই মাধ্যম মনে করি। মনে করি, পৃথিবীর প্রতিটি কাঁচাপাকা ঘরে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার জন্যে এই প্রচার মাধ্যমগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই একটি ব্যবস্থা। এগুলো ব্যবহার করার মতো সুযোগ যাদের আছে তাদের উচিত এ সুযোগকে কাজে লাগানো। ডাক্তার জাকির নায়েক এবং তার পদ্ধতিতে যারা দাওয়াতের কাজ করছেন আমি তাদের মর্যাদার সাথেই দেখি। তবে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আলেমদের কথা হলো- ডাক্তার জাকির নায়েক ও তাদের মতো দায়িদের কাজ হলো কেবল দাওয়াতের মধ্যেই নিজেদের নিমগ্ন ও সীমাবদ্ধ রাখা। মাসলাক ও ফিকহী গবেষণা থেকে বিরত থাকাটাই তাদের জন্যে সঙ্গত। অধম এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত। আমি স্বীকার করছি, 'ডাক্তার জাকির নায়েকের দ্বারা কোনো ফায়দা হচ্ছে না'- এমনটা বলা সঙ্গত নয়।

আমি বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক অমুসলিমকে পেয়েছি যারা পিস টিভি দেখে প্রভাবিত হয়েছে। তারপর ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ অন্য কোনো মাধ্যমে গিয়ে মুসলমান হয়েছে। সুতরাং বৈধতার ভেতরে থেকে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করাটাকে আমি সমর্থন করি। বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত যেসব ভুল ধারণা রয়েছে, যেমন- ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, ইসলামে বহুবিবাহ ইত্যাদি এসব প্রচার মাধ্যমকেই কাজে

লাগিয়ে দূর করা সম্ভব। যারা এক্ষেত্রে কাজ করছেন তাদের কাজের ইতিবাচক ফলাফলকে মূল্য দেয়া উচিত। যদি সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মন্দ দিক প্রমাণিত হয় তখন সেটা আন্তরিকতার সাথে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দূর করতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন. দাওয়াতের জন্যে কোন পদ্ধতিটিকে আপনি সবচে' সফল মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী: আমরা মনে করি কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দানের যে পদ্ধতি, আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে শেখানো হচ্ছে এটাই সবচাইতে সহজ এবং সতর্কতামূলক। আমরা খুবই দুর্বল। যারা দুর্বল তাদের সব সময় সতর্ক এবং সহজ পথ বেছে নিতে হয়। কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার জন্যে যেমন অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, তেমনি অনেক তর্ক-বিতর্কেরও প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অল্প পুঁজিতে লাভ হয় অনেক। দশ মিনিটের আলোচনা শেষে কালেমা পেশ করা যায়। মানুষ আনন্দ চিত্তে কালেমা গ্রহণও করে নেয়। অল্প পঁজিতে যদি অনেক লাভ করা যায় তাহলে অন্য পন্থায় যাওয়ার প্রয়োজন কী? কুরআনে কারীমের এই অলৌকিকতা এখন আমরা আমাদের চোখে দেখবার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক সময় দেখা যায়, কুরআন বুঝে না এমন ব্যক্তির সামনে যখন আরবিতে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন সে কাঁদতে শুরু করে। অন্য নবীগণের কাজ তো তাদের জীবনেই শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে তাদের মুজেযার কারিশমাও। আমরা মনে করি, এই পদ্ধতি সুন্নতেরও অধিক কাছাকাছি। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পদ্ধতি নিয়ে যদি আমরা ভাবি, তাহলে দেখবো- তিনি তাঁর দাওয়াতি আলোচনায় সংক্ষেপে এইটুকু বলে দিচ্ছেন-

قولوا لا اله الاالله تفلحون

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলকাম হবে।

লিখিত দাওয়াতে সংক্ষেপে এইটুকু লিখে দিতেন-

اسلم تسلم

মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপত্তা পেয়ে যাবে।

ফলে এটাকে আমরা সবচে' সহজ পন্থা মনে করি। আর সহজ হওয়ার কারনেই আমাদের মন এদিকেই টানে।

প্রশ্ন.অনেকেই প্রশ্ন করে- শুধু কালেমা পড়িয়ে কী লাভ?

মাওলানা সিদ্দিকী: একথা আমি প্রায় সবজায়গায়ই বলি। লৌকিকতা নয়; বরং এটাই সত্য- এই অধম তো দাওয়াতের অ-আ-ও জানে না। বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা চলছে। কিন্তু এই অধম যে সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু শিখবে সেই সুযোগও পাচ্ছে না। অনেকবার তো এমন হয়েছে- অনর্থক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষ আমার সাথে এসে দেখা করে। তখন আমি আপনাদের মতো প্রশিক্ষিত দায়িদেরকে খুঁজি। যখন খুঁজে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কথা বলতে হাই। কথা হলো, যখন আমি কিছু জানি না তখন 'কালেমা পড়'- এটা ছাড়া আর কি-ই-বা করতে পারি! একটি হাসির কথা বলি। একবার এক খান সাহেব এক সরদারজীকে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ওঠে বসেছে। তারপর ধমক দিয়ে বলেছে- কালেমা পড়। সরদারজী জীবনের ভয়ে তখন বললো- পড়িয়ে দাও। খান সাহেব তখন বললো- আমারও তো মনে নেই। আসল কথা হলো কী, আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু পারি না। এ কারণেই রীতিমত দলিল-প্রমাণসহ কাউকে দাওয়াতও দিতে পারি না। ফলে এই দুর্বলতার কারণেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী-'কূলূ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহূন'- এর সাথে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেছে। এখন এর মধ্যেই মজা পাই। তাছাড়া এই 'কালেমা পড়'- এর দ্বারা অনেক লোকের জীবন এতটাই ঈর্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে যা কল্পনারও অতীত। সুতরাং এমন উপকারি পন্থা আমরা কেন লুফে নেবো না? এটাও ঠিক, শুধু কালিমা পড়িয়ে ছেড়া দেয়া কোনোভাবেই ঠিক নয়। তবে সবকিছু বুঝাবার পর কালিমা না পড়াতে পারা এটাও ঠিক নয়। কালিমা ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। অনেককেই দেখা গেছে, জীবনভর এক ব্যক্তির পেছনে সাধনা করে যাচ্ছে। তাকে অনেক বই পড়িয়েছে। দলিল-প্রমাণের আলোকে বুঝিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালিমা পড়ানোর সুযোগ হয়নি। এর দ্বারা কী লাভ?

আমাদের এই ভারতবর্ষে- যেখানে আমাদের স্বদেশী এবং অমুসলিম ভাইদের অধিকাংশই হলো হিন্দু- তাদের অধিকাংশই রেওয়াজী হিন্দু। তাদের মধ্যে ধর্মবিষয়ে সমঝদার হিন্দুর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আমাদের একজন অনেক বড় হিন্দু ধর্মের নেতা এবং সনদ হিসেবে বিবেচিত স্কলার বলেছেন- ''আমাদের এ দেশে হাজার হাজার হিন্দুর মধ্যে হয়তো একজন এমন পাওয়া যাবে যে বেদ গ্রন্থ দর্শন করেছে। অথচ এটা তাদের ধর্মের' কেন্দ্রীয় গ্রন্থ। লাখ লাখ হিন্দুর মধ্যে হয়তো এমন একজন পাওয়া যাবে, যে

বেদের পাঠক।'' তার বক্তব্য হলো- পুরো ভারতে একশ' কোটি হিন্দুর মধ্যে হয়তো একশ'জনও এমন নেই যারা বেদসমূহকে বুঝে। সে হিসেবে বলতে পারি, প্রতি এক কোটি হিন্দর মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই রেওয়াজী হিন্দু। তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, এখানে দাওয়াতের কাজ করার জন্য খুব বেশি পড়াশোনার প্রয়াজন নেই। এখানে প্রয়োজন কেবল সাহসের। তবে এখানকার মানুষ যেহেতু ভালোবাসাপ্রবণ, তাই সাহসের সাথে চাই ভালোবাসা। এখানে প্রয়োজন এমন দাঈ- যারা সাহস করে মমতার সাথে বলবে- কালিমা পড়ো। এমন অনেককেই আমরা জানি, যারা তাদের অভীষ্ট ব্যক্তিদের পেছনে ইসলামকে পরিচিত করে তোলা এবং ভুল ধারণা দূর করার পেছনে বছরের পর বছর মেহনত করে যাচ্ছেন। কিন্তু কালিমা পড়ানোর সুযোগ হচ্ছে না । যখন জিজ্ঞেস করা হয়- আপনি কি কালেমা পেশ করছেন? তখন তারা বলে- সাহস হয়নি। এটা একেবারে সত্য- কালিমা পড়তে বলার জন্যে কালিমা পড়- এর একটি সাহস চাই। এটা সাহসেরই ফসল।

ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আলেমগণের উদ্দেশ্যে এই অধম একথাই বলছিল- কেউ তো বলতে পারে না মানুষের জীবনের একটি মিনিটেরও ভরসা আছে কি না! কোন শ্বাস জীবনের শেষ শ্বাস তা তো কারো রই জানা নেই। মৃত্যুর পর তো অনন্তকালের ব্যর্থতা অথবা সফলতা বেহেশ্‌ত অথবা দোযখ। যদি পরকালীন বেহেশ্‌ত দোযখের প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং কালেমার উপরই যে মুক্তি নির্ভরশীল এ বিষয়ে যদি আস্থা থাকে তাহলে দীর্ঘ আলোচনা এবং দলিল-প্রমাণের সুযোগ কোথায়? এক ব্যক্তি কূপে কিংবা নদীতে ডুবে যাচ্ছে, অগ্নিগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে- এখানে একজন মানুষের দায়িত্বটা কী? এখানে যৌক্তিকতার কি যথেষ্ট অবকাশ আছে? এই পতনুখ ব্যক্তিকে কি এই বলে দীর্ঘ ভাষণ দেয়ার সুযোগ আছে? 'জনাব! এই নদী খুবই গভীর। আপনি যখন এতে পতিত হবেন তখন বুঝতে পারবেন, আপনি সাঁতরাতে পারেন না। আপনি নীচে চলে যাবেন। তারপর পানি আপনাকে আবার উপরের দিকে ঠেলে দেবে। তারপর আবার পানির ভেতরে চলে যাবেন। তারপর আপনার মুখের ভেতর পানি চলে যাবে। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ফুসফুসে বাতাসের জায়গা দখল করে নিবে পানি। তারপর আপনার শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হবে। চক্ষুদয় বেরিয়ে পড়ার অবস্থা হবে। অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে রক্ত জমে যেতে শুরু করবে। তারপর আপনার জিহ্বা

বেরিয়ে আসবে। এরপর আপনি ডুবে যাবেন এবং মরে যাবেন। হতে পারে আপনার লাশও কেউ খুঁজে পাবে না। আপনাকে খুঁজে খুঁজে আপনার পরিবারের জীবন হয়তো দোযখে পরিণত হবে। সুতরাং আমার মত হলো- আপনি আপনার ডুবে মরার ইচ্ছাকে পরিহার করুন। এমন ভয়াবহ ক্ষেত্রে ভাষা- সাহিত্যে টান টান দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা জুড়ে দেবে, না পানিতে ডুবতে উদ্যত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্যে নিজে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে হাত-পা ধরে টেনে তুলে আনবার চেষ্টা করবে। এই পৃথিবীতে কত বীর সাঁতারু ডুবন্তদের বাঁচানোর জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন! তাদের কখনোও দীর্ঘ ভাষণের সুযোগ হয়নি। তাছাড়া এখানে দীর্ঘ ভাষণ কোনো যুক্তিসমর্থিত বিষয়ও নয়।

এক ব্যক্তি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাকে দেখে কি কেউ এই বলে ভাষণ জুড়ে দেবে- 'জনাব! আপনার জানা নেই এটা কত ভয়াবহ আগুন। আপনি এর ভেতর পতিত হওয়ামাত্র আগুন আপনার কাপড়ে এসে লাগবে। কাপড় স্পর্শ করার সাথে আপনার শরীরের পশমগুলো জ্বলে যাবে। প্রথমে আগুন আপনার শরীরের চামড়াকে ধরবে। চামড়া পুড়ে যাবে। তারপর আগুন ধরবে আপনার শরীরের মাংশে। আপনার পরিবারের লোকেরা যদি তখন আগুন নিভিয়েও ফেলে, আপনি যদি তখন বেঁচেও যান তাহলেও আপনাকে যখন হাসপাতালে নেয়া হবে তখন হাসপাতালে বিছানায় শুয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। যন্ত্রণা আপনাকে অস্থির করে রাখবে। পোড়া মাংসে পঁচন ধরবে। দুর্গন্ধ এবং পুঁজের সৃষ্টি হবে। যারা দেখতে আসবে তারাও ভয়ে আতঙ্কিত হবে। আপনি যদি মারা যান তখন আপনার কাফন-দাফনও কঠিন হবে। এভাবে দীর্ঘ ভাষণ দিবে না। তাকে রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবনকে আশঙ্কায় ফেলে দিয়ে হলেও তাকে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

নদীতে পড়ে ডুবন্তকে রক্ষা কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বলন্তকে উদ্ধার করতে যতটুকু সময় আছে একজন মানুষের মৃত্যুর তো ততটুকু সময়ও নেই। সুতরাং 'মুসলমান হও, নিরাপদ হয়ে যাবে' কিংবা 'হে লোক সকল! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই- সফলকাম হয়ে যাবে'- বলা ছাড়া একজন দাঈ'র সামনে আর কী উপায় আছে? আমাদের সত্য নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর ও সত্য কথা বলেছেন- তোমরা পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছো আর আমি তোমাদের কোমর

ধরে ধরে বের করে আনছি। এ কারণেই তো তাঁকে লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি আপনাকে হয়তো ধ্বংস করে দেবেন। –কাহাফ : ১২৮

আমি তো মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গীদের একথাও বলি- দাওয়াত দেয়ার সময় যদি অভীষ্ট ব্যক্তি একটি প্রশ্ন করে উত্তর তবে দিবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে তারও উত্তর দিবেন। তৃতীয় প্রশ্ন করলে কৌশলে প্রশ্নের ধারা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসবেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করবেন। হেড অফিস থেকে হেদায়েত মঞ্জুর করে নিবেন। সাধারণত যারা মানসিকভাবে মানতে অপ্রস্তুত থাকে তারাই বেশির ভাগ প্রশ্ন করে। অন্যথায় 'কালেমা পড়' বলাই যথেষ্ট হয়। শুধু এতটুকুর দ্বারা কত ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে। পরে তাদের জীবন হয়েছে ঈর্ষণীয় উজ্জ্বল। আমি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি শুধু 'কালেমা পড়' দ্বারা মুসলমান হয়েছে। তারপর নিজের পরিবারের পেছনে কাজ করার মানসে তার পরিবারে বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। একবার সে আমার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চারটি দুআ চেয়েছিল। তার সেই দুআই তার রুচি ও ঈমানীবোধের পরিচয় বহন করে। সে বলেছিল- আমার জন্যে দুআ করবেন- ১. আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর মতো ঈমান নসীব করেন। ২. আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর মতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা নসীব করেন। ৩. আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে আলেম বানান আর ৪. আমার প্রতি ভালো ধারণাবশত বলেছে- আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে কমপক্ষে আপনার মতো দা'য়ী হিসেবে কবুল করেন।

এ কারণেই এই অধম সকল পথের সকল দাঈ'র সম্মান ও মূল্য যথাযথভাবে স্বীকার করে এবং মনে করে- সকলেই তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। বিশেষ করে এই অধম তার সহকর্মীদের উদাত্ত আহবান জানায় তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে। সেই সাথে এই অধম নিজের জন্যে 'কালেমা পড়'-এর পথকেই সঙ্গত মনে করে। আর যারা সাহস ও

ভালোবাসা রাখে তাদের জন্যেও সঙ্গত মনে করে 'কূলূ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সংক্ষিপ্ত পন্থাকে।

প্রশ্ন. এর জন্যেও সংক্ষেপে কিছু বলতে হয়। কুরআনে কারীমের আয়াত পাঠ করতে হয়। তো এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া আপনি বেশি যৌক্তিক মনে করেন।

মাওলানা সিদ্দিকী: আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মানুষের প্রবণতাগুলো সবচে' ভালো জানেন। কুরআন তাঁর কালাম। সুতরাং যেসব বিষয়কে কুরআন প্রাধান্য দিয়েছে, আমি মনে করি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। বলার অপেক্ষা রাখেনা, কুরআন প্রাধান্য দিয়েছে তাওহিদ-রেসালাত এবং আখেরাতকে। এর মধ্যেও তাওহিদ ও রেসালাতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনে বার বার বেহেশ্‌ত দোযখের কথা বলা হয়েছে। এই আলোচনা মানুষকে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিতেও উৎসাহিত করে, সাহস যোগায়। আখেরাতে নাজাতের ভিত্তিতেই ঈমান কবুলকারী ঈমানের উপর অটল থাকে। তাই অভীষ্ট ব্যক্তির সামনে বেহেশ্‌ত দোযখের আলোচনা যতটা করা যায় ততটাই ভালো। তোমার জানা আছে, 'মরনে কে বাদ কিয়া হোগা' বইটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে লেখা হয়েছিল। হিন্দিতে এর অনুবাদ হয়নি। বরং বর্ণমালার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে যারা কেবল হিন্দি জানে, তারা এই বই পড়ে পুরোপুরি মর্ম উদ্ধারও করতে পারে না। তারপরও কত মানুষ এ পর্যন্ত এ বই পড়ে মুসলমান হয়েছে!

উমর নাসেহী : মুসলমান হওয়ার পর প্রথম কোন বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া উচিত?

মাওলানা সিদ্দিকী : প্রথমে কুফর এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার প্রতি নজর দিতে হবে। তারপর পবিত্রতার নিয়ম-কানুন এবং নামায ইত্যাদির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বুঝাতে হবে, আমরণ ঈমানের উপর অবিচল থাকার অপরিহার্যতা। তাকে বলতে হবে ঈমানের মূল প্রয়োজন পড়বে মৃত্যুর পর। তারপর পরিবারের লোকদে মুসলমান বানানোর জন্যে তাকে প্রস্তুত করতে হবে। একজন নওমুসলিমকে দা'য়ী বানিয়ে দেয়াটাই তার সকল সমস্যার সমাধান বলা যায়। সত্যি বলতে কী, আমরা নিজেরাও যদি দা'য়ী হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদেরও সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্ন. সাধারণভাবে মনে করা হয় এবং মনে হয়-বাস্তবেও তাই- ইসলাম এবং মুসলমানকে মানুষ ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাওয়াতের কাজ করা আশঙ্কাজনক। এই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত দেয়া কি হেকমতের পরিপন্থী নয়?

মাওলানা সিদ্দিকী : এই যে প্রতিকূলতা এবং শত্রুতা এর মূল কারণ হলো- আমরা দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমরা মানুষের প্রতি আমাদের কল্যাণকামিতা প্রমাণ করতে পারিনি। কল্যাণকামীদের জন্যে কোনো বিপদ নেই। আজ সকল প্রতিকূলতার ভিত্তি হলো তাদের অজ্ঞতা। যারা অমুসলিম, দীনের দাওয়াত তাদের অধিকার। কাউকে তার অধিকার না দেয়া অনেক জুলুম। জালেম সর্বদাই আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও গযবের শিকার হয়। আমরা যদি দাওয়াত না দিই তাহলে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও গযবের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আশঙ্কা তো হলো দাওয়াত না দেয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ যদি দাওয়াত দেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার রয়েছে-

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আল্লাহই তোমাকে মানষের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া! তোমার জানা আছে, আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া দাওয়াত দেয়া এটা আমাদের আইনি অধিকার। কেউ যদি বাঁধা দেয় তাহলে ভারতীয় আইনে সে অপরাধী হবে। সুতরাং এই কাজ না করার পেছনে ভয় থাকতে পারে, আশঙ্কা থাকতে পারে; করার ক্ষেত্রে আবার আশঙ্কার কথা আসছে কেন? আর যদি কোনো বিপদ আসেও তাহলে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত সঙ্গীগণ ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিসর্জন দিয়েছেন, ত্যাগ সয়েছেন, আমরাও সেই ত্যাগ ও বিসর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করবো। আর বাস্তব কথা হলো আল্লাহ তায়ালা জানেন আমরা দুর্বল। আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সামর্থের বাইরে কখনও দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।

প্রশ্ন. আলহামদুলিল্লাহ! বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক লোক দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। এখন তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং এই কাজকে গতিশীল করে রাখার উপায় কী বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী: এই অধমের মত হলো- প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব অঙ্গনে নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করতে দেয়া উচিত। উচিত প্রত্যেকের কাজকে

স্বীকার করা। সামর্থ অনুযায়ী সহযোগিতা করা। অন্যের কাজের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। অনেক সময় ঐক্যের পথে অধিক চেষ্টা উপকারী না হয়ে ক্ষতিকরও হতে পারে। আমাদের মতো কর্মীদের মাঝে এমনিতেও এখলাসের অভাব আছে। সবাই চাইবে আমার নেতৃত্বে কাজ হোক। দৃশ্যত এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যে উচিত, প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে কাজ করে যাওয়া। আর সামর্থ মাফিক অন্য যারা কাজ করছে তাদের সহযোগিতা করা। আমি মনে করি, পাস্পরিক ঐক্যের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

প্রশ্ন. আপনি অনেক সময় বলে থাকেন- দা'য়ী এবং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে পরস্পর আস্থাহীনতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। বিশেষ করে মুসলমাদের নেতিবাচক মানসিকতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। এর চিকিৎসা কী?

মাওলানা সিদ্দিকী : দা'য়ী এবং মাদউ- উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো চিকিৎসক এবং রোগীর মতো। চিকিৎসক যদি রোগীকে প্রতিপক্ষ এবং ষড়যন্ত্রকারী মনে করে তাহলে তো চিকিৎসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এর আসল চিকিৎসা হলো বাস্তবে দাওয়াতের ময়দানে নেমে আসা। ময়দানে নেমে এসে যখন ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্ত শত্রুকে দাওয়াত দেবে তখনই উপলব্ধি করতে পারবে এর শত্রুতার মূল ভিত্তি হলো অজ্ঞতা কিংবা ভুল ধারণা। আমাদের এক বন্ধু 'কিভাবে মুসলমান হলাম' শিরোনামে ছয়জন নওমুসলিমের ইন্টারভিউ সংকলন করেছেন। আরমোগান থেকেই। তারপর সেগুলো হিন্দিতে অনুবাদ করে ছাপিয়েছেন। একবার এক ব্যক্তি আমার মোবাইলে এসএমএস করলো। এসএমএস-এ সে লিখেছে- আমি বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বশীল। আপনার সাথে দেখা করবো। যখন সময় দিবেন তখন আপনার সাথে কথা বলবো। আমি তার সাথে কথা বললাম। কথায় মনে হচ্ছিল কোনো স্বামীজি। সে বললো- এক সময় এ্যাম্বুলেন্সেও কোনো মুসলমান আমার কাছে ভালো লাগতো না। কিন্তু 'কিভাবে মুসলমান হলাম' পড়ে আমার চিন্তা একেবারে বদলে গেছে। এরই মধ্যে আমি কুরআন মাজীদ পড়েছি। আমি পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি। বিশেষ করে মুসলমান হওয়ার পর আমাকে কী কী সংকটের মুখোমুখি হতে হবে।

আমি বলি- দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েই বুঝা সম্ভব আমাদের সমস্যাটা কোথায়। আমাদের প্রচলিত নেতিবাচক চিন্তা দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারাই ইতিবাচক এবং কল্যাণকর চিন্তায় পনিণত হতে পারে।

প্রশ্ন. আপনি আপনার একটি রচনায় উল্লেখ করেছিলেন-

ہر مرض کی دوا کی ہے صل علی محمد

'সকল রোগের চিকিৎসা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ।'

সে লেখাটি পরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আপনি উল্লেখ করেছেন- পৃথিবীর সকল সংকটের সমাধান হলো দাওয়াত। কথাটি যখন আমরা বলি তখন মানুষ বলে- এটা বাড়াবাড়ি এবং দাওয়াতি উন্মাদনা। ইসলাম হলো মধ্যপন্থার ধর্ম। এখানে বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মাওলানা সিদ্দিকী : কোনো সন্দেহ নেই ইসলাম হলো মধ্যপন্থার ধর্ম। শুধু ইসলাম কেন কোনো ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের এই মধ্যপন্থার মাপকাঠি কী হবে এটাও ঠিক করা আছে। নইলে তো প্রতিটি মানুষই তার নিজের পথ ও চিন্তাকে মধ্যপন্থা বলে দাবি করবে। সত্যি বলতে কী, অতি সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিও নিজেকে সীমালঙ্ঘনকারী মনে করে না। মনে করে সেই ঠিক জায়গায় আছে। আমাদের জন্যে বাস্তব জীবনে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে মধ্যপন্থার নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর আদর্শই হলো মধ্যপন্থার বাস্তব চিত্র। আমরা যখন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত নিয়ে ভাবি তখন দেখি, প্রতিটি কল্যাণকর্মেই তিনি ছিলেন প্রতিযোগী। তাঁর নামাযের অবস্থা ছিল এই- রাতভর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পা ফুলে যেতো। কিন্তু তাই বলে কেউ এসে তাঁকে এ কথা বলতে শোনা যায়নি- আপনি এত নামায কেন পড়ছেন? আপনাকে কি নামাযের পাগলামি পেয়েছে? তিনি রোযার পিঠে রোযা রাখতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে পাগল বলা হয়নি।

দানশীলতা ছিল এমন- হাতে কখনও কোনো সম্পদ এলে বণ্টন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে যেতেন না। কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দিতেন না। ঋণ করে মানুষের প্রয়োজন মেটাতেন। ঋণপ্রার্থীরা তাঁকে কষ্ট দিতো। কিন্তু এ কারণে তাঁকে পাগল বলা হয়নি। অন্য কোনো কল্যাণকর্মে তাঁর এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার কারণে তাঁকে কখনও পাগল বলা হয়নি।

কুরআন শরীফে নয়বার 'জুনুন' পাগলামি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। দুই বার ব্যবহার হয়েছে অন্য নবীর ক্ষেত্রে। সাতবার ব্যবহার হয়েছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে। আর সেটাও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর অস্থিরতা এবং মানুষ কেন মুসলমান হচ্ছে না এই চিন্তায় তাঁর বিচলতার প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়- হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের আলোকে ইসলামের মধ্যপন্থার দাবি হলো- দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এক ধরণের উন্মাদনা থাকতে হবে। মানুষকে কুফর শিরক এবং দোযখ থেকে বাঁচাবার অস্থিরতায় তাকে এতটাই বিচলিত হতে হবে মানুষ যেন তাকে বলতে বাধ্য হয়- একে দাওয়াতের উন্মাদনায় পেয়েছে। আমরা তো এই ভেবে বিস্মিত হই- এখনও তা কেবল মুখে দাওয়াত বলে চেঁচাচ্ছি। আহা! যদি আমাদের অন্তরাত্মায়ও হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই দাওয়াতি অস্থিরতা এবং উন্মাদনা প্রতিষ্ঠিত হতো! এই অধম দুআ কবুলের বিশেষ জায়গাগুলোতে এবং বিশেষ সময়গুলোতে সর্বদা এই দুআই করি- আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের আমাদের নবীর মতো দাওয়াতি উন্মাদনা দান করেন।

উমর নাসেহী : আমাদের বন্ধুরা যখন কোথাও যায়, তখন মাঝেমধ্যে তাবলীগি সাথীদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। অনেকেই বলে-আমাদের মুরব্বীদের পক্ষ থেকে এর অনুমতি নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

মাওলানা সিদ্দিকী : এ কথা আমি আগেও বলেছি, আমাদের মতো একেবারে শেকড়ছিন্ন তৃণলতাদের দাওয়াতের কাজে যুক্ত হওয়া অতঃপর আমাদের হাতে মানুষের ইসলাম গ্রহণে ধন্য হওয়া এটা একশ' ভাগ তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর নির্দেশনা এবং তাঁর কান্নাকাটির কারিশমা। আমার হযরত রহ. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাথে যেসব আলেম কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আমাদের হযরত বলতেন- হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করার জন্যেই বেরিয়েছিলেন। তারপর মেওয়াতের লোকদের সাথে দেখা হয়- যারা ছিল আধা মুরতাদ। পরে তিনি তাদের সম্মিলিত দাওয়াতের ক্ষেত্র মনে করে তাদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। তারপর মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতি প্রেরণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেন। যাকে বরাবরই তিনি কাজের 'আলিফ-বা' বলতেন- এই অধম মনে করে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ এটা

বাঙালাওয়ালী মসজিদের কর্মসূচীর 'তা-ছা'। আমি একশ' ভাগ বিশ্বাস করি, বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে এই কালিমা পৌঁছাবে। এই অধমের কাছে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর অসখ্য চিঠির ফটো সংরক্ষিত আছে। সেসব চিঠিতে তাঁরা প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন- আমাদের কাজ তো এখনও শুরুই হয়নি। মানুষ যখন দলে দলে ইসলাম গহণ করবে তখন বুঝবো আমাদের কাজ হচ্ছে।

একবার দিল্লির এক এজতেমায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দাঈগণের মজলিসে এই অধমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- আপনি তাবলীগি জামাতের মুরব্বীগনকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে বলেন না কেন? আমি তখন সত্য প্রকাশের খাতিরেই বলেছিলাম- এখন দুনিয়াব্যাপী যে দাওয়াতের পরিবেশ হয়েছে, মানুষ দলে দলে মুসলমান হচ্ছে এর অধিকাংশই এমন- যারা হয়তো সেচ্ছায় কিংবা ইসলামের বিরোদ্ধে প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে জেনে বুঝে মুসলমান হচ্ছে। অথবা তারা মুসলমান হচ্ছে মুসলমানদের দাওয়াতি প্রচেষ্টার বরকতে। আপনি যখন এ বিষয়টাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তখন নিশ্চিত এই ফলাফলে উত্তীর্ণ হবেন- মুসলমানদের প্রচেষ্টায় যারা মুসলমান হচ্ছে তাদের অধিকাংশই হলো তাবলীগি জামাতের সাথীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফসল।

আর এটা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কাল থেকেই চলে আসছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ)-এর সাথে ছায়ার মতো যারা থেকেছেন তাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর জীবন ও কর্ম পূর্ণাঙ্গ ভাবা যায় না, তাঁরা হলেন- এক. মিয়াজী মূসা ও দুই. হাজী আব্দুর রহমান উটাওরভী রহ.। হাজী আব্দুর রহমান রহ. ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর পরম আস্থাভাজন এবং নওমুসলিম। তাঁর হাতে- এক বর্ণনায় চার হাজারেরও বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছে। তাছাড়া কর্নেল আমিরুদ্দীনের মতো এমন অসংখ্য তাবলীগি কর্মী আছে যাদের হাতে বিশাল সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়েছে। এখনও যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তাদের দীনি তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের জন্যে তাবলীগ জামাতে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই ।

আলহামদুলিল্লাহ! মারকাযের সকল মুরব্বী এই অধমের জন্যে এবং তার সহকর্মীদের জন্যে বরাবর দুআ করেন। সাক্ষাতের বিশেষ বিশেষ স্থানে সময়ে আমাদের জন্যে সর্বদাই দুআ করেন। ট্রেনে, বাসে, ষ্টেশনে, বাসষ্টেশনে, যে

তালিম হয় তাতে অমুসলমানদেরও শামিল করার কথা এজতেমাগুলোতে আমাদের বুযুর্গগণ এখণ বলছেন। হয়তো ভুল বুঝার কারণে কোথাও কোনো বিরোধিতার ঘটনাও ঘটতে পারে। সেটা তো নিজেদের সহকর্মীদের মধ্যেও নানা সময়ে নানা কারণে ঘটে থাকে। আর তেমন কী!

প্রশ্ন. অনেকেই বলে- আগে আমাদের সংশোধন দরকার । আমরা মুসলমান হয়ে যখন ঠিক হতে পারিনি, খোদ আমাদের মধ্যেই যখন মানুষ মুরতাদ হচ্ছে তখন অন্যদের নিয়ে ভাবনার সুযোগ কোথায়? এই ধরণের প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মাওলানা সিদ্দিকী : এটা একটা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এ জন্যে আমি আরমোগানে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি। আমার সেসব প্রবন্ধ এখন গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম- دعوت دین: کچھ غلط فہمیاں کچھ حقائق 'দীনি দাওয়াত: কিছু ভুল ধারণা কিছু বাস্তবতা' এতে আমি এ জাতীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি। এ-ও বলার চেষ্টা করেছি, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ধর্মত্যাগী ফেতনার একমাত্র সমাধান হলো, এই উম্মতের মধ্যে দাওয়াতের চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি এটা পাঠ করার পর এ বিষয়ে কোনো সংশয় অবশিষ্ট থাকবে না। উলামায়ে কেরাম রচনাটিকে পছন্দ করেছেন। অনেকেরই এটা পাঠ করার পর মনের সকল প্রশ্ন দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন. রমযান মাসে আমাদের দাওয়াতের কী কর্মসূচী থাকা উচিত বলে মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : এই মাসকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এটা হলো শাহী দানের মওসুম। সমগ্র মানব জগতের জন্যে পথনির্দেশিকা হিসেবে অবতীর্ণ কুরআনের বরকত অর্জনের মাস এটা। এটা দাঈদের জন্যে তাদের টার্গেট স্থির করার মাস। বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে মনের প্রার্থনাকে মঞ্জুর করে নেয়ার মাস। এজন্যে উচিত, এই মাসে নিজের জন্যে দা'য়ী হবার মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে চেয়ে নেয়া। আল্লাহ তায়ালা যখন মঞ্জুর করে নেন তখন উপায় উপকরণ এমনকি ঈমান এবং অন্তরের ব্যাকুলতাও আল্লাহ তায়ালাই দান করেন। এজন্যে পুরো বিশ্বাস এবং দরদের সাথে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুআ করা উচিত।

প্রশ্ন. দাওয়াতের ময়দানে দাঈ'র জন্যে সবচে' লক্ষণীয় বিষয় কোনটি? কোনো বিষয়টি তার জন্যে সর্বাধিক উপকারী বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা সিদ্দিকী : এক কথায় সকলের জন্যে জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সকলের জন্যেই আলাদা উত্তর হতে পারে। এক্ষেত্রে এই অধমের অভিজ্ঞতা হলো- দাওয়াত হলো নবীগণের কাজ। এই কাজের মহত্ত্ব ও বড়ত্বের পাশাপাশি নিজের অযোগ্যতা এবং ক্ষুদ্রতার কথা যত বেশি মনে থাকবে তত বেশি আল্লাহ তায়ালা পথ খুলে দিবেন। মানুষ নিজের অযোগ্যতা ইলম ও আমলের ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি যত প্রখরভাবে অনুভব করে ততই তার কান্নাকাটি এবং মুনাজাতের তাওফিক হয়। মানুষের তো দুআ আর মুনাজাত ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নাই। মানুষ যত বেশি পরম বিনয়ের সাথে মুনাজাত করে ততই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দানের ফয়সালা হয়।

প্রশ্ন. আরমোগানের পাঠকদের উদ্দেশে আপনার কোনো বার্তা?

উত্তর. এই দেশ মহাব্বত ওয়ালাদের দেশ। আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম রূপ ও অবয়বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ভালোবাসাপ্রবণ এই জাতি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যে সাজানো হয়েছে। আল্লাহর উত্তম সৃষ্টি এই মানুষের উচিত নিরাশ না হয়ে বরং মানুষের সত্তায় নিহিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার জন্য প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া। এখানে দাওয়াতের জন্যে যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন সাহস ও ভালোবাসার। প্রয়োজন হেদায়েতের জন্যে তৃষ্ণার্ত মানবতার ঠোঁটে হেদায়েতের ঠান্ডা পানির পেয়ালাটুকু লাগিয়ে দেয়া। যদি কেউ এই আবেগ নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সকল নিরাশা আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা ওমর নাসেহী

মসিক আরমুগান, মে ও জুন,২০১০ইং

জনাব মুহাম্মদ নাঈম (উত্রপাল সিং চোহা)-এর সাক্ষাৎকার

তবে আমার কাছে মনে হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর পিপাসা এখন ইসলাম। যাদের কাছে ইসলাম আছে তাদের কর্তব্য হলো সকল তৃষ্ণার্তদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেয়া। যারা তৃষ্ণার্ত তারা পরম ভালোবাসার সাথে ইসলামকে গ্রহণ করবে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন পানি পান করে, তেমনিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে।

অথচ মুসলমানদের অবস্থা হলো, আমরা তাদের তৃষ্ণা নিবারণের পরিবর্তে তাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবছি। এটা ইসলামের চরিত্র নয়। আমাদের উচিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রতি দয়াবান হয়ে তাদের পিপাসা মিটানো। তাদের অজ্ঞতার কারণে অন্যায়ের বিনিময় অন্যায় দ্বারা দেয়া উচিত নয়।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

নাঈম মুহাম্মদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : নাঈম সাহেব, আপনি ভালো আছেন?

উত্তর : আলহামুদলিল্লাহ! আমার আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি খুব ভালো রেখেছেন।

প্রশ্ন : আব্বু হয়তো আপনাকে ফোন করেছেন। তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

উত্তর : হ্যাঁ, হযরত ফোন করেছিলেন আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। হযরত বলেছেন– আরমুগানের জন্য আপনার একটি সাক্ষাতকার প্রকাশ করতে চাই। আমি বললাম- আর আমার জন্য এরচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। কোনো দীনি কাজে আমারও একটি অংশ থাকবে। তা-ও আবার আমার শায়েখের নির্দেশে।

প্রশ্ন : নাঈম ভাই! আপনার বংশীয় পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : এখন থেকে ৫০ বছর আগে বাহরাইচ-এর রাজপুত পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা ছিলেন সরকারী স্কুলের হেড মাস্টার। বাহরাইচে ইন্টার পাস করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হই। দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিলে বি এ পাস করার পর ডিডিএতে চাকুরি পেয়ে

যাই। আমার মেযাজ ছিল একটু বেশি গরম। বংশীয়ভাবে জমিদার মেযাজ ছিল। তাছাড়া ঘুষ দেয়া-নেয়া অনেক বড় পাপ এ কথা আব্বু আমাদের ছোটবেলায় শিখিয়েছিলেন। অফিসার এবং নেতাদের সাথে আমার এ নিয়ে ঝগড়া হতো। ফলে আমাকে সাসপেন্ড হতে হয়। একদিন রাগ করে রিজাইন দিয়ে দিই। একজনের সাথে মিলে একটি কনস্ট্রাকশন কম্পানি খুলি। প্রাইভেট ঠিকাদারির কাজ করতে শুরু করি। কাজ-কাম ভালোই চলতে থাকে। আমাদের কর্মের পরিধি যখন বাড়তে শুরু করল, তখন এল এফ- এর কাজও নিতে থাকি। এর বাইরেও কয়েকটি বড় বড় কোম্পানির কাজ করি।

আমাদের ব্যবসা যখন বড় হলো তখন দিল্লিতে একটি শপিংমলের ঠিকাদারী নিলাম। আশা ছিল এই কাজটিতে আমাদের ভালো লাভ হবে। কিন্তু আমার পার্টনারের নিয়তে গরমিল এসে গেল। শপিংমলের মালিকও আমাদের সাথে প্রতারণা করলো। ফলে হঠাৎ করেই আমাদের কোম্পানির ধস নেমে গেল। এদিকে লোহা এবং সিমেন্টের দাম বেড়ে গেল। এটা ছিল বিপদের ওপর বিপদ। দিল্লীর নয়টি প- ট ও সাতটি ফ্ল্যাট বিক্রি করেও ক্ষতিপুরণ করা সম্ভব হলো না। তারপর আদালতে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হলো। আমার গাড়িটিও বিক্রি করতে হলো। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার একটি পুরানো গাড়ি ক্রয় করি। পাওনাদাররা আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো। আর তখনই আমার প্রতি সৃষ্টিকর্তার করুণা হলো। অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে ঈমানের আলো দেখতে পেলাম। এই পাপী কৃষ্ণ বান্দার জীবন তিনি ঈমানের আলোয় আলোকিত করে দিলেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করলেন কীভাবে বলবেন কি?

উত্তর : ১৩ই আক্টোবর আমার জীবনে একটি কালো অধ্যায় ছিল। আমাকে পাওনাদারদের চাপে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল। আমার সাথে পাওনাদাররা এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলো যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি আমার পনের বছরের ছেলের সাথে আমার স্ত্রী এবং দু'সন্তানকে ইজ্জত রক্ষার জন্য গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। ১৪ই অক্টোবর সকালে মোকাদ্দমার প্রয়োজনে আমাকে জামেয়া নগরে গাফফার মঞ্জিলে একজন উকিলের সাথে পরামর্শ করার জন্য যেতে হয়েছিল। সেখানে আমি সকালেই পৌঁছালাম। পরামর্শ শেষে সকাল সাড়ে নয়টায় আমি ফিরছিলাম, গাফফার মঞ্জিলের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় বাউন্ডারির পাশ দিয়ে আমি একাই গাড়ি চালিয়ে

যাচ্ছিলাম, দেখি আপনার আব্বু হেঁটে মেইন রোডের দিকে যাচ্ছেন।

তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, ইনি কোনো ধার্মিক মানুষ হবেন। মনে-মনে ভাবলাম একজন ভালো মানুষ! পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে গাড়িতে তুলে নিই। হতে পারে তিনি আমাকে কোনো চিকিৎসা বলে দিবেন। আমি তাঁর পাশে গাড়ি থামালাম। বললাম- আসুন! আপনাকে মেইন রোডে নামিয়ে দেব। তিনি বললেন– ধন্যবাদ আপনাকে, আসলে আমি আজ মর্নিং ওয়াক করতে পারিনি এজন্যেই হেঁটে যাচ্ছি। আমি বললাম– আমার সেবা করার সুযোগ হয়ে যাবে, অনুগ্রহ করে আসুন! তিনি গাড়িতে উঠলেন, আমার পাশের সিটে বসলেন। আমি জানতে চাইলাম-কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন– বাটলা হাউজ খলিলুল্লাহ মসজিদের কাছে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পার হবার পর প্রধান সড়কে এসে তিনি নেমে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আরো কিছুক্ষণ তাঁর সাথে চলি। বললাম, মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার! আমি আপনাকে বাটলা হাউজে পৌঁছে দিচ্ছি। তাঁর বারবার নিষেধ করতে থাকলেন আমি গাড়ি থামালাম না। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন– আমি বললাম– উত্রপাল সিং চৌহান। নাম জানার পর তিনি আমাকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। বললেন– দেখুন, আপনি আমার সাথে কেবলমাত্র মানবিক কারণেই এই সদয় আচরণ করেছেন। আপনার ব্যবহার আমার খুব ভালো লেগেছে।

আমার মন চাচ্ছে আপনাকে এমন একটি উপহার দিই; যা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনে আপনার কাজে আসবে। যেই মালিক পুরো দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম রয়েছে। তারমধ্যে দুটি নাম হলো– 'ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম।' হাদী অর্থ- যিনি মানুষকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেন। আর রাহীম অর্থ সর্বাধিক করুণাময় এবং সবচে' বড় দাতা। সকালে ঘুম থেকে ওঠে গোসল করে অথবা হাতমুখ ধুয়ে এই নাম দুটি একশ' বার পড়বেন। পড়ার সময় মনে-মনে ধ্যান করবেন– আমি আমার মালিককে স্মরণ করছি। তারপর পরিবার, ব্যবসা কিংবা অন্য যে কোনো সমস্যায় সরাসরি মালিকের কাছে প্রার্থনা করবেন, ইনশাআল্লাহ তিনি অবশ্যই বিপদ দূর করে দেবেন। আমি আপনাকে মালিকের ফোন লাইন ও ই-মেইল লাইন বলে দিলাম। আমি তখন বললাম– মিয়া সাহেব! বর্তমানে আমি খুব সমস্যায় আছি। আমার সমস্যার কথা শুনলে আপনারও চোখে পানি চলে আসবে।

এ কথা বলতেই আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি আমার

অবস্থা দেখে বললেন– আমাকে শুনিয়ে কী লাভ হবে! আমরা সবাই তো বিভিন্ন সমস্যায় ডুবে আছি। যে নিজেই বিপদের শিকার তাকে বিপদের কথা শুনিয়ে কী লাভ! আপনি বরং ইয়া হাদী এবং ইয়া রাহীম পড়ে বিপদের কথা আপনার মালিককে বলুন। তাঁকে বিপদের কথা বলতে কোনো লজ্জা নেই, কোনো আপমান নেই। আর তিনিই সবকিছু করতে পারেন। তবে এই যপের জন্য একটি বাছ আছে। একমাত্র এই মালিক ছাড়া আর কারো পূজা কিংবা কারও সামনে মাথানত করা যাবে না। কারও সামনে হাতজোড় করা যাবে না। পীরের সামনেও না; দেবীর সামনেও না। ভালো হয় ঘরে মূর্তি থাকলে সেগুলো বের করে ফেলবেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বিদায় জানাবার উদ্দেশে হাতজোড় করলাম। তিনি বললেন– এ থেকেই তো বেঁচে থাকতে বললাম। দাওয়া ব্যবহারে খাবার চেয়ে বাছ মেনে চলা বেশি জরুরী। আমি 'সরি' বলে ক্ষমা চাইলাম।

পরদিন সকালে আমি গোসল করলাম এবং চোখ বন্ধ করে একশ বার 'ইয়া হাদী ও ইয়া রাহীম' পাঠ করলাম। মাওলানা আহমদ সাহেব! আমি বলে বুঝাতে পারবো না, তখন আমার অনুভূতি কী হয়েছিল! মনে হয়েছিল, আমার মালিক আমার সামনে, আমি আমার বেদনাভরা ইতিহাস তাঁকে শুনিয়েছি। প্রার্থনা করেছি ও তাঁকে বলেছি– মালিক! আপনাকে আমি কী শোনাবো! আপনি তো আমার থেকে বেশী জানেন। প্রায় আধা ঘন্টা যাবত মালিকের দরবারে কেঁদেছি আধা ঘন্টা পর যদিও আমার পূর্ব সমস্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি তবুও আমার কাছে মনে হয়েছে আমার অন্তর এবং মাথা থেকে বিরাট বড় একটি বোঝা নেমে গেছে। মনে হয়েছে, আমি আমার মোকাদ্দমার ভার অন্য কারও কাঁধে সঁপে দিয়েছি। সেদিনও পাওনাদাররা এলো। কিন্তু সেদিন তারা আমার সাথে খুবই মার্জিত ভাষায় কথা বলল। মন চাচ্ছিল আমি সন্ধ্যায়ও এই দুআগুলো আবার পাঠ করি। আবার মনে হলো– হযরত তো আমাকে একবারই পাঠ করতে বলেছেন। পরক্ষণে মনে হল– মালিকের নাম যতো পারি নেব, তাতে সমস্যা কী! সাথে সাথে এ-ও মনে হলো– ওষুধ চিকিৎসকের কথামতই ব্যবহার করতে হয়। আমি সেদিন হযরতের নাম জিজ্ঞেস করিনি, ঠিকানাও জনতে চইনি এমনকি ফোন নাম্বারও না। আমি জামেয়া নগর এলাকার দিকে গাড়ি নিয়ে বের হলাম। বিকাল তিনটা থেকে রাত পর্যন্ত উখলা এবং তার আশপাশে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু

তাঁর সাথে দেখা হলো না। সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম। সকালের অপেক্ষায় ছিলাম। সকাল সকাল গোসল করে আবার ইয়া হাদী ইয়া রাহীম পাঠ করলাম। খুব ভালো লাগল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন এই দুআ পড়লাম। মনের অজান্তেই বারবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম।

তিন দিন পর ঘর থেকে সবগুলো মূর্তি বের করে মন্দিরে রেখে এলাম। একুশে অক্টোবর শপিংমলের মালিকের বিরুদ্ধে আমাদের একটি মামলার রায় হওয়ার কথা। মামলাটি হাইকোর্টে চলছিল। হাইকোর্টে গেলাম। মামলার রায় হলো আমাদের পক্ষে। আদালত এক মাসের ভেতর পঁচাশি লাখ রুপি আদায় করার রায় দিলেন। আমার আনন্দের সীমা ছিল না। তারপর ২২শে অক্টোবর গ্রীন পার্কে এক পার্টির সাথে মিটিং করতে গেলাম। লোকজন মসজিদে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম মসজিদের মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি– ইয়া হাদী এবং ইয়া রাহীম আরও বেশি পড়া যায় কিনা। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম– আমি কি মসজিদের মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে পারবো? তিনি বললেন, আধাঘন্টা পর নামায শেষে আপনি অবশ্যই দেখা করতে পারবেন। আমি অপেক্ষা কর ছিলাম। লোকজন নামাযে চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি আমাকে মাওলানা সাহেবের কক্ষে নিয়ে গেল। আমি তখন বললাম– এক মিয়া সাহেব আমাকে একশ' বার 'ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম' পড়তে বলেছিলেন। এগুলো পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। এখন আমি আরো বেশী পড়তে চাই। এতে কোনো ক্ষতি আছে কি? তিনি বললেন– আরো পড়ে নিয়েন আরো পরামর্শ দিলেন আপনি উখলায় গিয়ে মাওলানা কালিম সিদ্দীকির সাথে সাক্ষাত করুন। তিনি আপনাকে আরো ভালো পরামর্শ দিবেন। আমি তাঁর কাছে মাওলানা সাহেবের ঠিকানা চাইলাম। তিনি বললেন– বাটলা হাউজ জামে মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন। সেখানেই তাঁর অফিস।

আমি সেখান থেকেই বাটলা হাউজ চলে গেলাম। ইমাম সাহেব বললেন– মসজিদের সামনে যে 'দারে আরকাম' নামে অফিস দেখতে পাচ্ছেন সেখানে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করুন। সেখানে গিয়ে একজন হাফেয সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন– খলিলুল্লাহ মসজিদের পাশেই তাঁর বাড়ি। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। সম্ভবত হযরত এখন সফরে আছেন। আমি খলিলুল্লাহ মসজিদে অনেক সময় খোঁজাখুজির পর তাঁর ফ্ল্যাট পেলাম। দরজায় নক করার

পর একটা বাচ্চা এসে বলল– হযরত মাদ্রাজ সফরে গেছেন। এক সপ্তাহ পর ফিরবেন। আমি ওখান থেকে ফোন নম্বর নিলাম। মসজিদের বাইরে এসে লক্ষ করলাম টুপি মাথায় একজন লোক ঠেলা গাড়িতে করে বই-পুস্তক বিক্রি করছে। অনুমান করলাম ইসলামী বই হবে হয় তো। কাছে গিয়ে বললাম– হিন্দীতে কোনো ভালো দুআর বই থাকলে আমাকে দাও। সে আমাকে ছোট সাইজের কয়েকটি বই দিল। 'মাসনুন দুআ' ও 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ' বই দুটি কিনে নিলাম।

মনে হলো ইসলাম সম্পর্কিত আরো অন্য কোনো বই কিনি। আমি তাকে বললে সে আমাকে 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' ও'জান্নাত কি পুঞ্জী' ও 'দোযখ কা খটকা' কিতাব তিনটি দিল। এই পাঁচটি কিতাবের সাথে দুকানদার 'আপকি আমানত আপকি সেওয়া মে' নামে আমাকে ছোট্ট একটি বই দিল, বলল-এই বইটি আপনাকে ফ্রি দিলাম। সে বলল আপনি বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। তারপর দুআ করবেন। আপনার অনেক উপকার হবে। আমি ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির উপর লেখকের নাম দেখে বললাম– আমি তো মাওলানা কালিম সিদ্দীকির সাথেই দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁর সাথে দেখা হলো না। হকার লোকটি বলল– তাঁর সাথে দেখা হওয়া তো খুব কঠিন ব্যপার। তবুও আপনি অবশ্যই দেখা করবেন আপনার ভালো লাগবে। আমি কিতাবগুলো নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

মোবাইলে মাওলানা সাহেবের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মোবাইল বন্ধ থাকায় কথা বলতে পারলাম না। সেই রাতেই 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি পড়ে ফেললাম। ছোট বইটি হাতে নিলাম এক একটি শব্দ না পড়া পর্যন্ত আমার মন ভরলোনা। একবার পড়ার পর দ্বিতীয়াবার পড়লাম। বইটি পড়ে মনে হচ্ছিল, কঠিন পিপাসার পর তৃপ্ত হবার মতো পানি পেয়েছি। এবার হযরতের সাথে সাক্ষাতের আকুলতা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। আল্লাহ আল্লাহ করে চতুর্থ দিন তার সাথে কথা বলতে পারলাম। তার আওয়াজ শুনে সন্দেহ হলো– ইনি কি সেই লোক? যিনি আমার গাড়িতে ওঠেছিলেন এবং আমাকে ইয়া হাদী ও ইয়া রাহীম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সেই পুস্তিকাটির পিছনেও লেখা ছিল ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম।

চারদিন পর হযরত ফিরে এলেন। সেটা ছিল ৪ঠা নভেম্বর। সকাল সাড়ে দশটায় আমি খলিলুল্লাহ মসজিদে হযরতের সাথে দেখা করলাম। তাঁকে দেখে আমার খুশির আর অন্ত রইলো না। দেখলাম, 'আপ কি আমানত' এবং দারে আরকামের মাওলানা কালিম সিদ্দিকী আমার দেখা সেই মিয়া সাহেব। আর তিনিই আমাকে গাফফার মনজিল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম-এর সবক দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আমার অবস্থা জানালাম, তাঁর প্রতি

শুকরিয়া জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপকি আমানত' পড়ে আপনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমি বললাম- এই পুস্তিকার প্রতিটি হরফ আমার অন্তরাত্মায় লেখা হয়ে গেছে। হযরত বললেন– তাহলে কি আপনি কালেমা পড়েছেন? আমি বললাম– পুস্তিকায় তো পড়েছি। এখন আপনি পড়িয়ে দিন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন এবং নাম রাখলেন নাঈম মুহাম্মদ। আমাকে বললেন– জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে এই হাদী ও রাহীম মালিকের সন্তুষ্টি মতে চলতে হবে। তিনি এমন মালিক যাঁর সামনে চোখের পানি ফেললে মনে হয় যেন আমার বোঝা নেমে গেছে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আপনার সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালা বরকতময় করুন। তারপর দীন শেখার ব্যাপারে কি কিছু ভেবেছেন?

উত্তর : হযরতের পরামর্শে একজন মাওলানা সাহেবের কাছে নামায শিখেছি এবং এখন কুরআন শরীফ পড়ছি। এখন আমার তৃতীয় পারা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন : এসব কাহিনী আপনার পরিবারের লোকজনকে বলেছেন কি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এরপর তিনটি মামলাতেই আমার পক্ষে রায় হয়েছে। আমি পুনরায় ঘর ক্রয় করেছি। আমি আমার ঘরের সবাইকে ডেকে পুরো কাহিনী শুনিয়েছি। আমার এই নতুন অবস্থা তাদের ভালো লেগেছে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমার তিন সন্তান ও আমার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছে। মাওলানা সাহেব আমার স্ত্রীর নাম রেখেছেন খাদিজা এবং আমার সন্তানদের নাম রেখেছেন আমেনা, ফাতেমা ও মুহাম্মদ উমর।

প্রশ্ন : আপনি কি আগে কখনও ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন?

উত্তর : আমার বংশীয় প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। বাবরি মসজিদ শাহাদাতের সময় ইসলামের প্রতি বিরোধিতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের বংশের একজন পুলিশ ডিআইজি মুসলমান হয়ে হুযাইফা নাম ধারণ করেছিলেন। ফলে আমাদের পরিবারে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি দূরত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিলো। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সম্প্রসারিত হলো তখন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য মনে করে আমি বজরং দলকে অনেক অর্থ যোগান দিয়েছি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অনেক মুসলমান ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। বাহ্যত তাদের সাথে কথাবার্তার কারণে একটা প্রভাব তো ছিলই; তবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইমেজ ভালো লাগতো না। তাদের কারণেই মুসলমানদের থেকে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এবার ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিল ভিন্ন রকম। আমার বুদ্ধি ও অন্তরের পর্দা সরতে লাগল। মূলত ইসলাম বিরোধী মানসিকতা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বুঝতে দেয়নি। ইসলাম ছিল আমার ভেতরের একটা প্রয়োজন।

আলহামদুলিল্লাহ! সেটা আমি পেয়েছি। আমার কাছে মনে হয় যেন আমি আমার আসল ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার ঘর আমার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘর আবার ফিরে পেয়েছি।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতে আপনার বংশের লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করেছেন ?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমি তিনবার তিন দিনের জামাতে গেছি। হযরতকে বলেছি- নতুন বছর থেকে প্রতি মাসে দীনি দাওয়াতের জন্য এক লাখ টাকা খরচ করতে চাই। তিনি আমাকে বলেছেন– জান এবং মাল উভয়টিই খরচ করতে হবে। ভালো হয় আপনার সম্পদ আপনিই খরচ করুন। আমি হযরতের পরামর্শে 'আপকি আমানত সেন্টার' খোলার কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এজন্য একটি ফ্ল্যাট কিনেছি। দুআ করুন আল্লাহ তায়ালা যেন আমার ইচ্ছা সফল করেন।

প্রশ্ন : মুসলমানদের এবং আরমুগানের পাঠকদের জন্য কিছু বলবেন কি?

উত্তর : মাত্র কয়েক মাসের মুসলমান এর উপযুক্ত কোথায়, যে অন্য মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবো! তবে আমার কাছে মনে হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর পিপাসা এখন ইসলাম। যাদের কাছে ইসলাম আছে তাদের কর্তব্য হলো সকল তৃষ্ণার্তদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেয়া। যারা তৃষ্ণার্ত তারা পরম ভালোবাসার সাথে ইসলামকে গ্রহণ করবে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন পানি পান করে তেমনিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে।

অথচ মুসলমানদের অবস্থা হলো, আমরা তাদের তৃষ্ণা নিবারণের পরিবর্তে তাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবছি। এটা ইসলামের চরিত্র নয়। আল্লাহকে খুশি করার জন্য তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রতি দয়াবান হয়ে তাদের পিপাসা মিটানো উচিত। তাদের অজ্ঞতার কারণে অন্যায়ের বিনিময় অন্যায় দ্বারা দেয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন. আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর. শুকরিয়া জানাবো আপনাকে। আপনি আমাকে এতো বড়ো একটা কাজের যোগ্য ভেবেছেন। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ ইং

জনাব রেজওয়ান আহমদ (রাজন)-এর সাক্ষাৎকার

মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের ভাষায় পুরো পৃথিবী এখন তৃষ্ণার্ত। এই তৃষ্ণার্তদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। গ্রাম এবং শহরে যেমন রেশনের দোকানের সামনে এক দুই লিটার কেরোসিনের জন্য মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে-সামান্য তেলের আলোয় তাদের ঘরকে আলোকিত করবে বলে, তেমনিভাবে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে আছে। মুসলমানদের উচিত তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া। তাদের কথা ভাবা, ঈমান ও ইসলামের মশাল জ্বেলে তাদের অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করা।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

রেজওয়ান আহমদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : রেজওয়ান সাহেব, ভালো আছেন তো? সফরে কোনো অসুবিধা তো হয়নি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! সফর খুব ভালোই হয়েছে। ফুলাতে এসে আমার সফরের ক্লান্তি অনুভই হচ্ছে না। আল্লাহ তায়ালার শোকর! তিনি আমাকে ফুলাত দেখিয়েছেন। হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। খুব তৃপ্তির সাথে সাক্ষাত হয়েছে। আমার এ নতুন দুই ভাইও সাক্ষাত করেছেন। মাওলানা সাহেবও খুব খুশি হয়েছেন তিনি আমাদের বারবার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আনন্দে হযরতের চোখে পানি এসে ছিল।

প্রশ্ন : আসলে আব্বু আমাকে বাসা থেকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, বললেন- রেজয়ান সাহেব কিছুক্ষনের মধ্যে বাড়ি চলে যাবেন, তাই আমি যেন আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে নিই। আমাদের ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো– মুসলমানদের মাঝে দ্বীনি দাওয়াতের প্রেরণা সৃষ্টি করা। আমি আপনার সাথে মূলত এই পত্রিকার পক্ষ থেকেই কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : অবশ্যই বলুন! আমাকেও হযরত হুকুম করেছেন। বলেছেন– আমি আহমদকে পাঠাচ্ছি আপনি তার সাথে কিছু কথা বলবেন। উদ্দেশ্য, আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত ও করুণার যে ঘটনা ঘটেছে তা

যেন লাখ লাখ পাঠক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং এ ঘটনা যেন অন্যদের হেদায়েতের মাধ্যম হয়ে যায়। তিনি বলেছেন– আপনার ও আমার অংশেও যেন কিছু ছওয়াব চলে আসে। এবার বলুন, আমাকে কী বলতে হবে?

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার বংশীয় পরিচয় দিন।

উত্তর : ৩ জানুয়ারি ১৯৫৯ইং সালে আমি বেনারসের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন রাজন। গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করি। তারপর বিভিন্ন কলেজে বি কম পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। আমার বাবা শ্রী সৃজন কুমারও একজন পুরনো দিনের গ্রাজুয়েট ও সহকারী তহসিলদার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। যে কারণে অফিসারদের সাথে তার বনিবনা হতো না। ফলে চাকরি জীবনে সর্বদা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার স্বীকার হতে হয়। বি কম পাস করার পর আমি ব্যবসা আরম্ভ করি। প্রথমে গার্মেন্টসের ব্যবসা করি। এভাবে একের পর এক কয়েকটি ব্যবসা পরিবর্তন করি। একসময় আমার এক বন্ধুর সাথে গয়ায় চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় সেট হয়ে গেলাম। আমি বিয়ে করেছি এলাহাবাদের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। আমার শ্বশুর মগোলছড়ায় জজ পদে চাকরী করেন। আমার স্ত্রী পোস্ট গ্রাজুয়েট। আমার এক ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলেকেও একটি দোকান ধরিয়ে দিয়েছি। আমাদের পরিবার এখন গয়াতেই সেটেল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী মূলত এক অপবিত্র বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার অপার দয়া ও করুণার উজ্জ্বল নিদর্শন। আমার আল্লাহর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। ভেবে আশ্চর্য হই– কীভাবে তিনি আমার প্রতি হেদায়েতের বারি অবতীর্ণ করলেন! আসলে আল্লাহ তো আল্লাহই। তাঁর শান বুঝার ক্ষমতা কার!

প্রশ্ন : আমাদের বাসায় আব্বু আপনার ঘটনা আলোচনা করেছিলেন। ফলে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল যে আপনার মুখ থেকেই আপনার জীবন বৃত্তান্ত শুনি। অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

উত্তর : আহমদ সাহেব! ২০০০ সালের কথা। সে বছর আমার ব্যবসায় কয়েক লাখ টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। আমার দু-একজন কাস্টমার দোকান বন্ধ করে পালিয়ে গেল। এরপর বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হয়ে যায়। আমি খুবই

অস্থির হয়ে পরলাম। বন্ধুরা আমাকে ট্রেডিং করার পরামর্শ দিল। আমি সে উদ্দেশ্যেই একটি পরিকল্পনা তৈরি করলাম। মালপত্র সার্ভে করার উদ্দেশ্যে দিল্লী এবং লুধিয়ানায় সফর করার ইচ্ছা করলাম।

আমরা মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারী। আমাদের ঘরে শিবাজী এবং হনুমানের মূর্তি আগে থেকেই রাখা ছিল। পূর্বেও আমি এদের পূজা করতাম। তারপরও আমার মনে হতো মূর্তিগুলো তো মৃত। মরা আমাদের পূজার উপযুক্ত নয়। ব্যবসায় একের পর এক ক্ষতির ঘটনা আমাকে মূর্তিগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিল। ব্যবসায়িক সফরে বের হওয়ার আগে আমার কেন যেন মনে হলো- এই ভগবানদের কারণেই আজ আমার ঘরে এই দুর্গতি আসছে। আমরা যতই এদের পূজা করছি ততই ক্ষতি বাড়ছে। আমি এই দুই মূর্তি ও গণেশের মূর্তি নদীতে ফেলে দেই। এদের পূজা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার আল্লাহকে স্মরণ করলাম। মনে-মনে প্রার্থনা করলাম– হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান মালিক, এখন থেকে আমি কেবল তোমারই পূজা করবো। আর তুমি আমার এ সফরকে সফল করো। এই সফর যেন আমার সংসারের জন্য অশেষ কল্যাণ আনে। আর এখন থেকে সর্বদা তুমি আমাকে এই মূর্তিগুলোর ক্ষতি থেকে রক্ষা করো।

আহমদ ভাই! আমি আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না। আগে থেকেই রাতের রিজার্ভেশন টিকিট কাটা ছিল। আমি প্রস্তুতিস্বরূপ এই মূর্তিগুলো যখন ঘর থেকে সরিয়ে ফেললাম, মনে হলো আমি আমার মাথা থেকে কাঁটার বোঝা সরিয়ে ফেলেছি। আমি ট্রেনে সফর করলাম। দিল্লি আসার পর খুব ভালো অভ্যর্থনা পেলাম। ট্রেডিং এর কয়েকটি দিক সামনে এলো। তারপর সেখান থেকে ডিলাক্স এক্সপ্রেসে লুধিয়ানা যাব ভেবেছিলাম। দিল্লী থেকে যখন ট্রেনে উঠলাম– মনে হলো, আমার রিজার্ভেশন সিটটি থেকে এক অপূর্ব সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। আর সেই সুঘ্রাণ আমাকে এতোটাই মোহিত করে তুলেছিল যে– আমার মস্তিষ্ক, অন্তর এবং আমার কল্পনাব্যাপী এর অনুপ্রবেশ ও বিস্তারকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। মোটকথা, আমার অস্তিত্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এক বিস্ময়কর সুবাস। ভিতর থেকে আমার অন্তর বলছিল এটা কোনো আনন্দের সুবাস। ভাবছিলাম– কোনো বড় মানুষ এই সিটে উপবেশন করেছিলেন। তার সেই ঘ্রাণ এই গাড়িতে ও সিটে লেগে আছে।

আমি ভাবতে পারিনি এটা হেদায়েতের ঘ্রাণ। ট্রেন পানিপথে পৌঁছার পর কিছুটা ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব হলো। আমি আমার সহযাত্রীদের অনুমতি

নিয়ে মাঝখানের সিটটি খুলে ফেললাম। সিটের পকেটে মোবাইল রাখতে গিয়ে দেখি একটি ছোট পুস্তিকা। পুস্তিকাটির নাম 'আপকি আমানত আপকি সেওয়া মে'। পুস্তিকাটি ছিল হিন্দীতে লেখা। বুম্বাই থেকে প্রকাশিত। বইটির নাম আমার কাছে খুব চমৎকার লাগলো। বইটা বের করলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। এক সময় পুরো পুস্তিকাটি পড়ে ফেললাম। আমার ঘুম চলে গেল। ক্লান্তি ও দুর্বলতা কিছুই অনুভব হচ্ছিল না। মনে হলো আমার জীবন জেগে উঠেছে। আমি সিটটি বন্ধ করে নিচে নেমে এলাম। পুস্তিকাটি আরেকবার পড়লাম। এতেও আমার মন ভরলো না। তৃতীয়বার পড়লাম। কথা হলো কী, যখন থেকে আমার ব্যবসায় মন্দা পড়েছে তখন থেকেই আমার অন্তরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্থান করে নিয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর নির্দেশনা আমাকে আল্লাহর সুবাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। আমি মনে মনে আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম।

ট্রেন রাজপুরা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তখন। পড়তেপড়তে পুস্তিকাটির লেখক মাওলানা কালিম সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগল। আমি পুস্তিকাটিতে তাঁর ঠিকানা সন্ধান করলাম। কিন্তু সেখানে শুধু তার নাম ও ফুলাত লেখা ছিল। সাথে মুম্বাইয়ের একজন প্রকাশকের নাম ছিল। যখন আমি লুধিয়ানা থেকে ফিরলাম তখন মনে হলো ব্যবসায়িক দিক থেকে আমার সফর পরিপূর্ণ সফল। আমি যখন লুধিয়ানায় তখন একবার একটি মসজিদ সামনে পড়লো। আমি এর ভেতর প্রবেশ করতে চাইলাম। এগিয়ে গিয়ে জানতে পারলাম, ১৯৪৭-এর পূর্বে এটা মসজিদ ছিল। এখন একজন পাঞ্জাবীর বাড়ি। ভেতর থেকে আমি চরম অস্থির ছিলাম। পথ খুঁজছিলাম কিভাবে প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়া যায়। গাওয়ায় পৌঁছে আমি সোজা এক মসজিদে গেলাম। সেখানকার এক মাওলানা সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে এক মুফতি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বাড়ি মিরাঠে, তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। মাওলানা কালিম সিদ্দীকি সাহেবকে তিনি ভালো করেই চিনেন। ওই মুফতি সাহেব আমাকে মাওলানা সাহেবের ঠিকানা লিখে দেন, এবং ওয়াদা করেন যে, আমাকে ফোন নম্বরও সংগ্রহ করে দেবেন। কথামতো তিনি আমাকে ফোন নম্বর যোগাড় করে দেন। কিন্তু হাজার বার চেষ্টা করেও আমি ফোনে মাওলানা সাহেবকে পেতে ব্যর্থ হই। সময় পেলেই আমি সেই মুফতী সাহেবের কাছে ছুটে যেতাম। তাঁর কাছে দীন শিখতাম। আমি তাঁর কাছে কায়দা পড়েছি। তারপর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে কুরআন শরীফ পড়া

শিখেছি। সামান্য উর্দূ শিখেছি। দুই তিনবার দশ দিনের জামাতেও গিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি মুম্বাই এসেছিলেন। এখানে আব্বুর সাথে সাক্ষাত হবে জানলেন কী করে?

উত্তর : আমাকে মুফতি আদেল মিরাঠী সাহেব বলেছিলেন মুম্বাইয়ে একটি দাওয়াতী ক্যাম্প হতে যাচ্ছে। সেখানে মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব আসবেন। একথা শুনে আমি সাথে সাথে প্রস্তুতি নিই। মারকাযুল মাআরিফ খুঁজে বের করতে আমার পুরো একদিন লেগে যায়। আমি রাতের বেলা সেই ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছি, তখন শেষ অধিবেশন চলছিল। প্রোগ্রাম শেষে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। তখন কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম, আমাকে নতুন করে কালেমা পড়িয়ে দিন। তিনি বললেন– আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই বারবার ঈমানের নবায়ন করা উচিত। তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। বললাম– আমার এক বন্ধুর সাথে মুম্বাই সফরে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার 'আপ কি আমানত' পুস্তিকাটি দেন। মূলত তিনি পুস্তিকাটি তার শেরওয়ানীর পকেটে রেখেছিলেন। রাতে যখন ট্রেনে ঘুমানোর সময় শেরওয়ানী খুলেছেন তখন সিটে রেখে দিয়েছিলেন। সকালে সফরসঙ্গীরা যখন নীচে বসতে গেছেন তখন মাঝখানের সিটটি ভাঁজ করে রেখেছেন। পুস্তিকাটিও তখন সেই ভাঁজে পড়ে গেছে। আর সেখান থেকেই আমি পুস্তিকাটি পাই এবং পড়ি। আমি আরও বললাম মুফতী সাহেব আমার নাম রেখেছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো, আপনি আমার নাম রাখবেন। তিনি আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি বললাম রাজন। মাওলানা তখন বললেন– আপনার নাম রাখলাম রেজওয়ান আহমদ। রেজওয়ান অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি। রেজওয়ান বেহেশতের প্রহরী। নামটি আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। এর অর্থের কারণেও আবার মাওলানা সাহেবের নিজে নাম রাখার কারণেও।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের লোকদের কী অবস্থা? আপনি কি তাদের আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন?

উত্তর : প্রথমে আমি আমার পুরো কাহিনী স্ত্রীকে বলি এবং 'আপকি আমানত' বইটি একবার তাকে পড়ে শোনাই। সে তখন বলেছিল– আমি তো

একজন শিক্ষিতা মেয়ে, আমাকে দাও আমি নিজে পড়ে নেব। আমি বললাম– একবার আমার মুখে শুনে নাও না! আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার হক আদায়ের জন্যই তোমাকে একবার পড়ে শোনাতে চাইছি। একবার পড়ে শোনানোর পর বইটি তাকে পড়তে দিলাম। এভাবে 'মরনেকে বাদ কিয়া হোগা' এবং 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' এই দুটি বই তাকে পড়তে দিই। তারপর এক রাতে আমি তাকে আমার অসুবিধার কথা বলি। আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই ইসলাম আমার রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাতো হতেই পারেনা যে, আমি ইসলাম থেকে সরে যাই। তাই আমি চাচ্ছি পরিষ্কারভাবে মুসলমান হয়ে যাবো। এখন আমার সাথে তোমার বসবাসের একটাই উপায়– তুমিও মুসলমান হয়ে যাও। যদি মুসলমান হতে না পারো তাহলে ইসলামী বিধান মতে তুমি আমার জন্য পরনারী। পরনারীর সাথে বসবাস তো দূরের কথা কথা বলাও পাপ। আগামী কাল তোমার চিন্তা-ভাবনা করার জন্য শেষ সময়। যদি তুমি মুসলমান হতে না পারো। ইসলাম ধর্মকে সত্য বলে জানার পরও গ্রহণ করতে না পারো তাহলে আমি তোমাকে ঘর থেকে বের করবো না ঠিক কিন্তু আমি অবশ্যই তোমাদের ঘর ছেড়ে চলে যাবো। তারপর যেভাবে পারি, যেখানে পারি জীবন কাটিয়ে দেবো।

আমার কথা শুনে সে কাঁদতে লাগলো। সে বললো– আত্মীয়-স্বজন এবং এই সমাজের লোকদের সাথে কীভাবে লড়বে? আমাদের উভয়েরই জন্ম পুরো ধার্মিক পরিবারে। এখান থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসব? বললাম– কাল কেয়ামতে আল্লাহর সাথে লড়াই করার চে' পরিবারের সাথে লড়াই করাটা কি ভালো নয়? আমরা যদি আল্লাহর জন্য ইসলামকে গ্রহণ করে নিই, তাহলে তিনিই সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেবেন। রাত একটা পর্যন্ত আমি তাকে বোঝাতে থাকি। একটা বিশ মিনিটে সে ইসলাম গ্রহণের জন্যে রাজি হয়। সে কালেমা পড়ে। পরের দিন আমি তাকে নিয়ে মুফতী সাহেবের কাছে যাই এবং দ্বিতীয়বার আমাদের বিহাহ সম্পাদন করি। আমার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণের কারণে সন্তানদের ওপর কাজ করা সহজ হয়ে গেল। আর আমার ছেলের তো মুসলমান ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। ফলে সে খুব সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। বড় মেয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কয়েক দিন লেগে যায়। আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ এখন আমার পুরো পরিবারই মুসলমান।

এরই মধ্যে আমার ছেলে জামাতে এক চিল্লা পূর্ণ করেছে। মুম্বাইয়ে

মাওলানার সাথে সাক্ষাত হয়। সেখানেই তিনি আমাকে ফুলাত আসতে বলেন। আমারও ফুলাত দেখার খুব আগ্রহ ছিল। যে মানুষটির সুঘ্রাণ আমার অন্তর এবং আমার মস্তিষ্ককে হেদায়েতের সুবাসে সুরভিত করেছে তাঁর ঘর তো আমার জন্যে এই দুনিয়ার বেহেশত। আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত ভালোবাসা আমার সফরকে বরকতপূর্ণ করে দিয়েছে। পথে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। তাছাড়া 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি আমি গাওয়াতে এক হাজার ছাপিয়েছি। আমার সাথে এই যে আমার দুই বন্ধু দেখছেন, তাদের মধ্যে একজন আমার বেশ পুরনো বন্ধু। বেনারসেই থাকে। আমি যখন গয়ায় এসে থাকতে শুরু করি। তখন সেও আমার সাথে গয়ায় চলে আসে এবং থাকতে শুরু করে। সেখানেই সে একটি বেকারী খুলেছে। তার সাথে আমি প্রায় আটমাস ধরে কথা বলছি। ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। অবশেষে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফুলাত সফরের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হই।

আমরা উভয়ে গাওয়া এক্সপ্রেসে সফর করছিলাম। আমাদের সাথে সফর করছিলেন আজমগড়ের এই ভদ্রলোক। পরিচয়ের পর জানতে পারলাম তিনি উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। তারপর আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগলো। ভদ্রলোক সরকারী ইন্টার কলেজের লেকচারার। আমি তাকে 'আপ কি আমানাত' বইটা পড়তে দিই। বইটি পড়ে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। রাতভর আমাদের মাঝে কথাবার্তা এবং মতবিনিময় হতে থাকে। মথুরা এসেই তিনি কালেমা পড়তে প্রস্তুত হন। আমি তাকে কালেমা পড়াই, আমার বন্ধু অনিল কুমারও তখন কালেমা পড়ার জন্য রাজি হয়ে যায়। আমি তাকেও কালেমা পড়িয়ে দিই। আমাদের গাড়িটি মথুরায় বিশ মিনিট অবস্থান করে। মথুরা থেকে যখন গাড়ি ছাড়ে তখন আমি দুই বন্ধুকে বলি– আল্লাহ তায়ালার কী অপার করুণা, আপনারা উভয়ে মথুরাতেই কুফর ও শিরককে রেখে যাচ্ছেন। এখানকার জিনিস এখানেই পড়ে থাকলো–ভালোই হলো।

প্রশ্ন. আপনি কি আপনার পরিবার ও পরিচিত মহলে দাওয়াতী কাজ করার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?

উত্তর. মুম্বাইয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাতের আগেই আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর বাইরে আমার বন্ধু অনিল কুমার ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে আমি কাজ করিনি। মুম্বাইয়ে মাওলানা আমাকে এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত করেন। এবার এখানে এসে তাঁর সাথে দেখা হলো।

সফরের দীর্ঘ কাহিনী তাকে শুনালাম, শুনে খুব খুশি হলেন। কয়েকবার বসা থেকে উঠে জড়িয়ে ধরলে তাঁর চোখ তখন অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি অবশ্য আমাকে এ কথা বলেছেন– মথুরা সম্পর্কে আপনি আপনার বন্ধুদের যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। মথুরা শিরক ও কুফরের জায়গা হতে যাবে কেন? মথুরাও আল্লাহর জমিন। এখানকার সকলেই আল্লাহর বান্দা, সকলেই নবীজির উম্মত এবং আমাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর সন্তান। আমাদের মধ্যে রক্তের বন্ধন। তাদের প্রতি আন্তরিক মমতাও ঈমানের অংশ। বিদ্যমান শিরক এখানের জিনিস নয়। এটা এখানকার মানুষের ব্যাধি। আপনি এখন মুসলমান। আপনার দায়িত্ব মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়া। একজন দা'য়ী হলেন আত্মিক চিকিৎসক। চিকিৎসক কোথাও ব্যাধিকে নিরাপদ ছেড়ে যায় না। বরং কিভাবে ব্যাধিকে নির্মূল করা যায় সেটাই থাকে চিকিৎসকদের ভাবনা।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের লোকেরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা জেনেছেন?

উত্তর : আমি আমার শ্বশুরকে বাসায় দাওয়াত করেছিলাম। তারপর আমি ও আমার স্ত্রী তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি ইসলাম গ্রহণের কথা এবং তাকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি।

প্রশ্ন : তিনি রাগ হননি তো?

উত্তর : আমার শ্বশুর খুবই ঠান্ডা মেযাজের মানুষ। তিনি আমাদের বলেছেন– এখন নতুন যুগ। ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের কঠোরতা হওয়া ঠিক নয়। তবে খুবই ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ভেবে-চিন্তে যেটা ঠিক করবে সেটাই সযত্নে মেনে চলবে। আজ একটা কাল একটা এমন যেন না হয়। আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ তিনি খুব শীঘ্রই মুসলমান হয়ে যাবেন। মাওলানা সাহেব আমাকে বলেছেন, তাহাজ্জুদ পড়ে যেন তার জন্য এবং খান্দানের সকলের জন্য দুআ করি। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের বংশের সবাইকে হেদায়েত নসীব করেন।

প্রশ্ন : আপনার দুই বন্ধুরও কি নাম রেখেছেন?

উত্তর : মাওলানা সাহেব অনিল কুমারের নাম রেখেছেন মুহাম্মদ আদেল। আর রমেশ চন্দ্রের নাম রেখেছেন রঈস আহমদ। রমেশ কুমারজীর দিল্লীতেই নেমে যাওয়ার কথা ছিল। আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তিনি

ফুলাত আসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তারপর আমরা একসঙ্গে চলে এলাম। আমরা মাওলানা সাহেবের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি যে, তিন বন্ধু আমরণ দীনের দাওয়াত দিয়ে যাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর : মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের ভাষায় পুরো পৃথিবী এখন তৃষ্ণার্ত। এই তৃষ্ণার্তদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। গ্রাম এবং শহরে যেমন রেশনের দোকানের সামনে এক দুই লিটার কেরোসিনের জন্য মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, সামান্য তেলের আলোয় তাদের ঘরকে আলোকিত করবে বলে, তেমনিভাবে পৃথিবীর কোটিকোটি মানুষের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে আছে। মুসলমানদের উচিত তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া। তাদের কথা ভাবা, ঈমান ও ইসলামের মশাল জ্বেলে তাদের অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করা।

আহমদ আওয়াহ : রেজওয়ান ভাই! আপনাকে আবার শুকরিয়া!

রেজওয়ান আহমদ : আপনাকেও অনেক অনেক শুকরিয়া। আপনি আমাকে একটি দীনি কাজে অংশ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আমাকে এর উপযুক্ত মনে করেছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

আহমদ আওয়াহ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিদায় জানাবার এ দুআ শিখিয়েছেন। অর্থ- "আমি তোমার দ্বীন আমানত এবং কর্মের সমাপ্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পণ করছি।"

রেজওয়ান আহমদ : খুব সুন্দর দুআ! সত্যিই এমন একটি দুআর প্রয়োজন ছিল আমাদের।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারী-২০০৮

আশেকে রাসূল জনাব মুহাম্মদ আহমদ (রামকৃষ্ণ শর্মা)-এর সাক্ষাৎকার

আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে, আল্লাহর নবীর সবচে' বড় সুন্নত হলো দাওয়াত, এজন্য নবীজী কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতেন এবং তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেযও ছিলেন। আমার কথা হলো, আমি এই সুন্নাত থেকে মাহরুম থাকবো কেন? তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা তো আমাকে ভালো স্মৃতিশক্তিও দিয়েছেন। এজন্য আমি কুরআন শরীফ মুখস্থ করা শুরু করেছি। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া তিন মাসে ষোল পারা হিফয করেছি। এখন আমার প্রধান সাধনা হলো কুরআনে কারীমের হিফয। আমি সবচে' বেশি সময় এখন কুরআন হিফয করায় ব্যয় করছি।

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

আহমদ আওয়াহ: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ আহমদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : মুহাম্মদ ভাই! আপনার আগমনে খুবই খুশি হয়েছি। আপনার কথা আব্বু আলোচনা করছিলেন। প্রায় ছয় মাস আগে আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য আব্বু আমাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। সাথে এ-ও বলেছিলেন তার সাকক্ষাতকারটি রবিউল আওয়াল মাসেই প্রকাশ কর। আকস্মিক ব্যাপার আপনি এমন সময় এসেছেন যখন রবিউল আওয়াল সংখ্যার প্রস্তুতি চলছে।

উত্তর : গতকাল আমি জামাতে সময় লাগিয়ে নিজামুদ্দীন মারকাযে এলাম। এসে হযরতকে ফোন করেছি। ফোন পেয়ে খুবই খুশি হলেন। তিনি তখন দিল্লীতেই ছিলেন। বাটলা হাউজে প্রোগ্রাম ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আমি তাতে সরিক হলাম এবং হযরতের সাথে সাক্ষাতও হয়ে গেল। আরও অনেক লোক তাঁর সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিল। হযরত আমাকে আপনার সাথে দেখা করার কথা বললেন। তাছাড়া আরমুগানের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার দেয়ার কথাও বলেছেন। বলুন, আমাকে এখন কী করতে হবে?

প্রশ্ন: প্রথমেই আপনার বংশীয় পরিচয় দিন?

উত্তর : ১৯৬৫ সালের ২১ জানুয়ারী হরিদুয়ারে একটি পন্ডিত বংশে আমার

জন্ম। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় যোগী। তার নাম কেশুরাম শর্মা। তিনি আমার নাম রেখেছিলেন রামকৃষ্ণ শর্মা। আমার বংশে একজন অনেক বড় ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন। তার নাম ছিল শ্রীরাম শর্মা। তাকেই গায়ত্রী সমাজের এক প্রকার ফাউন্ডার বলা চলে। শান্তিকুঞ্জ হরিদুয়ারে তার আশ্রম ছিল। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনা জানা এমন কোনো হিন্দু নেই যে তাঁকে না জানে। তিনি আমাদের দূর সম্পর্কের দাদা ছিলেন। হযরত মাওলানা বলেছেন– শ্রীরাম শর্মাজী মাওলানা শামস নবীদ উসমানীর কাছে কালেমাও পড়েছিলেন। আমার একশ' ভাগ বিশ্বাস তিনি অবশ্যই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। আমরা এতোটুকুই জানি তিনি মৃত্যুর আগেই সমাধি গ্রহণ করেছিলেন। যারা দেখেছে তারা বলেছে মৃত্যুর পর তার পুরো শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা সাহেব আমাকে বলেছেন– তার শিষ্যরা তাকে বিষ পান করিয়েছিল।

আমাদের বংশ হলো আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি স্বরস্বতী স্কুলে। পরবর্তীতে হরিদুয়ার গুরুকুল আশ্রমে ভর্তি হই। সেখানে হিন্দী এবং সংস্কৃত শিখি। বেদগুলো পড়ি। দুই বছরের জন্য উচ্চশিক্ষার জন্য গুরুকুলে আরো পড়াশোনা করি। তারপর দিল্লীর নিকটবর্তী বুপুরা গুরুকুলে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি। শান্তিকুঞ্জের ম্যাগাজিনগুলোতে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মীয় পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন ?

উত্তর : আমি দিল্লি গুরুকুলের পড়াশোনা করছিলাম। সেখানে দুজন মুসলমান শুদ্ধি হয়ে এসেছিল। তাদের একজন ছিল সাহারানপুরের হতভাগা যুবক। প্রথমে তার নাম ছিল মুহাম্মদ তৈয়্যব। পরবর্তীতে সে শিবপ্রসাদ নাম ধারণ করে। সে দারুল উলূম দেওবন্দে দুই বছর কেরাতের কোর্স করেছিল। প্রথমে নিজেকে মুহাম্মদ তৈয়ব কাসেমী নামে পরিচয় দিত। আরেকজন ছিল বিহারের মূর্খ ও মজদুর মাঝ বয়সী লোক। প্রথমে তার নাম ছিল জাভেদ আখতার। ধর্ম পরিবর্তন করে হয়েছিল দয়ানন্দ। এক যুবক। নাম মাওলানা শামস নবীদ উসমানী। লখনৌতে পড়াশোনা করেছেন। তিনি কারও কাছে এই দুজনের মুরতাদ হওয়ার ঘটনা শুনেছিলেন। তারপর তিনি সুনিপথে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীর কাছে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা শোনান। মাওলানা তাকে গুরুকুল নিয়ে তাদের দুজনকে বুঝাতে বলেন। এই সুবাদে তিনি দুই-

তিনবার আমাদের এখানে আসেন। বিষয়টি তাকে খুবই চিন্তিত করে। আমি একদিন শিবপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম এই লোকটি এখানে বারবার আসে কেন? শিবপ্রসাদ আমাকে বললো– এ আমাকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে নিতে চাইছে। আপনি এর সাথে কথা বলুন। ইসলামে তো কিছুই নেই। আপনি তাকে আমাদের মতো হিন্দু হয়ে যেতে বলেন। এই ব্যক্তি হিন্দু হলে খুবই উপকার হবে।

ভাই আহমদ! যখনই আমি এই দুর্ভাগা শিবপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতাম তখনই সে আমাদের প্রিয়নবী (তাঁর প্রতি কোটিকোটি দরূদ ও সালাম) সম্পর্কে খুবই খারাপ মন্তব্য করতো। বিশেষ করে তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খুবই ঘৃণ্য রকমের অপবাদ দিত। সত্যি কথা কী, তার কথাগুলো তখনও আমার কাছে খারাপ লাগতো। এক সপ্তাহ পর শামস নবীদ উসমানী সাহেব এলেন। কথা বলে জানতে পারলাম তিনি একজন মাওলানা। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে দেখা করতে বললেন। খুব নম্রতার সাথে বললেন– তিনি আমাদের মুরুব্বী। খুবই সত্যবাদী মানুষ। আপনি যদি তাকে বুঝাতে পারেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে থাকবো। মোটকথা তার বদৌলতেই অমৃতসরের একটি গ্রামে হযরতের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হয়।

আমি আমার দুজন বন্ধুকে নিয়ে একটি মসজিদে চলে যাই। মাওলানা সাহেব আমাদের সাথে খুবই আন্তরিকতার সাথে মিলিত হলেন। আমরা তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হলাম। আমি তাঁকে বৈদিক ধর্মে আসার জন্য দাওয়াত দিলাম। বললাম–এরচে' বড় ধর্ম আর নেই। আমাদের পূর্বসূরীদের ধর্ম এটা। আমাদের স্রষ্টা যদি ইসলাম ধর্মই আমাদের জন্য পছন্দ করতেন তাহলে আমরা ভারতে জন্মগ্রহণ করতাম না। এখানকার বৈদিক ধর্মই মানানসই। তারপর শিবপ্রসাদের কাছে শোনা নবীজি সম্পর্কে দু-একটি কথা হযরতকে শোনালাম। হযরত তখন গাড়ি থেকে তাঁর ব্যাগ আনালেন এবং হিন্দীতে লেখা একটি পুস্তিকা বের করে আমাকে দিলেন। বইটির নাম 'ইসলামকে পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ' (ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুস্তিকাটির লেখক প্রফেসর কে এস রামা রাও। বইটি আমার হাতে দিয়ে বললেন– এটি একজন হিন্দু ভাইয়ের লেখা। আমার অনুরোধ এ বইটি আপনি পড়ে দেখবেন। আপনার কাছে আমার আরেকটি কথা– এই

বইটি পড়ার সময় তিনি 'ইসলাম ও মুসলমানদের পয়গম্বর' কথাটি মাথায় রাখবেন না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো বাণী বা কুরআনের কোনো একটি শব্দ দ্বারাও একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি কেবল মুসলমানদের পয়গম্বর বরং তিনি ছিলেন পুরো মানবতার জন্য সর্বশেষ পয়গম্বর।

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি দুই-তিনবার পড়বেন। তারপর আমি নিজে এসে গুরুকুল আশ্রমে আপনার সাথে সক্ষাত করবো। মাওলানা সাহেবের কোথাও সফরে যাওয়ার তাড়া ছিল। তাঁর সাথে মোটমাট আধা ঘন্টা কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আমি ফিরে এসে পুরো পুস্তিকাটি একবার পড়লাম। আমার মনে হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো মানবতার নয় শুধু আমার রাসূল। গুরুকুলের পরিবেশ, আমার পরিবার এবং আমার ধর্ম আমাকে বারবার ঝাঁকুনি দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে আমি বইটি ছাদের উপর ছুড়ে ফেলে দিলাম। ভাবলাম তার বিরুদ্ধে যত বই আছে আমি এবার সেগুলো পড়বো।

উদ্দেশ্য এই পুস্তিকাটি পড়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমার যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে এটাকে নষ্ট করা। আমি শিবপ্রসাদের কাছে পরামর্শ চাইলাম। সে আমাকে বললো– অমুসলিমদের লেখা বই খোঁজার দরকার নেই। মুসলমানদের মধ্যেই অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে লিখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সে তসলিমা নাসরিন ও সালমান রুশদীর কয়েকটি বইয়ের নাম বললো। আমি তাকে বইগুলো সংগ্রহ করে দিতে বললাম। সে তার পরিচিতদের কাছ থেকে এ দু লেখকের চারটি বই আমাকে এনে দিল। আমি চারটি বই-ই পড়ে ফেললাম। কিন্তু রামাকৃষ্ণ রাওয়ের ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যে পরিমাণ সত্য ছিল, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমার ভেতর যে প্রভাব ফেলেছিল মিথ্যার সয়লাবে ভরপুর এই বিশালবিশাল চারটি বই পড়েও সেই প্রভাব সামান্যতম হ্রাস পেল না। বরং প্রিয় নবীর কর্ম ও আখলাকের সততা আমাকে আরো বেশি ব্যথিত করে তুলল। আমার মনে হলো তসলিমা নাসরিন এবং সালমান রুশদী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিতাড়িত। তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে বলেই এমন এক মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে যাচ্ছে।

এক রাতের ঘটনা। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, আমার দাদাজান (যাকে আমরা ভারতের ভাষায় দেবতার চে' কম মনে করি না) শ্রীরাম শর্মাকে। তিনি আমাকে বললেন– বেটা! উদ্ভ্রান্তের মতো কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছ? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তো আমাদের সেই নরাশংস, যাকে

কল্কি অবতারও বলা হয়েছে। তাঁকে মানা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। আমার মুক্তিও হয়েছে তাঁর কালেমা পড়েই। ধোঁকার পথ ছাড়। মাওলানা কালিমের কাছে চলে যাও। জলদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেমা পড়ে নাও। মোটেও দেরী করো না।

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসায় আমি তখন পাগলপ্রায়। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ভাবলাম রামাকৃষ্ণের বইটি আরেকার পড়বো। তখন ভোর চারটা। আমি ছাদে গেলাম। রাতে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল আর তাতে বইটি ভিজে গিয়েছিল। আমি বইটি নিয়ে ঘরে চলে এলাম। চোখে লাগালাম, চুমু খেলাম। কিছু কাগজ পুড়িয়ে বইটি শুকালাম, তারপর পড়তে শুরু করলাম। আমার খুব কান্না পেল। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কাঁদতেকাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। তিনি পন্ডিত রামকৃষ্ণজীকে বলছেন– চলুন, আপনাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিই। আমি বললাম– আমি তো এই উদ্দেশ্যেই আপনার কাছে এসেছি। তিনি আমাকে একটি মসজিদে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এতো সুন্দর চেহারা আহমদ সাহেব! আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। চেহারায় যেমন আলোর উদ্ভাস আর তেমনি উজ্জলতা। আমি কাছে গিয়ে তার পায়ে মাথা লাগালাম। তিনি বসা অবস্থায় আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অত্যন্ত মমতার সাথে আমাকে কিছু কথা বললেন– এখন আমি তা ভুলে গেছি।

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, সকালে ভাবলাম ফুলাত যাবো। ফুলাতের ঠিকানা আমার জানা ছিল না। প্রথমে আমি সনিপথ ঈদগাহে গেলাম। সেখানে এক মাস্টার সাহেব আমাকে ফুলাতের ঠিকানা বলে দিল। সন্ধার সময় আমি ফুলাত পৌঁছে গেলাম। সেখানে ইসলাম নামক এক মাস্টার সাহেবের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি নিজেও মুক্তিশ্বর আশ্রমের মহারাজার পুত্র। তার বাবাও মুসলমান হয়ে মুক্তিশ্বর ছেড়ে ফুলাতে চলে এসেছেন। তিনি আমাকে 'আপকি আমানত' দেন। বইটি আমি কয়েকবার পড়ি। তৃতীয় দিন ২০ এপ্রিল ২০০৪ সাল। দুপুরের পর মাওলানা আগমন করেন। 'আপকি আমানত' আগেই আমাকে মুসলমান বানিয়ে রেখেছিল। মাওলানা সাহেব আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমি বললাম– কোনো মুসলমান কি পেয়ারা নবীর নামে নিজের নাম রাখতে পারে? মাওলানা সাহেব বললেন অবশ্যই।

আপনার নাম মুহাম্মদ আহমদ।

প্রশ্নঃ তারপর কী হলো?

উত্তর : মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত আইনী কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়ে তারপর চল্লিশ দিনের জন্য তাবলীগে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভুপালে চিল্লা কাটালাম। আলহামদুলিল্লাহ! সেখানে আমি নামায শিখে নিই। এক চিল্লায় দশ বার আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি।

প্রশ্ন : গুরুকুল আশ্রমের লোকেরা আপনার খোঁজ নেয়নি?

উত্তর : নিশ্চয়ই তারা আমাকে খুঁজে থাকবে। জামাত থেকে আসার পর মাওলানা আমাকে গুরুকুলে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। শিবপ্রসাদকে ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। কিন্তু আহমদ ভাই! সত্যকথা হলো এর মতো হতোভাগা আমি আর দেখিনি। তার নাম শুনলেই আমি চরম অস্থিরতা অনুভব করি। আমার অবস্থা এখন এমন, আমার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মহব্বত করে না আমি তাকে আল্লাহর শত্রু মনে করি। আমি মনে করি এটা আল্লাহর অভিশাপ। আমাদের নবী যেভাবে আমাদের অভিশপ্ত জায়গাগুলোর পাশ দিয়ে দ্রুত পথ চলতে বলেছেন, এই ধরনের অভিশপ্ত লোকদের পাশ দিয়েও আমি ঠিক সেভাবেই দ্রুত হেঁটে যাই এবং শংকাবোধ করি।

প্রশ্ন : আপনি কি শিবপ্রসাদের উপর কাজ করেননি?

উত্তর : আসলে আমি তাকে গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করেছি। আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার এ অভিশাপ নেমে এলো। পরে জানতে পারলাম– সে তার মাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। একবার কোনো এক কারণে সে তার মাকে লাথি পর্যন্ত মেরেছিল। এরই শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাকে পৃথিবীতে হতভাগা করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমানের অপরাধে তাকে দিয়েছেন কুকুরের মৃত্যু। গুরুকুল আশ্রমের লোকেরা তার শেষকৃত্য করতেও অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে পুলিশের লোকেরা তাকে পায়ে রশি লাগিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। নোংরা একটি নালায় ফেলে দিয়ে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দেয়। ঘটনাটি শুনে আমি কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছি। আমার মোটেও কষ্ট হয়নি। সত্যিকথা কী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা

বেয়াদবী করে তাদের প্রতি করুণা বা দয়াবোধের জন্য আমার ভেতর সামান্যতম জায়গাও নেই। এটা আমার এক রকমের দুর্বলতাই ধরুন।

প্রশ্ন : গুরুকুল আশ্রমের লোকেরা আপনার এই বেশভূষা দেখে বিরোধিতা করেনি?

উত্তর : আমি জামাত থেকে ফিরে এসে হযরত মাওলানার হাতে বাইয়াত হয়েছি। হযরত মাওলানার পরামর্শে উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম এবং শামায়েলে তিরমিযী কিনেছি। আলহামদুলিল্লাহ! প্রাণখুলে সুন্নাতের উপর চলতে চেষ্টা করছি। পাগড়ি-চুল সকল ক্ষেত্রেই সুন্নতের অনুসরণ করছি। এই বেশভূষায় আমি যেখানেই গিয়েছি, সম্মান পেয়েছি। প্রায় চার বছর হতে চলেছে। আজ পর্যন্ত কেউ আমার এই বেশভূষাকে বেয়াদবীর দৃষ্টিতে দেখেনি।

প্রশ্নঃ গত বছর আপনি ওমরা করতে গিয়েছিলেন। তো সেখানকার সফর কেমন ছিল?

উত্তর : পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ আমাকে খুব কষ্ট দিত। বারংবার মদীনার কথা মনে পড়তো। আল-হামদুলিল্লাহ! আমি এখন উর্দূ পড়তে পারি। আরবিও অল্প-অল্প শিখেছি। নাগপুর গিয়ে কুরআন শরীফের ক্লাশ করেছি। এখন বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করছি। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া এ পর্যন্ত সীরাত বিষয়ক একশ'টির বেশি কিতাব পড়েছি। কিতাবের মধ্যে যখনই মদীনার কথা পড়তাম তখনই স্মৃতিতে মদীনার নাম জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠতো। এক রাতে তাহাজ্জুদের শেষে দুআ করলাম– হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমার সবকিছু উৎসর্গ হোক। তিনি আমার কথা শুনলেন। আমার প্রতি দয়ালু হলেন। তাঁর একান্ত অনুগ্রহে আমাকে পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়াই এমনকি জাহাজ ছাড়া আমাকে মদীনায় পৌঁছে দেন। মক্কা শরীফে গিয়ে ওমরা আদায় করি।

প্রশ্ন : সেটা কী করে সম্ভব?

উত্তর : বিমান-পাসপোর্ট এসব শুধু উপকরণ। এর সৃষ্টিকর্তা তো আল্লাহ। আর আল্লাহ তায়ালা কোনো উপকরণের অধীন নন। তিনি চাইলে উপকরণ ছাড়াও যা খুশি করতে পারেন। বিমানের বাইরে আল্লাহ আরও অনেক বাহন

সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি চাইলে যে কোনভাবেই বান্দার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।

প্রশ্ন : সেটা কিভাবে হলো আমাদেরকে 'বলুন'

উত্তর : আহমদ ভাই, এখনও এটা বলার সময় আসেনি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, মক্কা-মদীনার কথা কিছু বলুন।

উত্তর : সেখানে এক মাস ছিলাম। মদীনা থেকে দুই বার ও মক্কা থেকে সাত বার ওমরা করেছি। মদীনায় এই অধমের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখেছি। এই দুর্বল ও নাপাক বান্দার প্রতি তাঁর নবীর মহব্বতের যে বরকত নাযিল হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

প্রশ্ন : সে সম্পর্কে আমাদেরকেও কিছু বলবেন কি?

উত্তর : সে কথা অন্য কোনো মজলিসে এসে হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনি কোথায় থাকছেন?

উত্তর : এখন আমি বেনারসে থাকছি। সেখান থেকে দাওয়াত নিয়ে হরিদুয়ার, ঋষিকেশ, আজিন, মথুরা, এলাহাবাদ, অযোধ্যাসহ নানা তীর্থস্থানে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : ওখান থেকে কোনো ফলাফল আসছে? কোনো লোকের হেদায়াতও কি হয়েছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভালো ফলাফল পাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এগুলো যখন সামনে চলে আসবে তখন প্রতিটি মুসলমানই গর্ববোধ করবে। আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটা অনুগ্রহ যে, তিনি এই অপবিত্র এক বান্দাকে কোথা থেকে কোথায় উঠিয়ে এনেছেন।

প্রশ্ন : আপনি কি বিয়ে করেছেন?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের আগে আমি বিয়ে-শাদীর কথা ভাবিওনি। ইসলাম গ্রহণের পর পারিবারিক দায়-দায়িত্বের বিষয়টি আমার কাছে বেশ ঝামেলার মনে হতো। দুই মাস আগে হযরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। তখন তিনি আমাকে বিয়ের কথা বললেন, এ বিষয়ে হাদীস শোনালেন। হাদীসের কথা শুনে খুবই সন্ত্রস্ত হলাম। বললাম– আমি এখনই চাইলে আজই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। ইনশাআল্লাহ হযরত খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। দুআ করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন কোনো নেক-সঙ্গিনী দান করেন। আমি যেন পারিবারিক জীবনটাও সুন্নত

মোতাবেক চালাতে পারি।

প্রশ্ন : ইদানিং আপনার অধিকাংশ সময় কথায় অতিবাহিত করছেন?

উত্তর : আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে, আল্লাহর নবীর সবচে' বড় সুন্নত হলো দাওয়াত, এজন্য নবীজি কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতেন এবং তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেযও ছিলেন। আমার মনে হচ্ছে, আমি এই সুন্নাত থেকে মাহরুম হবো কেন? তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা তো আমাকে স্মৃতিশক্তিও দিয়েছেন। এজন্য আমি কুরআন শরীফ মুখস্ত করা শুরু করেছি। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া তিন মাসে ষোল পারা হিফয করেছি। এই মুহূর্তে আমার প্রধান সাধনা হলো কুরআনে কারীমের হিফজ। আমি সবচে' বেশি সময় এখন এতেই ব্যয় করছি।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আপনার গাড়ির সময় হয়ে এসেছে।

উত্তর : জি, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। তখন আবার কথা হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান : *মার্চ ২০০৮*

বোন আয়েশার (বেলোন্দ্র কোর)
সাক্ষাতকার

ঈমানের নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। ঈমানের সঙ্গে একদিন, ঈমানবিহীন হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়েও শ্রেয়। আর গোটা জগতের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবীর উম্মত হওয়ার কারণে গোটা পৃথিবীর মানুষকে দুনিয়ার এই কয়েদখানা থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করুন। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দুআ করুন, যেন সবার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হয়।

আসমা যাতুল ফাওযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আয়েশা : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

প্রশ্ন : আয়েশা দিদি! কী ব্যাপার, এবার তো অনেক দিন পর এখানে আসলেন?

উত্তর : বোন আসমা! আমি তো আসার জন্য উন্মুখ ছিলাম কিন্তু হযরতজীকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। কিভাবে যেন এবার তাঁকে পেয়ে গেলাম এবং সময় চেয়ে এসে পড়লাম।

প্রশ্ন : আসলে আমাদের এখান থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা বের হয়। আব্বু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আরমুগানের জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আরমুগান সম্বন্ধে জানি। কিছু কিছু উর্দু পড়তেও শিখছি। এখন আরমুগানও দেখে দেখে পড়তে পারি।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন!

উত্তর : আমি ১৯৬৫ সালের ৩ রা জুন পিরোজপুর জেলার এক গ্রামের শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আব্বুর নাম শ্রী ফতেহ সিং। তিনি ছিলেন এলাকার শিক্ষিত জমিদারদের একজন। আমার পুরনো নাম ছিল বেলোন্দ্র কোর। শহরের গুরু গোবিন্দ সিং কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি। জলন্ধরের এক শিক্ষিত পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী তখন পুলিশের এস.ও ছিলেন। সাহসিকতা ও দক্ষতার কারণে পদোন্নতি হতে হতে তিনি ডি.এস.পি. হয়ে যান। আমার দুই ছেলে এক মেয়ে। তিনজনই পড়াশোনা

করছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন!

উত্তর : আশা কোর নামে আমার একটি ছোট বোন ছিল। আব্বু তাকেও পুলিশের এক থানা ইনচার্জের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। সে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। তার স্বামী তাকে খুবই ভালোবাসত। বিবাহের পর থেকে আমার বোনটি অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকতো। নিত্যই তার অসুখ-বিসুখ কোনো একটা লেগে থাকতো। চিকিৎসা করালে কিছুটা ভালো হতো, তারপর আবার অসুস্থ হয়ে পড়তো। তার স্বামী এতে অনেক টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। বাধ্য হয়ে ঝাঁড়ফুককারী করিবাজকেও দেখিয়েছে। কেউ বলল, তার উপর 'উপরের প্রভাব' (জ্বীন-ভুত) রয়েছে। কিন্তু কেউ চিকিৎসা করতে পারেনি। একজন বলল, মালির কোটলায় এক মহিলা আছে, সে এর চিকিৎসা করে। তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হল। সে মহিলা কিছু ঝাড় ফুঁক করার পর সে আরাম বোধ করল। তিনি আশাকে বললেন, তুমি এই দু'চারদিনের কষ্ট সহ্য করতে পারছো না, তাহলে দোযখের চিরস্থায়ী কষ্ট সহ্য করবে কিভাবে? এজন্য সেই কষ্ট দূর করার ফিকির করো। আর তার ব্যবস্থা হল, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমার বিশ্বাস মুসলমান হয়ে গেলে তোমার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে। তারপর আমি তোমাকে আমার হযরতজীর কাছে নিয়ে যাবো। তিনিও তোমার জন্য দুআ করবেন। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা তোমাকে অবশ্যই সুস্থ করে দিবেন।

আশা তাকে বলল, ঠিক আছে, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব। তিনি বললেন, ঈমান আনা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ব্যাপারে স্বামীর অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। বরং স্বামী যদি বিরোধিতাও করেন এমনকি মারধোর করে তাড়িয়েও দেন তবুও ঈমান গ্রহণ করার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। কেননা এতে সৃষ্টিকর্তা মালিককে সন্তুষ্ট করে সে চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করতে পারবে। আশা বলল, তারপরও পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যথা শ্রীঘ্রই পরামর্শ করে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে কালিমা পড়িয়ে আমাদের হযরতজীর ওখানে পঠিয়ে দেবো।

সে বাড়িতে ফিরে স্বামীকে বলল, আমি বেশ আরাম বোধ করছি কিন্তু আপা বলেছেন, তুমি মুসলমান হয়ে গেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। আশার স্বামী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। বলল, যা ইচ্ছা কর, যা ইচ্ছা হও তুমি

সুস্থ হলেই আমি খুশি। আশা ফোন করে আপাকে বলল, আমাকে আপনাদের হযরতজীর ঠিকানা বলুন। আমি গিয়ে তার হাতেই মুসলমান হতে চাই। তিনি হযরতজীর ফোন নাম্বার দিয়ে দিলেন। ২৫ শে মে, ২০০৪ সালের সকালে আশা হযরতজীকে (মাওলানা কলিম সিদ্দিকী সাহেব) ফোন করল। আশা আমাকে বলেছে, আমি হযরতজীকে বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতে চাই। তবে আমার স্বামী, সন্তান এবং ঘরের লোকজন মুসলমান হবে না। আমি একাই মুসলমান হবো। মাওলানা সাহেব কারণ জানতে চাইলে মালির কোটলার সেই আপার সঙ্গে আশার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা খুলে বলল। হযরতজী বললেন, তুমি তার কাছেই কেন কালেমা পড়ে নিলে না? আশা পীড়াপীড়ি করল, না জনাব, আমি আপনার নিকটই কালিমা পড়তে চাই। মাওলানা সাহেব বললেন, আমার নিকট পড়তে চাও তো এখনই ফোনে পড়ে নাও। আশা বলল, না, আমি আপনার নিকট হাজির হয়েই কালিমা পড়তে চাই। মাওলানা সাহেব বললেন, বোন! জীবন-মরণের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া তুমি তো অসুস্থও বটে। সুস্থ ব্যক্তিরই এক নিঃশ্বাসের ভরসা নেই, পরবর্তী শ্বাস সে নিতে পারবে কিনা, এজন্য এখনই পড়ে নাও। তারপর এখানে আবার নতুন করে পড়িয়ে দেবো। মাওলানা সাহেবের এ কথায় আশা বলল, ঠিক আছে পড়িয়ে দিন কিন্তু আসলটা আমি এসেই পড়বো।

মাওলানা সাহেব বললেন, আসলটা এখনই পড়ে নাও। নকলটা এখানে এসে পড়ো। আশা রাজী হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব তাকে কালিমা পড়ালেন। ইসলামের মোটা মোটা কথাগুলো বোঝালেন। বললেন, এখন তোমাকে নামায শিখতে হবে এবং সব ধরনের অনৈসলামী উৎসব, পূজা এবং রুসুম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নাম জিজ্ঞেস করে মাওলানা সাহেব বললেন, আশার পরিবর্তে তোমার ইসলামী নাম রাখা হল 'আয়েশা', আর এটা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি সাহেবার নাম। ফোন শেষ হলে সে তার ইসলাম গ্রহণের কথা খুশীতে পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দেয়। স্বামীকেও সে একথা জানায়। আমিও জলন্ধর থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমাকেও সে এ সংবাদ শোনায়।

আমার কিছুটা খারাপও লেগেছিল যে, ধর্ম বদল করে কিসের খুশি উদযাপিত হচ্ছে! মাওলানা সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এবং কালিমা পড়ে না জানি সে কি পেয়ে গিয়েছিল। আমি বারবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মুখ

নয় যেন ফুল ফুটে আছে। এক আশ্চর্য ধরনের নূর তার চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল। ওকে বললাম, আশা! আজ তোমার চেহারা কেমন ঝলমল করছে। সে বলল, আমার চেহারায় ঈমানের নূর চমকাচ্ছে। সারাটি দিন সে এতই খুশি ছিল, সম্ভবত ঘরের লোকজন দশ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার তাকে এত খুশি ও সুস্থ দেখল। কয়েক বছর পর সে নিজ হাতে খানা রান্না করল এবং জোর করে করে সবাইকে খাওয়ালো। ঘুমানোর পূর্বে সে গোসল করল এবং কালিমা পড়া আরম্ভ করল। কালিমাটি সে একটি কাগজে লিখে রেখেছিল। প্রথমে সে এটাকে ভালো করে মুখস্থ করল তারপর জোরে জোরে পড়তে লাগল।

হঠাৎ সে অসংলগ্ন ও এলোমেলো কথাবার্তা শুরু করে দিল। বলতে লাগল, 'স্বর্ণের এই মহল কতই না মনোরোম। এটা কার মহল?' যেন সে কারও সঙ্গে কথা বলছে। তারপর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলল, 'এটা আমার। এটা আমার। এটা জান্নাতের মহল। সে খুব খুশী হল, আচ্ছা! আমি তাহলে জান্নাতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগল, ফুলের এই সুন্দর তোড়া কার জন্য এনেছো? আহা! এটা কতই না প্রিয় ফুল। আচ্ছা তোমরা আমাকে নিতে এসেছো। একটু পর হেসে দিয়ে বলল, আমি তোমাদের জেল থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের দিকে চললাম। তারপর তিন বার জোরে জোরে কালিমা পড়ল এবং বসে বসেই বিছানার উপর একদিকে কাত হয়ে গেল। আমরা সকলেই ঘাবড়ে গেলাম। তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলাম। ভাই সাহেব ডাক্তার ডাকতে গেলেন।

ডাক্তার এসে বলল, এ তো মারা গেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। পরামর্শ হল, এ–তো মুসলমান হয়ে মারা গেছে। এখন আমরা যদি নিজেদের ধর্মানুসারে তাকে জ্বালিয়ে দেই তাহলে আমাদের কোনো বিপদও হতে পারে। সকাল বেলা ভগ্নিপতি মালির কোটলার আপাকে ফোন করে জানালেন, আশা গতরাতে ইন্তেকাল করেছে। আমাদের এখানে কোনো মুসলমান নেই। লাশের কাফন দাফনের জন্য মালির কোটলা থেকে কিছু লোক আসলে ভালো হয়। সকাল দশটায় একগাড়ী পুরুষ মহিলা আসল এবং তাকে ইসলামী রীতি অনুসারে দাফন করল। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম এই শহরে কোনো মানুষের দাফন হল। আশার (আয়েশার) কবর আজও সেখানে বিদ্যমান।

প্রশ্ন : আপনি আপনার বোনের মুসলমান হওয়ার ঘটনা শোনালেন।

বাস্তবিকই ঘটনাটি বিস্ময়কর। আর মৃত্যুও কেমন ঈর্ষণীয়। জীবনে না কোনো নামায পড়েছেন, না রোযা রেখেছেন আর না কোনো ইসলামী আমল করেছেন কিন্তু কেমন পবিত্র হয়ে গোনাহের গ্লানি ধুয়ে মুছে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কত সুন্দর, কত কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু।

এখন আপনি আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শোনাবেন?

উত্তর : আসলে আমার ইসলাম গ্রহণ আয়েশার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আশা এবং আমার মধ্যে সীমাহীন মহব্বত ছিল। তার হঠাৎ মৃত্যু আমাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছিল। কিন্তু তার মৃত্যু এবং ইসলাম গ্রহণপরবর্তী একদিনের জীবন আমাকে বারবার ভাবতে বাধ্য করেছিল, দুনিয়ার এই জেলখানা থেকে সে মাত্র একটি কালিমার বরকতে জান্নাতী মহলে পৌঁছে গেল। কেমন হাসিমুখে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। আমি আমার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়িতে কয়েকজন লোককে মরতে দেখেছি। কেমন তড়পাতে তড়পাতে এবং কত কষ্টে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়েছিল। আমি চিন্তা করতাম, আশা এমন কী পেয়েছিল যার ফলে এই কঠিন সময়টা এমন সহজে পার হয়ে গেল। এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আশা অতীব সুন্দর হীরা জহরত খঁচিত কাপড় পরিধান করে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় বহুমূল্য মুকুট শোভা পাচ্ছে। যেন সে রানী কিংবা শাহজাদী। জিজ্ঞেস করলাম, আশা! এমন সহজ মৃত্যু কীভাবে লাভ করলে? বলল, ঈমানের বদৌলতে। ঈমানের সঙ্গে একদিন বেঁচে থাকায় যে স্বাদ, শত-সহস্র বছর বেঈমান হয়ে বেঁচে থাকায়ও সে স্বাদ নেই। বিশ্বাস না হলে কিছু সময়ের জন্য মুসলমান হয়ে দেখে নাও। ব্যস, আমার চোখ খুলে গেল এবং হৃদয়ে তীব্র এক বাসনা জাগল, আমাকেও কিছুদিনের জন্য মুসলমান হয়ে দেখতে হবে। আমি স্বামীর নিকট আমার এই ইচ্ছার কথা জানালাম, আমি এক-দুই সপ্তাহের জন্য মুসলমান হতে চাই এবং দেখতে চাই, ঈমান কী জিনিস? আশার মৃত্যুর পর আমি যেহেতু সব সময়ই দুঃখিত থাকতাম এবং কামরা বন্ধ করে চুপি চুপি কাঁদতাম এজন্য আমার স্বামী অনুমতি দিয়ে দিলেন যাতে আমি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করি। আর বললেন, ইসলাম গ্রহণ করে দেখতে পার। কিন্তু ভেবে দেখো তুমিও না আবার আশার মত একদিন পরে মরে যাও। আমি বললাম, আমি মরে গেলে সম্ভবত আমিও আশার মত জান্নাতে চলে যাবো। তারপর আপনি ভালো দেখে আরেকটা বিবাহ করে

নিবেন। তবে খেয়াল রাখবেন আমার সন্তানদের আপনার নতুন স্ত্রী যেন কষ্ট না দেয়।

দুদিন পর আমি আমার ভগ্নিপতির নিকট থেকে মালির কোটলার আপার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করলাম। তারপর আপার নিকট থেকে হযরতজীর (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) ফোন নাম্বার নিলাম এবং আপাকে বললাম, আমি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই; উদ্দেশ্য মাত্র এক সপ্তাহের জন্য মুসলমান হওয়া। তিনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, মুসলমান হওয়া নাটক কিংবা অভিনয় নয় যে, সামান্য সময়ের জন্য নিজের রূপ বদলে নিবেন। এরপরও তিনি খুশী প্রকাশ করে বললেন, আপনি হযরতজীর নিকট গেলে তিনি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। তারপর আমি হযরতজীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কয়েকদিন চেষ্টার পর তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হল। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। হয়তো ফোনেই এর সমাধান করা যাবে। আমার খেয়াল হল, না জানি ফোনেই আমাকে কালিমা পড়িয়ে দেয় এবং মুসলমান হয়ে যেতে বলে। এজন্য বললাম, না জনাব! সেটা সাক্ষাতেই বলতে হবে। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, বোন! আমি একেবারেই অকর্ম একজন মানুষ। আপনি যদি হাত দেখাতে চান কিংবা যাদু-টোনার চিকিৎসা করাতে চান অথবা তাবীয-তুমার লিখে নিতে চান তাহলে আমাদের বাপ-দাদারাও একাজ জানতো না। কাজেই আপনি আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটি বলুন। যদি এখানে এসে তার সমাধান সম্ভব হয় তবেই কেবল আপনার সফর করা উচিত। অন্যথায় এত দীর্ঘ সফর করে পেরেশান হওয়ার কী ফায়দা হবে?

মাওলানা সাহেব যখন খুব জোর দিলেন তখন বলতেই হল, আমি এক সপ্তাহের জন্য মুসলমান হতে চাই। আমি আশার বড় বোন। যাকে আপনি ফোনে কালিমা পড়িয়েছিলেন। ঐ রাতেই সে ইন্তেকাল করেছিল। আশার নাম শুনে মাওলানা সাহেব বড় মহব্বতের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি অবশ্যই আসুন। আপনার যখন সুবিধা তখনই আসবেন। বাকী আজকেই সময়টা জানিয়ে দিবেন। আপনার জন্য আমার সফর মুলতবী করব। মাওলানা সাহেব আমাকে জলন্ধর থেকে যাওয়ার পথ বাতলে দিলেন। সফরের তারিখ ধার্য হল। উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে যাওয়ার ছিল

না। তাই আমার নানী শাশুড়িকে প্রস্তুত করলাম। ঘরের কাজের মেয়েটি, নানী শাশুড়ী আর আমি এই তিনজন মিলে ১৪ই নভেম্বর সকাল নয়টায় খাতুলী পৌঁছলাম। নেমে দেখি মাওলানা সাহেবের গাড়ী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির। সেই গাড়িতেই ফুলাত পৌঁছলাম। মাওলানা সাহেব তখন ফুলাতে ছিলেন না। কিন্তু আপনার আম্মুজান আমাকে জানালেন, হযরতজী দুপুর নাগাদ ফুলাত পৌঁছে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা গোসল সেরে নাশতা করে কিছুক্ষণ আরাম করলাম। তারপর আপনাদের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাত হল। আমি তাদের আমার সফরের উদ্দেশ্য বললাম। মুনীরা দিদি এবং আপনার আম্মুজান আমাকে বোঝালেন, এক সপ্তাহের জন্য কেউ মুসলমান হতে পারে না। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, আমাকে নিজ ধর্ম একেবারেই ত্যাগ করতে হবে, এটা কী করে সম্ভব?

দুপুর দু'টোর সময় মাওলানা সাহেব এলেন। বাইরে অনেক মেহমান এসেছিলেন। মাওলানা সাহেব দুই মিনিটের জন্য আমাদের নিকট আসলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, আর খুব খুশি প্রকাশ করলেন, আপনি মরহুমা আয়েশার কারণে এখানে এসেছেন। আপনার গোটা পরিবারের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক হয়ে গেছে। তারপর আমার ফিরে যাওয়ার প্রোগ্রাম জিজ্ঞেস করলেন। যখন বললাম, আমি তিনদিনের জন্য এসেছি তখন বললেন, বাইরে অনেক মেহমান এসেছেন। তাদের কয়েকজন আবার দু-তিন দিন ধরে আমার অপেক্ষা করছেন। রাতের বেলা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঙ্গে নিড়িবিলি আলোচনা করব।

বোন আসমা! আপনার মনে থাকবে হয়তো, আপনি আমাকে হযরতজীর কিতাব 'আপ কি আমানত আপ কি সেবা মে' এনে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি সেটা তিন তিন বার পড়ি। আমার অন্তর স্থায়ীভাবে ঈমান কবুল করার ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাগরিবের নামায পড়ে মাওলানা সাহেব আমাদের কাছে এলেন। আমাকে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝালেন। মৃত্যু পরবর্তী জান্নাত-জাহান্নাম এবং আপন সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করার কথা বললেন। 'আপকি আমানত' পড়ে আমার দিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য ইসলাম গ্রহণের খেয়াল খতম হয়ে গেল। আমি তাঁর নিকট আমার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পেশ করলে তিনি আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন। ঘরের

সকল মহিলা সমবেত ছিল। আমি বললাম, আপনি কি আমার জন্য আয়েশা নামটিই রাখতে পারেন? বললেন, কেন নয়? আপনার নামও আমি আয়েশাই রাখছি। আর আয়েশা ছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় সহধর্মিনী।

আসমা! আপনার মনে থাকবে হয়তো, আমি মাওলানা সাহেবকে দুটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমি লক্ষ করছিলাম, মাওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল পরিবারের মহিলাদের দিকে নিবদ্ধ। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলেছেন কেন? তিনি বলেছিলেন, ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। যে সকল মহিলার সঙ্গে ইসলামের বিধি মোতাবেক একজন পুরুষের বিবাহ হতে পারে তারা সকলেই সে পুরুষের জন্য 'না– মাহরাম'। ইসলাম এদের সঙ্গে পর্দা করার নির্দেশ দেয়। সত্যকথা হল, আপনাদের সঙ্গে আমার পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলা উচিত, কিন্তু এতে আপনাদের কাছে পর পর মনে হতে পারে ভেবে দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে ইসলামের বিধানের উপর আমল করছি। কেননা ঈমানের দাওয়াতের মত এত বড় ইবাদতের মধ্যে কোনো না–মাহরামের প্রতি দৃষ্টিপাতের গুনাহ হলে তাতে প্রভাব থাকে না। আমি বললাম, আমার বোন আশা ঈমান গ্রহণের কথা বলেছিল এত অস্বীকারের পরেও আপনি তাকে ফোনেই কালিমা পড়িয়েছেন। ঠিক এ কারণেই আমি আপনাকে আসার উদ্দেশ্য বলতে চাইনি , না জানি আমাকেও আবার ফোনেই কালিমা পড়িয়ে দেন। কিন্তু তবুও আপনি আমাকে ফোনে কালিমা পড়ার কথা বলেন নি কেন?

হযরতজী জবাব দিলেন, ফোনে কালিমা পড়ানোটা কোনো প্রতারণা নয় বরং ক্ষণস্থায়ী পানির মত লয়শীল জীবনের দিকে লক্ষ করে এবং সত্যিকার সহমর্মিতার ভিত্তিতে করে থাকি। সত্যিই আপনার ব্যাপারে কেন জানি একথাটা মনে ছিল না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন, যদি পথিমধ্যে কিংবা এই সময়ের মধ্যে আপনার ইন্তেকাল হয়ে যেতো তাহলে কী অবস্থা হতো! কিংবা আমারই যদি ইন্তেকাল হয়ে যেতো, তাহলে আমার জন্যও এটা বড় বঞ্চনার কাজ হতো। জানি না কোন্ বে-খয়ালে আমার এই ভুল হয়েছিল। ফলে আপনি চার-পাঁচটি দিন ইসলাম থেকে বঞ্চিত রইলেন এবং এত বড় কল্যাণময় কাজে বিলম্ব ঘটে গেল। আল্লাহ তাআলা আমাকে

ক্ষমা করুন। বাস্তবিকই আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। আসলে আল্লাহ তাআলাই কাজ করনেওয়ালাদের অন্তরে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে দেন। আপনি এক সপ্তাহের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন। স্পষ্ট যে, এটা কোনো খেলাধূলা নয়। ইকবাল একজন বিখ্যাত কবি– বলেছেন,

শহীদী এই ঈদগাহে খুব ভেবে চিন্তে হাজির হও
যেমন ভাবছো, এত সহজ নয় মুসলমান হওয়া।

ইসলাম গ্রহণ করা মানে নিজের আমিত্বকে কুরবান করে দেয়া। এজন্য আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলা যথেষ্ট ছিল না। কাজেই ফোনে কালিমা পড়ানোর কথা তিনি আমার অন্তরে ঢালেন নি। কিন্তু আশার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি অনুভব করছিলাম, একে যদি এক্ষুণি কালিমা না পড়াই তাহলে দু একদিনের মধ্যেই হয়তো তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। হযরতজী আমাকে বোঝালেন, এখন সর্বপ্রকার কুরবানী পেশ করে এই ঈমানকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এতে আপনার উপর বহু রকমের কষ্ট আপতিত হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কুরবানী দিতে হতে পারে। সামান্য মাটির হাঁড়িও ভালো কিনা বাজিয়ে দেখা হয়। তাহলে এমন মহামূল্য ঈমানের গ্রহীতাকেও পরীক্ষা করা হতে পারে। আপনি যদি ঈমানের ওপর জমে থাকতে পারেন তাহলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অনুভব করবেন, কত সস্তায় আপনি কত দামী নেয়ামত অর্জন করেছেন। হযরতজী তাঁর পরিবারের মহিলাদের আমাকে নামায, খানা-পিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বললেন আর আমার নানী এবং বুয়ার ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিলেন। আম্মুজান আর মুনীরা দিদি তাদের দুজনকে বুঝাতে লাগলেন। পরদিন হযরতজী সফরে চলে গেলেন। আমাদের ফিরে আসার দুই ঘণ্টা পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি নানী শাশুড়ী আর বুয়াকে বোঝালেন, আপনারা কেন এই দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকবেন? তারা আগে থেকেই বেশ কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন হযরতজীর কথায় তারাও এবার কালিমা পড়তে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি তাদের কালিমা পড়ালেন। বুয়ার নাম মারিয়াম আর নানীর নাম আমিনা রাখলেন। আমরা খুশি মনে সাফল্যের সঙ্গে বিদায় নিলাম। ঘরের সকলে আমাদের এমন মহব্বতের সঙ্গে বিদায় দিল যেন আমরা এই পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই পরিবারেরই একজন সদস্য। কেন জানি এখনও আমি যখন ফুলাত অথবা দিল্লী আসি, মনে হয় আমি যেন বাপের বাড়ি এসেছি।

প্রশ্ন : শুনেছি বাড়িতে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে

গিয়েছিল. তখন আপনার অবস্থা কী ছিল? আর তার ইন্তেকালই বা কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর : হযরতজী আমাকে বলেছিলেন, এখন আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে আপনার ভালোবাসার দাবী হল, তাদের সবাইকে আপনি দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। আপনার স্বামীকেও ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন আর সন্তানদেরও মুসলমান বানাবেন। আমাকে এ-ও বলেছিলেন, ইসলামের জন্য আপনাকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আমার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সব দেখে আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে আমার স্বামীকে সব অবস্থা খুলে বলি, আমি তো আজীবনের জন্য মুসলমান হয়ে গিয়েছি এবং তাকে জোর দিয়ে বলি যে, আপনিও মুসলমান হয়ে যান। তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন।

প্রথম প্রথম আমার কথাকে হালকাভাবে নিতেন কিন্তু যখন জোর দেয়া শুরু করলাম তখন বিরোধিতা শুরু করলেন এবং আমাকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। আমি আমার আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। আমি হযরতজীর কাছে ফোন করে জানতে চাইলাম, একজন মুসলমান এবং একজন শিখ কি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে? হযরত বললেন, সত্যকথা হল, মুসলমান হওয়ার পর আপনার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর বাকী নেই। আপনাদের বিবাহ ভেঙে গেছে। তবে আপনি সতর্কতার সঙ্গে এই আশায় তার সাথে অবস্থান করুন যে, তিনিও ঈমান কবুল করে নেন এবং সন্তানদের জীবন, ঈমান এবং ভবিষ্যতের সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়।

একথা জানার পর তার সঙ্গে থাকতে আমার খুবই সংকোচবোধ হল। প্রতি রাতেই আমাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। কখনো এতে অর্ধেক রাতও পার হয়ে যেতো। হযরতজী আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে বললেন যে, তাহাজ্জুদ নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করো। একবার সারারাত নামায পড়ে এবং কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম, আয় আমার মাওলা আপনার ভান্ডারে তো কোনো কিছুর কমতি নেই; আপনি আমার স্বামীকে কেন হেদায়াত দিচ্ছেন না। আমার আল্লাহ আমার দুআ শুনলেন। পরবর্তী রাতে আমি যখন তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য চাপ দেই তখন সে বিরোধিতা করল না। বলল, রোজ রোজ ঝগড়া করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যদি এতেই তুমি সন্তুষ্ট হও তাহলে চল আমিও মুসলমান হয়ে যাই। আমাকে মুসলমান বানাও। আমি বললাম, আমার সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান হওয়াকে

মুসলমান হওয়া বলে না; বরং সৃষ্টিকর্তা, অন্তর্জামি মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমান হতে হয়।

আমি তাকে হযরতজীর লেখা 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' বইটি পড়তে দিলাম। আগেও আমি তাকে এটি পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি কিতাবটি গ্রহণ করলেন এবং পড়তে লাগলেন। পুরো কিতাবটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তিনি কিতাব পড়ছিলেন আর আমি তার চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। অবশেষে তিনি ঐ কিতাব থেকেই জোরে জোরে তিনবার কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন। বললেন, এখন এই কালিমা তোমার খুশির জন্য নয়, বরং আমার খুশি এবং আমার প্রতিপালকের খুশির জন্য পড়ছি। আমি অজান্তেই তাকে জড়িয়ে ধরলাম। বলে বোঝাতে পারব না, দুই মাস ঝগড়া-ঝাটি আর কান্নাকাটির পর সেদিনই প্রথম আমার ঘরে খুশির বন্যা বইছিল। পরদিন জানা গেল, 'রৌপড়' এলাকায় তার ট্রান্সফার হয়েছে। তিনি সেখানে চলে গেলেন। এক সপ্তাহ পর সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফর হল। প্রোগ্রামের কাজে তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় এক জায়গায় নিরাপত্তা পরিদর্শনে গেলেন। কলেজের বাউন্ডারীর নীচে দাঁড়িয়ে কাজ পরিদর্শন করছিলেন। হঠাৎ প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের একটা ঝাপটা এমনই প্রচন্ড ছিল যে, বাউন্ডারীর যে অংশের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সোজা তার উপর ভেঙে পড়ল এবং মুহূর্তেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

বোন আসমা! বলে বুঝানো সম্ভব নয়, এই দুর্ঘটনা আমার জন্য কত বড় আঘাত ছিল। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। আমার ঈমানের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েনি। আমার এই অনুভূতি আমাকে স্থির রেখেছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং জান্নাতে চলে গেছেন। ইনশাআল্লাহ কিছু দিন পরে আমি সেখানে পৌঁছে যাবো। তাঁর শেষকৃত্যের (কাফন-দাফন) ব্যাপারে খুব হাঙ্গামা হয়েছিল। আমি বললাম, কিছুতেই আমি তাকে পোড়াতে দিব না। আমি তার লাশের উত্তরাধিকারী। আইনত সে আমারই অধিকার। কিন্তু পরিবারের লোকজন জেদ ধরেছিল, এ আমাদেরই বংশের সদস্য। ডি.জি.পি, এ.ডি.জি.পি, আই.জি,ডি.আই.জি– সবাই উপস্থিত ছিলেন। বহু চেষ্টা প্রচেষ্টার পর সিদ্ধান্ত হল তার সমাধি রচনা

করা হবে। অবশেষে তার সমাধি রচনা করা হল। সমাধি রচনার পর আমি এক মাওলানা সাহেবকে ডেকে তার জানাযা পড়িয়ে দেই।

প্রশ্ন : তার পর কী হল?

উত্তর : আমি রৌপড় থেকে জলন্ধর চলে আসি। হযরতজী বলার পর ইদ্দত পূর্ণ করি। আমার এক ভাই লন্ডনে থাকেন। তিনি আমাকে ইংল্যান্ডে চলে যেতে বললেন। আমি পাসপোর্ট বানালাম। ইতোমধ্যে স্বপ্নে একদিন কাবা ঘর দেখি। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি হযরতজীকে বৃত্তান্ত জানালাম। তিনি বললেন, আপনার ওপর সম্ভবত হজ্জ ফরয হয়েছে। আর এজন্য একজন মাহরাম সঙ্গী থাকা জরুরী। কিন্তু আপনার কোনো মাহরাম নেই। এক কাজ করুন, আপনি কাউকে বিয়ে করে নিন। আমি আমার সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে রাজী করতে পারিনি। কিন্তু কেন যেন হজ্জে যাওয়ার জন্য আমি পাগলপারা হয়ে উঠলাম। এজন্য বারবার দিল্লী, ফুলাত সফর করলাম। কিন্তু এজেন্টদের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো উপায় বের হচ্ছিল না। আমি কেবল তড়পাতে লাগলাম। হজ্জ থেকে বঞ্চিত হওয়াও আমার জন্য একটা বিরাট পরীক্ষা ছিল। আমি খুব কাঁদতাম। আমার আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতাম। আমার মনে হতো, এখনও আমার হজ্জে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কুরবানীর ঈদের তিনদিন পূর্বে মনে পড়ল, হজ্জের মাত্র তিনদিন বাকী আছে। কারণ, আমার জানা ছিল ঈদের দিনই হজ্জ হয়। তাহাজ্জুদ নামাযে কাঁদতে কাঁদতে বেঁহুশ হয়ে গেলাম। আমি আধো ঘুম আধো জাগরণে দেখি, আমার মাথায় ইহরামের স্কার্ফ বাঁধা। আমি মীনার দিকে চলছি। মোটকথা, হজ্জ পূর্ণ করছি। আমার চোখ খুলে গেল। বেঁহুশী উড়ে গেল। বলা সম্ভব নয়, এতে আমি কতটা খুশী হয়েছিলাম। আমি অনেক চেষ্টা করে হযরতজীর মক্কা মুকাররমার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করি এবং খুশিতে প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে তাকে হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ শোনাই। হযরতজী তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন : আব্বু বলেছেন, আপনি গত বছর হজ্জ করছেন। এ বছর তো আমরা হজ্জের মধ্যে আপনাকে বারবার স্মরণ করেছি এবং আফসোস করেছি।

উত্তর : আমার আল্লাহর প্রতি আমি কুরবান হই, তিনি আমার হজ্জের

আবদার কবুল করেছেন। প্রথম বছর তো তিনি আমাকে না নিয়েই হজ্জ করিয়েছেন। পরের বছর আমি আমার এক ভাইয়ের ওপর মেহনত করে তাকে বিদেশে সফর করানোর অর্থাৎ, হজ্জ করানোর লোভ দেখিয়ে মুসলমান হওয়ার জন্য জোর দেই। তাকে বলি যে, গুরু নানকজীও হজ্জে গিয়েছিলেন। চেষ্টা ফিকিরের পর সে মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে গত বছর আমাদের হজ্জের সৌভাগ্য লাভ হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের মাধ্যমে মুসলমানদের কোনো পয়গাম দিতে চান কি।

উত্তর : আমি আমার বোন আয়েশার (আশা) কথারই পুনরাবৃত্তি করছি, ঈমানের নেয়ামতের মূল্যায়ন করুণ। ঈমানের সঙ্গে এক দিন, ঈমান বিহীন হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়েও শ্রেয়। আর গোটা জগতের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবীর উম্মত হওয়ার কারণে গোটা পৃথিবীর মানুষকে দুনিয়ার এই কয়েদখানা থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করুন। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দুআ করুন। যেন সবার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান, সেপ্টেম্বর– ২০০৬

মাস্টার আব্দুল ওয়াহিদ (সঞ্জয়)-এর সাক্ষাৎকার

আম্বিয়া কেরামের মতো নির্লোভ-নিঃসার্থ ও মহব্বতপূর্ণ হৃদয় থাকতে হবে। সেই সাথে ইসলামের মতো সত্য নিয়ামত সাথে থাকলে কঠিন থেকে কঠিন মানুষও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়ে পারবেনা। এজন্য আমাদেরকে মানবতার হক আদায় করতে হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দিতে হবে। তাদের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচাতে হবে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মাস্টার আব্দুল ওয়াহিদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আব্দুল ওয়াহিদ ভাই! আব্বু আমাকে আরমুগানের জন্য আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে দাওয়াতী কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে ফায়দা হতে পারে।

উত্তর : গতরাতে আমাকেও মাওলানা সাহেব বলেছিলেন, আহমদ আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবে।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিচয় দিন?

উত্তর : পূর্বে আমরা আসামের অধিবাসী ছিলাম। ইংরেজ আমলে আমার দাদা গোহাটিতে অফিসার ছিলেন। পিতাজীও সেল ট্যাক্সের অফিসার ছিলেন। বাঙ্গালের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে অবশেষে কোলকতায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। আমার পুরনো নাম ছিল সঞ্জয় আস্থানা। ১৯৫৯ সালের এগারো সেপ্টেম্বর আমার জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা মালদহতে হয়েছিল। তারপর কলেজের সময় হলে পিতাজী কোলকতা ট্রান্সফার হন। এখানেই আমার শিক্ষাদীক্ষা হয়। এম.এস.সি ও বি.এড করে সরকারী হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে সায়েন্সের শিক্ষক হয়ে যাই। তারপর এক ডিগ্রি কলেজের লেকচারার হই। আল্লাহর শোকর, এখনও সায়েন্সই পড়াই। আজ থেকে চৌদ্দ বছর পূর্বে এক শিক্ষিত পরিবারে বিবাহ করি। আমার শ্বশুর সাহেব এক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আমার স্ত্রীও একটি কনভেন্ট স্কুলের শিক্ষিকা।

প্রশ্ন : একটু বিস্তারিতভাবে আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বলুন?

উত্তর : সরকারী চাকুরীজীবী হওয়ার কারণে তিন বছর পর পর আমাদের পারিবারিক ভ্রমণভাতা দেয়া হয়। আজ থেকে নয় বছর পূর্বে বালবাচ্চাসহ পিকনিক ট্যুরে বের হই। যাওয়ার পথে দুদিনের জন্য ভূপালে ব্রেকজার্নি করে ভূপাল দেখারও প্রোগ্রাম ছিল। ভূপাল নেমে স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া নেই। ঘটনাক্রমে আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। ট্যাক্সিওয়ালার কাছে উপযুক্ত একটি হোটেলের অনুসন্ধান করি। বলল, একটু দূরেই ভালো এবং সস্তা একটি হোটেলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সে আসলে ভালো লোক ছিল না। আমাকে নিয়ে এক হোটেলে গেল। বলল, আপনি হোটেলে কামরা পছন্দ করুন। আমি ভেতরে গিয়ে কামরা পছন্দ করলাম। ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে বলল, আমি সামানপত্র আর বাচ্চাদের নিয়ে আসছি, আপনার জ্বর এসেছে আপনি কামরায়ই আরাম করুন। গাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলল, আপনি বাচ্চাদের নিয়ে যান, আমি মালপত্র নিয়ে আসছি। আমার দুর্ভাগ্য বলব, না সৌভাগ্য– সফরে কখনও ট্যাক্সি ভাড়া করলে সবসময়ই গাড়ির নম্বর নোট করায় অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু জ্বরের প্রকোপে এবার নম্বর টুকে রাখার কথা মনে ছিল না।

ট্যাক্সিওয়ালা সামানসহ ট্যাক্সি নিয়ে পালিয়ে গেল। সমস্ত সামানপত্র কাপড়-চোপড়, মানি ব্যাগের পাঁচশত রূপি ছাড়া সমস্ত টাকা, এমনকি টিকিটও গাড়িতে ছিল। জরাক্রান্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে অচেনা শহরে যে দুর্ভোগের শিকার হলাম, তা বলার নয়। জ্বরের প্রকোপ নিয়েই হোটেল থেকে বের হয়ে থানার খোঁজ করলাম। সেখানে রিপোর্ট করলাম। পুলিশ অনেক সান্ত্বনা দিল কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় পড়ে থেকেও কিছু করা গেল না। জ্বরের জন্য দোকান থেকে ওষুধ এনে খেলাম। জ্বর কিছুটা কমল। ফিরে আসার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে ঘরে ফোন করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ঢলের ফলে বাঙ্গালের লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফোন কাজ করছিল না। ঝাঁসিগামী একটি গাড়ী প্রস্তুত ছিল টিকেট ছাড়াই ওতে চেপে বসলাম। রিজার্ভেশন ডাব্বায় টি.টি. টিকেট চেক করতে আসল। আমাদের জরিমানাসহ টিকেটের মূল্য দিতে চাপ দিতে লাগল। আমি আমার পরিচয় তুলে ধরে ঘটিত সমস্ত দুর্ঘটনা খুলে বললাম। তিনি নরম হলেন। বললেন, ঠিক আছে চিন্তা করবেন না।

ঝাঁসি থেকে সঙ্গে সঙ্গেই কাটিহারের গাড়ি পেয়ে যাবেন। আপনি ওটাতে উঠে যাবেন। আমার পরিচিত কোনো টি.টি-কেও পেয়ে যাবো, তাকে বলে দিলে তিনি বিনা টিকেটেই আপনাকে কাটিহার নিয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে আপনি কোনো একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। আমার প্রাণ ফিরে এল, যাক কাটিহার পর্যন্ত যাওয়ার তো ব্যবস্থা হল। ভূপাল থেকে রওয়ানা হতেই জ্বর আবার সওয়ার হল। জ্বরের তীব্রতায় শরীর কাঁপতে লাগল। কোনমতে ঝাঁসি পৌঁছলাম। কিন্তু আমার অবস্থা এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সামনে আর সফর করার উপযোগী ছিলাম না। বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, ঝাঁসির কোনো সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। ঝাঁসি স্টেশন থেকে স্থানীয় হাসপাতালের ঠিকানা জেনে নিলাম। কোনমতে অটোরিক্সা করে হাসপাতালে পৌঁছলাম। ডাক্তাররা বললেন, মস্তিষ্কের জ্বর হয়েছে। চিকিৎসায় বিলম্ব করলে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন। বললাম, আপনারা আমাকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে দিন। ঔষুধপত্রের জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আমি বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করব।

দশদিন হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালের ডাক্তাররা দয়া পরবশ হয়ে আমাদের খানার ব্যবস্থাও হাসপাতাল থেকে করে দিল। এই দিনগুলোতে আমার স্ত্রী তার নিজের বাড়িতে এবং আমাদের বাড়িতে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো প্রকার যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। শরীর কিছুটা ভালো হয়ে উঠলে ডাক্তাররা আমাকে সফর করার অনুমতি দিয়ে দিল। আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। ঘটনাক্রমে সেই টি.টি যিনি আমাদের ভূপাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার ট্রেনটি দু'ঘণ্টা লেট করে ফেলেছিল। আমি তাকে পরিচয় দিয়ে আমাদের কাটিহারের গাড়িতে তুলে দেয়ার অনুরোধ করলাম। তিনি তার সঙ্গীর খোঁজ করতে লাগলেন এবং পেয়েও গেলেন। ট্রেন দু'ঘণ্টা পর রওয়ানার কথা। তিনি আমাদের ট্রেনে তুলে দিলেন। পথে আবার আমার জ্বর আসল এবং অবস্থা আগের মত হয়ে গেল। অবিরাম কাঁপছিলাম। কত কষ্ট করে যে কটিহার পর্যন্ত পৌঁছেছি বলার নয়।

কাটিহার থেকে কোলকাতাগামী অনেকগুলো গাড়ি ছিল। টি.টির সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু কেউ আমাদের বিনা টিকেটে নিয়ে যেতে রাজী হল না। আমার পকেটে মাত্র তেরটি রূপী অবশিষ্ট ছিল। বাচ্চাগুলো রাত থেকেই অভুক্ত

ছিল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। আমি স্ত্রীকে তেরো রূপীর খানা কিনতে পাঠালাম। সে ডাল ভাত নিয়ে এল। স্ত্রী বাচ্চারা খেয়ে নিল। স্টেশনে বসে ফকীরের মত সারা সপ্তাহর ময়লা কাপড়ে তাদের ডাল ভাত খেতে দেখে আমার কান্না বাঁধ মানল না। আমার কান্নায় আমার মালিকের দয়া হল। আমাকে তিনি শুধু সেই পরীক্ষা আর বিপদ থেকেই উদ্ধার করলেন না, বরং মৃত্যুর পর দোযখ থেকে উদ্ধারেরও ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন : ডাল-ভাত খেতে দেখে কান্নার বদৌলতে-এর কী মর্ম?

উত্তর : মর্ম তো অবশ্যই আছে। আমি প্লাটফর্মের যেখানে শুয়েছিলাম সামনেই আমার বাচ্চারা খানা খাচ্ছিল। জ্বরের প্রকোপে আমি কাঁপছিলাম। আমার গোটা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এমন সময় আমার সমস্ত অসুখের আরোগ্যকে মালিক আমার সামনে এনে বসিয়ে দিলেন। আপনার আব্বু মাওলানা কালীম সাহেব বিহারের এক সফর শেষে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। কাটিহার থেকে তিনি রাজধানী এক্সপ্রেস ধরবেন। গাড়ি চার ঘণ্টা লেট ছিল। যারা মাওলানা সাহেবকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাদের অন্য ট্রেনে ফিরতে হবে। এজন্য তিনি তাদের জোর করে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর নিজ গাড়ির অপেক্ষায় আমার সামনের বেঞ্চে এসে বসলেন। আমাকে কাতরাতে দেখে আমার নিকট এলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম।

মাওলানা সাহেব আমাকে কাতরানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমার তখন বলার মত অবস্থা ছিল না। আমার স্ত্রী তাকে আমার দুঃখের কথা শোনাল। মাওলানা সাহেব আমাদের পেরেশানীর কথা শুনে তার সঙ্গীর নিকট সামানপত্র রেখে তিনি স্টেশন থেকে বের হয়ে গেলেন। নিজে দোকান থেকে ঔষুধ আনলেন আর সঙ্গীকে দিয়ে চা স্টল থেকে দুধ আনালেন। নিজে হাতে ঔষধ বের করে আমাকে দুধ আর ঔষধ খাওয়ালেন। আরো পাঁচদিনের ঔষুধ আমার হাতে দিলেন। একটু পরই কিছুটা আরাম বোধ করলাম। আমাকে বললেন, ভাই! আমার নিতান্তই লজ্জা করছে তবু বাধ্য হয়ে আপনাকে একটি অনুরোধ করছি। আপনি আমার রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। আপনার জায়গায় আমারও এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। আপনি আমার থেকে দুই হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করুন। ঋণ এজন্য বললাম, আপনি সম্মানী মানুষ আপনার যেন খারাপ না লাগে। অন্যথায় দুই হাজার টাকা আপনাকে আমার উপহার দিতে ইচ্ছে করছে। প্লিজ গ্রহণ করুন।

বলার ভাষা নেই আমি কতটা আশ্চর্যজনক অবস্থায় ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ইনি ঈশ্বর প্রেরিত কোনো দূত যিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এমন স্বর্গীয় আচরণ করছেন। কত লোককে আমি নিজের দুরাবস্থার কথা শুনিয়েছি। কেবল ট্যাক্সিওয়ালাকে ভর্ৎসনা আর হায় হায় করা ছাড়া কোনো কিছুই তাদের মনে পড়ে নি। আর এই ভিনধর্মী মুসলমান কেমন সৌজন্য ও বিনয়ের সঙ্গে এতগুলো টাকা দিচ্ছে যে, মনে হচ্ছে নিজেই ভিক্ষা চাইছে। আমি তাকে বললাম, টাকা আমার এতোই প্রয়োজন যে, মানা করতে পারছি না। কিন্তু আপনি আগে আপনার ঠিকানা দিন যেন বাড়ি গিয়ে টাকাগুলো মানিঅর্ডার করতে পারি। মাওলানা সাহেব বললেন, আগে তো এগুলো নেবেন, তারপর না হয় ঠিকানা লিখে দেবো। তারপর সঙ্গীকে বললেন, মাস্টারজী! ইনাকে ঠিকানা লিখে দিন। তারপর তার কানে কানে কী যেন বললেন। সে উঠে চলে গেল। বাচ্চাদের জন্য আইসক্রীম আর কলা নিয়ে আসল। বাচ্চারা নিতে চাইল না। আমি বললাম, নাও বেটা! ইনিই তোমাদের আসল আংকেল। মাওলানা সাহেবকে আমি ঠিকানা লিখে দেয়ার কথা বলছিলাম আর তিনি টালবাহানা করছিলেন। এইতো দিচ্ছি, একটু সবুর করুন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি যখন জোর দিলাম, বললেন, ভাই সাহেব! আপনি খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। আপনার এক রক্ত সম্পর্কীয় ভাইকে আপনি খুঁজে নিতে পারবেন না? ইতোমধ্যে গাড়ি এসে পড়ল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গী সেই টাকা থেকেই আমাদের জন্য টিকেট এনে দিয়ে ছিলেন। আমাদের তারা গাড়িতে তুলে দিলেন। আমি ঠিকানার কথা বললে মাওলানার সাথী মাস্টার জামশেদ সাহেব তাড়াতাড়ি একটি কিতাব বের করে বললেন, এটা মাওলানা সাহেবের লিখা কিতাব। এর নীচে হযরতের ঠিকানা দেয়া আছে।

দিনের বেলা রিজার্ভেশন ডাব্বা খালী পেয়ে আমরা বসে পড়লাম। ঠিকানা দেখার জন্য কিতাবটি বের করলাম। ওটার নাম ছিল 'আপকী আমানত আপকী সেবা মেঁ' কিতাবের শুরুতে 'দু'টি কথা' শিরোনামে মাওলানা ওয়াসি সাহেবের লেখা ছিল। সেখানে মাওলানা সাহেবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল। একটু আগেই আমি সেই ফেরেশতাসুলভ সেবককে দেখে এসেছিলাম। একেকটি শব্দ হৃদয়ে গেঁথে গেল। জ্বর থাকা সত্ত্বেও দুলতে দুলতে আমি পুরো বইটি পড়ে ফেললাম। তারপর স্ত্রীকে দিলাম। সে-ও একবারে পুরোটা পড়ে ফেলল।

আমাকে বলতে লাগল, মাওলানা সাহেব কিতাবটি স্টেশনে দিলেই ভালো হতো। ঔষধের দ্বিতীয় ডোজটি নিলাম ট্রেনে বসে। ঔষধও জাদুর মতো ক্রিয়া করল।

কোলকাতা পৌঁছে মনে হল, আমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেছি। আমি আর আমার স্ত্রী আপকী আমানতের প্রতিটি শব্দের শিকার হয়ে গেলাম। সত্য ও ভালোবাসার পয়গামের সামনে নিজেকে অসহায়রূপে আবিষ্কার করলাম। আমি কোলকাতা নেমে স্ত্রীকে বললাম, আমার শরীর বেশ ভালো হয়ে গেছে। মনে চাচ্ছে বাড়ি গিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে আজই মুজাফফর নগর চলে যাই এবং কিছু সময় মাওলানা সাহেবের সঙ্গে কাটিয়ে আসি। স্ত্রী বলল, ঔষুধ শেষ করে নিন তারপর তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। বাড়ি পৌঁছলাম। শরীর একেবারেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী বলল, আগে টাকাগুলো মানিঅর্ডার করে দিন তারপর কয়েকদিন পর ছুটি নিয়ে দেখা করতে যাবেন। মানিঅর্ডারে ঠিকানা লেখার জন্য কিতাব খোঁজ করলাম কিন্তু না জানি শয়তানই কিতাবটি কোথায় লুকিয়ে ফেলল। দুই দিন ধরে আমরা তন্নতন্ন করে খোঁজ করলাম কিন্তু কিতাব আর খুঁজে পেলাম না।

আমার একথা মনে ছিল যে, মাওলানা সাহেবের নাম মুহাম্মদ কালীম। কিন্তু মুজাফফর নগরের পরিবর্তে মুজাফফরপুর মনে আসছিল। এক দুজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, মুজাফফর নগর ইউ.পিতে নয়, বিহারে। অস্থির অবস্থায় বিহার মুজাফফর পুরের টিকেট কাটলাম। একদিন পূর্বে ইউ.পির এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, ইউ.পিতে মুজাফফর পুর নামে কোনো জায়গা আছে? বলল, মুজাফফর পুর নয়, মুজাফফর নগর আছে। আমার মনে পড়ে গেল এটাই সঠিক ঠিকানা। সে আরও বলল, মুজাফফর নগরের সরাসরি কোনো গাড়ি নেই। আপনাকে দিল্লী অথবা সাহারানপুর যেতে হবে। সেখান থেকে মুজাফফর নগরের বাস অথবা ট্রেন পাবেন। আমি দিল্লীর রিজার্ভেশন করলাম। ২৭শে অক্টোবর প্রথমে দিল্লী তারপর দিল্লী থেকে মুজাফফর নগর পৌঁছলাম। স্টেশনে এক মিয়াজীকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুজাফফর নগরের মাওলানা কালীম সাহেবকে চেনেন? বললেন, আপনাকে খাতুলী হয়ে ফুলাত যেতে হবে। স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ড গেলাম। খাতুলীর বাসে উঠলাম। আমার পাশে এক তরুণ মৌলভী সাহেব বসে ছিলেন। পরিচয়ের পর জানতে পারলাম, তিনি ফুলাত মাদরাসায়ই থাকেন। রিজার্ভেশনের জন্য

মুজাফফর নগর এসেছিলেন। তার নিকট থেকে জানতে পারলাম, মাওলানা সাহেব ফুলাত নেই পাঞ্জাব সফরে আছেন। তার সঙ্গে ফুলাত পৌঁছলাম। মাওলানা সাহেবের বাড়ি গিয়ে জানা গেল তিনি রাতেই ফিরবেন। অপেক্ষার স্বাদ আস্বাদন করলাম।

মাওলানা সাহেব রাত একটায় পৌঁছলেন। জেগেই ছিলাম। দেখা হল। সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললেন। আমাকে সুস্থ দেখে খুব খুশি হলেন এবং সকালে দেখা হবে বলে বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন সকাল নয়টায় সাক্ষাত হল। আমি টাকাগুলো পেশ করলাম। মাওলানা সাহেব জোর করছিলেন, এগুলো উপহার হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি আরও বেশী খুশী হবো। আপনি শুধু এই টাকা দেয়ার জন্য এত দীর্ঘ সফর করেছেন। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, আমি নিজেই গিয়ে নিয়ে আসতাম। তারপর হেসে দিয়ে বললেন, দেখুন আপনি খোঁজ করেছেন আর পেয়েও গিয়েছেন। ঠিকানা ছাড়াই খুঁজে পেয়েছেন। বললাম, আপনি কিভাবে জানলেন, আমি ঠিকানা অর্থাৎ, কিতাব হারিয়ে ফেলেছি? মাওলানা সাহেব বললেন, কোন্ কিতাব? আসলে আমি ঠিকানাই দিতে চাচ্ছিলাম না। বললাম, আপনার সঙ্গী গাড়ি চলতে চলতে 'আপকী আমানত আপকী সেবা মেঁ" ধরিয়ে দিয়ে ছিলেন। আমরা সেটা পড়েছি। আর শিকারও হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কিভাবে যেন ওটা হারিয়ে গিয়েছে। আমি পুরো ঘটনা খুলে বললাম। মাওলানা সাহেব অনেক খুশী হলেন। বললেন, আপকী আমানত পড়ে কী সিদ্ধান্ত নিলেন? বললাম, আপনার হয়েই এসেছি। আপনার যা ইচ্ছা করুন, বা ছেড়ে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমার হওয়ার দ্বারা কোনো কাজ হবে না, যিনি সৃষ্টি করেছেন তার হলেই কাজে আসবে। বললাম, এজন্যই তো আপনার নিকট এসেছি? মাওলানা সাহেব বললেন, কালিমা কি পড়ে নিয়েছেন? বললাম, কিতাবে তো পড়ে নিয়েছি আপনিও পড়িয়ে দিন। ২৯শে অক্টোবর সাড়ে নয়টায় মাওলানা সাহেব আমাকে কালিমা পড়িয়ে আমার নতুন নাম রাখলেন আব্দুল ওয়াহিদ।

মাওলানা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভাবীও কি কিতাবটি পড়েছে? বললাম, সে তিন তিনবার পড়েছে। মাওলানা সাহেব বললেন, তার ইচ্ছা কী? বললাম, আমি যা করেছি সে-ও আমার সঙ্গে আছে। তিনি কতগুলো কিতাব আনিয়ে আমাকে হাদিয়া দিলেন। একদিন সেখানে থেকে আমি কোলকাতা ফিরে

আসি। মাওলানা সাহেবের পরামর্শক্রমে কোলকাতা মারকাযে যাই। সেখানে আলীগড়ের একটি জামাআত এসেছিল। তাদের সঙ্গে চল্লিশ দিন সময় কাটাই। এই চল্লিশ দিন আমার জন্য খুবই উপকারী হয়েছে। নামাযও পুরোপুরি শিখেছি আর জরুরী বিষয়াবলীও জানা হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী-আহলিয়া সাহেবার কী হল?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! ফুলাত থেকে গিয়ে আমি তাকে কালিমা পড়িয়েছি। সে খুবই খুশী হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার অনুভূতি কী?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণ করার খুশির কথা আপনাকে বোঝাতে পারবো না, কতটা আনন্দিত হয়েছি। এখন আমি সেই ট্যাক্সিওয়ালাকে দুআ দেই। সে যদি আমার মালপত্র লুট না করতো তাহলে আমার কী হতো? আমার আল্লাহর রহমতের প্রতি কুরবান হই, টাকা-কড়ি লুট করিয়ে আমার ঈমানের খাজানা ভরে দিয়েছেন। আমরা দুজন যখনই একত্রে বসি ব্যস, একথার ওপর শোকর আদায় করি, আল্লাহ আমাদের মালপত্র লুট করিয়েছেন আমাদের ঈমানের ধনে ধনী করার জন্য, কুফর শিরকের ব্যাধি থেকে সুস্থ রাখার জন্য। সত্যিই আহমদ ভাই! আল্লাহর রহমতের কি কেউ কোনো আন্দাজ করতে পারে?

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, আব্বুর সহমর্মিতা ও আখলাক আপনাকে বেশী প্রভাবিত করে ঈমানের নিকটবর্তী করে দিয়েছে, নাকি আপকী আমানত ইসলামের হক্কানিয়ত?

উত্তর : আহমদ ভাই! এমন বিপদের সময় অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে মাওলানা সাহেবের এমন সহমর্মিতা আমাকে প্রভাবিত করেছে। এ সহমর্মিতাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। সেই নিঃস্বার্থ সহমর্মিতার কারণে আমার হৃদয়ে মাওলানার সহমর্মিতার প্রতি আস্থা জন্মেছে। আর আমি আপকী আমানতকে আমার সহমর্মি ও হিতাকাঙ্ক্ষীর কল্যাণকামিতা মনে করে পড়েছি। ফলে ইসলামের সত্যতা, মানবচরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাওহীদ এবং ইসলামী মতাদর্শ আমার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়েছে। সহমর্মিতা তো কত লোকেই করে। কিন্তু কে তার ধর্ম বদলায়? আমার হৃদয়ে একথা উদিত হয়েছে, ইসলামের সত্যতা মানুষকে ফেরেশতা বানিয়ে দেয়। কাজেই সেই ইসলামে আমারও অধিকার আছে।

প্রশ্ন : সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কী করছেন?

উত্তর : বর্তমানে ছেলেটি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। একজন মাওলানা সাহেবকে তার টিউশনিতে লাগিয়ে দিয়েছি। বাচ্চা আর আমরা দুজন রোজ রাতে কুরআন মজীদ, দীনিয়াত এবং উর্দূ পড়ছি।

প্রশ্ন : পরিবারের লোকজন আপনাদের ইসলাম গ্রহণের বিরোধিতা করেনি?

উত্তর : অনেক করেছে। কেউ যখন বিরোধিতা করতো আমরা তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিতাম। পুরো ঘটনা শুনে আমার চাচা যিনি সবচেয়ে বেশী নারাজ হয়েছিলেন, বললেন, বেটা তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো কিতাবটি আমাকেও দিয়ো। তিনি দিনাজপুর (ইন্ডিয়া) স্টেশনে পোস্টেড। আমি তাকে আপকী আমানত পড়তে দেই। মাওলানা সাহেবের পরামর্শক্রমে সফর করে তার ওখানে যাই। রাত দুটো পর্যন্ত তাকে বুঝাতে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ! রাত দুটোর সময় তিনি কালিমা পড়ে নেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমার বংশের পঞ্চাশজন লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : আম্বিয়া কেরামের মতো নির্লোভ ও মহব্বতপূর্ণ হৃদয় থাকতে হবে। সেই সাথে ইসলামের মত সত্য সঙ্গে থাকলে কঠিন থেকে কঠিন মানুষও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়ে পারবে না। এজন্য আমাদের মানবতার হক আদায় করতে হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দিতে হবে।

প্রশ্ন : শোকরিয়া মাস্টার সাহেব! অনেক অনেক শোকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম।

উত্তর : শোকরিয়া তো আপনার প্রাপ্য, দীর্ঘ সময় ধরে আমার কথা শুনলেন। ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, নভেম্বর– ২০০৬

মুহাম্মদ ইসহাক (অশোক কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্যই অত্যাবশ্যক। কারো ইসলাম বিদ্বেষ দেখে একথা ভাবা যাবে না যে, তার আর ইসলাম গ্রহণের আশা নেই। সকল ইসলাম বিদ্বেষী ভুল বুঝে কিংবা অজ্ঞতার কারণে ইসলামের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করছে। এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা বজরং দল করতাম। ইসলাম আর মুসলমান ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর সেই আমরাই এখন ভাবি, আল্লাহ না করুন যদি হিন্দু হয়ে মারা যেতাম (ঝর ঝর করে কেঁদে দিয়ে) তাহলে আমরা ধ্বংসের কোনো অতল গহ্বরে পড়ে যেতাম। আল্লাহ তাআলার কতটা অসন্তুষ্টি আর জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি আমাদেরকে সহ্য করতে হতো।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ ইসহাক : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : ইসহাক ভাই! গত বছর ৭ই ডিসেম্বরের পর থেকে তো আপনার আর দেখাই হলো না। গতকাল আব্বু বললেন, আপনার ফোন এসেছিল, দিল্লী এসেছেন। শুনে খুব খুশী হয়েছি। রাতেই আব্বু বলে দিয়েছেন, আগামী সংখ্যার আরমুগানের জন্য আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে।

উত্তর : হ্যাঁ, আহমদ ভাই! মাওলানা সাহেব আজ সকালেই আমাকে বলেছেন, আরমুগানের এই সংখ্যায় তোমার সাক্ষাৎকার ছাপাতে হবে। বললাম, আমার তো লজ্জা করছে। তিনি আদেশ করলেন, তোমার অবস্থা জেনে লোকদের মধ্যে দাওয়াতের জযবা সৃষ্টি হবে। তাদের ভীতি কমে আসবে। তোমার ছাওয়াব হবে। বললাম, তাহলে ঠিক আছে।

প্রশ্ন : ইসহাক ভাই! আপনার পরিচয় বলুন?

উত্তর : আহমদ ভাই! উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ জেলা রামজপুরের টান্ডাবাদলী কসবার নিকটবর্তী এক গ্রামের সাইনী পরিবারে আমার জন্ম। জন্ম তারিখ ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দ। বাড়ির লোকজন আমার নাম রেখেছিল অশোক কুমার। পিতা শ্রী পূরণ সিং ছিলেন অল্প শিক্ষিত এক কৃষক। গ্রামের

জুনিয়র হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি। স্কুল ও ইন্টার পাশ করেছি রামপুর থেকে। তারপর লক্ষ্মৌ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করি। একটা প্রাইভেট কন্সট্রাকশন কোম্পানীতে চাকুরী পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় খুব বদরাগী ছিলাম। স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গেও ঝগড়া করতাম। কোম্পানীতেও নিত্যদিন একটা না একটা লেগেই থাকতো। ব্যস, চাকুরী ছেড়ে দিলাম।

আমার দুজন বন্ধু ছিল। প্রথম শ্রেণী থেকে ইন্টার পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে লেখা পড়া করি। একজনের নাম যোগীশ কুমার আর অপরজন যোগীন্দ্র সিং। দুজনেই আমাদের আত্মীয় ছিল। সম্পর্কে একজন ভাই হতো। তিনজন এক সঙ্গে পড়াশোনা করতাম আবার ব্যায়ামও করতাম একত্রে। কিছুদিন কারাতেও শিখেছি। রামজন্মভূমি আর বাবরী মসজিদ নিয়ে লড়াই শুরু হলে আমরা তিনজনই বজরং দলে নাম লেখাই। আদভানীর রথযাত্রায় আমরা গোয়ালিয়র গিয়ে শামিল হই। চারদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম। পরিবারের সবাই আমাদের এই সিদ্ধান্তে খুশী হল।

একদিন যোগীশের পিতা যিনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন আমাদের তিনজনকেই তার বাড়িতে ডেকে নিলেন। যোগীন্দ্রের পিতাকেও ডাকলেন। বললেন, আমরা তোমাদের তিনজনকে রামের নামে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাম মন্দিরের নামে তোমাদের বলি হতে হলেও পিছু হটবে না। পৃথিবীতে তোমরা অমর হয়ে থাকবে। তিনি আমাদের তিনজনের মাথায় ***ফেটি*** বেঁধে দিলেন। আমাদের মনোবল চাঙ্গা হল, আর সাহস বেড়ে গেল । ৩০শে অক্টোবর আমরা করসেবায় পৌঁছলাম। তখনও আমরা জায়গামত পৌঁছিনি, এদিকে মুলায়ম সরকারে গোলাগুলি হল। পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে ট্রেনে উঠিয়ে রামপুর নিয়ে ছেড়ে দিল। আমাদের রাগের অন্ত রইল না। পথে কয়েকজন পুলিশকে পিটুনীও দিলাম। কিন্তু তারা আমাদের একথা বলে শান্ত করল যে, মুলায়ম সরকার গদিচ্যুত হলে আমাদের সরকার আসবে। তখন তোমরা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নিও। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে বাবরী মসজিদ শহীদ করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যা পৌঁছলাম। সঙ্গে শীতের কাপড়ও পুরোপুরি ছিল না। বিভিন্ন আশ্রমে থাকতে থাকতে আমরা বেশ হেনস্থা হলাম। তারা আমাদের ভয় দেখাল, তোমরা এসব পাপ কাজ করছ। এক সাধু তো বলেই ফেলল, আজ যদি রামচন্দ্র জীবিত থাকতেন তিনিও বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার এই পাপ করতে দিতেন না। এদের ওপর আমাদের প্রচন্ড রাগ হল।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর লোকজন বাবরী মসজিদের নিকটে সমবেত হল। পরিচালক আমাদের বলেছিলেন, আমরা ইঙ্গিত করামাত্রই তোমরা মসজিদ গুড়িয়ে দিবে। ব্যস, উমা ভারতী শ্লোগান দিতেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যোগেশ তো ভীড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ওকে মাড়িয়েই লোকজন ছুটে যাচ্ছিল। কেউ একজন ওকে দেখে হাত ধরে উঠাল। একমাস পর্যন্ত সে অসুস্থ ছিল ওর মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। বিজয়ের আনন্দে আমরা প্রত্যেকে একটি করে ইট নিয়ে আসলাম। পথে লোকজন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। বাড়ির লোকজন আমাদের সম্মানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিল। তারা আমাদের বাহবা দিয়ে যাচ্ছিল।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন?

উত্তর : বাবরী মসজিদ শহীদ করে আহমদ ভাই! আমরা নিজেদের মনোবাসনা তো পূর্ণ করেছিলাম কিন্তু কেন জানি আমি একাই নই বরং তিন জনই এক অজানা ভয়ে শংকিত থাকতাম। প্রত্যেকেরই মনে হতো, এই বুঝি কোনো বিপদ এসে গেল। মাঝে মাঝে তো এমনও মনে হতো, আকাশ থেকে কোনো অগ্নিকুন্ডলী আমাদের ভস্ম করে দিবে। বাবরী মসজিদের প্রত্যেক শাহাদাত বার্ষিকীতে (৬ই ডিসেম্বর) আমাদের দিনরাত কঠিন অস্থিরতার মধ্যে কাটতো। ভাবতাম, আজ তো অবশ্যই শাস্তি এসে পড়বে। গত বছর ৬ই ডিসেম্বর আশংকা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ৬ই ডিসেম্বর আমরা কখনই বাড়ি থেকে বের হতাম না। ৬ তারিখ পার হয়ে গেলে আমরা স্বস্তি অনুভব করতাম।

১৯৯৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর সকালে আমরা তিন জন বাড়ি থেকে বের হলাম। রামপুর বাস স্ট্যান্ডে আমাদের কলেজের সাথী রঈস আহমদের সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে সে এগিয়ে আসল। বিদ্রুপের সুরে বলল, অশোক! তোমাদের পালা, প্রস্তুত হয়ে যাও। আমি বললাম, এবার কিসের পালা? বলল, পাগল হওয়ার, তারপর মুসলমান হওয়ার। বললাম ঠোঁট বন্ধ কর। বলল, পত্রিকা পড়োনি? বললাম, কী এসেছে পত্রিকায়? সে তার ব্যাগ থেকে একটি উর্দূ সাহারা পত্রিকা বের করল এবং মুহাম্মদ আমের আর উমরের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী পড়ে শোনাল। আমরা রাগও হলাম ভয়ও পেলাম। আমি বললাম, উর্দূ পত্রিকা, মিথ্যা সংবাদও ছাপাতে পারে। সে দুটি হিন্দী পত্রিকা বের করে আমাকে দেখাল। তাতে ছোট আকারে দুটি খবর দেয়া ছিল। আমি উর্দূ পত্রিকার বিস্তারিত সংবাদটি আবার পড়তে বললাম। আমার

সাথীদ্বয় প্রচন্ড রেগে গিয়েছিল। পরামর্শ হল, ফুলাত গিয়ে জানতে হবে কেন তারা এমন মিথ্যা সংবাদ ছাপাল, সেইসাথে সংবাদিকদেরও মজা দেখাতে হবে। ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে হবে, নইলে বহুলোক ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

রামপুর থেকে আমরা মীরাঠের বাসে উঠলাম। মাওলানা সাহেবের ঠিকানা সংগ্রহ করে তার বাড়িতে গেলাম। মাওলানা সাহেব নামাযে গিয়েছিলেন। নামায পড়ে ফিরে আসলে এক ব্যক্তি বলল, ইনিই মাওলানা কালীম সাহেব। আমরা আগে থেকেই কিছুটা রেগে ছিলাম। কিছুটা কঠিন সুরে মাওলানা সাহেবকে পত্রিকা দেখিয়ে বললাম, সংবাদটি আপনি ছাপিয়েছেন? আপনি কিভাবে এই সংবাদ ছাপালেন? আমরা তিনজন একেবারে চাষার মত কর্কশ ভাষায় কথা বলছিলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব না জানি কোন দুনিয়ার মানুষ ছিলেন, অনেক নরম ভাষায় মহব্বত করে বললেন, ভাই আমার! আপনি আপনার রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছে এসেছেন। বললাম আপনার আমার, আমার আপনার এগুলো তো শহুরেদের ব্যাপার।

মাওলানা সাহেব বললেন, আচ্ছা বলুন কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আমরা রামপুর টান্ডাবাদলী থেকে এসেছি। মাওলানা সাহেব বললেন, ভায়েরা! এমন শীতের দিনে এতো দীর্ঘ সফর করে এসেছেন, কেমন ক্লান্ত হয়ে গেছেন! এটা আপনাদেরই বাড়ি, পরের ঘরে আসেন নি। যা জানতে চান বলবো। আগে তো বসুন, চা-নাস্তা করুন, খানা খান। সংবাদ আমরা ছাপাইনি তবে সংবাদ সত্য। আমরা কিছুটা শান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, আপনি এসব কী যা তা বলছেন। লোকদের ধর্মভ্রষ্ট করতে চাচ্ছেন। মাওলানা সাহেব বললেন, ঠিক আছে সত্য মনে হলে মেনে নিবেন অন্যথায় এ ব্যাপারে আমার কোনো জোরাজুরি নেই। আমের, উমরের মধ্য থেকে ঘটনাচক্রে মুহাম্মদ উমর নওমুসলিমদের একটি জামাআত নিয়ে ফুলাত এসেছিল। এদের মধ্যে নয় জন নওমুসলিম ছিল। আমীর না পাওয়ার কারণে মাওলানা সাহেব তাদেরকে ফুলাত ডেকে এনেছিলেন। এদের তিন জন ছিল হরিয়ানার। দুজন গুজরাটের আর চার জন ইউ.পির। তাদের দুজন আবার মন্দিরের সাধুও ছিল।

মাওলানা সাহেব একজন হাফেজ সাহেবকে ডেকে বললেন, উমর মিয়াকে ডেকে আনো। কিছুক্ষণ পরই মুহাম্মদ উমর উপস্থিত হল। মাওলানা সাহেব বললেন, যে দুজনের সংবাদ ছাপা হয়েছে তাদের একজন এই মুহাম্মদ উমর। আপনারা এর সঙ্গে কথা বলে আসল ঘটনা এবং সত্যতা জেনে নিন। উমর

ভাইয়ের সঙ্গে ছোট একটি কামরায় আমরা মুখোমুখি হয়ে বসলাম। মাওলানা তাকে ডাক দিয়ে কিছু কথা বুঝিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে উমর ভাইয়ের নিকট শুনেছি, মাওলানা সাহেব তাগিদ দিয়ে বলেছিলেন, এরা যত রাগই করুক তুমি সবর করবে এবং মহব্বতের সাথে নরম স্বরে রোগী মনে করে কথা বলবে। আর মনে মনে আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে। আমিও বাড়িতে গিয়ে দু'রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দুআ করছি।

কিছুক্ষণ পরেই ভরপুর নাস্তা এসে গেল। আমাদের সবারই শীত লাগছিল। উমর ভাই জোর করে দু'পেয়ালা চা পান করালেন। খুব খাতির করে আমাদের বুঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন, আদভানী সাহেবের রথযাত্রায় সানিপথ থেকে পানিপথ পর্যন্ত আমরা দুজনেই সামনে সামনে ছিলাম। ৩০শে অক্টোবর গম্বুজের উপরে আমাদের দুজনের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল। ইতোমধ্যে খানাও এসে গিয়েছিল। আমি উমরকে বললাম, এখন আমাদের কী করতে হবে? সে বলল, দুনিয়ার শাস্তি তো কিছুই নয়, মৃত্যুর পর মহা দিবসের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আপনাদের আমার কথা শোনা উচিত এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা তিনজন পরামর্শের জন্য বাইরে যেতে উদ্যত হলে উমর ভাই বললেন, আমি একটি কাজে বাইরে যাচ্ছি আপনারা ভেতরেই বসুন।

আমরা তিনজন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের মুসলমান হয়ে যেতে হবে। তারপর উমর ভাইকে ডেকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। উমর ভাই বললেন, তিনি দু'রাকাআত নামায পড়ে সত্য মালিকের নিকট আমাদের জন্য দু'আ করতে গিয়েছিলেন আর মাওলানা সাহেবও আমাদের জন্য দুআ করতে ভেতরে গিয়েছেন। উমর ভাই আনন্দিত হয়ে মাওলানা সাহেবকে ডেকে আবেদন জানালেন, এই তিন ভাইকে কালিমা পড়িয়ে দিন। মাওলানা সাহেব আমাদের কালিমা পড়িয়ে দিলেন।

আহমদ ভাই! ইতোপূর্বে আমাদের মনের ওপর দিয়ে যে কী ঝড় বয়ে যেতো তা বলে বোঝানো যাবে না কিন্তু যখনই মাওলানা সাহেব আমাদের কালিমা পড়িয়ে তাওবা করালেন, মনে হল, কাঁটার একটি পোশাক যা এতদিন আমাদের শরীরে জড়ানো ছিল এক মুহূর্তে খুলে গেল। ভেতরের ভয় যেন কর্পুরের মত উবে গেল। কেমন যেন বিপদসংকুল স্থান থেকে আমরা এক সুরক্ষিত কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। মাওলানা সাহেব আমার নাম রাখলেন মুহাম্মদ ইসহাক। যোগীশের নাম মুহাম্মদ ইয়াকুব আর যোগীন্দ্রের নাম মুহাম্মদ ইউসুফ। সেই সাথে হযরত ইউসুফ আ., হযরত ইসহাক আ., আর

হযরত ইয়াকুব আ.-এর ঘটনাও শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, কাল থেকে ফোন আসছিল, সংবাদ তো ছাপা হয়েছে, কোনো ফাসাদ না শুরু হয়ে যায়। বন্ধুদের আমি বলেছিলাম, ভয় পাবেন না, সংবাদ আমরা ছাপাইনি। আল্লাহ তাআলা ছাপিয়ে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই এতে কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। এদিকে আল্লাহ তাআলা এতো বড় কল্যাণ করে দিলেন। মাওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। মুবারকবাদ দিলেন এবং তিনজনকেই 'আপকী আমানত আপকী সেবা মে' উপহার দিলেন।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : সকালে নওমুসলিমদের জামাআতে আমাদেরও অনুর্ভুক্ত করে দেয়া হল। বুলন্দশহরের এক মুফতী সাহেব সাল লাগাচ্ছিলেন, তাকে আমাদের আমীর বানানো হল। আর দুজন লোককে শিক্ষক হিসেবে শামিল করা হল। ১৫ জনের জামাআত একদিন মীরাঠ রইল। আমরা তিনজনই মীরাঠ গিয়ে সার্টিফিকেট বানালাম। তারপর জামাআত আগ্রায় পাঠিয়ে দেয়া হল। আগ্রা মথুরায় আমাদের চল্লিশ দিন সময় লাগল। জাআমাতে সময় ঠিকই লেগেছিল, তবে বেশীর ভাগই ছিল নতুন। দু-একবার ঝগড়াঝাটিও হল। একদিন ঝগড়া করে রাতের বেলা আমরা পাক্কা এরাদা করলাম, সকাল হতে না হতেই চলে যাবো। রাতে ইউসুফ স্বপ্নে দেখল, মাওলানা সাহেব বলছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদের কীভাবে হেদায়াত দিয়েছেন। এরপরও আপনারা আল্লাহর রাস্তা থেকে পালাতে চাইছেন? ঘুম থেকে উঠে আমাদের দুজনকে সে স্বপ্নের কথা জানাল। আমরা ঠিক করলাম, জান চলে গেলেও চিল্লা পূর্ণ করেই মাওলানা সাহেবকে মুখ দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের চিল্লা পূর্ণ হয়ে গেল।

প্রশ্ন : জামাআত থেকে ফিরে আসার পর কী হল?

উত্তর : মাওলানা সাহেব আমার নিকট জানতে চাইলেন, এখন আপনাদের কী ইচ্ছা? এবং পরামর্শ দিলেন এক্ষুণি বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আমরা তাকে বললাম, আমরা শিশু নই। ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর সত্যকে মেনে নেয়া আমাদের মৌলিক অধিকার। আমরা বাড়িতে গিয়ে পরিবারের ওপর মেহনত করবো। তাছাড়া আমাদের কোনো প্রকার আশংকাও নেই। মাওলানা সাহেব বোঝানোর পরও আমরা গ্রামে ফিরে গেলাম। এলাকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। খবর রটেছিল, মুসলমানরা ওদের হত্যা করে ফেলেছে। আমরা বাড়ির লোকজনকে সাফ সাফ সব কথা বলে দিলাম। তারপর আর কী, আত্মীয় স্বজনের মাতম শুরু হয়ে গেল। বারবার সালিশ

বসল। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনেরা আসল। একবার সাংবাদিকও এসেছিল। গ্রামের লোকজন তাদের পয়সা দিয়ে দিয়ে ফেরত পাঠাল এবং কখনই এই সংবাদ ছাপাবে না বলে রাজী করাল।

আমার পরিবারের ওপর আত্মীয়-স্বজন চাপ সৃষ্টি করল, ছেলেকে যে কোনো মূল্যে সামাল দাও। কিন্তু আল্লাহ শোকর, তাদের বিরোধিতা আমাদের আরও পাকা করে তুলল। আমাদের সঙ্গে অনেক কঠোর আচরণও করা হল। স্ত্রী-সন্তানদের তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হল। আমরা বাড়ি ত্যাগে বাধ্য হলাম। ফুলাত যেতে আমাদের লজ্জাবোধ হল যে, মাওলানা সাহেবের কথা শুনলাম না। প্রথমে আমরা দিল্লী গেলাম। তারপর এক ব্যক্তি আমাদের পাটনা নিয়ে গেল। পাটনায় আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিছুদিন রিক্সাও চালিয়েছি। প্রয়োজনে মজদুরীও করেছি। তারপর এক ব্যক্তি আমাকে কোলকাতায় তার কোম্পানীতে নিয়ে যান। অতঃপর আমার দুই সাথীও কোলকাতা চলে আসে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কষ্টের দিন বেশী দীর্ঘ হয় নি। এখন আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এই দিনগুলোতে আমরা তিনজনই পালাক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভেও ধন্য হয়েছি। এতে আমরা খুব সান্ত্বনা লাভ করতাম। মাওলানা সাহেবের কথা আমাদের খুব মনে পড়ে, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আল্লাহর দয়া, আজ সাক্ষাত হয়ে গেল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নয়-দশ মাসের সমস্ত কষ্ট আর কষ্ট মনে হল না।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেছিলেন কি?

উত্তর : ওদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। মা আর ভাই-বোনের সঙ্গে কথা হয়। আব্বুর সাথে অবশ্য হয়ে ওঠে না। ইনশাআল্লাহ! সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য আমার স্ত্রী আর বাচ্চা দুটি এখনো শ্বশুরালয়েই আছে। এক মুসলমান মহিলাকে সেখানে পাঠিয়ে ছিলাম। স্ত্রী বলে দিয়েছে, "যখন যেখানে প্রয়োজন যেতে প্রস্তুত আছি। ভাবীদের সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছে না। এক স্বামীর সঙ্গে থেকেই মরতে চাই" আজকে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। এখন কোনোভাবে ওদের সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।

প্রশ্ন : দাওয়াতের ব্যাপারে আব্বু আপনাকে কোনো কথা বলেননি? এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : মাওলানা সাহেব আমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা বাবরী মসজিদ শহীদকারীদের জন্য ফিকির করবো এবং করসেবকদের ওপর কাজ করবো। সেই সেঙ্গ তাদের জন্য আর পরিবারের জন্য দুআও করবো। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হয়েছে, আমি শিগগিরই কোলকাতা থেকে জাআমাতে চিল্লা লাগাবো এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট মঞ্জুর করানোর দুআ করবো। তারপর চিল্লা থেকে ফিরে এসে পরিবার এবং করসেবকদের ওপর কাজ করবো।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্যই অত্যাবশ্যক। করো ইসলাম বিদ্বেষ দেখে একথা ভাবা যাবে না যে, তার আর ইসলাম গ্রহণের আশা নেই। সকল ইসলাম বিদ্বেষী ভুল বুঝে কিংবা অজ্ঞতার কারণে ইসলামের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করছে। এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা বজরং দল করতাম। ইসলাম আর মুসলমান ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর সেই আমরাই এখন ভাবি, আল্লাহ না করুন যদি হিন্দু হয়ে মারা যেতাম (ঝর ঝর করে কেঁদে দিয়ে) তাহলে আমরা ধ্বংসের কোনো অতল গহ্বরে পড়ে যেতাম। আল্লাহ তাআলার কতটা অসন্তুষ্টি আর জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি আমাদের সহ্য করতে হতো।

প্রশ্ন : শোকরিয়া ইসহাক ভাই! আপনাদের তিনজনকেই শোকরিয়া। আপনাদের দুজনের সঙ্গে অন্য সময় কথা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর– ২০০৭

মুহাম্মদ সালমান (বানাওয়ারী লাল)-এর সাক্ষাৎকার

আমি চিন্তা করি, পৃথিবীতে প্রায় দুই বিলিয়ন অন্তত দেড় বিলিয়ন দলিত, কৃষ্ণাঙ্গ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে। ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই তাদের দুঃখ-শোকের চিকিৎসা। তাদের নির্যাতিত হওয়া থেকে কেবল ইসলাম রক্ষা করতে পারে। মুসলমানরা যদি তাদের ইসলামের ইনসাফ ও সাম্যের পরিচয়টুকু করিয়ে দিতে পারে তাহলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। আর সকল দলিত, নমিত সমাজের মানুষ উচুঁদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমার মতই অনুভব করবে যে, তাদের ফাঁসি থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এজন্য দুই বিলিয়ন মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়া করতে হবে। ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মুহাম্মদ সালমান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আল্লাহর শোকর, আপনি একেবারে যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা গতকালই মক্কা মুআযযমা থেকে ফিরেছি। আব্বু মক্কা মুআযযমায় আপনার কথা অনেক বলেছেন। আমাকে বলছিলেন, আমি যেন থানায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করি। আর আমাদের ম্যাগাজিন আরমুগানের জন্য একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

উত্তর : কারী সাহেব আমাকে বলেছিলেন, মানুষ যেখানে হজ্জ করতে যায় মাওলানা সাহেব সেখানে (মক্কা শরীফ) সফরে গিয়েছেন। ১৭ই আগস্ট দেশে ফিরবেন। গতকাল ফোন করে জানতে পেলাম, আপনারা ফিরে এসেছেন। সাক্ষাতের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরামর্শও করতে হবে। এজন্য রাত দেড়টায়ই দিল্লী পৌঁছে গেছি। মালিকের শোকর! দেখাও হয়ে গেল। মনটাও প্রশান্ত হল।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন?

উত্তর : আমার প্রথম জন্ম তো হয়েছিল মুজাফফর নগরের মালহোপুরা মহল্লায় এক দলিত বরং চামার পরিবারে। স্কুল সার্টিফিকেটে লেখা ছিল ৬ই আগস্ট ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ। আসল জন্মতিথির খবর চামারের ঘরে, তা-ও আবার পঞ্চাশ বছর পূর্বে কীভাবে পাওয়া যাবে। আমার পিতা বেচারা মজদুরী করতেন। পরে দুর্বল

হয়ে পড়লে সব্জি বিক্রি শুরু করেন। তার নাম ছিল অত্রসিং। তিনি আমার নাম রেখেছিলেন বানাওয়ারী লাল। আমাদের বাড়িতে পড়াশোনার প্রচলন ছিল না। কেবল আমার এক মামা এক ব্যাংকে দারোয়ানীর চাকুরী করতেন। তিনি ছিলেন অষ্টম শ্রেণী পাশ। এই মামাই আমাকে পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করেছেন। গোটা বংশে আমিই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করি। তারপর টাইপিং শিক্ষা করি। ফলে পুলিশে আমার ক্লার্কের চাকুরী হয়ে যায়। অত্যন্ত প্রতিকুল পরিবেশে আমি পড়াশোনা করি। স্কুলে এক হেডমাস্টার পন্ডিতজী ছিলেন। তিনি এমন অমানবিক আচরণ করতেন যে, কয়েকবার বিষ খাওয়ার ইচ্ছা করি। ক্লাশের একেবারে পেছনে বসাতেন। বড় বড় গালি দিতেন।

যা হোক, ২৫ বছরে একশ ছেষট্টিতম থানায় আমার বদলী হয়েছে। এখানকার রতনপুর থানায়ও কিছুদিন থেকেছি। বর্তমানে আপনাদের থানাতেই প্রধান লিপিকার পদে কাজ করছি। আর আমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে দুই মাস পূর্বে ১৮ই জুলাই।

প্রশ্ন : এটা তো আমাদের গোটা পরিবারই জানে তবুও আপনার এই জন্মের ব্যাপারে আপনার ভাষাতেই একটু বলুন। অর্থাৎ, আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি খুলে বলুন। আর এজন্য আপনাকে এক দীর্ঘ কাহিনী শোনাতে হবে।

উত্তর : আপনারা শুনে থাকবেন, বিহারের এক বড় ডাক্তারের মেয়ে মীরাঠ কলেজে পড়াশোনা করতো। থাকতো তার বড় বোনের বাসায়। এক মুসলমান ছেলের সঙ্গে মেয়েটার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছেলেটার নাম ছিল বেলাল। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকে। এক পর্যায়ে দুজন বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মেয়েটি একদিন বোনের বাসা ছেড়ে ছেলেটির কাছে চলে আসে যে, আমাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ কর।

ছেলেটা ছিল সরল সোজা আর ভীরু প্রকৃতির। সে অস্বীকার করে দিল, আমার পরিবার কিছুতেই তোমাকে বাড়ি তুলবে না। আর আমি যে কোথাও রাখবো সে সাধ্যও নেই। মেয়েটি মানল না। বলল, আমাকে বিয়ে না করলে আমি বিষ খাবো। ছেলেটি অপারগ হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে কয়েক জায়গায় বিবাহের জন্য গেল। কেউ রাজী হল না। কেউ তাদের ফুলাত যাওয়ার পরামর্শ দিলে তারা ফুলাত পৌঁছল। মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব পুরো ঘটনা শুনলেন। মেয়েটিকে খুব ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে

জানাল, আমার পরিবার রাজী হয়ে যাবে। আমার পিতা তো অর্ধেক মুসলমান। দৈনিক কুরআন শরীফ পড়ে। হযরত কালিমা পড়িয়ে তাদের বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং আইনী নিয়মকানুন পূর্ণ করতে বলে দিলেন। ছেলেটি ছিল সহজ সরল। সে বলল, এখন আমার কোনো ঠিকানা নেই। আমার নানা কোলকাতা থাকেন। ভেবেছিলাম সেখানে চলে যাবো। কিন্ত ফোনে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা সাফ না করে দিল। আমার পরিবার আমাকে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দিবে না। মাওলানা সাহেব উত্তর দিলেন, তোমার পরিবার তোমাকে না রাখলে আমরা কিভাবে রাখবো? সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মাওলানা সাহেবের দয়া হল। তিনি তাদের দু-চারদিন ফুলাত রেখে দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন।

মেয়েটির জন্য একটি রূম ভাড়া করে দিলেন। আর তাঁর বোনকে মেয়েটিকে ইসলাম শিখানোর দায়িত্ব দিলেন। মেয়েটির নাম রাখলেন, সানা। মাওলানা সাহেবের বোনের ওখানে মেয়েটির ইসলাম বুঝে এসে গেল। ইসলাম এখন তার কাছে বেলালের চেয়েও প্রিয় হয়ে গেল। মেয়েটির বড় বোন বেলাল এবং তার পরিবারের বিরূদ্ধে থানায় অপহরণের মামলা করল। বিহারের এক সিনিয়র আই.পি.এস অফিসার ছিল মেয়েটির আত্মীয়। তিনি মীরাঠের এস.এস.পির ওপর মেয়েটিকে খুঁজে বের করার প্রচন্ড চাপ দিলেন। পুলিশ বেলালের পিতা আর পরিবারের লোকজনকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। মাওলানা সাহেবের বারবার চাপ দেয়া সত্ত্বেও বেলাল নিজের অলসতা ও ভীরুতার কারণে আইনী প্রক্রিয়া শেষ করতে পারল না। মেয়েটি থানায় ফোন করল, আমি একজন গ্রাজুয়েট। আমি সেচ্ছায় ওকে বিবাহ করেছি। কিন্তু পুলিশের উপর এর কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। বেলালের বড় ভাই কোনো মতে মাওলানার নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন করে বলল, যেভাবেই হোক বেলালের সন্ধান দিন। আমরা শুধু আইনী কিছু কাগজ করব যাতে থানায় দেখিয়ে পরিবারকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। মাওলানা সাহেব তখন মুম্বাই ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, দুদিন পর দিল্লীর এক মসজিদে বেলাল থাকবে। আপনারা সেখানে গেলে আমার বোন জামাই আপনাদের বেলালের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিবে।

বেলাল যোহরের নামাযে মসজিদে গেল না। বেলালের ভাই খোঁজ করতে করতে মাওলানা সাহেবের দিল্লীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে বাড়ির লোকজন বলল, আমরা বেলাল বলে কাউকে চিনি না। সে মাওলানা সাহেবকে ফোন করলে মাওলানা সাহেব কোনওভাবে বেলালকে খোঁজ করে তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। পুলিশের ওপর চাপ পড়লে তারা বেলালের সেই ভাইকেও ধরে নিয়ে গেল। তাদের সবার ওপর তারা চাপ দিল এবং লোভ দেখাল, আমরা শুধু মেয়েটিকে চাই। মেয়েটির সন্ধান দিলে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। বেলালের ভাই নিজেকে মুক্ত করার লোভে থানা ইনচার্জকে বলে দিল, মেয়েটিকে দিল্লী পাওয়া যেতে পারে। তারা তাকে এবং মেয়ের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা দিল্লী পৌঁছল। ১৭ই জুলাই রাত সাড়ে তিনটায় বাটালা হাউজে মাওলানা সাহেবের বাড়িতে পুলিশ হানা দিল। মাওলানা সাহেব কোথাও সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ বাড়ি তল্লাশি করল এবং মাওলানা সাহেবের নিকট বেলালের ঠিকানা জানতে চাইল। মাওলানা সাহেব বললেন, বেলাল তার কাছে নেই। গতকাল তার ফোন এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, আপনার কামরা তো খালি করে দিয়েছি এখন কী করব? আমি সফর থেকেই ফোনে তাকে পাঞ্জাবের এক বন্ধুর নাম্বার দেই যে, চেষ্টা করে দেখো। হয়তো তিনি তোমাকে কোনো ঘর ভাড়া বা চাকুরী দিতে পারেন।

পুলিশ মাওলানা সাহেবকে জামেআ নগর চৌকিতে নিয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে মীরাঠ থানায় রওয়ানা হয়ে গেল। তার মোবাইলটিও কব্জা করে নিল। মাওলানা সাহেব বলেছেন, জীবনে সেবারই প্রথম পুলিশের মুখোমুখি হতে হল। সাথে সাথে আমার খেয়াল হল, দাওয়াত সব সমস্যার সমাধান। মাওলানা সাহেব দাওয়াতী কথা শুরু করে দিলেন। থানা ইনচার্জ মোতলা সাহেব আর মাওলানা সাহেব এক গাড়িতে ছিলেন। মাওলানা সাহেব থানা ইনচার্জের নিকট জানতে চাইলেন, আপনারা শুধু পুলিশেরই লোক, না মানুষও। তিনি বললেন, আমরা প্রথমে মানুষ, তারপর পুলিশ। মাওলানা! আমরা উত্তর খন্ডের পাহাড়ী মানুষ। উত্তর খন্ডের পাহাড়ীরা প্রথমে মানুষ হন।

মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি আমার দিকে তাকান। আমার চেহারা থেকে কোনো অপরাধ ঝরে পড়ছে বলে মনে হয়? আমি কি কোনো মেয়েকে অপহরণ করতে পারি? ওসি সাহেব বললেন, স্যার আমরা তো আপনার কোনো

অনাদর (বেইজ্জতী) করিনি। আপনি পুলিশকে সহযোগিতা করুন। আমাদের শুধু মেয়েটিকে চাই। আমাদের ওপর প্রচন্ড চাপ রয়েছে। মাওলানা সাহেব বললেন, একজন ভদ্র মানুষকে বিনা অপরাধে রাত তিনটায় থানায় নিয়ে যাচ্ছেন, এটাও কোন আদর? মাওলানা সাহেব মুরাদনগর মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন। ওসি সাহেব হাত জোড় করে বললেন, স্যার! আমি আপনাকে মসজিদে নামায পড়তে দিতে পারব না, আপনি রাস্তায় কোথাও নামায পড়ে নিন, গাড়িতে চাটাই আছে। মাওলানা সাহেব বললেন, নামায তো আপনাকেও পড়তে হবে। একদিন মালিকের সামনে আপনাকেও যেতে হবে। সেখানে প্রশ্ন করা হবে, নামায কেন পড়োনি? মাওলানা সাহেব তাকে ইসলাম সম্পর্কে বলা শুরু করলেন। থানায় পৌঁছলে ওসি সাহেব মাওলানাকে চেয়ারে বসিয়ে এক সেপাইকে চা বিস্কুট আনতে বললেন। হযরত নিষেধ করলেন। বললেন, আমরা পুলিশের চা পান করি না। কিন্তু ওসি সাহেব বললেন, চা ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা কিভাবে পয়সা দিয়ে দেই। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই চা গ্রহণ করুন। অন্যথায় চায়ের পয়সা নিজের তরফ থেকেই দিয়ে দিন, তবু চা' টা গ্রহণ করুন।

মোতলা সাহেব গোসল-নাস্তা ইত্যাদি সারতে মীরাঠ বাড়ি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা সাহেবের বোন জামাই আর দুজন উকীল আসলেন। মাওলানা সাহেব তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মাওলানা সাহেব বলেছেন, ইতোমধ্যে থানার এক সান্ত্রী এসে বলল, মাওলানা সাহেব আপনি চেয়ার নিয়ে ভেতরে গিয়ে একাকী বসুন। মাওলানা সাহেব ভাবলেন, থানায় নিজের সম্মান রক্ষা করতে হবে। তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

আসলে আমি মজলুমের ওপর আমার মালিকের দয়ার সঞ্চার হয়েছিল। তিনি কুয়াকে গ্রেফতার করে তৃষ্ণার্তের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

আমি আমার এক সেপাইর সঙ্গে বিতর্ক করছিলাম যে, সব কাজ তো আমরাই করি। তোমাদের কাছে শুধু বুদ্ধি আছে। অতঃপর মাওলানা সাহেবকে লক্ষ করে বললাম, মিয়া সাহেব! মন্দির আমরা বানাই। মসজিদও আমরা বানাই। সব কাজতো আমরাই করি। কিন্তু আমাদের সেখানে ঢুকতেই দাও না। মাওলানা সাহেব বললেন, মন্দিরের কথা আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মসজিদের ব্যাপারে একথা বলবেন না, আপনি কোনো মসজিদে ইমামের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালে আপনাকে কেউ বাঁধা দিবে না। আপনি হিন্দু পরিচয়েই দিল্লীর জামে মসজিদে চলে যান কেউ আপনাকে ইমাম সাহেবের

পেছনে নামায পড়তে বাধা দিবে না। আমি আরয করলাম, মাওলানা সাহেব! আমরা আসলে চামার মানুষ। বলতে পারবো না আমরা ঠিক কতটা দুঃখী। মাস্টার সাহেব স্কুলে সবার পেছনে বসাতেন। তার আওয়াজ ছিল খুবই ক্ষীণ। প্রশ্ন করলে দাঁত-মুখ খিচিয়ে উঠতেন। কতবার মনে হয়েছে, মালিক কেন আমাদের হিন্দু করে বানালেন। কখনও মনে হয়েছে, বৌদ্ধ বা মুসলমান হয়ে যাই।

মাওলানা সাহেব বললেন, বৌদ্ধ হয়ে তো আম্বেদকর সাহেবেরই সমস্যার সমাধান হয়নি। তিনি স্বয়ং লিখেছেন, মুসলমান হওয়াই সমস্যার সমাধান ছিল। বললাম, আমাকে মুসলমান করে দিবে এমন কাউকে তো পাই না। মাওলানা সাহেব বললেন, এইতো আমি আজ এসে গেছি। বললাম, মাওলানা সাহেব! ব্যাপারটাকে আপনি ঠাট্টা হিসেবে নিচ্ছেন, আমার তো হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, আমি তো সিরিয়াসলি বলছি। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি আপনার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি সিরিয়াস। তারপর বললেন, কালিমা পড়ে নিন। لا اله الا الله محمد رسول الله জলদি পড়ুন, মুসলমান হয়ে যাবেন। বললাম, এটা তো আমার মুখস্থ। মাওলানা সাহেব বললেন, আমাকে শোনান। আমি শোনালাম। মাওলানা সাহেব বললেন, এখন এটাকে মুসলমান হওয়ার নিয়তে সাচ্চা দিলে পড়ুন। একথা খেয়াল করে পড়ুন, কুরআন যে মালিকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে তার শপথ নেয়ার জন্য পড়ছি। আর সেই অবতীর্ণ কিতাবকে মেনে চলব।

মাওলানা জোর দিলে আমি পড়ে নিলাম। মাওলানা বললেন, আপনি মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। বললাম, এখন আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য কী করতে হবে। মাওলানা সাহেব বললেন, মুসলমান হওয়ার জন্য আর কিছু করতে হবে না। তবে ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে, নামায শিখতে হবে, পরিচ্ছন্নতার ইসলামী নিয়ম জানতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম এজন্য আমাকে কোথায় যেতে হবে? বললেন, ফুলাত চলে আসুন। আমি বললাম, রতনপুরের ফুলাত? যেখানে বড় একটা মাদরাসাও আছে সেখানকার মাওলানা সাহেবও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মানুষ? মাওলানা সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সেখানেই। তারপর বললেন, ফোন নম্বর লিখে নিন। তবে আমার উপস্থিতিতে আসলে ভালো হয়।

আহমদ সাহেব! আমি বর্ণনা করতে পারবো না, কালিমা পড়ে মনে হল, এক সংকীর্ণ ও অপমানকর যিন্দেগী থেকে নতুন এক জগতে জন্ম নিলাম। মাওলানা সাহেব বলেছেন, তিনি যেই আমাকে কালিমা পড়ালেন অমনিই ওসি সাহেবের নিকট হোম সেক্রেটারী, নেতৃবৃন্দ আর অফিসারদের ফোন আসা শুরু হল। তিনি থানায় ফোন করে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বললেন, মাওলানা সাহেবকে সম্মানের সাথে অফিসে বসাও। নাস্তা ইত্যাদি করাও, আমি আসছি।

ওসি সাহেব এসে গেলেন। মাওলানা সাহেবের কাছে অনেক ওজর পেশ করলেন যে, পুলিশের আসল অবস্থা জানা ছিল না। আপনি সসম্মানে যেতে পারেন। আপনার নিকট অনুরোধ, আপনি এ ব্যাপারে আইনী কোনো ব্যবস্থা নিবেন না। আমার ঠিক এমন মনে হচ্ছিল, মালিক আমাকে দুনিয়ার জুলুম ও সংকীর্ণতা থেকে বের করার জন্য মাওলানা সাহেবকে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাওলানা নিজেও বলেন, আপনি আমাকে এমনিই ডেকে নিতেন। রাত তিনটার সময় কালিমা পড়ার জন্য একেবারে গ্রেফতার করেই নিয়ে গেলেন? তো আমি কোন্ মুখে আমার প্রিয় মালিকের শোকর আদায় করে শেষ করবো।

প্রশ্ন : এরপর ওসি সাহেবের কী হল?

উত্তর : পত্রিকাগুলোতে মাওলানা সাহেবের গ্রেফতারের সংবাদ বেরুল। প্রতিবাদে ফোনের পর ফোন আসা শুরু হল। ওসি আর ইন্সপেক্টরকে ট্রান্সফার করা হল। বরং তাদের পদাবনতি হল। প্রায় গোটা থানাই রদবদল হয়ে গেল। আমারও ট্রান্সফার হয়েছিল। ওসি সাহেব তার সামানপত্র নিতে আসলে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বললেন, দিল্লী থেকে আসার পথে মাওলানা সাহেব গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে যখন বললেন, আমার মুখের দিকে তাকান, এখানে কোনো অপরাধ দৃশ্যমান? আমি বলে বোঝাতে পারব না, আমার ওপর যেন বজ্রপাত হল। আমার মন বলে উঠল, তুমি কোনো মহান মানুষের ওপরই হাত দিয়েছো। পরবর্তীতে অফিসারদের চাপ থেকে বাঁচার জন্য মাওলানা সাহেবের নামে এফ.আই.আর এ লিখে তো দিয়েছি যে, মাওলানা সাহেবের ব্যাপারটা জানা ছিল। কিন্তু বানাওয়ারী লাল! আমার মনে হয়, সেই মেয়ে মুসলমান হয়েছে তো, আমাদের সকলেরই মুসলমান হয়ে যেতে হবে। আমি তাকে মাওলানা সাহেবের কিতাব আপকী আমানত হাদিয়া

দিয়েছিলাম। তিনি ফোন করেছিলেন যেন ইসলামের পরিচিতিমূলক আরও কিছু কিতাব পাঠিয়ে দেই।

প্রশ্ন : তারপর আপনি ইসলাম জানার এবং শেখার জন্য কী করলেন?

উত্তর : প্রথমে আমি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য এক দিনের ছুটি নেই। ধুতি পরে তিলক লাগিয়ে দিল্লীর জামে মসজিদে যাই। এগারোটার সময় সেখানে পৌঁছি এবং নামাযের সময় জেনে নেই। লোকজন বলল, আড়াই ঘণ্টা পর একত্রে নামায হবে। তবে একা আপনি যখন ইচ্ছা, পড়ে নিতে পারেন। আমি ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে গিয়ে বসে পড়লাম। দুই ঘণ্টা পর আযান হল। লোকজন আমাকে বলল, এখনই নামায হবে, আপনি অল্পক্ষণের জন্য চলে যান। আমি বললাম, আমি একজন চামার। হিন্দুরা কেউ আমাকে মন্দিরে যেতে দেয় না। আজ মসজিদ দেখতে এসেছি। আযানদাতা মিয়াজীর জন্য একটি জায়নামায বিছানো ছিল। তিনি সেটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে আমাকে বললেন, আপনি এতে বসে পড়ুন। আমি ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়লাম। লোকেরা আমার চামার হওয়ার কথা শোনে খুব খুশী হল। কয়েকজন আমার সঙ্গে কোলাকুলি করল।

ইসলামের সত্যতার প্রতি আমার একীন জমে গেল। বাড়ি ফিরে স্ত্রী-সন্তানদেরকে সব কিছু খুলে বললাম। তারাও খুব খুশী হল। আমি মাওলানা সাহেবের নিকট থেকে সময় নিয়ে চার সন্তান আর স্ত্রীকে ফুলাত এনে কালিমা পড়িয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার বংশের লোকজন কোনো বিরোধিতা করেনি?

উত্তর : আমাদের বংশের লোকজন মুজাফফর নগর থাকে। তাদের সঙ্গে আমাদের খুব একটা যোগাযোগও হয়ে ওঠে না। তবে আমার একীন, সত্য বুঝে আসলে তারা বিরোধিতার পরিবর্তে ইসলামের ছায়াতলে এসে সীমাহীন খুশীই হবে। আমি নিজেই অনুভব করি, আমাকে যেন ফাঁসির আদেশ থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : দ্বীন শেখার জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

উত্তর : মাওলানা সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। ইনশাআল্লাহ শিগগিরই ছুটি নিয়ে জামাআতে অথবা কোনো মাদরাসায় চার মাস সময় লাগাবো। আমি নাম পরিবর্তন করারও আবেদন করেছি। বিভিন্ন কিতাব পড়া আরম্ভ করেছি। মাওলানা সাহেব আমাকে হিন্দিতে পাওয়া যাবে এমন পঞ্চাশটি

কিতাবের লিস্ট দিয়েছেন। পঁচিশটি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি লাইন পড়েই মালিকের কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াতে ইচ্ছে করে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আমি এখনও অল্প বয়স্ক বরং শিশু। আমার বয়স মাত্র দুই মাস। দুই মাসের শিশু কিছু বলতে পারে? তবে আমি চিন্তা করি, পৃথিবীতে প্রায় দুই বিলিয়ন অন্তত দেড় বিলিয়ন দলিত, কৃষ্ণাঙ্গ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে। ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই তাদের দুঃখ-শোকের চিকিৎসা। তাদের নির্যাতিত হওয়া থেকে কেবল ইসলাম রক্ষা করতে পারে। মুসলমানরা যদি তাদের ইসলামের ইনসাফ ও সাম্যের পরিচয়টুকু করিয়ে দিতে পারে তাহলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। আর সকল দলিত, নমিত সমাজের মানুষ উচুঁদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আমার মতই অনুভব করবে যে, তাদেরকে ফাঁসি থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এজন্য দুই বিলিয়ন মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়া করতে হবে। ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

প্রশ্ন : আপনি কিন্তু আপনার ইসলামী নামটি বলেন নি?

উত্তর : মাওলানা সাহেব আমার নাম মুহাম্মদ সালমান রেখেছেন। নামটি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা সালমান ভাই! আপনি হাসি-ঠাট্টায় হেদায়াত পেয়ে গেছেন।

উত্তর: আপনারও অনেক অনেক শুকরিয়া। মাওলানা সাহেব! আপনি বলছেন, আমি হাসি-ঠাট্টায় হেদায়াত পেয়ে গেছি। আমার আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করে এক মহান দা'য়ীর সম্মানকে খাটো করে আমার জন্য গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি খুব আনন্দ পাই, দুনিয়াবাসী আমাকে তুচ্ছ মনে করে, নীচু মনে করে তো কী হয়েছে, আমার মালিক তো আমাকে এতোটাই ভালোবাসেন। স্বয়ং মাওলানা সাহেব বলছিলেন, আপনার কালিমা পড়ার পর আমাকে ওসি সাহেবের এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়াতে রাগের পরিবর্তে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআও করেছি। আয় আল্লাহ! এক ব্যক্তির ঈমান আনার জন্য আমাকে যদি বহু বছরও জেল খাটাতে হয় তাতেও আমি গৌরববোধ করব। সে তুলনায় এক পরিবারের ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েক ঘণ্টা তো খুবই সস্তা।

প্রশ্ন : একটি কথা জানার রয়ে গেছে। আপনি আপনার বংশীয় লোকদের জন্য কী কোনো চিন্তা ভাবনা করেছেন? আপনার তো তাদের মধ্যে কাজ করা উচিত। এখন তো আপনিও একজন মুসলমান। আপনারও তো যিম্মাদারী রয়েছে?

উত্তর : একেবারে খাঁটি কথা। মাওলানা সাহেব প্রত্যেক সাক্ষাতে আমাকে শুধু এ ব্যাপারেই জোর দিয়েছেন আমি 'আপকী আমানত, ও 'আম্বেদকর আওর ইসলাম' কিতাব দুটি এক এক হাজার কপি ছাপিয়েছি। আমার ধারণা, শুধু হাজার নয় আমাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ লোক উঁচু-নিচুর অত্যাচার আর ফাঁসি থেকে রেহাই পেয়ে ইসলামে দাখেল হবে। আপনিও দুআ করুন, আমাকেও ইসলাম সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করতে হবে। আমি কুরআন পড়াও শুরু করে দিয়েছি।

প্রশ্ন : মুবারক হোক, মাশাআল্লাহ।

উত্তর: ব্যস, আপনি শুধু দুআ করবেন।

প্রশ্ন : সেই সানা আর বেলালের মামলা মোকাদ্দমা আর বেলালের পিতামাতার পরবর্তী কাহিনী আপনার জানা আছে?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, সেটাও বেশ চমকপ্রদ ঘটনা।

প্রশ্ন : একটু বলুন!

উত্তর : পুলিশ বেলালের পিতা, ভাই, বোন জামাই আর তার মীরাঠের কামরা ভাড়াদাতা এবং সম্ভবত তার বোনকেও এক সপ্তাহ পর্যন্ত আটক করে রাখে। ভাড়াদাতা বাড়ির মালিককে তো সুপারিশের ভিত্তিতে আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। এদিকে হযরত মাওলানাকে থানায় নিতেই চারদিক থেকে অফিসারদের ফোন আসা শুরু হয়ে যায়। এতে ঘাবড়ে গিয়ে থানাওয়ালারা সবাইকে ছেড়ে দেয়। এলাহাবাদ হাটকোর্ট থেকে এফ.আই. আরের বিবরণীর ওপর ইতোমধ্যে লিস্টেও নেয়া হয়েছিল। জুলাইয়ের তেইশ তারিখে মেয়ের বক্তব্যের শুনানি ছিল। মেয়ের পিতা গোটা টিম নিয়ে এলাহাবাদ উপস্থিত হয়। তাদের চেষ্টা ছিল, আদালতের বাইরে থেকে মেয়ে নিয়ে চম্পট দিবে। ঘটনাক্রমে আগের রাতেই মেয়েটি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। বক্তব্য দেয়ার কোনো অবস্থা তার ছিল না। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বোনের ওখানে তাকে এমন সমাদর করা হয়েছে যে, ইসলাম তার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। সে জীবন বাজী রেখে হাটকোর্ট পৌঁছে। পথিমধ্যে অজ্ঞানও হয়ে পড়ে। কোর্টে গিয়ে বক্তব্য দেয়ার পূর্বে সে তার পরিবারের লোকজনের দিকে তাকিয়েও

দেখেনি। কোর্টে সে এমন বয়ান পেশ করে, আদালত পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে পড়ে। সে বলছিল, আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, শিক্ষিতও বটে। ইসলাম ধর্মকে জেনে বুঝেই মুসলমান হয়েছি। তারপর স্বেচ্ছায় নিজের পছন্দের পাত্রকে বিবাহ করেছি। আমার পরিবার অনর্থক লোকজনকে পেরেশান করছে।

মেয়ের পিতা অনেক অনুরোধ করেছিল, মেয়েটিকে মাত্র তিনদিনের জন্য আমাদের নিকট দিয়ে দিন। কিন্তু মেয়ে রাজী হল না। বলল, সেখানে গেলে আমার ঈমান আশংকার মধ্যে পড়ে যাবে। বক্তব্য শেষে শুনানি হল। সে তার পিতাকে ফোন করে বলল, ড্যাডি! আপনি নিজেই তো সব সময় ইসলামের কথা বলতেন। নিয়মিত কুরআন পড়তেন। এখন আমি মুসলমান হয়েছি আর আপনি বিরোধিতা শুরু করেছেন। এরপর সে তার পিতাকে মুসলমান হয়ে যেতে বলে এবং মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলে। শুনেছি তিনি মাওলানা সাহেবের মক্কা মুআযযামা থেকে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছেন এবং মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে উন্মুখ হয়ে আছেন। আমার তো মনে হয়, আল্লাহ তাআলা সানার পরিবারকে হেদায়াত দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। নইলে এ ধরনের কেইসে কোনো মেয়ের পিতা এভাবে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে? মাওলানা সাহেব বলছিলেন, সে-ও তো আমাদের ভাই। যতোটুকু সুযোগ হয় তার সঙ্গেও আমরা কল্যাণ ও সহমর্মিতার আচরণ করবো।

প্রশ্ন : বেলালের পরিবারের অবস্থা কি আপনার জানা আছে?

উত্তর : বেলালের ভাই গওহর রাতের বেলা পুলিশকে মাওলানা সাহেবের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। সে নিজের ভুলের জন্য খুবই অনুতপ্ত হয়। শুনেছি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে সে দিল্লী গিয়েছিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছে। মেয়েটির নিজের জীবন বিপন্ন করে এভাবে বর্ণনা দেয়ায় বেলালের পরিবার অনেক প্রভাবিত হয়েছে। তারা প্রথামত তাকে ঘরেও তুলে নিয়েছে। শুনেছি, বর্তমানে তাকে আপন মেয়ের চেয়েও বেশী আদর করে। সানা তাদের বাড়িতে দ্বীনদারীর পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সবাই নামাযে অভ্যস্ত হয়েছে এবং বেশ ভালো মুসলমানে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন : এই সব বিস্তারিত কাহিনী আপনি কিভাবে জানলেন?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পর এ ব্যাপারে আমার একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। আমি খোঁজ নিতে শুরু করি, এই কেইসের ফলে কে কে ইসলামের

কল্যাণ লাভ করেছে। মাওলানা সাহেব চারটি সাক্ষাতেই এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সত্যিকার মুসলমান যেখানে যায় সেখানেই কল্যাণের কাজ করে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিল, বন্ধু তো বন্ধুই শত্রুকেও তিনি কল্যাণকামিতা থেকে বাদ রাখতেন না। সত্যিকার কল্যাণকামিতা হল, মুসলমান যেখানে যাবে ইসলামের প্রসার ঘটিয়ে আসবে এবং দা'ঈ পরিচয়ে অবস্থান করবে। যেখানে যাবে সেখানেই দাওয়াতের কল্যাণ ছড়িয়ে দিবে এর নাম হল দায়ী। মাওলানা সাহেব বলেছেন, আমরা সেই রহমতময় নবীর উম্মত। ভেতর থেকে না হলে অন্তত বাহ্যিকভাবে দাঈ হওয়ার চেষ্টা করবো। এজন্যই আমি সবখানে শুধু দাওয়াত দাওয়াত করতে থাকি। আল্লাহ তাআলা এই নিষ্প্রাণ ডাকাডাকির ফলে নবীর অনুকরণের সাদৃশ্যের কারণে হয়ত এর মধ্যে প্রাণ ও হাকীকতও সৃষ্টি করে দিবেন।

মাওলানা সাহেব বলেছেন, আপনি লক্ষ্য রাখুন, আমার কয়েক ঘণ্টা থানায় থাকাতে আল্লাহ তাআলা কত লোককে কুফর থেকে বের করে এনেছেন। এজন্যই আমি চারদিকে নজর রেখেছি আর খোলা চোখে ইসলামের নূর ছড়িয়ে পড়তে দেখছি।

উত্তর : শোকরিয়া, বহুত শোকরিয়া।

প্রশ্ন : আপনাকেও অনেক শোকরিয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **সেপ্টেম্বর–** ২০০৭

ভাই হাসান আবদাল (জয় বর্ধন)-এর সাক্ষাতকার

সাথীদের কাওড় দিয়ে আমি মসজিদে গেলাম। ভয়ও লাগছিল, মুসলমানরা আবার কী মনে করে। কিন্তু আমি ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করছিলাম। ইচ্ছে করছিল, জামাআতে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু সাহস পেলাম না। এক বড় মিয়া বললেন, বেটা কী দেখছো? তোমার কী দরকার? বললাম, আব্বু! একবার নামায পড়তে চাই! তিনি আমার হাত ধরে বললেন, তাহলে আর অতো ভাবছো কেন? একথা বলেই আমাকে নিয়ে জামাআতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি নামায পড়তে লাগলাম। যমীনে যখন মাথা রেখে সিজদাবনত হলাম, মনে হল, আজ আমি মালিকের নিকট এসেছি।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হাসান আবদাল : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : হাসান ভাই! জামাআত থেকে কবে ফিরেছেন? আপনার সময় কোথায় লেগেছে?

উত্তর : আহমদ ভাই! আজই জামাআত থেকে ফিরেছি। আমাদের জামাআত মথুরা সময় লাগিয়ে ফিরেছে।

প্রশ্ন : জামাআতে কোনো সমস্যা হয়নি তো? আপনার সাথীরা কেমন ছিল?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! সময় বেশ ভালো কেটেছে আর সাথীরাও আমার অনেক খেদমত করেছে। জামাতে বিভিন্ন এলাকার সাথী ছিল। কয়েকজন সাহারানপুরের। তিনজন মেওয়াতের আর দু'চারজন বিজনুরের। আলহামদুলিল্লাহ! আমীর সাহেব ছিলেন সাহারানপুর জেলার এক গ্রামের আলেম। অনেক পুরানো সাথী। আলহামদুলিল্লাহ! দুআ কুনূতসহ পূর্ণ নামায শিখে নিয়েছি।

প্রশ্ন : হাসান ভাই! আমাদের এখানে ফুলাত থেকে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা বের হয়। আল্লাহ তাআলা বর্তমানকালে যাদের আপন অনুগ্রহে হেদায়াতের পথপ্রদর্শন করেছেন, পত্রিকাটিতে তাদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। আব্বুর নির্দেশ, ওটার জন্য আপনারও যেন একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। যাতে অন্যরাও দিক নির্দেশনা পেয়ে যায় বিশেষত পুরনো বংশীয় মুসলমানদের জন্য শিক্ষনীয় হয়।

উত্তর : হ্যাঁ, মৌলভী সাহেব! মথুরায় আমি অনেকের নিকটই আরমুগানের নাম শুনেছি। আমরা এক মসজিদে গেলাম। ইমাম সাহেব মুম্বাইয়ের নাদীম সাহেবের সাক্ষাৎকার পড়ে শোনালেন। আমার খুবই ভালো লেগেছিল। খেয়াল করেছিলাম মাওলানা সাহেবকে আমারও একটা ইন্টারভিউ ছাপিয়ে দিতে বলবো। আমার ধারণাও ছিলনা, আমার বলার পূর্বেই স্বয়ং মাওলানা সাহেবেরই মনে একথা উদিত হবে। আল্লাহ তাআলা কত পরম মমতাময় সত্তা, আমার মত দুই মাস বিশদিনের ক্ষুদ্র এক মুসলমানের হৃদয়ে যে কথাই উদিত হয় আমার আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।

আমীর সাহেব একদিন তালীমের মধ্যে হযরত মূসা আ.-এর কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তিনি আগুন সংগ্রহ করতে পাহাড়ে গেলেন আর তাঁকে পয়গম্বর বানিয়ে দেয়া হল। (কাঁদতে কাঁদতে) আমার মালিক (তার প্রতি আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক) আমার মতো নাপাককে শিরক ও মূর্তিপূজার পথে বরং মূর্তি পূজার মঞ্জিলে হেদায়াত দান করেছেন। আর আমার সঙ্গে কেমন তার দয়ার আচরণ যে আমার মনে চাচ্ছিল আরমুগানে ইন্টারভিউ ছাপার কথা বলবো আবার ভেতরে ভেতরে শরমও বোধ করছিলাম যে, দুই মাসের মুসলমানের কথা তো আরমুগানে ছাপারই যোগ্য নয়, কিন্তু তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন।

প্রশ্ন : আব্বু রাতে আমাকে হুকুম করেছিলেন, হাসানের ইন্টারভিউটি অবশ্যই নিতে হবে। যাহোক, আপনি আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন!

উত্তর : গাজীয়াবাদ জেলার এক গ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে আমার জন্ম। আব্বু আমার নাম রেখেছিলেন জয় বর্ধন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামের এক স্কুলে লেখাপড়া করি। তারপর গাজীয়াবাদের এক কলেজ থেকে ইন্টার করি। অতঃপর অন্য আরেক কলেজ থেকে বি.কম করি। বি.কম করার পর এক বৎসর I.A.S কম্পিটিশনের প্রস্তুতি নিই। ব্যবস্থাপকগণ প্রথম পরীক্ষাটি দু'বার নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পাশের কাছাকাছি গিয়েও আমি কৃতকার্য হলাম না। এতে মনটা খুব ভেঙ্গে যায়।

পিতাজী এক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু দুনিয়া থেকে মন একেবারেই উঠে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার আমার প্রবল আশা ছিল, আমি পরীক্ষাটিতে অবশ্যই পাশ করবো। কিন্তু একেবারে নিকটে গিয়েও বঞ্চিত হওয়ার কারণে আমার মন-মস্তিষ্ক মারাত্মক আহত হয়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে বাড়ি থেকে পালিয়ে

হরিদুয়ার চলে গেলাম। হরিদুয়ার, ঋষিকেশ, উত্তর কাশী, বানারস প্রভৃতি আশ্রমগুলোতে আমি চার বছর ঘুরতে থাকি। কোথাও শান্তি মিলেনি। দু-চার মাস যাওয়ার পরই প্রত্যেক আশ্রমে এমন কিছু জিনিস নজরে পড়তো যার ফলে মন বিষিয়ে উঠতো।

হরিদুয়ার থেকে একদিন দুই সাথীর সঙ্গে কালিয়ার যাই। সেখানে গিয়ে আমি শান্তি পেলাম। কিন্তু সেখানকার অবস্থাও আমার নিকট বাজারী আশ্রমের মতো মনে হল। সেখানে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়ে আমরা ফিরে আসি। ইতোমধ্যে এক পাগল আমাকে ধরে বসে। বারবার বলতে থাকে, দশটা টাকা দিয়ে যাও, আল্লাহ তোমাকে আবদাল বানাবেন। বললাম, আমি একজন সাধু। হরিদুয়ার থেকে এসেছিলাম। কিন্তু পাগলটি আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, পাগলটি এখানে কোথায় থাকে? লোকেরা বলল, এ এখানকার ফকীর। কারও কাছে কিছু চায় না। কেউ দিলে খেয়ে নেয় অন্যথায় জঙ্গলে চলে যায়। জান বাঁচানোর জন্য আমি তাকে দশ টাকা দিয়ে দিলাম। তারপর লোকজনের নিকট জানতে চাইলাম, লোকটা 'আবদাল' না কী যেন বলছিল– এর অর্থ কী? উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, আবদাল বলা হয় বড় মাপের ফকীরকে। আমি তাকে যেই না দশ টাকা দিয়েছি অমনি ভিক্ষুকরা পারে তো আমার কাপড় ছিঁড়ে নেয়। সবার দাবী, তাকেও কিছু দিতে হবে। আমার মাথায় তিলক দেয়া ছিল। তবুও ভিক্ষুকদের হাত থেকে জান বাঁচানো মুশকিল হয়ে গেল।

সেখানকার এসব বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমার মন্দ ধারণার সৃষ্টি হল। কিন্তু ভেতরে গিয়ে আমি এক আশ্চর্যরকম শান্তি অনুভব করেছিলাম। বিশেষ করে সেখানে একটি মসজিদ আছে। ভেতরে গিয়ে বসলাম, তো টানা দুই ঘণ্টা বসেই রইলাম। সেখান থেকে আসতে মন চাচ্ছিল না। মসজিদে কিছু লোক শুয়ে ছিল। কিছু লোক নামায পড়ছিল। সেখান থেকে হরিদুয়ার ফিরে এলাম। এখানে স্বস্তি পেলাম না। সব ছেড়ে বাড়ি চলে গেলাম। পরিবার আরও পড়াশোনা করার জন্য জোর দিল। সি.এ. কিংবা অন্তত এম.বি.এ-টা করে নিতে বলল। আমার মনে আর এ জাতীয় কাজে উৎসাহ ছিল না। তিন মাস বাড়িতে থাকার পর চাপ বাড়লে আমি আবার হরিদুয়ার চলে আসি। অব্যক্ত এক অস্থিরতা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি। এটা আমার প্রথম জন্মের কথা।

প্রশ্ন : প্রথম জন্ম মানে কী?

উত্তর : আমি আমার নতুন জীবন ২৯শে জুলাই ২০০৮ খৃস্টাব্দ থেকে গণনা করি। এটাকে আমি আমার নতুন জীবন বলে অভিহিত করি। কারণ, শিরকের ওপর জীবন কাটানোকে জীবন বলে না।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বলুন!

উত্তর : একটু আগেই বলেছি, আমার অবস্থা হল, আল্লাহ তাআলা শিরকের পথে আমার ওপর আপন দয়ার হাত রেখে আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছিলাম। মনে হতো, আমাকে কী যেন খুঁজে পেতে হবে। ধর্মের কোনো ব্যাপারে যদি মনে হতো, এতে কুরবানী করলে আমার মালিক সন্তুষ্ট হবেন তাহলে আমি সেটা করার চেষ্টা করতাম। এজন্য আমি 'কাওড়' নিয়ে যাওয়ার মান্নত করলাম। আপনার জানা আছে হয়তো, মহাশিব রাত্রিতে প্রচন্ড গরম আর বর্ষার মৌসুমে হরকিপুড়ি হরিদুয়ার থেকে কাওড়ে গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে যেখানে কাওড় থেকে পানি ছিটানোর মানত করা হয় সেখানে নিয়ে যেতে হয়। পূর্বমহাদেব শেখপুরের এক মন্দিরে সবচেয়ে বেশী প্রায় দশ লাখ লোক পানি ছিটাতে যায়। মাওলানা সাহেব! এই সফর অনেক তপস্যা আর মুজাহাদার। আমিও তিন বছর ধরে কাওড় নিয়ে যেতাম। কোনমতে পানি ছিটিয়ে এসেই কঠিন অসুখে পড়তাম। গত বছর তো এমন অসুস্থই হয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল সেটাই বুঝি শেষ যাত্রা। কিন্তু আমার মালিক আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন। পা ফুলে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে থাকতো। ফোস্কা গলে ঘা হয়ে যেতো। আমি বারবার আসমানের দিকে মুখ তুলে মালিকের কাছে অভিযোগ করতাম।

ফরিয়াদ জানাতাম, মালিক! ধর্মকে আপনি কত কঠিন করে দিয়েছেন। কখনও বলতাম, জল ছিটানো ছাড়াই তুমি খুশী হতে পারো না? এ বছর কাওড় নিয়ে রওয়ানা হলে আমি আশ্চর্য এক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কখনও মনে হতো, সবকিছু ভূয়া। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ বলে উঠতো, তুমি সত্য হলে এপথেই মালিক পর্যন্ত পৌঁছা নসীব হবে। মুজাফফর নগর শহরে গিয়ে এক কাওড় ক্যাম্পে বিশ্রাম নিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক মসজিদে আছি। জামাআত দাঁড়িয়ে গেছে। এক ব্যক্তি এসে আমাকে দরওয়াজার নিকট জুতা পায়ে দাঁড়ানো দেখে বলল, বেটা! নামায হচ্ছে, তুমি নামায পড়ছো না কেন? বললাম, আমি হিন্দু বলে এরা আমাকে পড়তে দিচ্ছে না। তিনি বললেন,

এসো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আমার হাত ধরে জামাআতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি দেখাদেখি নামায পড়লাম। চোখ খুলে গেল।

আহমদ সাহেব! বলে বোঝাতে পারব না কতটা ভালো লাগছিল। সামান্য বিশ্রাম করে আবার রওয়ানা হলাম। আমার সঙ্গে হরিদুয়ারের আরও তিন সাথী ছিল। পথিমধ্যে রাস্তায় একটি মসজিদ পড়ল। তখন ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। দেখলাম লোকজন মসজিদে নামায পড়ছে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। সাথীদেরকে বললাম, এই মসজিদও তো সেই মালিকেরই ঘর যার জন্য আমরা যাচ্ছি। কিছুটা ভেঁট এখানেও চড়িয়ে আসি। মসজিদে গিয়ে তেলের পয়সা দিয়ে আসি। সাথীদের কাওড় দিয়ে আমি মসজিদে গেলাম। ভয়ও লাগছিল, মুসলমানরা আবার কী মনে করে। কিন্তু আমি ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করছিলাম। ইচ্ছে করছিল, জামাআতে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু সাহস পেলাম না। এক বড় মিয়া বললেন, বেটা কী দেখছো? তোমার কী দরকার? বললাম, আব্বু! একবার নামায পড়তে চাই? তিনি আমার হাত ধরে বললেন, তাহলে আর অতো ভাবছো কেন? একথা বলেই আমাকে নিয়ে জামাআতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি নামায পড়তে লাগলাম। যমীনে যখন মাথা রেখে সিজদাবনত হলাম, মনে হল, আজ আমি মালিকের নিকট এসেছি। নামায পড়ে ফিরে আসলাম।

সাথীদের স্বপ্নের কথা খুলে বললাম। নামাযে যে স্বাদ পেয়েছি তা-ও বললাম। সাথীদের দুজন তো অনেক ভালোমন্দ বলল। আরেক সাথী দীনেশ বলল, আমাকে কেন নিয়ে গেলে না? আমাকেও দেখাতে নামাযে কেমন স্বাদ অনুভূত হয়। আমাদের সফর চলছিল। আমরা উনত্রিশ তারিখ দুপুরে নদীর পাশ্ববর্তী সড়ক ধরে সামনে অগ্রসর হলাম। মসজিদে যোহরের আযান হল। সুযোগ বুঝে এক ক্যাম্পে কাওড় রেখে দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের ভেতরে মসজিদে চলে গেলাম। চার-পাঁচজন লোকের জামাআত হচ্ছিল। আমি জামাআতে শরীক হয়ে গেলাম। দীনেশকে বললাম, যমীনে যখন মাথা রাখবে মনে করবে, মালিকের চরণেই মাথা রাখছো। দেখবে কেমন আনন্দ লাগে। নামায পড়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। দীনেশ বলল, বাস্তবিকই তুমি সত্য বলেছো। আসরের পর আমরা পূর্বা মহাদেব পৌঁছলাম। আমরা ভালোয় ভালোয় মঞ্জিলে পৌঁছতে পারার আনন্দে প্রফুল্ল মনে বসে ছিলাম। রাত বারোটার পর জল চড়াতে হবে। প্রচন্ড ভীড় ছিল। ভীড় থেকে একটু দূরে নদীর কিনারে এক সিঁড়ির নীচে আমরা শুয়ে পড়লাম।

আধ ঘণ্টা পর চোখ খুলে গেল। দেখি কয়েকজন তরুণ নিকটেই বসে আছে। তাদের হাতে কিছু কিতাব ছিল। তারা আমাদের কাছে এসে পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলে তারা বলল, আমরা সবাই এক মাতা-পিতার সন্তান। আমরা আপনার আদি রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। মালিককে খুশী করার জন্য আপনারা কত কঠিন তপস্যা করে এখানে পৌঁছেছেন। আমাদের একজন ধর্মগুরু আছেন। মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী আর এই সম্পর্কের সবচেয়ে বড় দাবী কী একথা বোঝানোর জন্য এবং এই দাবী কিভাবে পৌঁছানো যায় তার জন্য তিনি বরোটে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। মসজিদে তার শেষ প্রোগ্রামের ভাষণে আমাদের সবাইকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করে বলেছেন, এই কাওড় যাত্রীরা আমাদের রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। কত দুঃসহ ও কষ্টকর সফর করে তারা আসে। সত্যের পথ জানা না থাকার কারণে প্রতিটি কদমে তারা নরকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এদিকে আমরা নিজেদের আনন্দ-ফূর্তি আর আয় উপার্জনের ধান্ধায় আছি। এটা কত বড় জুলুমের কথা, সকল অমুসলিমকেই আমরা নিজেদের শত্রু ঠাওরে বসে আছি। এই লক্ষ লক্ষ লোক কেবল মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই ক্লান্তিকর সফর করে। আমি কয়েকটি কাওড় ক্যাম্পে দেখেছি, পা ফুলে গেলে, ফোস্কা পড়ে, ফেটে ঘা হয়ে গেছে। লোকজন তাদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আমরা দয়াল নবীর কেমন অনুসারী যে, আমরা এ সকল ভাইকে তাদের আমানত পৌঁছে দেই না। কিছুটা চেষ্টা তো করা উচিত। আমাদের দায়িত্ব হল, আপন মনে করে তাদের সত্য পৌঁছে দেয়া। কেউ না করুক, আমাদের অন্তত একাজ করতে হবে। ছয় সাতদিনের ক্যাম্পে একজন লোকও কাওড় ভাইদের সঙ্গে দেখা করেনি। কাল হাশরের ময়দানে এরা আমাদের চেপে ধরবে। আমরা এর থেকে নিস্কৃতি পাবোনা।

তাঁর দরদভরা কথায় আমাদের মনও ভরে উঠল। আমরা ইচ্ছা করলাম, কিছু ভাইয়ের নিকটে হলেও আমরা সত্যকে পৌঁছে দেবো। আজ সকাল থেকে পাঁচিশজন ভাইয়ের সঙ্গে আমরা ভয়ে ভয়ে সাক্ষাত করেছি। আপনাদের ঘুমন্ত দেখে মনে করলাম, আপনারা আলাদা আছেন, নিশ্চিন্তে আপনাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। আপনাদের খারাপ না লাগলে আমরা আপনাদের এবং আপনাদের মালিক সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। দীনেশ বলল, অবশ্যই বলুন। লোকটি আমাদের এক মালিক ও তার পূজার ব্যাপারে

কথা বলতে লাগল। তাকে ছাড়া অন্য কারও পূজা করলে যে নরকে জ্বলতে হবে সে ব্যাপারে ভয় দেখাল এবং কুরআন পড়ে পড়ে শোনাল। সে যখন আরবীতে কুরআন পড়ছিল আমাদের সবারই খুব ভাল লাগছিল। আধা ঘণ্টা পর্যন্ত তারা পালাক্রমে কথা বলে যাচ্ছিল।

আমরা যখন তাদের সব কথায় একমত প্রকাশ করলাম তারা আমাদের কালিমা পড়তে বলল। আমরা চার জনই কালিমা পড়ে নিলাম। তারা আমাদের প্রত্যেককে একটা করে 'আপকী আমানত আপকী সেবা মেঁ' নামের বই হাদিয়া দিল। আর বলল, যে ধর্মগুরু বড়োটে ক্যাম্প স্থাপন করে আমাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং যার কারণে আমরা আপনাদের নিকট এসেছি এটা তারই লেখা কিতাব। আমরা আপনাদের এগুলো উপহার দিচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে তিনবার করে পড়বেন। এতে আপনাদের সত্য কী, ইসলাম গ্রহণ করা এবং কালিমা পড়া কেন জরুরী তা জানা হয়ে যাবে। তারপর কিতাবে যা করতে বলা হয়েছে তা করবেন। কিতাবটি নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করে দিলাম। আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও পড়তে লাগল। আমরা সেই প্রেম-ভালোবাসা মোড়ানো কিতাবে একেবারে হারিয়ে গেলাম। কিতাব পড়ে মনে হল, এটা একান্ত আমার জন্যই লেখা হয়েছে। আমি যে সত্য অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি, দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছি তপস্যার পর তপস্যা করে যাচ্ছি তা আমি পেয়ে গেছি।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তারা 'আমরা যাচ্ছি, বলে রওয়ানা হলেন। আমি বললাম, আপনারা তো যাচ্ছেন কিন্তু আমরা কী করব? বললেন, আপনারা জল ছিটিয়ে বাড়ি ফিরে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন। বললাম, আপনি এ কেমন কথা বলছেন? এই কিতাবে শিরককে সবচেয়ে বড় পাপ বলা হয়েছে। কাজেই এখানে জল ছিটানো সবচেয়ে বড় পাপ। তারা বলল, আপনারা যদি এই কাওড় এখানে রেখে যান তাহলে আবার অন্য কিছু ঘটে না বসে। আমি বললাম, হলে হবে, তাতে কী? আমি কাওড় নদীতে ফেলে দিয়ে বললাম, এখন কোনো নামাযের সময় আছে? বললেন, একটু পরেই নামাযের সময় হবে। বললাম, আমাকে নামায পড়তে নিয়ে চলুন। আমার সাথী দীনেশও কাওড় ফেলে দিল। আমরা দুজন তাদের সঙ্গী হয়ে বড়োট পৌঁছলাম। আমার অপর দুই সঙ্গী কাওড় নিয়ে পানি ছিটাতে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে তারাও পানি ছিটানো মুলতবী রাখল।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : বড়োট পৌঁছে তারা আমাকে আপনার পিতা মাওলানা কালীম সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিলেন। তিনি ফোনেই আমাকে অনেক মুবারকবাদ দিয়ে বললেন, আপনি সাচ্চা অনুসন্ধানী ছিলেন এজন্য মালিক আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানার বিশেষ করে নামায শেখার আবেদন করলাম। তিনি আমাকে জামাআতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সাথে একথাও বলে দিলেন, প্রথমে কোর্টে গিয়ে কোনো উকীলের সঙ্গে সাক্ষাত করে আইনী কাগজপত্র করে দিল্লী চলে আসুন, আমি আপনাকে ভালো জামাআতে পাঠিয়ে দেবো।

পরদিন আমি সাহারানপুর গিয়ে হলফনামা দিয়ে সার্টিফিকেট ইত্যাদি বানিয়ে নিলাম। তারপর একত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় আমি আর দীনেশ দিল্লী পৌঁছলাম। হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করে পুরো ঘটনা শোনালাম। তিনি আমার নাম রাখলেন হাসান আর দীনেশের নাম রাখলেন হুসাইন। আমি আরয করলাম, এক ফকীর আমাকে কালিয়ারে বলেছিল, তোমাকে আবদাল বানানো হবে এজন্য আমার নাম আবদাল রেখে দিন, যাতে অন্তত নামের আবদাল হতে পারি। অসম্ভব কী যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যিকার আবদাল বানিয়ে দিবেন। মাওলানা সাহেব বললেন, আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রিয় ও বুযুর্গ এক বান্দার নাম ছিল হাসান আবদাল। কাজেই আমি আপনার নাম হাসান আবদাল রেখে দিলাম। যেন আপনি ভালো মানের আবদাল হতে পারেন। যে আল্লাহ আপনাকে পূর্ব মহাদেবে শিরকের ঘাঁটিতে হেদায়াত দান করছেন এবং তার রহমতের কোলে তুলে নিয়েছেন সেই আল্লাহর জন্য আবদাল বানানো খুবই সহজ।

মাওলানা সাহেব বললেন, আমি আশাবাদী! আপনি অবশ্যই আবদাল হবেন ইনশাআল্লাহ। বরং আবদালের চেয়েও বড় কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বানাবেন। মাওলানা সাহেবকে আমি যখন আমার চার বছরের তপস্যার কথা বললাম যে, আমি দিনের পর দিন অভুক্ত কাটিয়েছি। তিন চিল্লা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে যজ্ঞ করেছি। ছয়মাস বলতে গেলে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। যে আশ্রমে যা বলা হতো অম্লান বদনে মেনে নিয়ে তা পালন করেছি। মাওলানা সাহেব কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আসলে আপনার এই দুরাবস্থার জন্য আমরা দাঈ'। কারণ, আপনাকে আমরা বলিনি। তবুও

আল্লাহর শোকর, তিনি তো আপনার পালনকর্তা, এজন্য নিজেই আপনাকে পথ বাতলে দিয়েছেন।

মাওলানা সাহেব আমাকে একজন মাওলানার সঙ্গে নেযামুদ্দীন মারকাযে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের জামাআত পহেলা আগস্টে মথুরা পৌঁছে। তিন চিল্লার জামাআত ছিল। আগ্রা মথুরার চিল্লায় আমার মন ভরেনি। কেবল কায়দা পড়া শেষ হয়েছে। উর্দূ পড়াও শুরু করে দিয়েছি। আমীর সাহেব আমাকে দ্বিতীয় চিল্লা লাগানোর পরামর্শ দিলেন। জামাআতে আমি বিভিন্ন আশ্চর্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। এক দুইবার কীভাবে যেন সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তখন কিছু আশ্চর্যজনক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তারা আমাকে কেমন সব বিস্ময়কর জিনিস দেখায়। আর যখনই আমার জামাআতের কথা খেয়াল হতো, তখন হঠাৎ যেন আমার পায়ের নীচে যমীন সরে যেতে থাকতো, ঠিক যেমন রেলে অথবা গাড়িতে বসে অনুভূত হয়।

তারপর আমি আমার জামাআতের সঙ্গে গিয়ে শরীক হতাম। এই ঘটনা আমার সঙ্গে ৮/৯ বার হয়েছে। স্বপ্নে দেখতাম, আমি যেন ডানাওয়ালা পাখি। এখানে উড়ে যেতাম ওখানে উড়ে যেতাম। শুয়ে শুয়েই আমি উড়তে থাকতাম। একদিন আমি আমীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদাল কেমন হন? তিনি বিস্তারিত আলোচনা করলেন, তারা আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা। তাদের পায়ের নীচে যমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফিল্ড অফিসারদের যেমন গাড়ি দেয়া হয় অনুরূপ আবদালদেরও বিভিন্ন রকম কামালাত ও কারামত দান করা হয়। আমার ধ্যান লেগে গেল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে আবদাল বানিয়ে দিন। গোটা জামাআতই এই দুআ করছিল। তারপর থেকেই আমার সঙ্গে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে লাগল।

প্রশ্ন : আপনি আব্বুকে এই অবস্থার কথা বলেছিলেন?

উত্তর : দুই ঘণ্টা পর্যন্ত হযরত কারগুযারী শুনেছেন। হযরত আমাকে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমি যেন কাউকে আমার কাণ্ড নিয়ে যাওয়ার কথা এবং নতুন মুসলমান হওয়ার কথা না বলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আমি আমীর সাহেবকে বলে দিলাম। আজ আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনি দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে আবদাল বানিয়ে দেন। মাওলানা সাহেব বললেন, ডাল হয়ে কী হবে, গোশত হোন। আবদাল

তো আপনি আছেনই মানুষের জন্য গোশত হয়ে থাকাই উত্তম।

আমি যখন জেদ ধরলাম, মাওলানা সাহেব বললেন, ব্যস, আল্লাহ তাআলা ঈমানের ওপর খাতেমা করেন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার ওপর উঠিয়ে দেন এর জন্য দুআ করা চাই। আবদাল হওয়া, কাশফ ও কারামতের আকাঙ্ক্ষা করা এটাও এক ধরনের গায়রুল্লাহ। দেবদেবী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা যেমন শিরক তেমনি এটাও বিশেষ লোকদের জন্য এক প্রকার শিরকেরই মতো। কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার ফিকির করাই উচিত। এজন্য দাওয়াতের কাজকে মাকসাদ বানাতে হবে। আবদাল আর গাওস হওয়ার ব্যাপারে কথা হল, মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার প্রশ্নে খাঁটি হয়, আল্লাহু তাআলা এমনিই তাকে গাওস-আবদাল বানিয়ে দেন। আপনার অবস্থা বলছে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অবশ্যই শুধু আবদালই নয় তার চেয়েও বড় বানিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন : এখন আপনার কী ইচ্ছা?

উত্তর : হযরত আমাকে কিছু দিনের জন্য এক আল্লাহওয়ালার ওখানে গিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনার আর দুই সাথী যারা কাওড়ে আপনার সঙ্গে ছিল তাদের কী অবস্থা?

উত্তর : তারা বাড়িতে গিয়ে ১৫ দিন পর মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। পরবর্তীতে তারাও চিল্লা লাগিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গী দীনেশ কুমারের সময় কেমন কাটছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! তারও সময় ভালো কেটেছে। সে খুব সহজ সরল ভালো মানুষ। তার প্রকৃতিতে আগে থেকেই কোনো মন্দ ছিল না। এখন কালিমা পড়ে আরও ভালো মুমিন মুসলমান হয়েছে। জামাআতের সবার চেয়ে দীনেশের সময় সবচেয়ে ভালো কেটেছে। তার খিদমতে সকল সাথীই খুব খুশী হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি সাথীদের খিদমত করেননি?

উত্তর : আমার সঙ্গে দু'-একটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এজন্য সাথীরা আমাকে কী-সব মনে করতে শুরু করে। সবাই আমার খিদমত শুরু করে দেয়। আমাকে তারা কী কী সব বলতো। দুআ করতে আবদার জানাতো। আমার ভয়ও হতো, ভেতরের খারাবী প্রকাশ পেলে সব ভড়ং খুলে যাবে। আমি আল্লাহর নিকট দুআও করতাম।

প্রশ্ন : আব্বু আপনাকে দাওয়াতের কাজ করতে বলেননি?

উত্তর : আজ বসে প- ্যান করেছেন। হযরত আমাকে বলেছেন, প্রথমে নিজেকে গড়ার ফিকির করুন। আমাদের এই দেশ ভালোবাসা আর আধ্যাত্মিকতার দেশ। ভেতরকে কলুষমুক্ত করে সৎগুণাবলী দিয়ে সাজিয়ে তোলে রুহানিয়াতের উন্নতি করা হলে এদের মধ্যে বিশেষত ধার্মিকদের মধ্যে কাজ করা বেশী সহজ হবে। তাই কিছুদিনের জন্য আমাকে এক জায়গায় পাঠাচ্ছেন। সেখানে যিকির ইত্যাদি বাতানো হবে। দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা আমার ভেতরের দোষগুলো দূর করে দেন এবং আমার ব্যাপারে হযরতের যে ইচ্ছা তা পূর্ণ করে দেন।

প্রশ্ন : ইনশাআল্লাহ! আল্লাহু তাআলা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ হাসান ভাই। একবার হুসাইন ভাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাত করিয়ে দিবেন। তখন তার সঙ্গেও কথা হবে।

উত্তর : আপনি যখনই বলবেন, ইনশাআল্লাহ তাকে নিয়ে আসবো।

প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক অনেক শোকরিয়া।

উত্তর : আহমদ ভাই! আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শোকর, আল্লাহু তাআলা আমার দিলের তামান্না পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনাকেও অনেক অনেক শোকরিয়া। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, অক্টোবর– ২০০৮

ভাগ্যবতী আমেনা (অঞ্জু দেবী)-এর সাক্ষাৎকার

আমি আমার হযরতের (মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব) আলোচনায় একথা শুনেছি। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের আলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছাবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। মুসলমানগণ যদি এখন তাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য মুসলমানদের মুখাপেক্ষি নন। আমার হযরত বলেছেন, ঋষিকেশের ঘরে বসে আমার মুসলমান হয়ে যাওয়াটা মুসলমানদের জন্য একটি সংকেত। সুতরাং অন্যদের মাধ্যমে হেদায়েতের কাজ আঞ্জাম পাওয়ার আগেই মুসলমানদের উচিত, এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়া।

সিদরাতু যাতিল ফায়যাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আমেনা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু :

প্রশ্ন : বোন আমেনা! এটা আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন, তিনি আপনাকে মূর্তিপূজারী পরিবারে হেদায়েতের আলো দেখিয়েছেন। আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার খুব আগ্রহ ছিল। আপনাকে দেখে ও কথা বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ইদানিং আব্বু তাঁর আলোচনায় প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

উত্তর : (চোখের পানি ছেড়ে) বোন সিদরাহ্! কোনো সন্দেহ নেই আমার প্রতি করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ অসীম। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিভিন্ন দুয়ারের পূজার অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর দুয়ারে। দুআ করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমরণ ঈমানের উপর অটল রাখেন এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন : বোন আমেনা! আব্বু আপনাকে এই মুহূর্তে এখানে বিশেষভাবে এই কারণে ডেকেছেন, আমি যেন 'আরমুগান'-এর পক্ষ থেকে আপনার সাথে কিছু কথা বলি। ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। গত কয়েক বছর যাবত এতে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছে। কিছুদিন হলো কেবল পুরুষ নওমুসলিমদেরই ইন্টারভিউ ছাপা হচ্ছে। আব্বু আপনাকে ডেকেছেন আমি যেন আপনার সাথে কথা বলি। সাধারণত আমার

বড় বোন আসমা সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন। আমি প্রথমবারের মতো আপনার সাথে এই বিষয়ে কথা বলছি।

উত্তর : হযরত আমাকেও একথা জানিয়েছেন। বলুন, আমাকে কী বলতে হবে?

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশীয় পরিচয় দিন।

উত্তর : বর্তমান পৃথিবীর সবচে' বড় মূর্তিপূজক দেশের মূর্তিপূজারী অঞ্চল ঋষিকেশে আমার জন্ম। ঋষিকেশে চারটি বড় আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমগুলোর একটির প্রধান হলেন আমার পিতা। তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ। তাঁকে ভারতবর্ষের বড় এক পন্ডিত হিসেবে গণ্য করা হয়। আমার জন্ম ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল। আমার পরিবারের লোকেরা আমার নাম রেখেছিলেন অঞ্জু দেবী। আমার দু'জন বড় ভাইবোন রয়েছে। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে ঋষিকেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্কুলটি আমার আব্বুর ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত। হাইস্কুল পাস করার পর আমি বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট করেছি। তারপর বি এস সি করেছি। এ বছর এম এস সি পড়ছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শোনাবেন কি?

উত্তর : বোন কী বলবো! আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত ও করুণায় আমাকে ঢেকে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার মহান শক্তি ও শান প্রতিদিনই তিনি রাতের অন্ধকার থেকে দিনকে বের করে আনেন। ঠিক এভাবেই আমাকেও মূর্তিপূজার অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোয় নিয়ে এসেছেন। একবার আমাদের আশ্রমে একটি ভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এক হিন্দু বোন তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে আশ্রমে পূজা করতে যায়। আশ্রমের একজন সাধু তাকে কিছু দেয়ার কথা বলে ভেতরে ডেকে নেয়। তারপর তার সঙ্গীদের নিয়ে আগন্তুক মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে বিষয়টি যখন আশ্রমে জানাজানি হয় তখন আমিও জানতে পারি। আমি আমার আব্বুকে বলি, আপনার আশ্রম এই সাধু-সন্ন্যাসীদেরসহ জ্বালিয়ে দেয়া উচিত। বরং আমাদেরসহ আপনাকেও জ্বলে মরা উচিত। কারণ, আপনি এই আশ্রমের নিয়ন্ত্রক।

মূলত এই ঘটনার পর থেকে আশ্রমের প্রতি আমার ভেতর ঘৃণা জন্ম নেয়। আমি আশ্রমে গিয়ে পূজা করাও ছেড়ে দিই। এক রাতের ঘটনা– আমি ঘুমিয়ে আছি। স্বপ্নে দেখি, পূজা করতে আশ্রমে গিয়েছি। আর তখনই দু'জন সাধু আমার পেছনে লেগেছে। তারা আমাকে ধরে তাদের কক্ষে নিতে চাইছে। আমি

কোনভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে শুরু করি। তখন তারাও আমার পেছনে দৌড়াতে থাকে। এভাবে মাইলের পর মাইল আমি ছুটতে থাকি। দুজন সাধুর একজনের নাম মহারাজ। তার বয়স পঞ্চাশ বছর। আশ্চর্য! সেও আমার পেছনে ছুটছে। আমি ক্লান্তিতে প্রায় অবশ হয়ে পড়েছি। ছুটছি আর মনে মনে ভাবছি– আর বুঝি নিজেকে রক্ষা করা গেল না। এরা আমাকে নিশ্চিত ধরে ফেলবে এবং আমার সম্ভ্রম নষ্ট করে ছাড়বে। আমি যখন একথা ভাবছি ঠিক তখনই লক্ষ করলাম, ছোট্ট একটি মসজিদ। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন মাওলানা সাহেব। তাঁর মাথায় টুপি এবং চোখে চশমা। তিনি আমাকে বললেন, বেটি! এদিকে চলে এসো। মসিজদের ভেতর এসে পড়ো। আমি কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লাম। মাওলানা সাহেবও দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি আমাকে সস্নেহে বললেন, বেটি! এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। এটা তোমার ঘর, এখানে তোমার দিকে কেউ মন্দ দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবে না।

এ পর্যন্ত এসে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার অবস্থা তখন ভিন্ন রকম। রাত তখন তিনটা। তারপর থেকে সকাল পর্যন্ত আর ঘুমাতে পারলাম না। স্বপ্নটি আমার কাছে বাস্তব ঘটনা বলে মনে হতে লাগলো। মনে হলো বাস্তবেই আমি এমন এক অবস্থার শিকার হয়েছি। আমার অবস্থা তখন ভয়াবহ। সকাল দশটার দিকে মনে হলো, এই পন্ডিতদের হাত থেকে আমার সম্ভ্রম রক্ষা পাবার নয়। আমাকে কোনো মাওলানা খুঁজে বের করতে হবে, হয়তো বা ইসলামই আমার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারবে। তারপর আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। এটা তো একটা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল– ভেতর থেকে কে যেন আমাকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে– হোক না স্বপ্ন, এটা শত সত্যের চেয়েও সত্য! আমি যখন এরকম এক দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছি তখন আমার মন বললো– আচ্ছা, আমি আমার ফোনটা ঘুরিয়ে দেখি না। যদি কোনো মুসলমানের সাথে আমার ফোনের সংযোগ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবো ইসলাম ধর্মেই আমার সম্ভ্রম রক্ষা পাবে। সুতরাং আমার মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। আর যদি ফোনের সংযোগ কোনো হিন্দুর সাথে হয় তাহলে বুঝবো এটা নিছক একটা স্বপ্ন।

মনেমনে আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলাম। প্রার্থনা করলাম-মালিক!

তুমি আমার কাছে সব পরিষ্কার করে দাও। আমাকে এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করো। তারপর ফোন দিলাম। রিং হলো। ওপাশ থেকে রিসিভ করা মাত্র জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কে বলছেন? জবাব এলো– মাহমূদ বলছি। আমি বললাম, কোত্থেকে বলছেন? তিনি বললেন– মোজাফ্ফরনগরের একটি গ্রাম থেকে। বললাম, আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি বললেন, মুসলমান হতে চাও কেন? আমি বললাম, ইসলাম সত্য ধর্ম। আমার মনে হয় ইসলামের মধ্যেই আমার সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্যই আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন– তুমি কোত্থেকে বলছো? বললাম, ঋষিকেশ থেকে বলছি। তিনি তখন বললেন– মুসলমান হতে চাইলে তোমাকে ফুলাতে যেতে হবে। সেখানে আমাদের হযরত থাকেন। তাঁর নাম- মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। ফুলাত মোজাফফরনগরের একটি গ্রাম। তোমাকে আমি তাঁর ফোন নাম্বার দিব। আমি বললাম, এখনই দিয়ে দিন। বললেন– এখন আমার কাছে নেই, আমি খুঁজে দেখছি, তুমি এক ঘন্টা পর ফোন করো। আমি তাঁকে বললাম– আচ্ছা, আমি যদি মুসলমান হই তাহলে তো আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে জায়গা দেবে না– তখন আমি কোথায় যাবো?

তিনি বললেন– আমার একজন বড় ছেলে ছিল এক্সিডেন্টে মারা গেছে, এখন আরেক ছেলে আছে। তার বয়স বর্তমানে পনের বছর। তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে আমি তার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। তুমি আমার ঘরেই থাকবে। আমি বললাম– এই অঙ্গীকার মনে রাখবেন তো? তিনি বললেন– অবশ্যই মনে থাকবে। আমি তখন চরম অস্থিরতায় কাঁপছি। এক ঘন্টা অপেক্ষা করা আমার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। পঞ্চাশ মিনিট পার হতেই আমি ফোন করে বসি। কিন্তু তখনও তিনি মাওলানা সাহেবের ফোন নম্বর যোগাড় করতে পারেননি। তারপর এক ঘন্টা আধা ঘন্টা পরপর ফোন করতে থাকি এবং ক্ষমা চেয়ে বলি, আমি আপনাকে পেরেশান করছি। কিন্তু কী করবো, ইসলাম ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।

তিনি আমাকে বললেন– তোমাকে আর ফোন করতে হবে না। সকালে আমিই তোমাকে ফোন করবো। রাতটা খুব কষ্টে পার হলো। সকাল ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলাম। তারপর নিজেই ফোন করলাম। তিনি বললেন– এখনও ফোন নম্বর সংগ্রহ করতে পারিনি। বাড়ুলিতে একজন লোক পাঠিয়েছি। সে ফোন নম্বর নিয়ে এলে আমিই তোমাকে ফোন দিব। সাড়ে

এগারটায় তাঁর ফোন পেলাম। আমি ফোন নম্বরটি পেয়েই মাওলানা সাহেবকে ফোন করলাম– ফোন বাজতেই মাওলানা সাহেব রিসিভ করলেন এবং বললেন– আসসালামু আলাইকুম! আমি বললাম– জী, সালাম! আপনি কি মাওলানা কালিম সিদ্দিকী বলছেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ, কালিম বলছি। বললাম– আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি বললেন, তুমি কোত্থেকে বলছো? আমি বললাম– ঋষিকেশ থেকে। তিনি বললেন– এখানে তুমি কিভাবে আসবে? বললাম– আমি একাই চলে আসতে পারবো। মাওলানা সাহেব বললেন– তুমি ফোনেই কালেমা পড়ে নাও, তিনি এও জানালেন ফোনেও মুসলমান হওয়া যায়। আর যাবে না কেন– সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি তোমার অন্তরের কথাও জানেন। তাঁকে হাজির-নাজির মনে করে কালেমা পড়ে নাও আর শপথ করো, আমি মুসলমান হয়ে কুরআন শরীফ এবং আল্লাহ তা'আলার সত্য নবীর বর্ণিত পথে জীবন-যাপন করবো। আমি বললাম– তাহলে আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। মাওলানা সাহেব আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিলেন এবং বললেন– সঙ্গে হিন্দীতে এর অর্থটাও বলো। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার ফোনটা কেটে গেল। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি দ্রুত দোকানে গেলাম এবং ফোনে টাকা ভরলাম। কিন্তু তারপর আর ফোনে মাওলানা সাহেবকে পাচ্ছি না। আমার তখন কী যে অস্থিরতা! পারলে নিজেই নিজেকে অভিশাপে জ্বালিয়ে ফেলি।

আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকি– অঞ্জু! তোমার মনে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত ছিল, এ জন্যই তোমার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, ডাকতে লাগলাম– হে সত্য মালিক! তুমি আমার সামনে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়েছো, আমি তো অপবিত্র, ঈমানের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি তো দাতা! যাকে খুশি তাকে ভিক্ষা দিতে পারো, তুমি আমাকে ঈমান ভিক্ষা দাও। তৃতীয় দিন আমি কেঁদে কেঁদে আমার মালিকের কাছে প্রার্থনা করলাম। তারপর ফোন করতেই মাওলানা সাহেবকে পেয়ে গেলাম। তাঁকে পেয়ে যারপরনাই খুশি হলাম এবং বললাম, মাওলানা সাহেব! আত্মার অপবিত্রতার কারণে আমার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।

মোবাইলে পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি অবিরাম চেষ্টা

করতে থাকি কিন্তু আপনাকে কোনভাবেই পাচ্ছিলাম না। মাওলানা সাহেব অত্যন্ত দরদের সাথে আমাকে বললেন– বেটি! তোমার ঈমান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমিই তোমাকে ফোন করবো ভাবছিলাম, কিন্তু তখন একটি জরুরী প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম। আমার এক সফরসঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাথে কথা বলছিলেন। যে কারণে ফোন করতে পারিনি। তারপর ব্যস্ততা এতই বেশি ছিল যে, ফোন মাঝে-মাঝে নামে মাত্র খুলেছি। আমি বললাম– এবার আপনি আমাকে পুনরায় কালেমা পড়িয়ে দিন।

আমার ফোন আবার কেটে গেল। আমার অবস্থা তখন ভয়াবহ। দম বন্ধ হবার উপক্রম। আমি মালিকের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম– মালিক! আজও কি আমার ঈমান অপূর্ণ থেকে যাবে? ঠিক এমন সময় মাওলানা সাহেবের 'ফোন এলো'। আনন্দিত হয়ে ফোন রিসিভ করলাম। মাওলানা সাহেব বললেন– আমিই তোমার ফোন কেটে দিয়েছি। যদি আবার পয়সা শেষ হয়ে যাবার কারণে তোমার ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন– কালেমা পড়! আমি কালেমা পড়লাম। হিন্দীতে অঙ্গীকার করলাম। তিনি আমাকে কুফর, শিরকসহ সব ধরনের পাপ থেকে তওবা করালেন। আল্লাহ ও তার নবীর আনুগত্যের উপর শপথ করালেন। তারপর মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করলেন– আমার ফোন নম্বর তোমাকে কে দিল? বললাম– মোজাফফর নগরের মাহমূদ সাহেব। তিনি বললেন– এখন তুমি কী করবে? বললাম– আমি সবকিছু আগেই ভেবে রেখেছি। মাহমূদ সাহেব কথা দিয়েছেন, তিনি আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবেন। মাওলানা সাহেব আমাকে অনেক দুআ দিলেন আর বললেন– যে কোনো সমস্যায় প্রয়োজনে আমাকে ফোন দিতে পারো।

প্রশ্ন: তারপর আপনি কী করলেন?

উত্তর : মাহমূদ সাহেবকে (যিনি এখন আমার শ্বশুর আব্বা) ফোন দিলাম। বললাম, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি বললেন– কিভাবে? বললাম– হযরত ফোনেই আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন– ফোনে আর সাক্ষাতে কালেমা পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আব্বুকে বললাম– এখন তো আমি ঋষিকেশে থাকতে পারবো না, আব্বাজি বললেন– বেটি! তুমি আমাদের দেখনি আর আমরা তোমাকে দেখিনি। কী তোমার পরিচয়? তোমার বাবা কী করেন? বললাম– আমার পিতা ঋষিকেশের

একটি বড় আশ্রমের পন্ডিত, আমি এখন এমএসসি পড়ছি। আব্বু বললেন– বেটি! তুমি অত্যন্ত বড় ঘরের মেয়ে। আমি গরীব মানুষ। আমি বললাম– আপনার ঘরে এসে আমি মজদুরি করে খাব। তিনি বললেন– আমার ছেলের বয়স পনের। সে এখনও কাজ-কাম কিছু করে না। বললাম– তাকে আমিই লালন-পালন করবো। তিনি বললেন– তুমি কি গোশত খাও? বললাম– গোশতের প্রতি আমার এক ধরনের ভয় আছে। তবে খুব তাড়াতাড়িই খেতে শুরু করবো। তিনি বললেন– আমার একটি মোরগের দোকান আছে। তাছাড়া আমি একজন কসাই মানুষ। আমার প্রতিদিনকার আয় একশ' রুপি। তুমি আমাদের সাথে কীভাবে থাকবে? বললাম– আমিও কসাই হয়ে যাবো। তিনি বললেন– দেখ বেটি! তুমি অত্যন্ত উঁচু বংশের মেয়ে। তাছাড়া অল্প দিনের জন্য তো নয়, সারা জীবনের ব্যাপার। তুমি আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। আমি বললাম– দেখুন! ইসলামে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কাবাঘর ভাঙ্গার সমান অপরাধ। তিনি বললেন– আমি হযরতের সাথে পরামর্শ করে তোমাকে জানাচ্ছি।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : আব্বু মাওলানা সাহেবকে ফোন করলেন। বললেন– আপনার সাথে সাক্ষাত করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। মাওলানা সাহেব জানালেন– আমার অবিরাম সফর চলছে। অন্তত দুই সপ্তাহ পর ফুলাত আসবো। আব্বু বললেন– আপনি যখন মুম্বাই থাকবেন তখন আমি আপনার সাথে দেখা করবো। হযরত তখন বললেন– আপনার গ্রামের কাছেই কান্ধালার পাশে রাধোরা গ্রামে আমার প্রোগ্রাম আছে। আপনি সেখানেই আসুন, দেখা হবে। আব্বু সেখানে গেলেন এবং পুরো কাহিনী শোনালেন। মাওলানা সাহেব তখন আব্বুকে বললেন– আপনি একজন ভাগ্যবান মানুষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটিকে নিয়ে আসুন। যদি এর জন্যে পুরো পরিবারকে জীবন দিতে হয় তবুও এমন একটা ঈমানদার মেয়ের ঈমানের হেফাযত করা উচিত। আর এ-ও বলে দিলেন এর নাম রাখবেন আমেনা। সঙ্গে বিয়ে-শাদীসংক্রান্ত কাগজপত্রের জন্যে কয়েকজন উকিলের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। এদিকে মূর্তিপূজারী পরিবেশে অবস্থান করাও আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে একেকটি মাস মনে হচ্ছিল। নিজেকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না।

দুদিন পর ঠিকানা জোগাড় করে আমি নিজেই আব্বুর ঘরে পৌঁছে যাই।

সেখানে দু'দিন থাকি। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে মিরাঠ যান। পথে হযরতের সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম হয়। আমার ভাগ্য খুবই ভালো ছিল। হযরত তখন ফুলাতেই ছিলেন। বোন সিদ্‌রাহ! আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না তাঁকে দেখার পর আমার অনুভূতি কী হয়েছিল। আমি শিশুর মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম; স্বপ্নে আমাকে যিনি মসজিদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ইনি সেই মাওলানা। সেই চশমা, সেই টুপি! আমি তখন বারবার বলতে থাকি– আপনিই তো সেই! আপনিই তো ছিলেন! আসলে তখন আমি এতোটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে, ভুলেই গিয়েছিলাম একজন অপরিচিত পুরুষের সাথে আমি আমার যৌবন বয়সে কথা বলছি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একটি ছোট্ট শিশু, আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলছি। সেখান থেকে আব্বুর সাথে মিরাঠ গেলাম।

আমার ইসলাম গ্রহণসংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পন্ন করলাম। এক মাসের ভেতর নামায শিখে নিলাম। প্রতিদিন ফাযায়েলে আমাল পড়তাম। পরিবারের সকলেই আমাকে খুবই ভালোবাসেন। গ্রামের মেয়েরা আমাকে বরাবর সঙ্গ দেয়। আব্বুর এক নিকটাত্মীয়, কোনো এক বিষয়ে আব্বুর সাথে তার বিরোধ ছিল। আমার বিষয়টি সে জানতে পারে। তারপর থানায় গিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে যে, এই লোক ঋষিকেশ থেকে একটি হিন্দু মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। থানা ঋষিকেশের সাথে যোগাযোগ করে। তারপর ঋষিকেশ থেকে পুলিশ এসে স্থানীয় পুলিশ সঙ্গে করে তারা আমাকে ও আব্বুকে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়। জিপের পেছনে আমি ও আব্বু বসে আছি। গাড়ি যখন চলছে তখন আমি আব্বুকে বললাম– আমি ড্রাইভারকে বলছি। ড্রাইভার গাড়ি স্পেড়া করার সাথে-সাথে আপনি লাফিয়ে নেমে পড়বেন এবং পালিয়ে যাবেন। আব্বু বললেন– তখন তোমার কী হবে? আমি বললাম– আল্লাহর উপর আস্থা রাখুন। আমার আল্লাহ আমাকে স্বীয় ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেবেন। আমি ড্রাইভারকে ডাকলাম। ড্রাইভার সাহেব একটু থামুন, একটু থামুন! ড্রাইভার সাহেব গাড়ি খানিকটা স্লে- া করলেন। গাড়ি যখন ষাট কিলোমিটারে নেমে এলো তখন আব্বু গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তিনি কিছুটা ব্যাথাও পেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ গাড়ি থামায়নি। কারণ, গ্রামের লোকেরা পাথর হাতে পেছন থেকে পুলিশকে ধাওয়া করছিল।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : তারপর আল্লাহ আমার ঈমান নির্মাণ করলেন– ফাযায়েলে আমালে লেখা সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাগুলো আমি পূর্বেই পড়েছিলাম। এই গল্পগুলোর স্বাদ নেয়ার সুযোগ হলো। পরিবারের লোকেরা আমাকে প্রচুর শাস্তি দিয়েছে। মহিলা পুলিশ দিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের বারবার এ কথাই বলেছি, আমার শারীরকে কেটে টুকরোটুকরো করে ফেল, কিন্তু আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে যে ঈমান প্রবেশ করেছে তা বের করতে পারবে না। আমার শরীর রক্তাক্ত দেখে যে কেউ কেঁদে ফেলতো। আমাকে যারা মারতো তাদের চোখেও আমি অশ্রু দেখেছি। কিন্তু আমার কান্না পেত না। আমি বরং এক ধরনের স্বাদ আস্বাদন করতাম। আমার কাছে মনে হতো যে, আল্লাহর ভালোবাসায় আজ আমি নির্যাতিতা হচ্ছি, তিনি আমাকে দেখছেন।

আমার প্রতি কত যে খুশি হচ্ছেন! আমার মা দুইবার আমার গলা টিপে ধরেছেন। আমার বড় ভাই বারবার আমার দিকে তেড়ে আসতেন। কেবল আমার দূর সম্পর্কের এক খালা- তার মনটাই আল্লাহ তাআলা কিছুটা নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি বারবার আমাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতেন। তারা আমার বিয়ে শাদীর ব্যাপারেও চিন্তা করতে লাগলো। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলে দিলাম– আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যার, একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মনে রেখ, এটা মুসলমানের জীবন। তোমাদের আশ্রমে লালিত বিলাসীদের জীবন নয়। আমি তোমাদের এই মুশরিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবো না, হয়তো আমাকে মেরে ফেল নয়তো এখান থেকে যেতে দাও। আমাকে যদি এখানে রাখতে চাও তাহলে একটাই পথ তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও। আমাকে মেরেমেরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বরং তারা হেরে গিয়েছিল। আমাকে কয়েকবার বিষপান করানোর পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়।

কয়েকবার আমার আব্বুর কাছে ফোনও করা হয় যে, এই মেয়েকে এসে নিয়ে যাও। যখন তিনি আসার জন্য প্রস্তুত হন তখন আবার ফোনে নিষেধ করে দেয়া হয়। একদিন আমার পিতা আমার আব্বুকে ফোন করে জানালেন– আমরা এই মেয়েকে বিদায় করে দিচ্ছি কিন্তু সেটা কিভাবে করবো? আপনি মুসলমান আর আমরা হিন্দু। আব্বু বললেন– এর সুরাহা তো খুব সহজ, আপনারাও মুসলমান হয়ে যান। মুসলমান হয়ে যদি মেয়েকে এখানে না দিতে

চান তাহলে আমি আমার কলিজার টুকরা ছেলেকেই আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেব।

একদিন আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে খুব মারধর করছিল। আমার সেই খালা খুব কষ্টে আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন। ঘরের লোকজন চলে যাবার পর খালা আমাকে বললেন– অঞ্জু! তুই যে মালিকের প্রতি ঈমান এনেছিস তিনি যদি সত্যিই তোকে ভালোবাসেন, তাহলে তুই তাঁকে একথা কেন বলিস না– হে মালিক! তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নাও। খালা এ কথা বলে চলে গেলেন। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ওযু করলাম। তারপর দুই রাকাত সালাতুল হাজত নামায পড়লাম, অতঃপর প্রাণখুলে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারও প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার প্রতি তোমার এ করুণা কম কোথায়– তুমি আমার মতো এক গুনাহগারকে এই শিরকের রাজ্যে ঈমান নসীব করেছ। আমার মতো এক অপবিত্র দাসীকে সাহাবায়ে কেরামের মতো কষ্ট সহ্য করার সুযোগ করে দিয়েছো। হে আল্লাহ! তুমি তো সমস্ত কষ্টকে আমার জন্য আনন্দের উপাদান বানিয়েছো। আমি কোথায় আর ঈমান কোথায়! কিন্তু হে আল্লাহ! আমার খালা ভাববে- এর খোদা একে চায় না। কিংবা সে হয়তো ভাববে আমার খোদা কিছু করতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার খালার মাধ্যমে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।

আমার আব্বু কোনো কুলকিনারা না পেয়ে আশ্রমের লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা পরামর্শ দিল– এই মেয়ে অর্ধম হয়ে গেছে। এখন তাকে যতই মারধর করা হবে ততই পুরো ঋষিকেশে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলবে। সবচে' ভালো হয় একে এর স্বামীর ঘরে নীরবে পাঠিয়ে দেয়া হোক। তারপর আমার পিতা আব্বুকে ফোন করলেন। বললেন– আপনারা আমাদেরকে ভয় করছেন আমরাও আপনাদেরকে ভয় করছি। ভালো হয় মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গা ঠিক করেন। যেখানে আমরা অঞ্জুকে নিয়ে আসবো। আপনারা সেখানে থাকবেন। পরস্পর কথা বলে ঠিক করলেন সাহারানপুর। আব্বু তার এক পরিচিত জনের ঠিকানা দিলেন। পরের দিন সকালে আমার পিতা এবং খালা আমাকে নিয়ে সাহারানপুর চলে এলেন। তারপর খুশি মনে আমি আমার স্বামীর বাড়ীতে চলে এলাম। আমি খালাকে বললাম–খালা দেখলেন! আমি এদিকে আল্লাহকে বললাম আর সাথেসাথে

তিনি ওদিকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার পিতাজীকে বাধ্য করলেন– আমাকে এখানে পৌঁছে দিতে। খালা বলুন, এমন আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে বেঁচে থাকা যায়! আমার কথায় খালা খুবই আশ্চর্য হলেন। সাহারানপুর থাকতেই আমি আমার খালাকে ঈমানের দাওয়াত দিলাম। তিনি সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। আমি চলতি পথেই তাঁকে কালেমা পড়ালাম।

প্রশ্ন: গ্রামে পৌঁছার পর কী হলো?

উত্তর : গ্রামের লোকেরা আগেই জেনেছিল। পুরো গ্রামের মানুষ পথে নেমে এসেছিল। মনে হচ্ছিল গ্রামে যেন ঈদ শুরু হয়েছে। আমার সেই খুশি এবং আনন্দ এখনও মিলিয়ে যায়নি। একবার এক অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন আমাকে বললেন– পুরো গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! গ্রামের অনেক মেয়েই আগে নামায পড়তো না, রোযা রাখতো না। দীন থেকে তারা অনেক দূরে ছিল। এখন তারা নিয়মিত নামায-কুরআন পড়ছে। নফল নামায, নফল রোযাও রাখতে চেষ্টা করছে। তাছাড়া আমিও এখানে প্রাণখুলে ইবাদত-বন্দেগীর সুযোগ পাচ্ছি। কুরআন শরীফ পড়ছি। পরিবারের লোকেরা আমাকে খুবই ভালোবাসে।

প্রশ্ন: আপনি কি গোশত খেতে শুরু করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা গোশতকে হালাল করেছেন। গোশতকে খাদ্যের রাজা বানিয়েছেন। এখন গোশত আমার একটি প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া ইসলামের কথাই হলো– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তাই আমার পছন্দ হতে হবে। আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ, এখন যে বিষয়েই আমি জানতে পারি, এটা আল্লাহ কিংবা রাসূলের প্রিয়, তখনই সেটা আমারও প্রিয় হয়ে যায়। একসময় আমি মিষ্টি পছন্দ করতাম না। আসলে আমার রুচি বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আমি কখনও মিষ্টি খেতাম না। পরে জানতে পারি এটা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব পছন্দ করতেন। এখন এটা আমার প্রিয় খাবার। মনে হয় যেন মিষ্টি আমার সেই কতদিন থেকে প্রিয় খাবার!

প্রশ্ন: আপনার পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে কি?

উত্তর : আব্বু এবং আমার বোন মাঝেমাঝে ফোন করেন। তারা কথা দিয়েছেন, একবার এখানে আসবেন।

প্রশ্ন: আপনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন?

উত্তর : আমি তাদের জন্য দুআ করছি। ঠিক দুআও নয়, বরং ইচ্ছা করেছি তাদের জন্য দুআ করবো। এমনভাবে দুআ করবো যেটাকে দুআ বলা হয়। তারপর অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যাবেন। আসলে দুআও তো আল্লাহ তাআলাই করান। আমি আশায় আছি এমন একটা দুআ আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে করাবেন।

প্রশ্ন: বোন আমেনা! আরমুগানের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি আমার হযরতের আলোচনায় একথা বারবার শুনেছি। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের আলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছাবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। মুসলমানগণ যদি এখন তাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য মুসলমানদের মুহতাজ নন। আমার হযরত বলেছেন, ঋষিকেশের ঘরে বসে আমার মুসলমান হয়ে যাওয়াটা মুসলমানদের জন্য একটি সংকেত। সুতরাং অন্যদের মাধ্যমে হেদায়েতের কাজ আঞ্জাম পাওয়ার আগেই মুসলমানদের উচিত, এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়া।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আপনার জীবনকাহিনী শুনে আমাদের ঈমানও তাজা হয়ে উঠেছে।

উত্তর : আপনাকেও অনেক শুকরিয়া। দুআ করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
সিদরাতু যাতুল ফায়যাইন
মাসিক আরমুগান, জুন– ২০০৮

হাকীম আব্দুর রহমান (অমিত কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

লোকজন আমাকে এ প্রশ্নটিই করে যে, কোন্ বিষয়টি আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে? আমি মানুষকে বলি, বলুন তো ইসলামের মধ্যে এমন কোন বিষয়টি আছে যা মানুষকে প্রভাবিত করে না? যেমন– সুন্নাতী পোশাক। চেহারায় দাড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তাছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ, পরস্পরে একসঙ্গে বসে খানাপিনা করা– ভ্রাতৃত্বের এমন উদাহরণ আর কোথায় আছে? এ সবকিছুই আমাকে প্রভাবিত করেছে, একই ঘরে লালিত-পালিত মা-বাবা এবং ছেলে মেয়েরা যেখানে একজনের পান করা পানি অপর জন পান করেনা। একজনের গ্লাসে অপরজন মুখ লাগায় না। এমন কি আমার পিতা আমার গ্লাসে পানি পর্যন্ত পান করতেন না। সেখানে মুসলমানগণ আরেকজন অচেনা মুসলমানের সঙ্গে বসে কত নিবিড়ভাবে খানা খাচ্ছে। আমি আমার বাবার কথাই বলবো। তিনি কখনও আমার পানি খাওয়া গ্লাসে পানি খেতেন না। এমনকি আমিও তার গ্লাসে কখনও মুখ লাগাতাম না। এসব বিষয়ই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। সেগুলো দেখেই আমি মুসলমান হয়েছি।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আবদুর রহমান: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন: আব্দুর রহমান ভাই! দীর্ঘদিন যাবত আরমুগানে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সাধারণ পাঠকদের নিকট নওমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তুলে ধরছি। উদ্দেশ্য হলো– এসব কাহিনী শুনে যেন মুসলমানদের ভেতর ইসলামী চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। তাছাড়া তারাও যেন অমুসলিমদের মধ্যে দীনি দাওয়াতের কথা ভাবতে শিখে। মূলত এ উদ্দেশ্যেই আব্বু ফোন করেছেন। বলেছেন– তোমার ইন্টারভিউর কারণে এখনও আরমুগান প্রেসে পাঠানো হয়নি। আমি আব্দুর রহমানকে বলেছি। তুমি দ্রুত এসে তার সাক্ষাৎকারটা নাও। তারপর সেটা মাওলানা ওয়াসির কাছে পাঠিয়ে দাও।

উত্তর : হ্যাঁ, ভাই আহমদ! আমি বিষয়টি জেনেছি। তাছাড়া আমিও নিয়মিত নওমুসলিমদের সাক্ষাতকারগুলো পড়ি। হযরত আমাকে এ কথা বলেই পাঠিয়েছেন। আমি আপনার অপেক্ষায়ই ছিলাম। এখান থেকে আমাকে আবার আজমির যেতে হবে।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, আমিও সে কথা জেনেছি। আচ্ছা, প্রথমেই আমি আপনার পরিচয় জানতে চাইবো।

উত্তর : বিদ্যালয়ে আমার নাম ছিল অমিত কুমার। পরিবারের লোকেরা ডাকতো জগুন বলে। খাতুলির পাশেই ভাইসি নামক গ্রামে আমার জন্ম। বাবার নাম ডাক্তার মোহন কুমার। আমরা চার ভাইবোন। তিন ভাই আর এক বোন।

প্রশ্ন : আপনার পড়া লেখা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি হাই স্কুল পাশ করেছি।

প্রশ্ন: আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : ছোটকালে আমি খুব দুষ্টমি করতাম। কখনই নির্দিষ্ট সময়ে হোম ওয়ার্ক করতাম না। ফলে স্কুলের দেয়া কাজগুলো করার জন্য আমার বন্ধুদের খাতার প্রয়োজন পড়তো। একবারের ঘটনা। আমি হোম ওয়ার্ক করিনি। ফলে এক বন্ধুর কাছে যেতে হলো। সম্ভবত তার নাম ছিল মুস্তাকিম। বাড়িতে গিয়ে ওকে পেলাম না। পরিবারের লোকেরা বললো মসজিদে গেছে। আমি সেখান থেকে সোজা মসজিদে চলে গেলাম। কিন্তু আমার সহপাঠি বন্ধুটি আমাকে মসজিদে দেখামাত্রই অবাক দৃষ্টিতে বললো– তুমি মসজিদে চলে এলে কিভাবে? তুমি তো নাপাক, বেরিয়ে যাও।

আমি বললাম– আমার পোশাক তোমার চে' পরিষ্কার ও দামী। আমি নাপাক হলাম কী করে? কিন্তু তার পরিষ্কার কথা; তুমি নাপাক, বেরিয়ে যাও। তার প্রতি তখন আমার প্রচুর রাগ হলো। সে তখন কুরআন শরীফ পড়ছিল। আমি বললাম– স্কুলের ছোটছোট বই পড়তে পার না, আর এখানে এসে এতো মোটা বই নিয়ে বসেছো। সে বললো– এটা আল্লাহর কালাম, তারপর সে আমাকে বিষয়টি বুঝাতে লাগলো। তার প্রতি আমার রাগ তখন ছিল চরমে। এদিকে তার খাতাটিও আমার দরকার। তাই কোনো কিছু না বলে খাতাটি নিয়ে ঘরে চলে এলাম। পরের দিন কয়েকজন বন্ধু মিলে তার কলার চেপে ধরলাম। বললাম, একজন চৌধুরীর সন্তানকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার মতো কথা বলতে তোমার মুখে বাঁধলো না। কত বড় সাহস তোমার, মসজিদ কি তোমার বাবার? আমার সাথে মন্দিরে চল। তোমাকে যদি কেউ কিছু বলে বা বের করে দিতে চায় তার কী দশা হয় দেখো। তখন সে আমাকে বললো– এটা আল্লাহর ঘর। সেখানে কোনো নাপাক ব্যক্তি ঢুকতে পারে না। সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো– আচ্ছা, তোমরা মন্দিরে গিয়ে কী

পড়ো? আমি তাকে কয়েকটি শেণ্ঢাক পাঠ করে শোনালাম। তারপর আমিও তাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা তুমি বলো–মসজিদে গিয়ে তুমি কী পড়ছিলে? সে বললো– আমি আল্লাহর কালাম পড়ছিলাম। অবশ্য ওটা তুমি বুঝবে না। কেউ যদি অন্তর লাগিয়ে এ কালাম পাঠ করে তার অনেক উপকার হয়। তারপর সে আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিল, ভাই আহমদ! তখন আমার মনে হলো আমার ভেতর যেন একটি আলো প্রবেশ করানো হলো।

প্রশ্ন : এরপর কী হলো?

উত্তর : তারপর আমি খাতুলিতে পিকেট ইন্টার কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে প্রতি শুক্রবারে জুমার সময় ক্লাসে ঘোষণা করা হতো– যারা জুমার নামায পড়তে চাও হাত উঠাও। যারা হাত উঠাতো তাদের ছুটি দেয়া হতো। সুযোগ বুঝে মাথা নিচু করে আমিও হাত উঠাতাম, তারপর বাইরে এসে ঘুরে বেড়াতাম। এক শুক্রবারের কথা, জুমার নামাযের ছুটি নিয়ে বাইরে এসেছি তখন মুসলমান বন্ধুরা আমাকে ঘিরে ধরলো। বললো– তুমি নামাযের ছুটি নিয়ে বাইরে আসো অথচ নামায পড়ো না।

একথা বলে ধরে মসজিদে নিয়ে গেলো। যাওয়ার পথে আমাকে নামাযের নিয়ত ইত্যাদি শিখিয়ে দিল।

প্রশ্ন: তারপর?

উত্তর : তারপর আমি মুজাফফরনগর জৈন ইন্টার কলেজে চলে গেলাম। সেখানে খালাপাড় নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমি প্রায়ই লাচ্ছি পান করতে যেতাম। সেখানে এক লোক আমাকে বললো– বন্ধু! তুমি দেখতে এতো সুন্দর অথচ একদিন তোমাকে আগুনে পুড়তে হবে। আমি বললাম– আমাকে আগুনে পুড়তে হবে কেন? সে বললো– শুধু আগুন নয়; মাথার একেবারে কাছে সূর্য চলে আসবে, মানুষের মাথার মগজ রান্না হতে থাকবে। সেদিন ঐ কঠিন অগ্নিতাপ থেকে কেবল ঈমানদাররাই মুক্তি পাবে। লোকটি আমাকে প্রায়ই এসব বোঝাতো। তার আচরণও ছিল চমৎকার। কিন্তু আমি তার কথা তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনতাম না। তারপর আমি যখন খাতুলিতে বুড়হানা রোডে নজেলপ্লাঞ্জার-এর কাজ করতে লাগলাম; তখন পরিচয় হলো এনাম ভাইয়ের সাথে। এনাম ভাই আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিছু দিন পর তিনি আমাকে মাওলানা শাকিল সাহেবের কাছে নিয়ে যান। তিনি ভাউড়িতে থাকেন। মাওলানা শাকিল সাহেব আমাকে কালেমা পড়ান। তারপর এনাম ভাই খুব যত্নের সাথে আমাকে নিয়মিত নামায পড়াতে থাকেন।

প্রশ্ন : আপনাকে বেশ কয়েক বছর ধরে ফুলাত দেখতে পাচ্ছি। এখানে এলেন কী করে?

উত্তর : হ্যাঁ, ভাই আহমদ! খাতুলিতে রিয়াজুদ্দিন সাহেব নামে এক ভদ্রলোক আছেন। তিনি একবার আমাকে বললেন– আব্দুর রহমান! কাজ-কাম তো চলতেই থাকবে। তাছাড়া কাজ-কাম তো সকলেই জানে এবং শেখে। আমি মনে করি সব কিছুর আগে আপনাকে ইসলাম শেখা উচিত। ইসলাম শিখতে হবে বুঝতে হবে এবং মানতে হবে। আমি বললাম খুব ভালো কথা। তারপর তিনি আমাকে ইসলাম শেখার জন্য ফুলাত পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা! আপনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : ১৯৯১ সালের ১৪ জানুয়ারী সোমবার আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তারপর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত আমি নানা বিষয়ে শিখেছি, নানা জায়গায় গিয়েছি। তারপর যখন হযরতের কাছে এলাম, তখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন: আব্বুর সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাত কিভাবে হয় এবং কোথায় হয়?

উত্তর : তিন বছর আগের কথা। আমি তখন ফুলাতে এক ব্যক্তির কাছে থাকতাম। তার সাথে আমার বনিবনা হচ্ছিলো না। আমি তাকে ছেড়ে তখন বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে যাওয়ার সময় আমার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এদিকে লোকজন খবর ছড়িয়ে দিল– আব্দুর রহমান মুরতাদ হয়ে গেছে। অথচ বিষয়টা এমন ছিল না। তারপর আমার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আপনার আব্বুর কাছে চলে আসি। তখন আমার মাথায় বেশ পাগলামী ছিল। অস্ত্রের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক ছিল। আমি ফুলাতে এসেছিলাম মূলত এই কারণেই যে, যে লোকটির সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে তাকে খুন করে ফেলবো। অস্ত্র আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে মাওলানা সাহেব বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি তখন আমাকে বুঝালেন– হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের জীবনে বরাবর কুরবানী দিয়েছেন, মানুষকে ছাড় দিয়েছেন। তাঁর কথায় আমি ধৈর্য ধরলাম। আসলে হযরতের কাছে আসার পর আমি আমার জীবনে একটা ভিন্ন ধরনের শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পেয়েছি।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আপনি যা কিছু জেনেছেন, তা কীভাবে জেনেছেন বলবেন কি?

উত্তর : এমন প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছে, কারও কারও প্রশ্ন ছিল– কোন্ বিষয়টি আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে। আমি বলতে চাই– ইসলামের

মধ্যে কোন বিষয়টি এমন আছে যা মানুষকে প্রভাবিত করে না? যেমন– সুন্নাতী পোশাক। চেহারায় দাড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তাছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ, পরস্পরে একসঙ্গে বসে খানা-পিনা করা– ভ্রাতৃত্বের এমন উদাহরণ আর কোথায় আছে? এ সবকিছুই আমাকে প্রভাবিত করেছে। একই ঘরে লালিত-পালিত মা-বাবা এবং ছেলে মেয়েরা যেখানে একে অপরের মুখ দেয়া কোনো খাবার গ্রহণ করতে পারে না। সেখানে মুসলমানগণ আরেকজন অচেনা মুসলমানের সঙ্গে বসে কত নিবিড়ভাবে খানা খাচ্ছে। আমি আমার বাবার কথাই বলবো। তিনি কখনও আমার পানি খাওয়া গ্লাসে পানি খেতেন না। এমনকি আমিও তার গ্লাসে কখনও মুখ লাগাতাম না। এসব বিষয়ই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। সেগুলো দেখেই আমি মুসলমান হয়েছি।

প্রশ্ন: আমি জানতে চেয়েছিলাম এ পর্যন্ত আপনি ইসলাম সম্পর্কে যতটকু জেনেছেন কার থেকে এবং কিভাবে?

উত্তর : এর মাধ্যম হল, হযরত (মাও. কালিম সিদ্দিকী) আমাকে জামাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি জামাতে গিয়ে নামায ইত্যাদি শিখেছি। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যন্ত আমি তিন চিল্লা দিয়েছি। এখন আমার ভেতর যতটুকু মানবতা আছে, সবটুকু আপনার আব্বুর বরকত। তাঁর সাথে থেকে তাঁর কথাবার্তা শুনে ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ভালোই ধারণা লাভ করেছি এবং সে অনুযায়ী চলারও চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন: আজকাল কী করছেন?

উত্তর : আমি হেকিমী শিখেছি। এখন চিকিৎসালয় খোলার কথা ভাবছি।

প্রশ্ন: হেকিমীর দিকে মন ঝুঁকলো কেন আপনার?

উত্তর : ভাই আহামদ! আপনার আব্বু আমাকে বললেন, আব্দুর রহমান! কিছু একটা কর। অবসর থাকা ভালো নয়। আমি বললাম, ড্রাইভিং শিখতে চাই। তিনি বললেন– এটা কোনো কাজ হলো? আমি বললাম– মাদ্রাসার পাশে একটা ক্যান্টিন খুলি? তিনি বললেন– কোথাও যদি তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাই তখন তারা জিজ্ঞেস করবে– ছেলে কী করে? আমাকে তখন বলতে হবে, দোকান করে, থালাবাটি ধোয়। এমন কিছু করো যাতে আমাদের ভালো লাগে ও তুমি সুখে থাকো। তারপর আমি হযরতের অনুমতিক্রমে হেকিমী শিখতে চাইলাম। হযরত আমাকে সেদিনই দেওবন্দে হেকিম আসিফ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে থেকে কিছুদিন হেকিমী শিখি, তারপর ডাক্তার

নজরুল ইসলাম সাহেবের কাছে কিছু দিন থেকেছি। তারপর হযরত আমাকে হেকিম জামিল সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। এক বছরের মত ওখানে থাকার পর ফিরে এসেছি। এখন ভাবছি ডাক্তারখানা খুলবো এবং মানুষের সেবা দেয়ার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন: আপনার বাবা-মার সাথে যোগাযোগ আছে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আমি তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে বুঝিয়েছেন পুরনো ধর্মে ফিরে আসার জন্য। তারা এ-ও বলেছেন– মোল্লাদের ফাঁদে পড়েছো, ওখানে থেকে তোমার কী হবে? আমি বলে দিয়েছি– মোল্লাদের ফাঁদে আমি পড়িনি। আমি এখন একটি সত্যধর্ম মেনে চলছি। আপনাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।

একদিনের ঘটনা। আমি দুধদোহন করছিলাম। আমাদের ঘরে সৎ মা। তার দুর্ব্যবহারের কারণে আমি একবার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। মূলত তার ব্যবহারে অতিষ্ট হয়েই আমি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এই মা না থাকলে হয়তো মুসলমান হওয়া যেত না। এই হিসেবে আমার প্রতি তার অনুগ্রহ অনেক। তিনি একবার আমাকে বুঝাতে লাগলেন এখনও সময় আছে। নিজেদের ধর্মে ফিরে এসো। আমি তাকে বললাম– এই যে দুধদোহন করছি, এইদুধ যেমন পুনরায় মহিষের স্তনে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে আমার পক্ষেও ইসলাম ছেড়ে হিন্দুধর্মে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার কথাবার্তায় পরিবারের লোকেরা বুঝতে পারে আমি তাদের কথা কোনভাবেই মেনে নেব না। তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় একে চিরতরে শেষ করে দেওয়াই ভালো। বাঁশও থাকবে না, বাঁশিও বাজবে না। তাদের এ পরিকল্পনার কথা আমার ছোট বোন আমাকে জানিয়ে দেয়। সে আমাকে বলে– পরিবারের লোকজন তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, তুমি এখান থেকে পালাও। আমি রাতের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। জানতে পেয়ে পরিবারের লোকেরা আমার পিছু নিল। আমার আয়াতুল কুরছি মুখস্ত ছিল। আয়াতুল কুরসী পড়ে আমার শরীরে ফুঁ দিলাম। তারপর এক জায়গায় আস্তে করে লুকিয়ে পড়লাম। ভাই আহমদ! আমার চোখের সামনে ওরা কয়েকবার ঘোরাঘুরি করেছে কিন্তু আমাকে দেখেনি। তারপর তারা ঘরে ফিরে যায়। সকালে আমি তাদের ফোন করি। তারা বলে এবারের মতো বেঁচে গেছো পরবর্তীতে আর পালাতে পারবে না।

প্রশ্ন: তারপর কি তাদের সাথে আপনার আর সাক্ষাত হয়েছে?

উত্তর: না, আহমদ ভাই! সাক্ষাত হয়নি। কারণ তারা গাজিয়াবাদ চলে যায়। আমি খাতুলিতে একবার দূর থেকে আমার আব্বুকে দেখেছিলাম।

প্রশ্ন: আপনার আব্বুকে ইসলাম দাওয়াত দেননি?

উত্তর : দাওয়াত দিয়েছি। একবার তো তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলাম বুঝার জন্য ফুলাতে এসেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আমার মায়ের সাথে আলোচনা করছিলেন। হয়তো তার ভাগ্যে হেদায়েত ছিল না। আমাদের এই কথাবার্তার মাঝেই তার কাছে এক নেতা এসে উপস্থিত হয়। আব্বু তখন আমার মাকে রেখে নেতার সাথে বেরিয়ে যান। আমার মা দুই ঘন্টা তার জন্যে অপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। আমি আমার মায়ের খুব যত্ন করি। অবশেষে তিনিও মন খারাপ করে চলে যান। তারপর তিনি আমার সাথে ফোনে কথা বলাও ছেড়ে দেন। বর্তমানে আমার আব্বুর পেছনে যথেষ্ট মেহনত করছি। আমার আব্বু গংগুহে ক্লিনিক খুলেছেন। আমি এইমাত্র জামাত থেকে এসেছি। আমাদের জামাতের আমীর ছিলেন গংগুহের এক ভদ্রলোক। তাঁর সাথে কথা হয়েছে তিনিও আমার পিতার পিছনে দাওয়াতী কাজ করবেন। আমি আপনার কাছে এবং পাঠকদের কাছে দুআ চাইবো, আল্লাহ তায়ালা যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার আব্বুকে হেদায়েত করেন। (আমিন)

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পর আপনাকে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

উত্তর : আমাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় সমস্যা ছিল– আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো মহিষ আছে। আমি কখনও মহিষের গোবর তুলিনি। কিন্তু পরিবার ছাড়ার পর আমাকে এ কাজও করতে হয়েছে। কখনও কখনও আমাকে মানুষের বাড়ীতে কাজ পর্যন্ত করতে হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনার জীবনের কোনো একটি সুন্দর ঘটনা আমাদের শুনান।

উত্তর : নিযামুদ্দিন থেকে আমাদের জামাত কুলহাপুর যাচ্ছিল। সফরে বের হওয়ার আগেই আমাদের সফরের বিভিন্ন আদব বলে দেয়া হয়েছিল। এ-ও বলা হয়েছিল– সফরে যে দুআ করা হয় তা খুব দ্রুত কবুল হয়। আমরা ট্রেনে বসা ছিলাম। দুআর বিষয়টি হঠাৎ আমার মনে হলো। আমার পায়ে তখন ছিল মারাত্মক জখম। আমি হাত তুলে আল্লাহ তায়ালার কাছে মুনাজাত

করলাম– হে আল্লাহ! তোমার নেক বান্দাগণ বলেছেন– সফরের দুআ দ্রুত কবুল হয়। আমি অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা। তুমি দয়া করে আমার দুআ কবুল কর। আমার পায়ের জখমগুলো ভালো করে দাও। আহমদ ভাই! আমি আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করাবো, কুলহাপুর স্টেশনে পৌঁছার আগেই আমার পায়ের ঘা পরিপূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায়। সেটা শুধু এক কুলহাপুরের ঘটনা নয়; এখনও আল্লাহ তায়ালার কাছে যা চাই, তাই পাই।

প্রশ্ন: আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার পয়গাম হলো– আপনারা আপনাদের ধর্মের উপর অবিচল থাকুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اٰمِنُوا -

হে ঈমানদাগণ! তোমরা ঈমান আন।

আমি এখন থেকে সতের বছর আগে মুসলমানদের মধ্যে যে ঈমান দেখতে পেয়েছি তা এখন আর দেখি না। যারা আমাকে একসময় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, এখন দেখি তারা নামায পর্যন্ত পড়েনা। তাদের আমি মাঝেমাঝেই বলি, তোমরাই আমাকে এখানে পৌঁছে দিলে অথচ নিজেরা পড়ে রইলে কোথায়? ঈমানের ভিতর পুরোপুরি প্রবেশ করার উদ্দেশ্য হলো– আমরা আল্লাহর রসূল ও আল্লাহর হুকুমের অনুসারী হবো, এবং অন্যকে দ্বীনের উপর দাওয়াত দিব। এরচেয়ে বড় কোনো কাজ আল্লাহ আমাদের দেন নি। এর বাইরে আমরা যা কিছু করছি প্রয়োজন পূরণের জন্য করছি। হযরত মাও. কালিম সিদ্দিকী সাহেব যেই কাজ করছেন সেটা হলো এটা। তার চিন্তা-ভাবনাও এটাই। দিন-রাত তিনি যে কাজ করেন সবগুলো দ্বীনের জন্য। আমরা যদি এমন ঈমানওয়ালা হয়ে যাই, তাহলে ইনশাআল্লা আমি মনে করি, কুফরের নাম এই দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে। আর চার দিকে শুধু ইসলাম আর ইসলামই দেখা যাবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, এপ্রিল– ২০০৮

মুহাম্মদ সালামান (রাম বীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার

পুরো মানবতাই এখন সত্যের তৃষ্ণায় অধীর। মরীচিকা দেখে তারা পানি মনে করে ছুটছে। কখনও এই ধর্মে কখনও ঐ ধর্মে। কখনও এই সিস্টেম আবার কখনও ঐ সিস্টেম, কখনও জয় গুরুদেব। আবার শ্রী ডি ওয়ালার বাবা। অথচ সর্বত্রই অন্ধকার। সত্য একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একমাত্র শান্তি ও স্বস্তির ঠিকানা। বর্তমানে এই অর্থকড়ির উত্তেজনাময় কালে সাইন্স এবং টেকনোলজির উৎকর্ষের যুগে মানুষ পূর্বের তুলনায় আরও অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত। আল্লাহর ওয়াস্তে এই উৎকণ্ঠিত মানবতার প্রতি আপনারা একটু দয়াপরবশ হোন। ইসলামের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে দুঃখী অস্থির মানবতার প্রতি সামান্য দয়ার হাত বাড়াতে আপনারা দাওয়াতী আসনে উঠে আসুন। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ সালমান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার পরিচয় বলুন।

উত্তর : হিন্দুধর্মে আমাকে রাম বীর সিং বলে ডাকা হত। কিন্তু আমি যখন ১৯৯৪ সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করি তখন আমি আমার নাম রাখি বীর ছোট্টো। তারপর ১৯৯৭ সালে আমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করি। তখন সেখানকার লোকেরা আমার নাম বদলে ব্যাপ্টাই করে দেয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ সালমান। আমরা মূলত মিরাঠের অধিবাসী, এখন অবশ্য দিল্লীতেই থাকছি। আমার বাবা খুব কম বয়সে দিল্লী চলে এসেছিলেন। তারপর দিল্লীতেই নিজের নিবাস বানিয়ে নেন। আমার জন্ম হয়েছে দিল্লীতেই। এখন আমাদের বসবাস দিল্লীর উজিরাবাদে।

প্রশ্ন: আপনার লেখাপড়া সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তর : আমি ইংরেজী এবং মার্শাল আর্টে এম.এ করেছি, আমি তিন বছর পর্যন্ত দিল্লী জেলার মার্শাল আর্টে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। তাছাড়া পূর্ব দিল্লীতে আমার একটি কোচিং সেন্টার আছে, বিশেষ করে ইংলিশ স্পিকিং-এর প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি কবে মুসলমান হলেন?

উত্তর : ২০০৭ সালের ৬ এপ্রিল আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

প্রশ্ন: আপনি বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্ম কবে কিভাবে গ্রহণ করলেন? আপনাকে কেউ এসব ধর্মের প্রতি আহ্বান করেছিল কি?

উত্তর : আসলে আমার মধ্যে সত্য সন্ধানের একটা অনুসন্ধিৎসা ছিল। গোড়া থেকে এই অনুসন্ধিৎসাই আমাকে বিভিন্ন দ্বারে নিয়ে উপস্থিত করেছে। আমি আমার জীবনে স্বস্তির একটা পথ খুঁজছিলাম। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ– তিনি আমাকে কতক অলীক ধর্মের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। তারপর আমি দেখাদেখি নয় বরং বুঝে-শুনে ইসলাম ধর্ম বেছে নিয়েছি। ১৯৯৪ সালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই তাদের উপাসনালয়, সেখানে তাদের একজন ধর্মগুরু থাকতো। বীর ছোট্টো। পরে তার নামেই আমার নাম রাখি। মূলত তিনিই আমাকে বৌদ্ধধর্মের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমাকে লোভ দেখিয়েছিলেন আমি যদি তার ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে আমাকে বাইরে কোনো দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তার কথা মেনে নেই এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করি।

প্রশ্ন: তারপর এই ধর্ম ছাড়লেন কী করে?

উত্তর : ঐ ধর্মগুরুর সাথে আমার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল বেশ ঘনিষ্ট। তার ঘরে আমার রীতিমত যাতায়াত ছিল। আমাদের সম্পর্কে কোনো লৌকিকতা ছিল না। একবার তার ফ্রিজ খুলে দেখি সেখানে শূকরের গোশত রাখা। আমি বুঝে ফেলি এর ধর্ম মিথ্যা হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। এরা মানুষকে ধর্মের কথা বলে অথচ নিজেরা শূকরের গোশত খায়। এ কথা আমি তাদের মুখের উপর বলে চলে আসি।

প্রশ্ন: আপনি খ্রিষ্টান হলেন কিভাবে?

উত্তর : আমার মা নিয়মিত চার্চে আসা-যাওয়া করতেন, তার সাথে আমাকেও যেতে হতো। সেখানে পাদ্রী আমাকে খৃষ্টধর্ম বোঝাতেন। আমার সাথে তার ব্যবহার ছিল খুবই মার্জিত। মাঝে মধ্যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কখনও বা আমার প্রতি পরম ভালোবাসা দেখাতেন। আমি তার আচার-আচরণে প্রভাবিত হই। মূলত এই আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই পাদ্রী আমাকে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করি। তাছাড়া এই পাদ্রীও সেই বৌদ্ধ ধর্মগুরুর মতো আমাকে বিদেশে

পাঠানোর কথা বলতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। আমি এদের মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো দেশে যাবো এমন কোনো ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালার ছিল না। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন। ধীরে-ধীরে খৃষ্টধর্মের প্রকৃত রূপ আমার সামনে ভেসে উঠলো। আমি দেখলাম হিন্দুধর্মের মতো এরাও মূর্তিপূজা করে। তারপর আমি খৃষ্টধর্ম ছেড়ে দিলাম।

প্রশ্ন: তারপর কী হল? ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলেন কবে?

উত্তর : আসলে আমি প্রকৃত সত্যকে খুঁজে ফিরছিলাম।

যেখানেই যাচ্ছিলাম সেখানেই কেবল অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম– আত্মিকতার সন্ধান এবং সত্যের সাক্ষাত। আমার এক হিন্দু বন্ধু একবার বাদায়ুনের এক পীর সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। সেই পীর সাহেব দিল্লীতেও আসতেন। প্রথম সাক্ষাত হয় দিল্লীতেই। তিনি আমাকে বাদায়ুন যেতে বললেন। আমি বাদায়ুনে তার দরগায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি মানুষ দলেদলে মুরীদ হচ্ছে। কিছু লোক আমাকেও কাপড় ধরিয়ে দিল। আমি কাপড় ধরে বসে রইলাম। তারপর তারা জানালো আপনি আমাদের হযরতের মুরীদ হয়ে গেছেন। পীর সাহেব কালেমা এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির বলে দিলেন।

ভাই আহমদ! কালেমা এবং যিকিরের মধ্যে সত্যিই আমি এক ভিন্ন ধরনের স্বাদ অনুভব করলাম। কিন্তু পীর সাহেবের সব আচার-আচরণ আমার কাছে মনে হতো হিন্দুধর্মেরই মতো। সেখানে মূর্তি আর এখানে পীর। পার্থক্য এতটুকুই। সকলে এসে পীর সাহেবকে সিজদা করছে। মনের বিরুদ্ধে আমাকেও এই কান্ড করতে হয়েছে। তারপর বেশ কয়েকবার আমি বাদায়ুন গিয়েছি। আমার ঘরে বসে আমি যখন যিকির করতাম, বেশ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করতাম, কিন্তু বাদায়ুনে গিয়ে যিকিরে বসলে বেশ অস্থিরতা বোধ করতাম।

প্রশ্ন: পীর সাহেব কি আপনাকে যথারীতি কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছিলেন?

উত্তর : না। পীর সাহেবের দরবারে প্রত্যেকেই নিজনিজ ধর্ম ধরে রেখেই মুরীদ হতো।

প্রশ্ন: তারপর ইসলাম গ্রহণ করলেন কীভাবে বলুন!

উত্তর : তখন আমাদের বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছিল। আমি মুজিব

ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু মালপত্র কিনেছিলাম। তিনি একবার আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি তাকে সত্য সন্ধানে যে দ্বারেদ্বারে ফিরছি সে কথা বলি। বাদায়ুনে পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার ঘটনাটিও তাকে শোনাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কিনা? আমি বললাম– পীর সাহেব প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্মে রেখেই মুরীদ করেন। আমার কথা শুনে তিনি খুব হাসলেন। তারপর আমাকে মাওলানা কালিম সিদ্দীকির কথা বলেন। এ-ও বলেন– সত্যিকারের পীর কেমন হয় একবার মাওলানার সাথে সাক্ষাত হলেই বুঝবেন। তাছাড়া তখন আর আপনাকে দ্বারেদ্বারে ফিরতে হবে না। আমি তার সাথে ওয়াদা করি তিন দিন পর ফুলাত যাবো। কথামতো তিন দিন পর ফুলাতে রওয়ানা হই। পথে মুজিব ভাই আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন, তাছাড়া 'আপকি আমানত' বইটি আমার হাতে দেন। আমি বইটি পড়ি। তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল এতোদিন আমি যে সত্যকে খুঁজছিলাম তা আজ পেয়ে গেছি। মাগরিবের পর আমরা ফুলাত এসে পৌঁছাই। হযরত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুজিব ভাইয়ের অনুরোধে হযরত আমাকে দ্বিতীয়বার কালেমা পড়ান। বিশেষ করে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে হযরত আমাকে বিস্তারিত বলেন। তাঁর কথা শুনে আমি অন্তরে স্বস্তিবোধ করি। হযরত 'আমাকে মরণে কে বাদ কিয়া হোগা', 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' এবং 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর হিন্দি অনুবাদ পড়তে বলেন।

দিল্লী গিয়ে বইগুলো সংগ্রহ করি। এগুলো পড়ার পর আমার কাছে মনে হয় এতো দিন অন্ধ ছিলাম। এখন সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। আমি হযরতকে বলি বিপুল সংখ্যক মুসলমানও এখন তাওহিদ থেকে অনেক দূরে। তারা পীরপূজা করে। তাছাড়া আমার পীর সাহেব তো নিজেও মুরীদদের সিজদা করান। এদের শিরক থেকে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমি হযরতকে এ-ও বলি– আমি কি আমার পীর সাহেবের জন্য চেষ্টা করতে পারি? তিনি বললেন– পীর সাহেব আপনাকে যিকির শিখিয়েছেন। আপনার প্রতি তার অবদান রয়েছে, তার কথা অবশ্যই আপনাকে ভাবা উচিত। মুজিব ভাইয়ের পরামর্শে আমি হযরতের কাছে মুরীদ হওয়ার আবেদন জানাই। হযরত বললেন– আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ। যা কিছু করবেন খুব ভেবে চিন্তে করবেন। এ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই আপনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত আপনাকে আরও ভেবে নিতে হবে। আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। এ-ও

বলি আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিভিন্ন দুয়ার ঘুরিয়ে আমার মনযিলে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন ইনশাআল্লাহ আমাকে আর কোনো দুয়ারে যেতে হবে না। আমার বারবার অনুরোধে অবশেষে তিনি আমাকে মুরীদ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : তারপর কি আপনি আপনার পূর্বের পীর সাহেবের সাথে দেখা করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি। বিভিন্নভাবে শিরকের খারাপ দিকগুলো বুঝাবার চেষ্টা করেছি। প্রথম দিকে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্ষোভের সাথে বলেছেন– এটা ধোঁকাবাজি, তুমি কোনো ওহাবীর ফাঁদে পড়েছো।

তারপরও আমি সাহস ছাড়িনি। বারবার তার সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনিও ধীরেধীরে নরম হয়েছেন। একবার তিনি কী যেন একটা স্বপ্ন দেখলেন। এখন ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তিনি আমাদের হযরতের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য আসবেন। তিনি তার পুরনো পথ ছেড়ে সত্য পথে ফিরে আসতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমি আশাবাদী, তিনি যদি ফিরে আসেন তাহলে তার অনেক মুরীদও তাওবা করে শিরক ছেড়ে এ পথে চলে আসবেন।

প্রশ্ন: এর আগে কি আপনাকে কেউ ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে?

উত্তর : না। আমাকে কেউ ইসলামের দাওয়াত দেয় নি। তবে আমার বন্ধুদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে। মুম্বাইয়ে এক ভদ্রলোক আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তবে তিনি আমাকে যথাযথভাবে বুঝাতে পারেননি। তাছাড়া কিছু মুসলমানের প্রতি আমার ব্যক্তিগত দূরত্বও ছিল। বলতে পারি ঘৃণাই ছিল। কারণ, আমরা যেখানে থাকি সেখানকার মুসলমানগণ সব ধরনের মন্দ কাজের সাথে যুক্ত। ক্রাইম করা, মদপান করা তাদের জন্য খুব সাধারণ ঘটনা। এই কারণে আমি কোনো মুসলমানকে পছন্দ করতাম না। যারা আমাকে ইসলামের কথা বলতো ইসলাম ধর্মের সাথে মূলত তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি তাদের মাঝে ইসলামের কিছুই খুঁজে পেতাম না। ফলে তাদের কথা আমাকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করতে পারেনি।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী শিক্ষা কোথায় পেয়েছেন?

উত্তর : ইসলাম সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন মুজিব ভাই। যখনই আমি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি মুজিব ভাই সমাধান করে দিয়েছেন। তাছাড়া বইপত্র পড়েও অনেক কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন : আপনি কখনও তাবলিগ জামাতে সময় লাগিয়েছেন?

উত্তর : জি, প্রতি মাসেই তিন দিনের জন্য জামাতে যাই।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পর আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছিল বলবেন কি?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পর আমার অনুভূতি হয়েছিল খুবই স্বস্তিদায়ক। কারণ তখন পরিপূর্ণ জীবনের একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। সমাজে কিভাবে চলতে হবে, মানুষের সাথে কিভাবে মেলামেশা করতে হবে, কিভাবে অন্যের সাথে লেনদেন করবো তার একটা পরিষ্কার দিকনির্দেশনা পেয়েছিলাম। ফলে আমার অন্তরে পরম শান্তি অনুভূত হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি কি আপনার পরিবারের লোকদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমার হযরত আমার অন্তর ও মস্তিষ্কে এই কথাটা ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন– মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য এমন কি তার পেশা ও পরিচয় হবে দাওয়াত। আজ আমরা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের কোনো ছায়া দেখতে পাচ্ছি না। এর বড় কারণ হলো– আমরা দাওয়াতের জায়গা থেকে সরে এসেছি। তিনি বলেন– তোমরা যদি দা'য়ী হিসেবে উঠে না দাঁড়াও তাহলে লবণের খনিতে যেভাবে কিছু পড়লেই লবণ হয়ে যায়, তেমনিভাবে তোমরাও অমুসলিমদের সমাজে থেকে তাদের মতোই হবে যাবে। তোমাদের মুখে ইসলামের শেণ্ঢাগান ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি একজন দা'য়ী হিসেবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। এর বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার স্ত্রী-সন্তানদেরকে ইসলামের মতো মহান সম্পদ দান করেছেন। আমার স্ত্রী এখন শুধু একজন মুসলমানই নয় বরং আমার দাওয়াতের সঙ্গীও। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গীত হোক। মুজিব ভাই বিভিন্ন দাওয়াতী কাজে আমাকে পরম আস্থার সাথে বারবার পাঠিয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা মুজিব ভাই এবং আমার হযরতের আশা কখনও ভঙ্গ করেননি।

প্রশ্ন: এ সম্পর্কে আমাদের দু'একটি ঘটনা বলুন!

উত্তর : মধ্যপ্রদেশের সৈয়দ বংশের এক কন্যা। সে এক হিন্দু ছেলের সাথে একবার দিল্লী চলে আসে। তারপর তারা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলে। বিয়ের পর মেয়েটি হিন্দুধর্মে চলে যায় এবং ছেলেটির সঙ্গে দিল্লীতে বসবাস

শুরু করে। সংবাদ পেয়ে মেয়েটির চাচা এবং মামা আমাদের হযরতের কাছে আসেন। হযরত আমাকে ফোন করেন। আমি এবং মুজিব ভাই সেখানে চলে যাই। আমরা মেয়েটির সাথে সাক্ষাত করে বলি, আমরা তোমার স্বামীর সাথে দেখা করতে চাচ্ছি, কিন্তু সে কোনভাবেই আমাদেরকে তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়। তার সাফকথা, আপনারা যদি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

হযরত তখন আমাদের ফোন করে বলেন– যদি এই দুজনকে কালেমা পড়িয়ে পুনরায় বিয়ে দিতে পার, তাহলে পেটভরে মিষ্টি খাওয়াবো। আমরা দুজন এদের পেছনে লেগে থাকি। তারপর মেয়েটিকে না জানিয়েই ছেলেটির অফিসে চলে যাই। আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম বৈঠকেই ছেলেটি কালেমা পড়ে নেয়। তারপর আমরা মেয়েটিকে পুনরায় তার ঈমান নবায়ন করি। জাফরাবাদে ডেকে এনে তাদের পুনরায় বিয়ে সম্পাদন করি। এখন তারা মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করছে। হযরত আমাদের এই সাধনায় খুবই আনন্দিত হন। আমরা হযরতের কাছে এসে উপস্থিত হলে আমাদের মাথায় চুমু খান এবং আমাদের পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ান।

একবার এক জজের কাছে হযরত আমাদের দাওয়াতের মিশন নিয়ে পাঠান। আলহামদুলিল্লাহ! আলোচনা-পর্যালোচনার পর সেই জজ সাহেবও ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্যি কথা কী, আমাদের হযরত যে বলেন– হেদায়েত তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নেমে এসেছে। আমরা যেখানে যাবো, যেখানেই চেষ্টা করবো সেখানেই হেদায়েত আমাদের হাতে ধরা দেবে। একবার ইশার নামাযের পর আমি জানতে পারলাম– একজন মুসলমান উকিল মুসলমান মেয়েকে শুদ্ধি করে এক হিন্দু ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে।

একথা শোনার পর আমার কতটা রাগ হয়েছিল ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। উকিলের ঠিকানা সংগ্রহ করে রাত সাড়ে দশটায় তার বাসায় পৌঁছি। আমি তাকে সোজাসুজি বলি, আপনি মুসলমান নন, কেননা আপনি একজন মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে দিয়েছেন। এখন তো আপনি নিজেও আর মুসলমান নন। আপনাকে কি মরতে হবে না? আমাকে ঠিকানা দিন এই ছেলে মেয়ে দুটি কোথায় থাকে? উকিল সাহেব বললেন, ফাইল আমার অফিসে। সকালে এসে ঠিকানা নিয়ে যেও।

আমি বললাম, রাতের মধ্যেই যদি এই ছেলে মেয়ে দুটি মারা যায়, তাহলে কী হবে? আমি তাকে চাপ দিতে থাকি। আমাকে এখনই ঠিকানা

দিতে হবে। আমি রাত সাড়ে দশটাতেই তাকে ধরে অফিসে নিয়ে যাই। ঠিকানা নিয়ে রাত সাড়ে এগারটায় তাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হই। তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বলি– রাতেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

কারণ, যদি এই রাতেই আপনাদের মৃত্যু হয়, তাহলে আপনাদের অবস্থা কী হবে! এভাবে তাদের সাথে কথা চলতে থাকে। রাত একটার সময় ছেলেটি কালেমা পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়। ছেলেটি ছিল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মুসলমান মেয়েটিও কালেমা ভুলে গিয়েছিল ফলে তাকেও কালেমা পড়াতে হলো। পরের দিন তাদের নতুন করে বিয়ে পড়িয়ে দিই। তারপর আমি আমার স্ত্রীকে এই মেয়েটির কাছে পাঠাতে থাকি। আমার স্ত্রী তাকে দীন শেখাতে থাকে। এখন আলহামদুলিল্লাহ মেয়েটি নামায পড়তে শুরু করেছে।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পর কি আপনাকে কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে?

উত্তর : ইসলামের মতো মহান নেয়ামত পাওয়ার পর যদি সামান্য কিছু বিপদাপদের মুখে পড়তে হয়, তাহলে সমস্যা কী? আসলে মূল্যবান জিনিস অনেক মূল্য দিয়েই কিনতে হয়। রূপার মূল্য কম, স্বর্ণের মূল্য অনেক। আল্লাহ তায়ালা তার অনেক বড় নেয়ামত এই বান্দাকে খুবই সস্তায় দান করেছেন। এ পথে খুব সামান্যই বিপদের মুখোমুখি হতে হয়ছে। প্রথমে যে সমস্যায় পড়েছিলাম তা হলো আমার ইনস্টিটিউট থেকে সকল ছাত্র চলে যায়। তারা বলতে থাকে পড়ালেখা করা এই মানুষটি এমন মূর্খ হয়ে গেল! ফলে আমার উপার্জনের পথে বিরাট সংকট দেখা দেয়। কিন্তু ঐ অবস্থায় আমাকে বেশিদিন থাকতে হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা খুব দ্রুত বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছাত্র পাঠিয়ে দেন। যারা চলে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে অন্যত্র ব্যর্থ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন বয়কট করেছিল। বাড়ি বানাতে গিয়ে কিছু ঋণ করতে হয়েছিল। পাওনাদাররা যখন জানলো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি, তখন তারা আমার সাথে কঠোর আচরণ শুরু করলো। কিন্তু এগুলো খুবই মানবিক বিষয়। একজন সাধারণ মানুষও এসব সংকটের মুখোমুখি হয়। এসব সঙ্কটকালে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুআর স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। দুআর প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়েছে।

প্রশ্ন: আপনার দাওয়াতে আরও কেউ মুসলমান হয়েছে কি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! সে সংখ্যা কম নয়।

প্রশ্ন: তাদের সংখ্যা কত হবে?

উত্তর : আমাদের হযরত বলেন, যারা এখনও মুসলমান হয়নি তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে, তাদের সংখ্যা তো কোটিকোটি। যারা মুসলমান হয়েছে তাদের সংখ্যা এদের তুলনায় অনেক কম। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি। তিনি আমাদের অন্যদের মুসলমান হওয়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি অসংখ্য শুকরিয়া।

প্রশ্ন: আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : পুরো মানবতাই এখন সত্যের তৃষ্ণায় অধীর। মরীচিকা দেখে তারা পানি মনে করে ছুটছে। কখনও এই ধর্মে কখনও ঐ ধর্মে। কখনও এই সিস্টেম আবার কখনও ঐ সিস্টেম, কখনও জয় গুরুদেব। আবার শ্রী ডি ওয়ালার বাবা। অথচ সর্বত্রই অন্ধকার। সত্য একমাত্র ইসলাম।

ইসলামই একমাত্র শান্তি ও স্বস্তির ঠিকানা। বর্তমানে এই অর্থকড়ির উত্তেজনাময় কালে সাইন্স এবং টেকনোলজির উৎকর্ষের যুগে মানুষ পূর্বের তুলনায় আরও অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত। আল্লাহর ওয়াস্তে এই উৎকণ্ঠিত মানবতার প্রতি আপনারা একটু দয়াপরবশ হোন। ইসলামের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে দুঃখী অস্থির মানবতার প্রতি সামান্য দয়ার হাত বাড়াতে আপনারা দাওয়াতী আসনে উঠে আসুন। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন।

প্রশ্ন: ইসলামকে জানার জন্য আপনি কী করছেন?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ! আমি নিয়মিত পড়াশোনা করছি। কুরআন শরীফ মুখস্ত করতে শুরু করেছি। আমার ইচ্ছা, আমি কুরআনের আলোকে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিব। এজন্যে কুরআন শরীফ মুখস্থ করাকে জরুরী মনে করছি।

প্রশ্ন: আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহু খাইরান।

উত্তর : আপনাকেও অনেক অনেক শুকরিয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, মে-২০০৮

চৌধুরী আব্দুল্লাহ সাহেবের সাক্ষাতকার

আমাদের শাইখ হযরত মাও. কালিম সিদ্দিকী দা. বা. বলেন, এই হিন্দুস্থানের লোকেরা রোগী মাত্র। তাদের শত্রুতা আর চক্রান্ত হলো ঐ রোগের হইচই। এই সব রোগের চিকিৎসা হলো ভালোবাসা আর সাহস । আরমুগানের পাঠকদের নিকট আমার আবেদন হলো, অমুসলিমদের যেন দুশমন না মনে করে; বরং রুগী মনে করে ভালোবাসার কথা দিয়ে তার চিকিৎসা করে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

চৌধুরী আবদুল্লাহ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু?

প্রশ্ন : চৌধুরী সাহেব! প্রতিটি কাজেরই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। কতদিন যাবত আপনার আলোচনা শুনছি। আব্বু প্রায়ই তার বয়ানে আপনার নাম ধরে আলোচনা করেন। আমি কয়েকবার ভেবেছি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব। অনেক দিন পর আজ সেই দিন এলো। আমাদের এখান থেকে আরমুগান নামে একটা মাসিক পত্রিকা বের হয়। আমি ঐ পত্রিকার পক্ষে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আরমুগানের সাথে আমার নতুন করে পরিচয় করানোর প্রয়োজন নেই। ব্যস্তার কারণে বরং কিছুটা অলসতার কারণে উর্দূ শেখা হয়নি। তবে খুবই যত্নের সাথে আরমুগান অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনি। আমি হাফেয ইদ্রীস সাহেব ও মাওলানা ওয়াসি সাহেবকে কতবার বলেছি আমরা যারা উর্দূ পড়তে পারি না তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করুন। আরমুগানের হিন্দী সংস্করণ বের করার ব্যবস্থা করুন। তাদের সাথে যখন কথা হয় তখন মনে হয় আমাদের ব্যথা তারা বুঝতে পেরেছেন। মনে হয় আগামী মাস থেকেই আরমুগানের হিন্দি সংস্করণ বের হতে শুরু করবে। কিন্তু কতদিন যাবত অপেক্ষায় আছি। বুঝি, তাদেরও অনেক ব্যস্ততা। নতুন একটি ম্যাগাজিন বের করা সহজ কথা নয়। আমি মাওলানা সাহেবকে বলেছি বেশি না পারি হিন্দি সংস্করণের জন্য অন্তত পাঁচশ সদস্য যোগাড় করা আমার দায়িত্ব, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ডাক একদিন অবশ্যই শুনবেন।

প্রশ্ন: নিরাশ হবেন না। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আপনার আশা পূর্ণ হবে। ঈদের পর আশা করছি আরমুগানের হিন্দী সংস্করণ বের হতে শুরু করবে।

উত্তর : আহমদ ভাই! আপনাকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবো যদি এ খবর সত্যি হয়।

প্রশ্ন: চৌধুরী সাহেব! আপনার বংশীয় পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : আমি ১৯৫১ সালের ৬ ডিসেম্বর এই ফুলাতেরই প্রতিবেশী গ্রামে এক জাট খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা ছিলেন একজন জমিদার। ইংরেজ আমলের ইন্টারমিডিয়েট পাস। কর্মজীবনে তিনি প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তার বয়স একশ' এক বছর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন আমার পিতাজী ছিলেন সেই স্কুলের হেড মাস্টার। এই স্কুলেই আমি প্রাইমারি এবং জুনিয়র হাই স্কুল পাস করেছি। তারপর এস. এস কলেজ থেকে হাইস্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। খান্দানি ঐতিহ্য হিসেবেই ব্যায়াম এবং বডিবিল্ডিংয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। ইন্টার পর্যন্ত মরুভূমিতে কুস্তি লড়েছি। কুস্তিযুদ্ধে অনেক পুরস্কার জিতেছি। উত্তর প্রদেশের বিহার অঞ্চলে প্রচুর নাম কামিয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই ছিলাম নির্ভীক এবং বীর স্বভাবের। আমার বাবা দুর্বল ও গরীবদের প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। প্রচুর গরীব শিক্ষার্থীর ফিস তিনি নিয়মিত নিজের পকেট থেকে আদায় করতেন। বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ছিল তার অভ্যাস। আমরা সব ভাই এই স্বভাবটা পিতাজীর কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি।

এই আবেগের কারণেই অসহায় নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক খুনি এবং বদমাশের সাথে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে মিশতে হয় কিছু বাজে মানুষের সাথে। তারপর এই অসৎসঙ্গ আমাকে সেদিকে টানে। এক সময় এসব অসৎদের সঙ্গেই আমার একটা স্থায়ী সম্পর্ক হয়ে যায়। সেই হিসেবেই পুরো এলাকায় আমার নাম ছড়িয়ে পড়ে। জানি না কত মানুষের অন্তরে আমার নাম একটি সাক্ষাত ভীতিকর মূর্তি হয়ে বসে আছে। পুলিশের অনেক লোক পর্যন্ত আমার নাম শুনে ভয় পায়।

ভাই আহমদ! অবস্থা এক সময় এতোটাই জটিল হয়ে যায়– একদিনের কথা, আমি খাতুলির থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ কিংবা কোতায়ালের কোনো লোক গেটের সামনে দাঁড়ানো ছিল। আমাকে দেখামাত্রই তারা ভেতরে চলে গেল এবং ফিসফিস করে কী সব বলতে লাগলো। না জানি

আবার কখন ধরে পঙ্গু বানিয়ে দেয়! মানুষ আমার নামে হিন্দু কায়স্থ সমাজে এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে থাকে। মানুষ আমার নাম শোনামাত্রই চাঁদা দিয়ে দেয়।

আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম কৃপা– এই অবস্থায়ও আমি সর্বদা নির্যাতিত ও অসহায়দের পাশে থেকেছি। এদের সাথেই আমি আমার জীবন-মরণের সার্থকতা ভেবেছি। এজন্য আমি প্রপার্টি ডিলিং করেছি। এটা খুব ভালো চলছে। কয়েকটি শহরে আমি আমার নামে কলোনী বানিয়েছি। সেগুলো খুব দ্রুত আবাদ হয়ে উঠেছে। গরীব দুঃখীদের জন্য আমি কাজ করতে পারছি এটাই আমার তৃপ্তি। আমার ব্যবসায়ও দ্রুত উন্নতি হয়েছে। তারপর ১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়েত নসীব করেছেন।

প্রশ্ন: মুসলমান হওয়ার ঘটনাটি বলুন।

উত্তর : কোনো নির্যাতিত কিংবা দুঃখী মানুষের প্রতি আমার কোনো সাহায্য হয়তো আল্লাহ তাআলার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তাই এই নাপাক বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুণা জেগেছে। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম খুবই রাগী। মাঝেমাঝে আমার রাগ এতোটাই চরমে উঠতো যে মনে হতো শরীরে আগুন জ্বলছে। একবার ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বললেন– বণ্ঢাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে। তারপর আমার রোগ ধীরেধীরে বাড়তে লাগলো। দেখা গেল সারা শরীরে ব্যাথা এবং একাধারে ব্যাথা বেড়েই চললো। এজন্য আমাকে ইনজেকশন নিতে হলো এবং এভাবে এটা অভ্যাসে পরিণত হলো। এক সময় দেখা গেল চারটি কোর্টভিন দুটোদুটো করে মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা নিতে হতো।

একদিনের ঘটনা। সন্ধাবেলা আমি ক্লিনিকে গিয়েছি ইনজেকশন নেয়ার জন্য। ক্লিনিকটি ছিল টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে। আপনার আব্বু মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব সেখানে ফোন করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ফুলাতে ফোনের ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া শহর থেকেও সরাসরি ফোন করার ব্যবস্থা ছিল না। বরং ডাক্তার সাহেবের ফোনে কলব্যাক করে কথা বলতে হতো। আপনার আব্বু তখন ফোন করার জন্য ক্লিনিকে বসে ছিলেন। আমি ডাক্তার সাহেবকে ইনজেকশন দিলাম। তিনি ইনজেকশন দুটি একসাথে আমার হাতে পুশ করে দিলেন। মাওলানা সাহেব এই ঔষধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষকে এই ইনজেকশন দেয়ার

পর অন্তত দশ ঘন্টা তাকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। অথচ দুটি ইনজেকশন নিয়ে আমি দিব্যি কথা বলছিলাম। আমার এই অবস্থা দেখে মাওলানা সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। মনে হলো যেন ইনজেকশন আমাকে নয় তাকে দেয়া হয়েছে। আমাকে বললেন– চৌধুরী সাহেব! আপনি তো নিজের প্রতি অবিচার করছেন। এই ইনজেকশন আপনি কেন নিচ্ছেন? বললাম– আমার সারা শরীরে ব্যথা। আমার রাগ অতিরিক্ত। ফলে সকাল-বিকাল আমাকে চারটা ইনজেকশন নিতে হয়।

মাওলানা সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন– আপনি দিনে অন্তত ২ বার আত্মহত্যা করে চলছেন। আপনি অন্য কোনো উপায়ে চিকিৎসা করছেন না কেন? এই ইনজেকশন আপনি এখনি ছাড়ুন। তারপর তিনি বললেন– আচ্ছা, আপনার এতো রাগ হয় কেন? আমি বললাম– যখন কোনো সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির উপর অত্যাচার চালায় তখন আমার মন চায় তাকে খুন করে ফেলি বা নিজের জীবনটা দিয়ে দিই। আর এসব করতে গিয়েই আমি শতশত মোকদ্দমায় ফেঁসে গেছি। এ-ও বললাম– কতবার এই নেশা কাটাবার জন্য মাসের পর মাস হাসপাতালে থেকেছি। হেকিম দেখিয়েছি। লাখ লাখ রুপি ঢেলেছি। যদি বলি– অন্তত দশ লাখ রুপি আমি এই চিকিৎসায় ব্যয় করেছি তাহলে মিথ্যা হবে না। মাওলানা সাহেব বললেন– আপনি থাকেন কোথায়? আমি বললাম, মাওলানা সাহেব! আপনি মনে হয় ফুলাতের লোক। তিনি বললেন– হ্যাঁ, আপনি কিভাবে চিনলেন?

আমি বললাম– ফুলাতের পথে আমি কিছু জমি খরিদ করেছি। সেখানেই আপনাকে আসা-যাওয়ার পথে দেখেছি। আমি আপনার প্রতিবেশী। আমার নামও হয়তো আপনি শুনেছেন। আমার নাম শোনামাত্রই তিনি বললেন– আচ্ছা, আপনিই সেই ব্যক্তি! আমাদের পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত যার নাম ছাপা হয়। বললাম– সেই অধমঅপদার্থ আমিই। মাওলানা সাহেব বললেন– আপনি তো জীবনে অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন এবার একটা মাস সময় আমাদের দেন। আপনি ফুলাতে আমাদের ঘরে আসুন। সেখানে আরামে খানাপিনা করবেন। আপনার চিকিৎসার সব দায়-দায়িত্ব আমার। আপনার কোনো পয়সা খরচ হবে না। আপনি আমার সাথে থাকবেন। মালিকের অনুগ্রহে আমি আশাবাদী এক মাসের মধ্যেই আপনি এই ইনজেকশনের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

মাওলানা সাহেব কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বললেন। তারপর আমাকে বললেন– কথা দিন, কবে আপনি ফুলাতে আসছেন? আমি বললাম– মাওলানা সাহেব! আমি আপনার ভালোবাসার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। এই মুহূর্তে আমি খুবই পেরেশানির ভেতর রয়েছি। বেশ কয়েকটি মামলা চলছে। এগুলোর হাজিরা থেকে মুক্ত হয়েই আপনার ওখানে চলে আসবো। আপনার কথা আমি অবশ্যই শুনবো।

মাওলানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং হৃদ্যতার কারণে তাঁর অস্থির চেহারাটি আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো। রাতে এক দুইবার অল্প ঘুম পেয়েছিল তখন স্বপ্নে দেখলাম– মাওলানা সাহেব আমার সামনে কাঁদছেন। তিনি আমাকে বারবার বলছেন– চৌধুরী সাহেব! নিজের জীবনের প্রতি যত্নবান হোন। নিজের প্রতি অবিচার করবেন না। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি ভাবছি, ভগবান! এ তোমার কেমন জগৎ সংসার! কিছু লোক অন্য মানুষের গর্দান উড়িয়ে নিজেদের স্বপ্ন নির্মাণ করছে আবার কিছু লোক অন্যের বেদনায় নীরবে অস্থির হয়ে কাঁদছে।

এই অস্থিরতার ভেতর দিয়ে আমি রাতটি পার করি। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে বাগানে পানি দেয়ার জন্য পাইপটা তুলেছি এমন সময় দরজায় নক হলো। দরজা খুলে দেখি হাফেয ইদ্রীস সাহেব দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে বললাম– আসুন মাওলানা সাহেব! ভেতরে ঢুকেই হাফেয সাহেব বললেন– ফুলাত থেকে এসেছি। তার হাতে একটি চিঠি ও ছোট একটি পুস্তিকা। পুস্তিকাটি হিন্দীতে লেখা, আমি বললাম– এই কি সেই দেবতাদের ফুলাত, যেখানকার একজন মহাত্মা অতিথির সাথে খাতুলিতে ক্লিনিকে সাক্ষাত হয়েছিল? যাঁর ভালোবাসা পুরোটি রাত আমাকে অস্থির করে রেখেছে? হাফেয সাহেব বলেন– তাঁর পক্ষ থেকেই একটি প্রেমপত্র নিয়ে এসেছি। আপনার ভালোবাসায় তিনিও গতরাতে একটুও ঘুমাতে পারেননি। হাফেয সাহেব চিঠিটি আমার হাতে দিলেন। আমার ভাতিজা বাগানে পানি দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাকলাম, বললাম– বেটা এসো, এক দেবতার পক্ষ থেকে প্রেমপত্র এসেছে। আমি পত্রটি ভালোবাসায় মাথায় ছোঁয়ালাম এবং চুমু খেলাম। তারপর খুলে পড়তে লাগলাম। মাওলানা আহমদ, আমি পত্রটি লেমিনেটিং করে সযত্নে এখনও আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সেই পত্রটি ছিল এই–

"আমার একান্ত প্রিয় ভাই চৌধুরীজী! তাঁর প্রতি সালাম যিনি সত্য পথের পথিক। ডাক্তার সাহেবের ক্লিনিকে আপনার সাথে দেখা হবার পর চলে এসেছি ঠিক কিন্তু আমার অবুঝ মন আপনাতে আটকে রয়েছে। রাতভর আপনার অবস্থার কথা ভেবেছি। যে ইনজেকশন আপনাকে দেয়া হচ্ছিল তার ফলশ্রুতিতে নেমে আসা অপেক্ষমান মৃত্যু আমাকে সারা রাত অস্থির করে রেখেছে। আমি জানি এই জীবন নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। কুরআন আমাকে জানিয়েছে মৃত্যু এক মুহূর্ত আগেও আসে না এবং তাকে পেছানোও যায় না। কিন্তু এই জীবনের পর একটি স্থায়ী জীবন আছে। সেখানে আছে অনন্ত সুখের স্বর্গ এবং অনন্ত দুঃখের নরক। নরকের একটি দুঃখ কিংবা এক পলের শাস্তি পুরো জীবনের অগ্নিদহনের চেয়েও ভয়াবহ। কানে শোনা কথা এবং চোখে দেখা ঘটনাও মিথ্যা হতে পারে কিন্তু আমার প্রিয় ভাই! ঈশ্বরের সত্য পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের কথায় কোনো মিথ্যা নেই। আপনি যদি মুসলমান না হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তাহলে আপনাকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্য আপনার এই প্রিয় ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং জীবনের প্রতি মমতা করে ঈমান কবুল করে নিন এবং মুসলমান হয়ে যান। সত্য দিলে পাঠ করুন– আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া পূজনীয় আর কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও সর্বশেষ পয়গম্বর।

আমার প্রিয় ভাই! আপনি যদি সর্বশেষ খোদায়ী পত্র এবং অন্তিম সংবিধান কুরআন শরীফকে মেনে চলার অঙ্গীকার করে এই কালেমা না পড়েন তাহলে আপনাকে নরকে জ্বলতে হবে। আমার ভাই! একবার ভেবে দেখুন, সেই নরক থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়! এই নরকে একবার প্রবেশ করার পর আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। আমার প্রিয় ভাই! আপনাকে কিভাবে বুঝাবো রাতটি আমার কিভাবে কেটেছে! রাত ১টার সময় আমি অস্থির হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। তারপর মালিকের সামনে মাথা রেখে আপনার জন্য দুআ করেছি। বলেছি, নির্যাতিত দুর্বলদের প্রতি অবিচার সইতে পারে না এবং নিজের ক্ষোভ ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে যে বান্দা নিজেকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে– হে মালিক! তোমার সে বান্দা তোমার হেদায়েত এবং করুণার কতই না যোগ্য! আমি আশাবাদী আমার মালিক এই দুঃখী বান্দার দুআ অবশ্যই শুনবেন।

আমার তো মনে হচ্ছে তিনি আমার প্রার্থনা শোনছেন। সুতরাং আপনি আপনার মুসলমান হওয়ার শুভ সংবাদটি আমাকে দিন। যেন আপনার এই প্রিয় ভাই অন্তরে সামান্য স্বস্তি পেতে পারে। আমি আপনাকে যে সর্বশেষ পয়গম্বরের কালেমার প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাঁর জীবন সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। কামনা করি আমার অন্তরের কথা আপনাকে স্পর্শ করুক। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও আপনাকে হেদায়েতের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদের মৃত্যু হোক হেদায়েতের উপর।

ওয়াস সালাম

আপনার ভালোবাসায় অধীর আপনার ভাই–

মুহাম্মদ কালিম

১৩ ডিসেম্বর– ১৯৯৭

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

উত্তর : চিঠিটি আমি আমার ভাতিজাকে জোরে– জোরে পড়ে শোনালাম। পত্রের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার অস্তিত্বের রন্ধ্রেরন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। আমি চিঠিটি পড়ছিলাম আর পত্রের নিখাঁদ ভালোবাসার ছোঁয়ায় আমার এক একটা লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর ভালোবাসার হাতে আমি এক বন্দি গোলাম। মন চাইছিল সঙ্গেসঙ্গে ছুটে গিয়ে হযরতকে জড়িয়ে ধরি। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করি। কিন্তু সেদিনই গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার তারিখ ছিল। মামলার সাক্ষীদের সাথে কথা বলার দরকার ছিল। উকিলের সাথেও দেখা করার প্রয়োজন ছিল। তাই আমি হাফেয সাহেবকে বললাম– রাতে কিংবা আগামীকাল আমি মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করবো। সেদিন মুজাফফরনগর থেকে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। এত রাতে মাওলানা সাহেবের কাছে যাওয়া ঠিক মনে হয়নি। রাতে দেরী করে শোয়ার কারণে ঘুম ভাঙ্গে সকাল দশটায়। এগারটার সময় ফুলাত গিয়ে শোনলাম– হযরত সফরে চলে গেছেন।

তারপর আট-নয়বার ফুলাত গিয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমার পরীক্ষা নিচ্ছিলেন– একবারও মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা হয়নি। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ। মাওলানা সাহেব বুলন্দ শহরে যাওয়ার কথা। তখন তিনি খাতুলি থেকে হাফেয ইদ্রীস সাহেবকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন– আজ সন্ধ্যায় আমি ফিরছি, আপনি আসলে দেখা হবে। সেদিনও আমার তিনটি মামলার তারিখ ছিল। আমি অনেক রাতে ঘরে ফিরি। রাত দশটায় প্রচন্ড শীতের মধ্যে মোটর সাইকেলে করে রওয়ানা দেই ফুলাতের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে আমার ভাতিজা।

আমার আসার সংবাদ শুনে মাওলানা সাহেব বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এখন যেটাকে খানকা বলা হচ্ছে সেখানেই প্রথম সাক্ষাত হয়। মাওলানা সাহেব আমাকে দেখেই বলেন– কালেমা পড়ে নিয়েছেন তো! আমি তাঁর সাথে একান্তে কথা বলার আবেদন জানাই। মাওলানা সাহেব আমাকে ঘরের ভেতর একটি কক্ষে নিয়ে যান।

আমি তাঁকে বলি– আপনার প্রেমপত্র আমাকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে। এখন আপনি চাইলে আমাকে বিক্রিও করতে পারেন। আবার মুক্তও করতে পারেন। প্রথমেই আমি ক্ষমা চাইছি সাক্ষাতে আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এর আগে আমি এগার-বারোবার এসেছি। আপনার সাথে দেখা হয়নি। আমার মুসলমান হওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে। সবার সামনে এমনকি মসজিদে আমাকে কালেমা পড়তে পারেন। এতেও আমি আনন্দচিত্তে রাজি আছি। আবার এ-ও হতে পারে, আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছেন। তাদের ছেলে-মেয়ে আছে। আমি এখন কালেমা পড়ে নিই। তারপর আমি আমার মামলাগুলো থেকে উদ্ধার হই। পরিবারের লোকদের প্রস্তুত করি। তারপর সকলের সামনে আমার মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করি। আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে। আপনার হয়তো জানা নেই, আমি জেলা শিবসেনার প্রধান ছিলাম।

১৩ ডিসেম্বর আপনার পত্র পাওয়ার পর সন্ধ্যায় এই পদ থেকে আমি ইস্তফা দিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন আমি মাওলানা সাহেবের পিছনেই অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেবো। মাওলানা সাহেব বললেন– প্রথমেই কালেমা পড়ে আমার অন্তর ঠান্ডা করুন। আমি বললাম– পড়িয়ে দিন। আমি আপনার চিঠিতেই সত্য দিলে কালেমা পড়ে নিয়েছি। আমার নামও রেখে ফেলেছি আব্দুল্লাহ। মাওলানা সাহেব বললেন– ঈমান প্রতিনিয়তই তাজা করতে হয় এবং তাজা রাখতে হয়। তারপর আমাকে তিনি কালেমা পড়ালেন এবং বললেন– আবদুল্লাহ খুবই সুন্দর নাম। আমাদের নবীজি বলেছেন– আবদুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান আল্লাহ তায়ালার কাছে খুবই প্রিয় নাম।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর: মাওলানা সাহেব আমাকে সময় করে নামায ইত্যাদি শিখতে বললেন এবং পরিবারের লোকদের জন্য ভাবতে বললেন। আলহামদুলিল্লাহ দুই মাসের মধ্যে আমার ছোট স্ত্রী এবং তার চার সন্তান ইসলাম গ্রহণ করে। মামলা-মোকদ্দমায় খুব পেরেশান ছিলাম। মাওলানা সাহেব বলেছেন– যখনই কোনো মোকদ্দমায় যাবেন দুই রাকাত সালাতুত তাওবা এবং সালাতুল হাজত

পড়ে যাবেন। আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দার তাওবা কবুল করেন তখন তার অপরাধ ফেরেশতাদের পর্যন্ত ভুলিয়ে দেন এবং আমলনামা থেকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমি এই প্রেসক্রিপশন সযত্নে ব্যবহার করেছি। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া। খুব সহজেই তিনি আমাকে সকল মামলা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখন মাত্র দুটি মামলা আছে।

প্রশ্ন: আপনার ইনজেকশনের কী হলো?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পর রমযান মাস এলো। মাওলানা সাহেব আমাকে ডাকলেন। বললেন– আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। কোনো মানুষ যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহলে পাহাড় কেটে দুধের নদী পর্যন্ত প্রবাহিত করতে পারে। এই ইনজেকশন একটি নেশা। ইসলামে নেশা হারাম। আপনি গুনাহ মনে করে খাঁটি দিলে তাওবা করুন। পুরো রমযান মাস রোযা রাখুন। রমযানের শেষ দিকে আমাদের সাথে মসজিদে এসে কয়েকদিন এতেকাফ করুন। আমি সাহস করলাম এবং প্রতিদিন সালাতুত তাওবা পড়ে এই অঙ্গীকার করতে লাগলাম– হারাম থেকে আমাকে বাঁচতেই হবে। ব্যথায় হাত-পা কাঁপতো। কিন্তু আমি সাহস হারাতাম না। নিজেকে বলতাম– জীবন চলে যাক তবু আমি হারাম কাজ করবো না। রমযানের শেষ দশকে মামলা-মোকদ্দমার কারণে ফুলাত আসতে পারিনি। মাওলানা সাহেব ইদ্রীস সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন ফুলাতের জামে মসজিদে তিন দিন কাটাবার জন্য। একথা যখন ফুলাতের লোকেরা শুনেছে তখন এ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে যে, একজন ডাকাত-বদমাশকে মসজিদে আনার কোনো মানে হয়?

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাকে ফোর্টভিনের আযাব থেকেও নাজাত দিয়েছেন। আহমদ ভাই! কী আশ্চর্যের বিষয়। মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের এক মাসের মধ্যেই আমি সেই ফোর্টভিন থেকে মুক্তি পেলাম বিগত বিশ বছরেও আমি যার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না।

প্রশ্ন: শিবসেনার মতো একটি সংগঠনের জেলা–দায়িত্বশীল ছিলেন আপনি। মুসলমান হওয়ার পর কি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না?

উত্তর : একেবারেই না। আমার কাছে মনে হয় আমি যেন স্বভাবজাতভাবেই মুসলমান ছিলাম। ইসলামের প্রতিটি কথাই আমার কাছে মনে হয় আত্মার খোরাক।

প্রশ্ন: আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর কী হলো?

উত্তর : সে এখনও মুসলমান হয়নি। আমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। সম্পদে তার যতটুকু পাওনা ছিল তা আদায় করে দিয়েছি। তার থেকে আমার এক কন্যা ও এক পুত্র আমার সাথে দিল্লীতেই আছে। মাওলানা সাহেবের পরামর্শে আমি দিল্লীতে একটি বাসা নিয়ে বসবাস করছি। এ সিদ্ধান্ত আমার কাছে খুবই স্বস্তিদায়ক মনে হয়েছে। তাছাড়া আমার মুসলমান হওয়ার বিষয়টিও প্রকাশ করা সহজ হয়েছে।

প্রশ্ন: আব্বু কি আপনাকে দাওয়াতের কাজে যুক্ত করেননি?

উত্তর : কেন নয়? তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আমি যা কিছু করি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই চেষ্টা করি। আমার ভাই একটি হাই স্কুল পরিচালনা করতেন। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিল মুসলমান। অন্যদিকে খাতুলিতে এক মুসলমান একটি জুনিয়র হাই স্কুল চালাতো। এই স্কুলের দায়িত্বশীল একজন হাজী সাহেব। তিনি খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। হেড মাস্টারের সাথে বিতর্কের সূত্র ধরে সেখানকার ধর্ম বিষয়ক তিনজন শিক্ষক দুই মাস ধরে কোনো ক্লাস নিচ্ছেন না। হাজী সাহেব বিষয়টি যাচাই না করে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন– আমি মাদ্রাসা রাখবো না। শুধু স্কুল চালাবো, তারপর তিনি তিনজন হাফেয ও মাওলানাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন। হঠাৎ করেই একদিন আমি আমার ভাইয়ের স্কুলে যাই। কিছু মুসলমান ছেলেকে স্কুল ছুটির সময় বাইরে আসতে দেখে তাদের কালেমা শুনাতে বলি। কালেমা তাদের মনে ছিল না একথা আমার মনে বড় আঘাত দেয়। আমি ভাইকে বলি আপনার স্কুল মুসলমান মহল্লায়। আপনি যদি এখানে কুরআন শরীফ ও উর্দূ শেখাতে শুরু করেন তাহলে আপনার ছাত্রসংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। কথাটা তার কাছেও যৌক্তিক মনে হয়।

তারপর আমি মাওলানা সাহেবকে শিক্ষক দিতে বলি। মাওলানা সাহেব মুসলিম স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হাফেয সাহেব ও মাওলানা সাহেবকে পাঠিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আমার ভাইয়ের স্কুলে এখন পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে কুরআন শরীফ এবং ধর্ম বিষয়ের পাঠ মাদ্রাসার মতোই চলছে। আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইও মুসলমান হয়ে গেছেন। তাঁর নাম আব্দুর রহমান। আমাদের দুই ভাইয়ের গল্প মাওলানা সাহেব মাঝে মধ্যেই ওয়াজের মধ্যে বলেন।

প্রশ্ন: আরামুগানের পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলুন।

উত্তর : কারও বাইরের অবস্থা দেখে প্রতিপক্ষ মনে করা, তাকে ইসলামের দুশমন বলে সিদ্ধান্ত নেয়া এটা ঠিক নয়। দৃশ্যত শিবসেনার জেলা দায়িত্বশীল

অসংখ্য অন্যায় অপকর্ম এবং মামলা-মোকদ্দমায় নিমজ্জিত আমার মতো এক অচ্ছ্যুত মানুষের কাছেও বাবরি মসজিদ শাহাদাতের পর ইসলাম বিরোধী পরিস্থিতি ছিল চরম ঘৃণাদায়ক।

আরেকটি মজার কথা বলছি– আমাদের খান্দানের এক ছেলে। আমার দুঃসম্পর্কের ভাই। তার বাবা ডাক্তার, হঠাৎ মুসলমান হয়ে আব্দুর রহমান হয়ে গেল। তারপর এসে ফুলাতে থাকতে লাগলো, তার জন্য আমার ভাবি খুব কান্নাকাটি করতো। তার কান্না দেখে আমারও মায়া হতো। কতবার ভেবেছি একবার গিয়ে এই হযরতজীকেও শেষ করে দিয়ে আসি। আমার মাথার উপর কতো মামলা ঝুলছে সেখানে না হয় আরেকটি বাড়বে। কিন্তু আহমদ ভাই! সত্য বলছি– আমি যখন ইসলাম পেলাম তখন আমার মনে হলো এটা ছিল আমার অন্তরের মমতা। আর আমার জন্ম হয়েছে এই মমতার উপর। বাবরী মসজিদ শাহাদাতের পর একজন শিবসেনার মুসলমান হওয়া আবশ্যই একটি আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু আমার কাছে এটা মোটেও আশ্চর্যের মনে হয় না। আমার কাছে মনে হয় না এটা বিস্ময়কর কিছু। বরং এটা আমাদের দেশের ত্রুটি। আমাদের হযরতের ভাষায়- ভালোবাসার আবেগই শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই জাতি সকল অস্ত্র ও সকল হামলা ঠেকাতে পারে কিন্তু ভালোবাসার আঘাতকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। হযরতের ভালোবাসা আমাকে এতোটাই গোলাম করে ফেলেছে, আমি রন্ধ্রেরন্ধ্রে তার কাছে বন্দি। কেবল ভালোবাসা আর খাঁটি মমতাই আমাকে কাবু করতে পেরেছে। আমি কোনো চমক দেখিনি, কোনো কথাও শুনিনি। আমাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছে কেবল ভালোবাসা আর দরদ।

ফুলাতের এক কসাই, নাম জামালুদ্দিন। খাতুলিতে ব্যবসা করে। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। একদিন সকাল দশটার সময় তার সাথে আমার দেখা। সে আমাকে বললো– চৌধুরী সাহেব! আপনি এখানে ঘুরছেন অথচ মাওলানা সাহেব এক সপ্তাহ যাবত বিছানায় পড়া। আহমদ ভাই কী বলবো! এ কথা শোনা মাত্রই আমার জীবন বের হবার উপক্রম। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে গেলাম। তারপর গাড়ি নিয়ে কাঁদতেকাঁদতে পৌনে বারোটার সময় ফুলাত গিয়ে হাজির হলাম। মাওলানা সাহেব তখন মুম্বাই থেকে আগত কিছু মেহমানের সাথে বসে কথা বলছিলেন। তার চেহারায় ছিল নিষ্পাপ হাসি। জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলাম।

বললাম– জামালুদ্দীন আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। সে বললো আপনি বিছানায় পড়ে আছেন। সারা রাস্তা আমি আল্লাহর কাছে এই দুআ করতে

করতে এসেছি হে আল্লাহ! আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তুমি হযরতকে বাঁচিয়ে রাখো। আপনি ভালো আছেন দেখে জীবন ফিরে পেয়েছি। বাকী জীবনেও দুআ করে যাবো আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মাওলানা সাহেব বললেন– প্রচন্ড গরমের মধ্যে পাঞ্জাবে এক সপ্তাহ সফর করতে হয়েছে। গরমের কারণে মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। আজ সকালে পাথর বের হয়ে গেছে।

আমাদের হযরত সত্যই বলেন– ভারতবর্ষের মানুষগুলো শত্রু নয়, বরং রোগী। তাদের শত্রুতা এবং চক্রান্ত হলো তাদের ব্যাধির চিৎকার। প্রয়োজন ভালোবাসা দিয়ে সাহস দিয়ে তাদের চিকিৎসা করার। আরমুগানের পাঠকদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ তারা যেন ভারতবাসীকে প্রতিপক্ষ না ভাবেন। বরং অসুস্থ মনে করেন। তাদের চিকিৎসা হলো ভালোবাসা মেশানো দুটো কথা। সাথে সাথে আমি সকলের কাছে আমার জীবনের সুন্দর সমাপ্তির জন্য দুআ চাই।

প্রশ্ন: চৌধুরী সাহেব! আপনাকে অনেক শুকরিয়া।

উত্তর : শুকরিয়া তো আপনাকে জানানো উচিত। আপনি আমাকে আরমুগানের মাহফিলে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, সেপ্টেম্বর– ২০০৮

মুহাম্মদ উমর (গৌতম)-এর আত্মজীবনী

বহু অমুসলিম ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে আমার এ কথা অনুভব হলো যে, আসল অর্থে ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছানো হয়নি। যার ফলে তারা ভুল ধারণার শিকার হয়। বাস্তবতা হলো ইসলাম সমস্ত মানুষের জন্য। মৌলিকভাবে ইসলাম মনবতার শিক্ষা দেয়। আজ পৃথিবীতে অনেক জাতি ও দেশ এই ইসলাম থেকে উপকৃত হচ্ছে আর মুসলমানরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে আর প্রশংসা করছে। এদেশে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ট হলো অমুসলিম সেখানে দাওয়াতের খুবই প্রয়োজন। আজও যদি মুসলমানরা দ্বীনের উপর চলে এবং তাদের চরিত্র অভ্যাসকে ঠিক করে এবং মানবতার খেদমতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানায় তাহলে হাজারো মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করায় সফল হত।

আমার জন্ম ১৯৬৪ সালে। উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার রাজপুত পরিবারে জন্মেছিলাম। এ বংশ গৌতম নামে পরিচিত। আমার পিতাজীর নাম জনাব ধনরাজ সিংহ গৌতম। তিনি একজন সরকারী অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। কয়েক শ' বিঘা জমির মালিক। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর ধন-দৌলত দান করেছেন। আমার প্রাথমিক শিক্ষা হাই স্কুল পর্যন্ত আমাদের গ্রামেই হয়েছে। পনের বছর বয়সে এলাহাবাদ চলে আসি। শুরু হয় উচ্চশিক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণীর পর নৈনিতাল জেলার পন্থনগর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে বি এস সিতে ভর্তি হই। সেটা ১৯৮০ সালের কথা। এই ভার্সিটিতে পড়াকালীনই ১৯৮৪ সালে আল্লাহ তায়ালা আমার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন। আমি মুসলমান হই। শ্যামপ্রতাপ সিং গৌতম থেকে মুহাম্মদ উমর গৌতম হই।

আমার বয়স যখন পনের তখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন বারবার উঁকি দিতে থাকে– আমাদের ঘরে আমাদের খান্দানে যে পূজা-পাটের পদ্ধতি চালু আছে, যে দেব-দেবীদের পূজা করা হচ্ছে তা কতটুকু সত্য? পনের বছর বয়স পর্যন্ত আসলে আমাকে জানানোই হয়নি যে আমরা হিন্দু কেন? আমাদের বিশ্বাস বা আকিদাই কী? আমার চারপাশের সামাজিক অবস্থা যতটুকু সম্ভব দেখেছি। চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার চিন্তা ও দর্শন আমার ভেতর নানা রকমের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেমন আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের মালিক কে? কে আমাদের রিযিক দেন? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় যেতে হবে? তাছাড়া আমাদের পূজার উপযুক্ত কে?

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজা একত্রে কিভাবে সম্ভব? ৮৬ লাখ যোনিতে পুনঃজন্মই বা কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া আমাদের মা-বাবাই তো আবার আমাদের সৃষ্টিকর্তা নন? এই সমাজে আমাদের মতই মানুষকে কেন অচ্ছুৎ মনে করা হয়? সব প্রশ্ন নানা দিক থেকে আমাকে অস্থির করে তোলে। এর উত্তর জানার জন্য আমি সর্বপ্রথম আমার পরিবারের শরণাপন্ন হই।

আমি আমার পরিবারের লোকদের নানা প্রশ্ন করতে থাকি। কিন্তু তারা কখনই আমাকে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। কারণ, তারাই তাদের ধর্মের বিষয়ে তেমন কিছু জানে না। না জানলে বলবেই বা কিভাবে? তারা আমাকে বুঝায়– বেটা! তোমার বাপ-দাদাদের ধর্ম যেটা সেটাই তোমার ধর্ম। তোমাকে এই ধর্মই মেনে চলতে হবে। তোমার জীবনের লক্ষ্য হলো নিজেকে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। বাবা-মার সেবা করতে হবে, অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু কোনভাবেই আমি জানতে পারিনি এই যে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমত– হিন্দুধর্ম যাকে বিভিন্ন বেদের নামে আমরা স্মরণ করে থাকি এর মূল শিক্ষাটা কী? এর প্রকৃত শিক্ষাই ছিল–

একম ব্রক্ষা দ্বিতীয় নাস্তি "ব্রক্ষ কেবল একজন তার কোনো দ্বিতীয় নেই।" এর অর্থ হলো– পূজা এবং বন্দেগী হবে কেবল একজন ঈশ্বরের। তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও নয়। বেদগুলোতে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। সেখানে আছে, জীবনে সফল হতে হলে একজন ঈশ্বরের ইবাদত করতে হবে। আমি আমার মনের প্রশ্নের জবাব জানার জন্য পরিবারে যারা বড় তাদের কাছে গেছি। যারা পরিবারে পূজা করানোর জন্য আগমন করতেন– মানে বড় বড় পন্ডিতগণ তাদের কাছেও গেছি। তাদের কেউ আমাকে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে আমি ধর্মীয় বইপত্র পাঠ করতে শুরু করি।

প্রথমেই আমি হিন্দুধর্মের বইগুলো পাঠ করি। বিশেষ করে গীতা মনোযোগ সহকারে পড়ি। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-পুরান এবং মনুসংহিতা সম্পর্কে বেশ কিছু দিন লেখাপড়া করি। এ সম্পর্কে বেশ কিছু বই-পুস্তক আমার পড়ার সুযোগ হয়। আমি বুঝতে চেষ্টা করি। প্রস্থ নগর ভার্সিটিতে পড়ার সময় বেশ কিছু বই আমি লাইব্রেরীতে বসে পড়ি। বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধ, বিবেকানন্দ পরম হংস রামকৃষ্ণ, গান্ধী, নেহেরু তাছাড়া বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকের জীবনীও আমি মনোযোগসহ পাঠ করি। আসলে আমি চেষ্টা করছিলাম এসব ব্যক্তিত্বের সফলতার মূল রহস্যটা আবিষ্কার করতে। কিন্তু অধিক পড়াশোনার কারণে আমার মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকে।

ফলে আমি সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যাই। ভাবতে থাকি, আমি সত্যকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন? আমি মনেমনে প্রস্তুত হয়ে পড়ি যে আমার ডিগ্রি কমপিণ্টট করার পর পিতাজীকে চিঠি লিখবো। তিনি আমার পড়াশোনার যে ব্যয়ভার বহন করছেন – সেজন্যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো যে, আমার জীবনের মূল্য লক্ষ্য সত্য সন্ধানের কারণে তার আশা ও কামনা পূরণ করতে পারলাম না। তারপর আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর মতো বাকি জীবনটা পার করে দেব। আমি মেডিটেশান এবং ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চেষ্টা করবো। আমি খুঁজে বের করবই তিনি কোথায় আছেন আর আমার কাছে তিনি কী চান।

যখন আমি এসব কথা ভাবছি তখনই আল্লাহ তায়ালা আমার মনের মধ্যে এ কথা উদয় করে দিলেন– তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার কাছে এ বিষয়ে প্রার্থনা করছো না কেন? তুমি কেন তার কাছে সত্যপথ ও সত্যের ঠিকানা চাচ্ছ না? তিনিই তো ইচ্ছা করলে তোমাকে এ পথে সাহায্য করতে পারেন। এ ভাবনার পর আমি রাতের বেলা প্রার্থনা করতে শুরু করি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার পথ সহজ করে দেন।

১৯৮৪ সালের কথা। আমার এক বন্ধু নাসির খান। বিজনুরে থাকে। আমার ক্লাসমেট, সেই আমার হেদায়েতের উপলক্ষ হয়েছিল। একবার আমি গাড়িতে একসিডেন্ট করি। পায়ে মারাত্মক আঘাত পাই। ফলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এজন্য আমাকে সাইকেল চালানো ছাড়তে হয়। নানা পেরেশানীর মুখোমুখি হতে হয়। আমার এ চরম দুর্দিনে নাসির খান আমাকে খুব সাহায্য করে। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কলেজে নিয়ে যাওয়া, মেস থেকে খাবার এনে আমার সাথে বসে খাওয়া এগুলো সব করতো। প্রায় এক মাস এভাবে চলতে থাকে। তার সেবায় আমি দারুণভাবে প্রভাবিত হই। একদিন তাকে কাছে বসিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি আমার প্রতি এতোটা আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করছেন– এই চরিত্র আপনি কোথায় পেলেন?

তিনি বললেন– গৌতম সাহেব! আমি এই কাজ কোনো লোভ কিংবা চাপে পড়ে করছি না। আমি একজন মুসলমান। আমার ধর্ম ইসলাম। আমাদের ধর্মের শিক্ষা হলো– একজন প্রতিবেশী সে প্রতিবেশীই। সে যেই হোক। তার সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। বিপদে তাকে সাহায্য করতে হবে। এটা একজন মুসলমানের মৌলিক কর্তব্য। আমার ভয় হয়, আমি যদি আপনাকে সাহায্য না করি, আমি যদি পাশে থেকেও আপনার কোনো উপকারে না

আসি, তাহলে হাশরের মাঠে আল্লাহকে মুখ দেখাতে পারবো না। আমাকে এজন্য জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

এই বন্ধুর কথায় আমি খুবই প্রভাবিত হই। ইসলাম সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি আমি জানতে পারি তা হলো– প্রতিবেশীর অধিকার এবং হাশরের মাঠের হিসাব-কিতাব। আমি আশ্চর্য হই এমনও কি হবে? তারপর নাসির খানের মাধ্যমে আমি ইসলাম সম্পর্কিত বইপত্র সংগ্রহ ও পড়াশোনা শুরু করি। আমার এই পড়াশোনা টানা ছয় মাস চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আমি বিভিন্ন ধরনের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বই পড়ে ফেলি। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি জানতে পারি। কুরআন শরীফ পড়ার আগে নাসির খান সাহেব আমাকে এতটুকুন অনুভূতি দেয়ার চেষ্টা করেন– কুরআন শরীফ এক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ। এটা সমগ্র মানবের হেদায়েতনামা। যখন আমি এ বিশ্বাস ও এখলাসের সাথে কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়তে শুরু করি, তখন আমার মনে উদিত পূর্বের সকল প্রশ্ন একটা একটা করে উড়ে যেতে থাকে। আল্লাহ বলেছেন– যারা হেদায়েত পেতে চায়, তারা হেদায়েত পাবে। এই অঙ্গীকার আমার জীবনে সত্য হয়ে উঠে। আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ, এত বড় নেয়ামত তিনি আমাকে দান করেছেন কোনরূপ চেষ্টা-সাধনা ও বিসর্জন ছাড়াই।

মুসলমান হওয়ার পর সর্বপ্রথম যাদের বিরোধিতার মুখোমুখি হই তারা হলো আমার ভার্সিটির বন্ধু-বান্ধব। তাদের প্রায় অধিকাংশই এসে জিজ্ঞেস করতো– এমন কী দায় পড়েছিল যে, তোমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হলো? ইসলাম ছাড়া কি আর কোনো ধর্ম ছিল না? আসলে এই বন্ধুরা জানতোই না ইসলামের শিক্ষা কী, ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিগুলো কী। কয়েকদিন পর কলেজের দেয়াল পত্রিকায় ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত আমার একটি ইন্টারভিউ ছেপে দেয়। লেখাটি ভার্সিটির কয়েক হাজার ছেলে পড়ে এবং পুরো ভার্সিটি জুড়ে হইচই পড়ে যায়। এমনকি বেরেলি থেকে প্রকাশিত অমর উজালা নামে একটি পত্রিকায় "গৌতম হলো উমর" শিরোনামে লেখা ছাপা হয়। বাতাসের মতো সংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নানা শ্রেণীর নানা লোক এমনকি সিআইডির লোকজন পর্যন্ত অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যেই আসতো আমি তাদের আমার হিসাব মতো জবাব দিতাম। আর এস এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকেরা বিষয়টি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না। তারা আমাকে হোস্টেল থেকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে মারধর করে। শাসিয়ে বলে, যদি দুই তিন দিনের মধ্যে পুরনো

ধর্মে ফিরে না আস, তাহলে তোমাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবো। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে– আমাকে এম এস সির ফাইনাল পরীক্ষা রেখে ভার্সিটি ছাড়তে হয়। আমি দিল্লী চলে যাই। এভাবে দুই তিন বছর কেটে যায়। ১৯৮৮ সালে জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ায় ইসলামিক স্টাডিজ এম এ ভর্তি হই। বাধ্য হয়ে আমাকে এগ্রিকালচার বিভাগ ছাড়তে হয়। পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রচন্ড বিরোধিতার মধ্যে পড়ি। তারা আমাকে বয়কট করেন। যে কারণে কয়েক বছর পর্যন্ত আমাকে পরিবার এবং খান্দানের সাথে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হয়। এভাবে অন্তত দশ-বারো বছর কেটে যায়। তারপর ধীরেধীরে অবস্থা স্বাভাবিক হয় এবং আসা-যাওয়া শুরু হয়।

দাওয়াতের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ; পরিবারের মধ্যে প্রথমে আমার স্ত্রী তারপর আমার মুহতারাম মা মুসলমান হন। আমার আত্মীয়-স্বজন সবার সাথেই আমার একটা দাওয়াতের সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। তাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। তখন দুঃখ পাই যখন দেখি, একদিকে ইসলাম যেমন একটি সত্যধর্ম, তেমনি তার শিক্ষাও পরম সুন্দর। অথচ এর বিপরীতে মুসলমানদের সামাজিক এবং চারিত্রিক অবস্থা বর্ণনাতীত। তারপরও এ পর্যন্ত প্রায় একশ' জনকে ইসলামের ভেতর আনার চেষ্টা করেছি এবং সফল হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

দাওয়াতের সুবাদে হাজারহাজার মুসলমান বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, তাদের কাছে যথাযথভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায়নি। ফলে তারা ভুল ধারণার শিকার। অথচ ইসলাম হলো– সকল মানুষের ধর্ম। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো মানবতাবোধ। মুসলমান না হয়েও পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বরা উপকৃত হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশ ও জাতি ইসলামের শিক্ষাদীক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছে। আর মুসলমানগণ দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন এবং প্রশংসা করছেন। দুআ করি আল্লাহ তায়ালা আমাদের সমাজকে ইসলামী সমাজ করে দিন। আমাদের এমন এক সমাজব্যবস্থা দান করুন যাতে মানুষের সামনে আমরা তাকে নমুনা হিসেবে তুলে ধরতে পারি। এমন কথাও জানতে পেরেছি– অনেকেই মুসলমান হয়েছেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর যথাযথ শিক্ষাদীক্ষার অভাবে সমাজে তারা স্বাতন্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে মানুষের মাঝে একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে– নতুন মুসলমানদের জন্যও এরা নমুনা হতে পারেনি।

আমি মনে করি– এখন যারা ইসলামের জন্য নানা ক্ষেত্রে কাজ করছেন বিশেষ করে যারা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছেন তাদেরকে ভাবতে হবে– অমুসলিমদের মাঝে আমরা কিভাবে দীনের কথা তুলে ধরবো। তাদেরকে অনাগত দিনে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার নির্মাণের কথা ভাবতে হবে। মুসলমান জাতি যেন দৃঢ়ভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অমুসলিম। এখানে দীনী দাওয়াত একটি অপরিহার্য বিষয়। এখনও যদি আমাদের মুসলমানগণ নিজেদের জীবনে ইসলামকে গ্রহণ করেন, চরিত্র কর্মসূচিতে ইসলামকেই প্রধান হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে তাদের উসিলায় লাখলাখ মানুষ ইসলামকে বুঝতে পারবে এবং সফলকাম হতে পারবে।

পৃথিবীর সামনে একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত, ইসলাম কাউকে জোর করে মুসলমান বানায় না; বরং এখানে বান্দা আল্লাহর সামনে বসে অঙ্গীকার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি আত্মার গভীরতা দিয়ে ইসলামকে না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আখেরাতের সফলতার সাক্ষাত পাবে না। পারবে না পূর্ণমাত্রায় মুসলমান হতে। চোখ বন্ধ করে কেউ যদি মুসলমান হয়েও যায়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা তার জন্য কোনভাবেই সহজ হবে না। সবশেষে আমি সকল অমুসলিম ভাইকে দাওয়াত দেব– আপনারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামকে পড়ে দেখুন, মুসলমানদের অবস্থা দেখে নয়। আমি এ-ও অনুরোধ করবো– ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে কেউ কোনো মন্তব্য করবেন না। আর মুসলমান ভাইদের কাছে আবেদন জানাবো– তারা যেন অমুসলমানদের সাথে তাদের আচার-আচরণ। লেন-দেনকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। অমুসলমানগণ যেন তাদের ধর্মচিন্তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। আপনার মন্দকর্মের কারণে মানুষ যেন আপনাকে এবং আপনার অপরাধে পুরো ইসলামকে ঘৃণা করতে না পারে। তাহলে সেটা হবে পৃথিবীর সবচে' বড় ট্রাজেডী। দুআ করি আল্লাহ তায়ালা আমাদের সত্যিকার অর্থে ইসলামকে বোঝার তাওফীক দিন। (আমিন)

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **জানুয়ারী– ২০০৯**

ভাগ্যবতী বোন যায়নাব (চৌহান)-এর
সাক্ষাৎকার

একদিন সকাল এগারটার সময় যায়নাব ঐ আয়শার কাছে গেল। তার চেহেরা আনন্দে চমকাতে ছিল। শুক্রবারের দিন ছিল, সে বলল, আপনাকে একটি খুশির কথা শোনাবো, এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও জান্নাতে যেতে আর কোনো অপেক্ষা করতে হবে না। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এলেন, আমাকে বললেন, আয়শা! এই দুনিয়া তো জেলখানা কতদিন পর্যন্ত এখানে থাকবে? সোমবারে আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে আসব। এ কথা বলে সে খুব হাসল। যায়নাব আরো তিনদিন আছে। সেখানে আবার দেখা হবে। সেখানে খুব সস্তির সাথে আনন্দের সাথে সোমবারে আসরের পর সে হঠাৎ করে বলতে লাগল, আমার নবী তো আমাকে নিতে এসে গেছেন। জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়তে লাগল। উঠতে চাইল কিন্তু পারল না। হটাৎ কালেমা শাহাদাত পড়ল, হেঁচকি এল এবং মৃত্যুবরণ করল।

আসমা আমাতুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

যায়নাব চৌহান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : যায়নাব আপা! আপনি আসাতে খুবই খুশি হয়েছি। আপনার সত্তাটাই আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আব্বুর কাছে যখন আপনার গল্প শুনতাম মনে হতো যেন রূপকথা শুনছি। আপনাকে দেখার খুব আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তায়ালা সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। আব্বু আমাকে বলেছেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনে যেন আরমুগানের পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরি।

উত্তর : সত্যি বোন আসমা! তোমাদের ছোটবেলার গল্প যখন হযরতের কাছে শুনেছি তখন আমাদের মতো জাহান্নামের পথের পথিকদের জন্য তা ঈমানের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত দুই বার হযরতের আলোচনায় আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমার একটা আফসোস ছিল তোমাদের দেখার। আল্লাহ তায়ালা আমার পুরনো ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

প্রশ্ন : এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তিনি আমাদের উভয়ের বাসনাই পূরণ করেছেন। আপনাকে হয়তো আব্বু বলেই দিয়েছেন, আরমুগানের জন্য আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলবো, সেজন্য আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো।

উত্তর : হ্যাঁ, আজ দিল্লীতে এ জন্য এসেছি।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশিয় পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি রাজস্থানের চুরু জেলার এক রাজপুত খান্দানের মেয়ে। আমার জন্ম ১৯৬৮ সালের ২০ শে এপ্রিল। আমার পিতাজী ছিলেন হাই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। পরে চুরুতে একটি ডিগ্রি কলেজ থেকে বি এ করি। হনুমানগড়ের একটি শিক্ষিত খান্দানে আমার বিয়ে হয়। সে সময়টা ছিল ১৯৯০ সালের ৬ জুন। আমার স্বামী মধ্যপ্রদেশে রতলামে নায়েবে তহশিলদার ছিল। তাছাড়া সে ছিল চমৎকার হকি খেলোয়াড়। তার চাকরির সূত্রও ছিল এটা। বিয়ের পর আমি আমার শ্বশুরালয়ে ২ বছর থাকি।

তারপর আমরা রতলাম জেলার একটি তফশিলে থাকতে থাকি যেখানে আমার স্বামী চাকরি করতো। বদলির সুবাদে আজীনে পরে মন্দসুরে ছয় বছর থাকি। এই সময়ে আমার ২টি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। ২০০০ সালে আমার স্বামীর প্রমোশন হয়। তারপর তহশিলদার হয়ে সপরিবারে আমরা ভুপাল চলে যাই। আমাদের পরিবার ছিল খুবই চমৎকার। পরস্পর ভালোবাসা, আস্থা কোনটারই কমতি ছিল না। হঠাৎ করে কী হলো, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাদের প্রতি কারও নজর লাগলো কিনা! যদি বলি আমাদের ঘরে হেদায়েতের বাতাস লেগেছিল তাহলেই মনে হয় ভালো হয়। আমার অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। বিপর্যয় আমার জীবনকে সাজিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এ কথাই তো শুনতে চাইছি। কীভাবে আপনি ইসলামের পথে আসলেন, কে আপনাকে এ পথ দেখালো? একটু খুলে বলুন।

উত্তর : আমার স্বামীর অফিসে একজন ব্রাহ্মণ ক্লার্ক ছিল। দেখতে যেমন অপূর্ব সুন্দরী, কাজকর্মেও তেমন অ্যাকটিভ। আমি যদি তাকে ওভার অ্যাকটিভ বলি তাহলেই মনে হয় ঠিক বলা হয়। মেয়েটির চালচলন, আকার-আকৃতি, গলার স্বর এক কথায় তার সব কিছুতেই ছিল ভয়ানক জাদু। বোন আসমা! আমার স্বামীর দোষ দেব না। বরং এই মেয়েটিই এমন ছিল, যার পরশে এলে পাথরও মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য। আমার স্বামী নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। নিজেকে সামলানোর খুব চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই তো নারী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর এক অদৃশ্য টান রেখেছেন। এই

অদৃশ্য টান থেকে সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তার সাথে ধীরে-ধীরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার ভালোবাসায় হারিয়ে যেতে থাকে। আমার একশ' ভাগ বিশ্বাস বিয়ে না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে শারিরীক কোনো সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু এ-ও তো সত্য একটি শরীরে দুটি অন্তর তো আর থাকে না। তার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর আমার প্রতি ভালোবাসায় ভাটা পড়তে থাকে। প্রথমে সে অনেকভাবেই চেষ্টা করে বিষয়টি গোপন রাখতে, কিন্তু অবশেষে বিষয়টি গোপন থাকে না। আমি জানতে পারি তার অফিসের সকলেই বিষয়টি জেনে গেছে। এমন একটি বিষয় মেনে নেয়া আমার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। এভাবে আমাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে চরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। অবশেষে আমার স্বামী সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করবে। এ উদ্দেশ্যেই আমার স্বামী আমাকে হনুমানগড়ে রেখে আসে।

২০০০ সালের মে মাস। আমার সন্তানদের ছুটি চলছিল। আমার স্বামী দিল্লীতে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, সেখানে একটি ট্রেনিংয়ে তাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। দিল্লীতে পৌঁছার পর সে তার বন্ধবী আশা শর্মাকে ডেকে পাঠায়। আশা শর্মা দিল্লীতে এসে তার সাথে হোটেলে একই কক্ষে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। দাবি করে আগে বিয়ে তারপর একসাথে থাকা। বাধ্য হয়ে আমার স্বামী হোটেলে দুটি কক্ষ ভাড়া নেয় এবং দুজন আলাদা কক্ষে থাকতে শুরু করে। তারপর উকিলদের সাথে পরামর্শ করে। একজন উকিল তাকে এই মর্মে পরামর্শ দেন– আইনি বিপদ থেকে বাঁচার সহজ পথ হলো তোমরা উভয়ে মুসলমান হয়ে যাও, তারপর বিয়ে কর। পরামর্শটি তার বেশ পছন্দ হয়। আশাকেও সে রাজি করিয়ে ফেলে। অবশ্য শুরুর দিকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মুসলমান হতে সে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে আমার স্বামীর পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে যায়। তারা উভয়ে দিল্লী জামে মসজিদে চলে যায়। সেখানকার ইমাম বোখারী সাহেব তাদের মুসলমান করতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর আমার স্বামী আশাকে নিয়ে বিভিন্ন মসজিদে যায়। কিন্তু কোনো ইমামই তাদের মুসলমান করতে এবং কালেমা পড়াতে রাজি হননি।

তখন একজন উকিল আমার স্বামীকে পরামর্শ দেন, পুরনো দিল্লীতে সরকারি রেজিস্টার্ড কাজী আছে। তারা বিয়ে পড়ান। আমার স্বামী সেই কাজীর ঠিকানা নিয়ে পুরান দিল্লীতে চলে যায়। কাজী সাহেব আমার স্বামীকে

বলেন, প্রথমে আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণের হলফনামা সরকারি উকিলের মাধ্যমে তৈরি করে নিয়ে আসুন, তারপর বিয়ে হবে। আমার স্বামী বলে, আপনি আমাদের মুসলমান করুন তারপর হলফনামার ব্যবস্থা করবো। কাজী সাহেব তাদের মুসলমান বানাতে অস্বীকার করেন এবং পরামর্শ দেন আপনারা মাওলানা কালিম সিদ্দীকির কাছে চলে যান। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে তারা ফুলাত চলে যান। ফুলাত যাওয়ার পর জানতে পারেন হযরত দিল্লী চলে গেছেন। সেখানে অবস্থানরত এক মাওলানা তাদের কালেমা পড়িয়ে দেন এবং বলেন কালেমা পড়ার জন্য মাওলানা সাহেবের উপস্থিতি জরুরী নয়। এবার আপনারা মিরাঠ অথবা দিল্লী গিয়ে সরকারি কোনো নোটারির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি করে নিন। সাথে মিরাঠের গুপ্তাজির ঠিকানাও বলে দেন। ঠিকানা নিয়ে তারা মিরাঠ চলে যায়। হলফনামা তৈরী করার পর কাজী সাহেব তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেন। এ-ও বলে দেন– আদালতে গিয়ে আপনাদের বিয়ের বিষয়টি রেজিস্টার্ড করিয়ে নিন।

আশা শর্মা তখন আমার স্বামীকে বলে, মুসলমান যখন হলামই তখন তো ইসলাম সম্পর্কেও জানা দরকার। তারপর সে বাজার থেকে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে। হিন্দী ভাষায় অনূদিত একটি কুরআন শরীফও সংগ্রহ করে। জনৈক ব্যক্তি তখন তাকে মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে দেখা করতে বলে। উখলায় কোনো একটি মসজিদে অনুসন্ধানের পর হযরতের সাথে দেখা হয়। মাওলানা তাকে 'আপকি আমানত' বইটি পড়তে দেন। আর বলেন– নিশ্চয়ই নিজের খান্দান, ফুলের মতো সন্তান এবং এমন একজন সৎ স্ত্রীকে ছেড়ে আসা খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু আপনারা যদি সত্য দীলে মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে এই বিপর্যস্ত জীবনের মালিক যিনি তিনি চাইলে এই জীবনে আবার সৌন্দর্যও ফিরিয়ে দিতে পারেন।

বিশেষভাবে আমার স্বামীকে বলেন, আপনার উচিত আপনার প্রথম স্ত্রী, আপনার সন্তান এবং পরিবারের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া। আর এখন থেকেই তাদের জন্য অন্তত হেদায়েতের দুআ শুরু করে দিন। আমার স্বামী বলেছে, মাওলানা সাহেব তাকে কুরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছেন– যে কোনো পুরুষ কিংবা নারী ঈমানদার হওয়ার পর যদি নেক আমল করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্র জীবন দান করেন।

আসমা আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

যায়নাব : আয়াতটির তরজমা একটু আমাকে বলুন।

আসমা আমাতুল্লাহ : "যে কোনো পুরুষ কিংবা নারী নেক আমল করবে এবং সে ঈমানদার তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্র জীবন দান করেন।"

যায়নাব : হ্যাঁ, একেবারে এ আয়াতটিই। আমার স্বামী বলেছে, এই আয়াতটি তার জীবনকে আলোকিত করে দিয়েছে। পুরো আয়াতটি তার মুখস্থ।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, তারপর বলুন আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন? এটা তো আশা শর্মার ইসলাম গ্রহণের গল্প বললেন।

উত্তর: হ্যাঁ বোন, আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আশার ইসলাম গ্রহণের সাথেই তো জড়িয়ে আছে। পরে যা ঘটেছে তা হল এই- আমার স্বামী ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার তেমন কোনো সুযোগ পেল না। কিন্তু ইসলামকে জানার আগ্রহ আশার মধ্যে ছিল অসামান্য। সে এ সম্পর্কে যতই পড়ছিল ইসলাম ততই তার অস্তিত্বের গভীরে বিস্তার করছিল। তারপর আমার সন্তানদের ছুটি শেষ হলো। স্বামীরও ছুটি শেষ। ছুটির পর সে ভুপাল চলে গেল। কিন্তু আমাকে রেখে গেল হনুমানগড়েই। আমার সাথে তার যোগাযোগও কমে গেল। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে আমার ছোট ভাইকে ভুপাল পাঠালাম।

কাকতালীয়ভাবে সেদিন রাতে আশা ঘরেই ছিল। তার ইসলামী নাম আয়েশা। আমার ভাই আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো– আপনার ঘরে রাতের বেলা এই মেয়েটি কে? আমার স্বামী বললো, আমার অফিসে কাজ করে। অফিসিয়াল কাজে তাকে ডেকেছি। আমার ভাই এর প্রতিবাদ করে এবং তার সাথে রীতিমত ঝগড়াঝাটি হয়। তৃতীয় দিন ফোন করে সে আমাকে ভুপাল যেতে বলে। আমি আমার পিতাজীকে সাথে নিয়ে ভুপাল যাই। কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে আমার স্বামী ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত তার কাগজগুলো আমার সামনে ছড়িয়ে দেয়। আমার জন্য এর চেয়ে বড় দুঃখের বা বেদনার আর কী হতে পারে! আমার পিতাজী উকিলদের সাথে পরামর্শ করলেন। এফ আর আই করলেন। কয়েকদিন

আদালতে গেলেন। পুলিশ আসলো এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। কয়েকদিন পর সে জামিনে মুক্তি পেল। কিন্তু খেসারতস্বরূপ তাকে চাকরি হারাতে হলো।

আমার ভালোবাসায় আমার পরিবারের লোকেরা আমার স্বামীর শত্রু হয়ে উঠলো। তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা দায়ের করলো। জীবনটা তখন তার জন্য বিভীষিকা হয়ে উঠলো। এ সময় আশার একমাত্র চিন্তা ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল ইসলাম। সে গভীর মনোযোগসহ ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছিল এবং সে পরম ধার্মিক হয়ে উঠলো। ইতোমধ্যে তার চাকরিও চলে গিয়েছিল। ফলে ঘরে বসে সে কুরআন শরীফ পড়া শিখলো। মুসলমান মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করলো। তাদের ধর্মীয় সভা-সমাবেশে যাওয়া আসা-যাওয়া করতে লাগলো। পর্দা করতে লাগলো।

এদিকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই ছিল তুমুল। আমার শ্বশুরালয়ও ছিল আমার পক্ষে। অবস্থা যখন এমন তখন আমার স্বামী ও আয়েশা মিলে পরামর্শ করলো বিষয়টি দিল্লী গিয়ে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীর সাথে আলোচনা করা দরকার। তারা দিল্লি চলে গেল। আয়েশা হযরতকে বললো– হযরত! আলহামদুলিল্লাহ আমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ভালোই ধারনা লাভ করতে পেরেছি। আমার অবস্থা এখন এমন যদি পুরো জীবনটা জেলখানায় কাটাতে হয়; কিংবা যে কোনো ধরনের বিপদাপদে কাটাতে হয় আমার ঈমান নিরাপদ থাকবে এবং আমি এর বিনিময়ে পরকালে যে বেহেশত লাভ করবো সেই তুলনায় এ কষ্ট খুবই সামান্য।

এজন্য আমার মনের কথা হলো– এর প্রথম স্ত্রী যার সাথে এ দীর্ঘ একটা সময় পার করেছে– তাদের পরস্পরে আস্থা ও ভালোবাসা ছিল। এখানে বেচারীর কোনো দোষ নেই। সুতরাং আমার স্বামীর উচিত তার প্রথম স্ত্রীর সাথে গিয়ে থাকা। আমার মনের কামনা একটাই তাঁর ঈমান যেন মজবুত থাকে। সে যেন তার স্ত্রীকেও মুসলমান বানানোর চেষ্টা করে এবং মুসলমান বানিয়ে নিয়ে পুনরায় বিয়ে করে। তারপর আমাকে চাইলে রাখতে পারে আর না চাইলে ছেড়ে দিতে পারে। এজন্য আমি মনে করি কিছুদিনের জন্য আমার স্বামী জামাতে চলে যাক। যেন স্ত্রীর কাছে গিয়ে আবার মুরতাদ না হয়ে যায়।

আয়েশার কথা শুনে মাওলানা সাহেব খুব প্রশংসা করেন এবং তার কথায় একমত হন। তারপর আমার স্বামীকে চল্লিশ দিনের জামাতে নিযামুদ্দীন

পাঠিয়ে দেন। তার জামাত গুজরাটে কাজ করে। জামাতের অধিকাংশ সদস্যই ছিল হায়দারাবাদের। তাদের সাথে তার সময় চমৎকার কাটে।

এ সময় খুব ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখে। আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম তার অন্তরে স্থান করে নেয়। জামাত থেকে ফিরে আসার পর সে আয়েশার কাছে যায়। আয়েশা তাকে হনুমানগড়ে গিয়ে আলোচনা করতে বলে। কিন্তু আমার স্বামী এতে সাহস করে না। এদিকে আয়েশা একজন ভালো দা'য়ী হয়ে যায়। এরই মধ্যে ওর প্রচেষ্টায় ওর ছোটবেলার কয়েকজন সখী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আয়েশাই আমাকে ফোন করে। ফোনে বলে "আপনি মাসুদ সাহেবের (আমার স্বামীর ইসলামী নাম) সাথে আর কতদিন লড়াই করবেন? আর কতদিন আপনাদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলবে? আপনি দশ মিনিট আমার কথা শুনুন। একদিনের জন্য ভুপাল চলে আসুন। আমি মাসুদ সাহেব থেকে আলাদা হতে প্রস্তুত আছি।" শুরুর দিকে আমি তাকে খুব গালাগালি করতাম। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দী ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। সে আমাকে বারবার ফোন করতে থাকে। আমি যখন কোনমতেই তার কথা মানতে রাজি হচ্ছিলাম না তখন সে আমাকে বললো– ঠিক আছে আমি আমার আল্লাহকে বলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

পরে আয়েশার কাছে জেনেছি সে দুই রাকাত সালাতুল হাজত নামায পড়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছে– হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভালোবাস। তুমি তার অন্তরকে নরম করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার হেদায়েতের ফায়সালা করে দাও। তুমি তাকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও।

তারপর থেকে সে সবসময় তাহাজ্জুদ পড়ে আমার জন্য দুআ করে। কী বলবো বোন আসমা! এই বান্দীর সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক ছিল অভিমানের। তার দুআ আমার জন্য গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ালো। তিন দিন পর আমার মন তার সাথে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। আমি আমার সন্তানদের রেখে আমার ভাইকে সঙ্গে করে সেখানে চলে গেলাম। আমার সাথে আমার স্বামীর সাক্ষাত করার সাহস ছিল না। আয়েশাই আমার কাছে এলো। আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিল। আমাকে সে বুঝালো– আপনাকে আপনার স্বামীর সাথে থাকার একটাই পথ ইসলাম। আগে ইসলাম গ্রহণ করুন। তারপর পুনরায় বিয়ে সম্পাদন করে তার সাথে থাকুন। এতে

প্রয়োজনে আমি নিজেকে আপনার স্বামীর পাশ থেকে সরিয়ে নিতে প্রস্তুত আছি। সে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলো, আমাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে লাগলো। জান্নাত-জাহান্নামের কথা শোনাতে লাগলো। তার কথাগুলো ধীরে-ধীরে আমার অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু হলো। ভাবলাম আমি মুসলমান হয়ে যাই। আমি তাকে বললাম– আমি মুসলমান হতে প্রস্তুত। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার স্বামীকে ফোন করে নিয়ে এলো। একজন মহিলা এবং তার স্বামীকে ডেকে পাঠালো। মহিলার স্বামী একজন হাফেয। তারা এসে আমাকে কালেমা পড়ালো এবং মোহরে ফাতেমী দিয়ে পুনরায় বিয়ে পড়ালো। তারপর সে একটি আলাদা কামরা যোগাড় করে আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল। কয়েকদিন ফাতেমা আপা যার ঘরে নিয়মিত এজতেমা হতো তার ঘরে থাকলো।

তারপর নিজে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া নিল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত সামান্য সময়ের জন্য সে আমার ঘরে আসতো। আমার খোঁজ-খবর নিত। আমাকে মোবারকবাদ জানাতো। সে বলতো! বোন যায়নাব! তুমি যে কত ভাগ্যবতী। আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তোমাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছেন। এর উপহার অসামান্য। কিন্তু এই ঈমান তখনই মূল্য পাবে যখন তুমি তাকে জানবে– পড়বে। আসলে আয়েশা ছিল এক অদ্ভূত ধরনের মেয়ে। তার আত্মা তখনই ছিল বেহেশতে। কেবল শরীরটা ছিল দুনিয়াতে। সে এই পার্থিব জীবনকে একটি ধোঁকার ঘর এবং সামান্য সময়ের একটি সফরের বেশি মনে করতো না। তার কথায় সততা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা এমনভাবে উপচে পড়তো– এক সময় আমার কাছে মনে হতো এই মেয়ে 'পৃথিবীতে আমার সবচে' কল্যাণকামী।

এক সপ্তাহ পার হবার পর সে বললো– আজ থেকে আমি আর এই ঘরে আসবো না। এখন থেকে আপনি আমার ঘরে আসবেন। আমি তার ঘরে যেতে লাগলাম। এরই মধ্যে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যত মামলা ছিল সব তুলে নিলাম। আমার স্বামী যখন অফিসে থাকতো, তখন কয়েক ঘন্টা আমি আয়েশার কাছে কাটাতাম। সে আমাকে কুরআন শরীফ শিখিয়েছে। উর্দূ শিখিয়েছে। একদিন সকাল এগারটার সময় আমি তার ঘরে গেলাম। তার চেহারা তখন আনন্দ উজ্জ্বল। সেদিন ছিল শুক্রবার। সে আমাকে বললো, তোমাকে একটি খুশির খবর দিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত এবং বেহেশতে যাওয়ার জন্য আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি; আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ এনেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন– আয়েশা! এই দুনিয়া হলো কয়েদখানা। এখানে তুমি আর কতদিন পড়ে থাকবে? সোমবার আমি তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যেতে আসবো। এ কথা বলে সে খুব হাসলো এবং বললো– বোন যায়নাব! আর মাত্র তিন দিন। তারপর সাক্ষাত হবে বেহেশতে। সেখানে আমরা খুব সুখে থাকবো। সেখানে কোনরূপ দুশ্চিন্তা থাকবে না। তার কথাবার্তায় আমি খুবই বিস্মিত হচ্ছিলাম। পরের দিন আমি তার ঘরে গেলাম। তাকে বেশ উজ্জ্বল এবং উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছিল। আমাকে কুরআন শরীফ পড়ালো। বললো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান দিয়েছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে দাওয়াতের মাধ্যমে অন্যদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার।

সোমবার যখন আমি তার ঘরে গেলাম– দেখলাম একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি ডাকলাম। বললাম– আয়েশা তোমার কী হয়েছে? আয়েশা বলল– সকাল থেকে জ্বর। আমি তাকে খুব পীড়াপীড়ি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ওষুধ খাওয়ালাম। বললাম– তুমি বললে আমি এখানে থেকে যাই অথবা আমার ঘরে তুমি চলো। জ্বর নিয়ে একাকী থাকা ঠিক নয়। সে বললো, ঈমানদার একা হবে কেন? তারপর সে এই কবিতা পড়লো–

তুম মেরে পাস্ হোত হো, জব দোসরা কোয়ী নেহী যেতা।

"যখন আমি থাকি একা, পাশে থাকো তুমি।"

আসমা আমাতুল্লাহ : আসলে কবিতাটা হবে– তুম মেনে

পাস হোতা হো, গোয়্যা জব কোয়ী দোসরা নেহী হোতা।

যায়নাব : হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। সে যাই হোক, আমি সেখান থেকে চলে এলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম– তার সাথে আমি ঘরেই অবস্থান করছি। হঠাৎ অনিন্দ সুন্দর এক রূপময় হযরত আগমন করলেন। তাঁর সাথে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীও আছেন। আমাকে বলা হলো ইনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয়েশাকে নিতে এসেছেন। তারপর তিনি আয়েশার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেখার কারণে আমার মধ্যে যে আনন্দ থাকার কথা তা ছিলো না, বরং ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড বেদনা অনুভূত হতে লাগলো। রাত তখন তিনটা। উঠে তাহাজ্জুদ পড়লাম।

আল্লাহ তায়ালার কাছে খুব কান্নাকাটি করলাম। ভোরে আয়েশার ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম প্রচন্ড জ্বর। মাথায় পানির পট্টি দিলাম। আয়েশা আমাকে বললো– বোন যায়নাব! আমি আপনার জীবনকে বিরান করে দিয়েছি। আমাকে মাফ করে দেবেন, আল্লাহর দোহাই আমাকে মন থেকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এই কষ্ট ও সংকটের পর আপনি যে ঈমান লাভ করেছেন– খুবই সহজে লাভ করেছেন। আপনার প্রতি আমার জীবনের শেষ অনুরোধ রইলো– আপনার তিন সন্তানকেই আলেম বানাবেন। আল্লাহর পথের দা'য়ী বানাবেন। এরা দুনিয়াতে দীনের কাজ করবে। মৃত্যুর পর আপনি আপনার আমলনামায় নেকীর এক বিশাল ভান্ডার পাবেন। আমি তাকে কিছু খেতে বলি। সে দুধ পান করতে চায়। আর বলে, আমাদের নবীজি বলেছেন– দুধ খুবই উত্তম রিযিক। একই সাথে খাবার এবং পানীয়ের কাজ করে। আমি তাকে দুধ দিলাম। দুধ গরম ছিল। সে বললো– একটু ঠান্ডা করে দিন। হাদীস শরীফে অতিরিক্ত গরম খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমি দুধ ঠান্ডা করে দিলাম। আস্তে আস্তে শরীরের দুর্বলতা বাড়তে লাগলো। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার মাথা কোলে তুলে আমি দাবাতে লাগলাম। আসরের পর হঠাৎ করে বলে উঠলো– এই দেখুন! আমার নবী আমাকে নিতে এসেছেন। তারপর সে চিৎকার করে দরূদ শরীফ পড়তে থাকে। ওঠে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু তার শরীরে বসার মতো শক্তি ছিল না। হঠাৎ কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে দুইবার হেঁচকি তুলে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : জানিনা, কিভাবে যেন ফাতেমা আপা এসে উপস্থিত হলো। তিনি সবাইকে খবর দিলেন। তার কফিন থেকে আশ্চর্য ধরনের সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। শুধু ঘর নয়, পুরো মহল্লা যেন সুগন্ধিতে ভেসে যাচ্ছিল। জানাযায় প্রচুর লোক হয়েছিল।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী কি আয়েশাকে তালাক দিয়েছিলেন?

উত্তর : আসলে আয়েশা আমার স্বামীকে চাপ দিচ্ছিলেন তালাক দেয়ার জন্য। কিন্তু সে তালাক দেয়নি। তার ইন্তেকাল আমার স্বামীকে চরমভাবে আহত করেছে বলতে পারি। তার জীবনটাই খামুশ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: আপনার কেমন লেগেছে?

উত্তর : এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর যে কোনো নারীর জন্যই সতীন হলো জীবনের সবচে' বড় কাঁটা, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন–আয়েশার ইন্তেকালে আমি বেশি দুঃখ পেয়েছি না আমার স্বামী! তবে

আমি অবশ্যই একথা বলতে পারি আমাকে যদি একশ'বার কসম দিয়ে বলা হয়– এই পৃথিবীতে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ কে, তাহলে আমি কোনরকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলবো, এই পৃথিবীতে আমার সবচে' প্রিয় এবং সবচে' কল্যাণকামী মানুষ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আয়েশা। আয়েশা ছিল মাটির পৃথিবীতে একজন জীবন্ত ওলী। বোনা আসমা! সত্যি কথা কি, আমার স্বামীর সাথে সাময়িক বিচ্ছেদের সময় আমি যে পরিমাণ কান্নাকাটি করেছি, আয়েশার ইন্তেকালে তারচে' একশ'গুণ বেশি কেঁদেছি।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানদের কী লেখা-পড়া শিখিয়েছেন?

উত্তর : আমার সন্তানদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। দুই ছেলের নাম রেখেছি হাসান ও হুসাইন। তাদের উভয়কে একটি বড় মাদ্রাসায় ভর্তি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! হাসান ছাব্বিশ পারা ও হুসাইন চার পারা মুখস্থ করেছে। আর মেয়েটার নাম ফাতেমা। সে-ও ষোল পারা হেফয করেছে। আমার আশা তারা আলেম হবে। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী রহ.-এর মতো মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আয়েশার ইন্তেকালে সে প্রচন্ড রকমের আঘাত পেয়েছে। বারবার শুধু বলে দুনিয়া থেকে অন্তর উঠে গেছে। এখন আল্লাহ তায়ালা ঈমানের সাথে মৃত্যু দিলেই ভালো। যখন খুব বেশি পেরেশান হয়ে পড়ে তখন হযরতের কাছে পাঠিয়ে দিই। তিনি তাকে দাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করেন। এবারও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওয়াদা করেছে আমাদের সাথে হাসিখুশি থাকবে।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী কি আব্বাজানের কাছে আসা-যাওয়া করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আয়েশাও আপনার আব্বাজানের মুরীদ ছিল। আমি এবং আমার বাচ্চারাও মুরীদ। আমি প্রথমে যখন মুরীদ হওয়ার কথা বলি তখন তিনি অস্বীকার করেন। বলেন, মুরীদ অবশ্যই হওয়া চাই কিন্তু কোনো কামেল পীর এবং আল্লাহ ওয়ালার হাতে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানুষ যেমন সবচে' ভালো চিকিৎসক খোঁজে তেমন অন্তরের চিকিৎসার জন্যও সবচে' ভালো পীর সন্ধান করা উচিত।

তিনি এও বলেন– যে নিজেই চরম পর্যায়ের অসুস্থ সে কিভাবে অন্যের চিকিৎসা করবে। আমি তো আমার পীরের নির্দেশে মানুষকে তাওবা পড়াই।

হয়তো তাদের বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আমার স্বামী তখন বলে, হযরত আপনার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া আমরা চিকিৎসা পাব কোথায়? অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি আমাদের মুরীদ করেন।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সত্যিই আপনার জীবন এক বিস্ময়কর উপাখ্যান।

উত্তর : বোন আসমা! সত্যিই আমার জীবন এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। আমার জীবনে এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা আছে, যদি সেগুলো বলি তাহলে দীর্ঘ রচনা হয়ে যাবে। আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। অন্য কোনো সাক্ষাতে বিস্তারিত বলবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: অবশ্যই আবার যখন আসবেন, কয়েক দিনের জন্য আসবেন। আমরা এখানে আরও কিছু মেয়েকে একত্রিত করবো। তারা সরাসরি আপনার কথা শুনবে।

উত্তর : না বোন! এটা কেবলই তোমাকে বলতে পারি। অন্য মেয়েদের সামনে আমি বলতে পারি না। তাছাড়া আমি তো কোনো মাওলানা সাহেব নই। আমি এমনিতেই ভীতু স্বভাবের।

প্রশ্ন: আচ্ছা ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেয, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা আমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, মার্চ– ২০০৯

মুহাম্মদ শাহেদ (রামধন)-এর সাক্ষাৎকার

সত্যকথা হলো, পৃথিবীব্যাপী মানবতা আজ তৃষ্ণাকাতর। প্রয়োজন হলো মানবতার কল্যাণে মুসলমানদের বেরিয়ে আসা। মুসলমানদের প্রমাণ করতে হবে আমরা মানুষের নিখাঁদ বন্ধু। বিশেষ করে ভারতবর্ষের এই হিন্দু সমাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। এটা প্রমাণিত যে, যখনই তাদের সামনে এই বন্ধুত্বের রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে তখনই তারা মুসলমানদের গোলামে পরিণত হয়েছে। আমার জন্য দুআ করবেন। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য দুআ করবেন। আরও দুআ করবেন– আল্লাহ তায়ালা যেন ভারতবর্ষের সকল হিন্দু ভাইকে আমার মতো ঈদ নসীব করেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ শাহেদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন: শাহেদ সাহেব! আপনার আসাতে খুবই খুশি হয়েছিল। আব্বু বলছিলেন– আপনি জামাত থেকে ফিরছেন। আরমুগানের পক্ষ থেকে একটা সাক্ষাতকার নিতে হবে। কিন্তু আপনি সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। খুব আফসোস করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা আবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

উত্তর: আসলে মালিয়ার কোটলায় আমরা জামাতে ছিলাম। শেষ দিন আমি বাড়িতে ফোন করে জানতে পারলাম আমার ছেলে খুবই অসুস্থ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তখন আমি ফোনে মাওলানার সাথে আলাপ করলাম। তিনি আমাকে বললেন এখন সোজা বাড়িতে চলে যান। পরে ইন্‌শাআল্লাহ সাক্ষাত হবে। আল্লাহ পাকের শোকর বাসার সবাই এখন সুস্থ। আমি কোম্পানীর একটি কাজ উপলক্ষে দিল্লী এসেছি। মনের মধ্যে অস্থিরতা ছিল, মাওলানার সাথে দেখা করবো। আলহামদুলিল্লাহ দেখা হয়েছে।

প্রশ্ন: অনুমতি দিলে আসল কথা শুরু করতে পারি।

উত্তর : অবশ্যই আমার পক্ষে সম্ভব এমন যে কোনো খিদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশ পরিচয় বলুন।

উত্তর : আমি এলাহাবাদে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছি ১৯৫৭ সালের ৯ নভেম্বর। আমার পারিবারিক নাম রামধন; আমার পিতাজীর রাখা নাম। তিনি

স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। আমরা দুই ভাই ও দুই বোন। আমিই সবার বড়। যদিও গুণ বিচারে আমিই সবার ছোট। আমি আমার পিতাজীর স্কুল থেকেই হাই স্কুল কমপি- ট করেছি। তারপর সায়েন্সে ইন্টার করেছি। ইন্টারে রেজাল্ট ভালো হয়নি। ফলে সাবজেক্ট বদলাতে হয়েছে। পরে বি.কম পড়েছি। তারপর একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেই। তারপর কাজের সন্ধানে ছিলাম। এখন একটি কোম্পানিতে প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। বিয়ে করেছি বেনারসের আরেক ব্রাহ্মণ খান্দানে। আমার স্ত্রী ইন্টার পাস। আমি জেনে-বুঝেই একজন সংসারী মেয়েকে বিয়ে করেছি। পারিবারিক শান্তি এবং স্বস্তিই ছিল আমার কাম্য। আমার তিন সন্তান। বড় ছেলের নাম নলিত কুমার, এখন আল-হামদুলিল্লাহ মুহাম্মদ জাভেদ, দুই মেয়ে তাদের নাম– কমলা ও গীতা। বর্তমান নাম– আয়েশা ও ফাতেমা। আমার স্ত্রীর নাম খাদীজা।

প্রশ্ন: আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবিস্তারে বলুন।

উত্তর : আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা। ২০০৩ সালের জুন মাস। বাচ্চাদের ছুটি চলছে। পরিবারের সবাই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করি। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল পুনায় কয়েকদিন ঘুরে দিল্লি হয়ে শিমলা যাওয়ার। সফর শেষ করলাম। মুম্বাই থেকে দিল্লির টিকেট আগেই করা ছিল। আমরা যে কেবিনে ছিলাম- সেই কেবিনে ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আপনার আব্বু মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। তাঁকে দেখেই আমাদের ভালো লেগে গেলো। ভাবলাম– ভালোই হলো একজন ধার্মিক সঙ্গী পাওয়া গেল। আমাদের সন্তানরা আনন্দ-ফুর্তির ভেতর দিয়ে কিছু শিখতেও পারবে। আমাদের সফর ছিল নিছক আনন্দ-ফুর্তির উদ্দেশ্যে।

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপা তিনি আমাদের পরিবারকে পূর্ব থেকেই পরস্পর হৃদ্যতা ভালোবাসা ও মমতা দান করেছেন। তাছাড়া সফরে গিয়ে সেই হৃদ্যতা আরো একটু অকৃত্রিমতা পায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা তখন খুব আনন্দ করছিলো। সন্ধ্যার পর আমি তাদের শাসিয়ে বললাম, আংকেল সাথে আছেন। আর তোমরা মস্তি করছো! কিন্তু মাওলানা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– এরা বাচ্চা মানুষ; নিষ্পাপ। এরা ফুর্তি করে মজা পাচ্ছে। আপনি এদের বাঁধা দিচ্ছেন কেন? তার কথা আমার কাছে ভালো লাগলো। রাত দশটায় আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, যদি ঘুমাতে চান তাহলে বার্থ খুলে নিতে পারেন। মাওলানা সাহেব বার্থ খুলে শোয়ার জন্য চাদর বিছাতে গেলেন তখন আমার স্ত্রী মেয়েদের ধমকের সুরে বললো, তোমাদের লজ্জা নেই দুজন মেয়ে উপস্থিত থাকতে আংকেল নিজ হাতে

বিছানা করেছেন। মেয়েরা ছুটে গিয়ে বললো, আংকেল আমরাই আপনার বিছানা করে দিচ্ছি। মাওলানা সাহেবের বারংবার বাধা সত্ত্বেও তারা জোর করেই বিছানা করে দিল। আমার স্ত্রী এমনিতেই একটু সেবক স্বভাবের। সে মাওলানার জুতা তুলে হেফাযতের উদ্দেশ্যে রেখে দিল এবং মাওলানা সাহেবকে বললো– আপনার জুতা বার্থের নীচে রাখা আছে। রাতে উঠে এখানে খুঁজলেই পাবেন।

মাওলানা সাহেব বললেন– আপনি আমাকে খুব লজ্জা দিলেন। ভাই আহমদ! সত্য কথা কী, মানবতার একজন হৃদয়বান বন্ধু এই সামান্য সেবাতেই আবেগাপ্লুত। আমার মেয়েরা তার বিছানা করে দিয়েছে, স্ত্রী তার জুতা ভাজ করে রেখেছে। আর তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভাগ্য খুলে দিয়েছেন। কুফর ও শিরকের অন্ধ জগতে উদ্ভ্রান্ত আমাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার মেয়েদের এবং আমার স্ত্রীর এই সামান্য সেবার উসিলায় আমরা হেদায়েতের আলো পেয়েছি।

প্রশ্ন: একটু ব্যাখ্যা করে বলুন!

উত্তর : ভাই আহমদ! মাওলানা সাহেব আমাকে পরবর্তীতে বলেছেন– আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের এই সামান্য সেবা তাকে খুবই আপ্লুত করেছিল। এতে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য দুআ করতে থাকেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদে আমার এবং আমার বংশধরের জন্য হেদায়েতের দুআ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন– আল্লাহ তায়ালার কাছে তিনি এই বলে দুআ করেছেন– হে আমার মালিক! বিদ্বেষ ও ঘৃণাভরা এই পরিবেশে নিষ্পাপ মেয়ে দুটি এবং তাদের মা এই অধমের সেবা করেছে। হে আল্লাহ! এই পাপী অধম এর বিনিময় দিতে অক্ষম। এর বিনিময়ে আপনি তাদের এবং তাদের বংশধরকে হেদায়েত দান করুন। মাওলানা সাহেব বলেছেন– তিনি আমাদের জন্য দুআ করেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন আমাদের সাথে দ্বীনী দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সকাল আটটার সময় বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠেই নাশ্‌তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারপর খেলাধূলায় লেগে যায়। মাওলানা সাহেব বলেন– আমি তখন চরম অস্থির ছিলাম। কিভাবে এদের ইসলামের দাওয়াত দিই। মনে হচ্ছিল কে যেন আমার মুখটা বন্ধ করে রেখেছে। বারবার আমি কিছু বলতে যাই, কিন্তু বলতে পারি না। সকাল এগারটায় ট্রেন এসে নিযামুদ্দীন স্টেশনে পৌঁছায়। মাওলানা সাহেব বলেন– যতই সময় যাচ্ছিল আমার অস্থিরতা ততই বাড়ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল– আমি যদি এদের দাওয়াত না দিই তাহলে এদের কে ইসলাম গ্রহণের কথা বলবে? কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখ খুলতে

পারছিলাম না। আমরা সবাই গাড়ি থেকে নামলাম। মাওলানা সাহেবের ব্যাগ জোর করে তুলে নিলাম। ভাবছিলাম এমন একজন মানুষের সেবা আমিও একটু করি। মাওলানা সাহেব সাহস করে তাঁর ব্রিফকেস থেকে 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি বের করেন। তিনি বলেন, আমি মনেমনে নিজেকে ভর্ৎসনা করি। তারপর সাহস করে আমাদের সামনে বাচ্চাদের ডেকে বলেন, তোমাদের পরস্পর হাসি-আনন্দ আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমার অন্তর উচ্ছ্বাসিত হয়েছে। তোমাদের খুবই ভালো লাগছিলো। তোমাদের প্রতি তোমাদের আংকেলের একটি মাত্র আবেদন আশা করি তোমরা কথা রাখবে। আর তা হলো– বিয়ের পরও তোমরা পরস্পরে এমন ভালোবাসার সাথেই থাকবে। দুই পয়সা, সন্তান কিংবা স্বামীদের ফাঁদে পড়ে পবিত্র এই বন্ধন ছিন্ন করবে না।

আমার বাচ্চারা মাওলানা সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করে। তিনি তাদের বারবার নিষেধ করেন। অবশেষে তিনি আমার হাতে আপকি আমানত পুস্তিকাটি তুলে দেন। বলেন এটা আমার ঠিকানা। এখন আমার কাছে ভিজিটিং কার্ড নেই। এই সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি আমার পরিবারের লোকদের বললাম– আমার মালিক আমাকে এ কোনো দেবতার সাথে সফর করালেন। তিনি আমার সন্তানদের কি আন্তরিক ও মমতামাখা উপদেশ দিলেন। আমি আমার সন্তানদের বারবার বলতে থাকি দেখো, আংকেলের উপদেশ ভুলে যেও না যেন। নিশ্চয় তিনি কোনো দেবতা ব্যক্তি। দুই-তিনদিন আমরা দিল্লীতে ছিলাম।

তারপর শিমলায় চলে যাই। পথে চন্ডিগড়ে ট্রেনে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়। সে তার জীবনের দুঃখভরা কাহিনী যাত্রীদের শোনাতে থাকে এবং ভিক্ষা চাইতে থাকে। শুনে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। শিমলায় পৌঁছে রাস্তায় কী কী দেখলাম– শুনলাম এ বিষয়ে আলোচনা ওঠে। আমি আমার সন্তানদেরকে আরেকবার মনে করিয়ে দিই আংকেলের উপদেশ ভুলে যেও না। কমলা বললো– পিতাজী আংকেল একটা ঠিকানা দিয়েছিল সেটা কোথায় গেল? আমি সাথেসাথে পুস্তিকাটি বের করলাম। এক বৈঠকে পড়ে ফেললাম। দ্বিতীয়বার সবাইকে পড়ে শোনালাম। আসলে নেযামুদ্দীন ষ্টেশনে মাওলানা যে উপদেশ দিয়েছিলেন সে উপদেশ আমার এবং সন্তানদের অন্তরে মিঁশে গিয়েছিল। আমাদের কাছে মনে হয়েছে তিনি আমাদের এক নিখাদ কল্যাণকামী। আমরা সকলে আমাদের একজন অকৃত্রিম কল্যাণকামীর লেখা মনে করেই পুস্তিকাটি পড়ি এবং শুনি।

আহমদ ভাই! আপনি জানেন, আপকি আমানত আসলেই একটি ফাঁদ। যদি কারও অন্তরে পাথর বসানো না থাকে যদি কারও অন্তর সত্যিকার অর্থেই অন্তর হয়ে থাকে তাহলে এই কিতাব পড়ে এর জন্য পাগল না হয়ে পারবে না। শিমলা থেকে চন্ডিগড়ে ফিরে এসে এই কিতাবের বেশ কিছু ফটোকপি করালাম। কারণ, এই কিতাবে অন্যদের কাছে এর কপি পৌঁছানোর কথাও বলা হয়েছে। ফেরার সময় আমাদের এই সফর আর আনন্দ ফুর্তির সফর রইলো না বরং এক বিপ- বী সফর হলো। এমনিতেই আমার পিতাজি ছিলেন একজন সেক্যুলার মানুষ। ফলে অন্যান্য ভারতবাসীর মতো মুসলমানদের প্রতি আমাদের কোনরূপ ঘৃণা বা ক্ষোভ ছিল না। বলতে পারি ইসলাম আর মুসলমান আমাদের পর ছিল, কিন্তু এখন আর তা রইল না। ট্রেনে আমি ভ্রমণকারীদের কাছে এই বইয়ের ফটোকপি বিলি করলাম।

পুরো রাস্তা আমার সন্তানদের মুখে এই বইয়ের কথাই আলোচিত হতে লাগলো। পুনায় আসার পর ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে গেল। এক ব্যক্তি আমাক প্রফেসর আনিস চিশতির সাথে দেখা করার পরামর্শ দিল। আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম তখন তিনি কী যেন এক সমস্যায় ছিলেন। ফলে আমাকে খুব একটা সময় দিতে পারলেন না। আমি এক জায়গা থেকে 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' বইটি সংগ্রহ করি। এটা পড়ার পর কুরআন শরীফের হিন্দি অনুবাদ পড়তে থাকি। কয়েক মাস চিন্তা-ভাবনা করার পর আবার 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি পড়ি। সিদ্ধান্ত নিই মুসলমান হবো। মুসলমান হওয়ার জন্য আমি অনেক শিক্ষিত মুসলমানের দ্বারস্থ হই কিন্তু কেউ আমাকে মুসলমান বানাতে রাজি হয়নি। আমার ছেলে তখন আমাকে বলে– তুমি ফুলাতের মাওলানা সাহেবের কাছে চিঠি লেখ। আমার চিঠি ঈদের চারদিন আগে মাওলানা সাহেবের হাতে পৌঁছে। চিঠি পাওয়ার পর তিনি আমাকে জবাবী চিঠি লেখেন। তাঁর চিঠিটি আমি সবসময় আমার পকেটে রাখি। চিঠিটি ছিল–

প্রিয় দবেদী সাহেব! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আপনি আপনার বাচ্চাদের নিয়ে একদিনের সফরে আমাকে আপন করে নিয়েছেন। আপনাকে এবং আপনার সন্তানদের আমার খুব মনে পড়ে। আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ। মুসলমান হওয়ার জন্য কেন এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন? ইসলাম একটি সত্যের নাম। 'আপকি আমানত' পড়ে সত্য দিলে কালেমা পড়লেই মুসলমান হয়ে যাবেন। ইসলাম কোনো রুসম ও রেওয়াজের ধর্ম নয়। হ্যাঁ, আপনার মনের সান্ত্বনার জন্য যদি ফুলাত চলে আসেন আপনাকে স্বাগতম। আপনার চিঠি যদি আগে পেতাম তাহলে

একসাথে ঈদ করতে পারতাম। যদি ভাবি এবং বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসেন তাহলে আমার পরিবারের জন্যও সেটা ঈদ হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনি যখনই আসবেন খুশি হবো।

ওয়াস সালাম

আপনার আপনজন

কালিম

আমি রাজধানী এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন করে দিল্লী পৌঁছাই। তারপর ঈদের দিন আড়াইটার সময় ফুলাত পৌঁছি। মাওলানা সাহেব আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বুকের সাথে মিলিয়ে রাখেন। আমার বাচ্চাদেরকে আদর করেন। মনের সান্তনার জন্য আমাদের কালেমা পড়ান। আমার নাম রাখেন শাহেদ। আমার স্ত্রীর নাম খাদিজা। আর ছেলের নাম জাভেদ। আর বড় মেয়ের নাম আমেনা, ছোট মেয়ের নাম ফাতেমা। সত্যকথা কী সেটাই ছিল আমাদের এক আনন্দঘন ঈদ। রোযা ছাড়াই আমরা ঈদের আনন্দে শরীক হয় যাই। মাওলানা সাহেব বলেন, সেই সফরে আমি খুবই হতাশা বোধ করি। আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করতে থাকি– হে আল্লাহ! আমার অযোগ্যতা দেখ। মন থেকে এতটা আগ্রহ পাওয়ার পরও এমন প্রিয় মানুষগুলোকে তোমার দীনের একটা কথাও বলতে পারলাম না। পরে আবার এই ভেবে আনন্দিতও হয়েছি আল্লাহ তায়ালা তার দীনের দাঈদের হেফাযতও করেন। মাঝে মধ্যে বান্দার শক্তিতে কিছু হয় না; হয় সবকিছু মহান আল্লাহর ইঙ্গিতে, এই সত্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও বান্দার মুখে তালা এঁটে দেন।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : আমরা দুইদিন ফুলাতে থাকলাম। সেখানে দুই বছর আগে মুসলমান হয়ে এসেছেন ভাই আব্দুর রহমান। তিনি বলেন– যখন বাড়ির কথা মনে হয় তখন অন্তরটা ভেঙ্গে যেতে চায়। মাওলানা সাহেব যখন সফর থেকে ফিরে আসেন। মুসাফাহা করেন। মাঝে মধ্যে বুকে জড়িয়ে ধরেন কখনও বা সামান্য রসিকতা করেন তখন সব দুঃখ ভুলে যাই। মনে হয় যেন উজাড় অন্তর আবার ফুলেফলে ভরে উঠেছে। দুই দিন ফুলাত থেকে আমি নিজেও তার কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছি। মাওলানা নিজ খরচে ট্যাক্সি করে আমাদের দিল্লী পৌঁছে দেন। ফেরার সময় পরিবারের লোকদের জন্য হেদায়েতের দুআ এবং মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দাওয়াতের কাজ করার জোর তাগিদ দেন।

প্রশ্ন: আপনি কি পরিবারের লোকদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা আমার ওয়াদার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আমার এক ভাই এবং এক বোন তাদের সন্তানসহ মুসলমান হয়েছে। মা-বাবা উভয়েই মুসলমান হয়েছেন। আব্বু ইন্তেকাল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এলাহাবাদ তাঁকে দাফন করা হয়েছে। আমার দুই বোন তো এর মধ্যে ইসলাম কবুল করেছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা হলো– যে সফরে মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা সেই সফর থেকে ফেরার সময় যাদের আমি 'আপকি আমানত' দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাওলানা সাহেব নিজেই বলেছেন– তাদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয় এবং আল্লাহ তায়ালার শানে হেদায়েতের কারিশমা। সে সব কাহিনী আমিও আপনাকে শোনাতাম। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ গত বছর আমার বাচ্চাদেরসহ আমার আব্বুকে নিয়ে হজ্জ করেছি। এই অধম পাপীদের প্রতি আল্লাহ পাকের কী অনুগ্রহ। তিনি দয়া করে তাঁর ঘর পর্যন্ত দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : সত্যকথা হলো, পৃথিবীব্যাপী মানবতা আজ তৃষ্ণাকাতর। প্রয়োজন হলো মানবতার কল্যাণের মুসলমানদের বেরিয়ে আসা। মুসলমানদের প্রমাণ করতে হবে আমরা মানুষের নিখাঁদ বন্ধু। বিশেষ করে ভারতবর্ষের এই হিন্দু সমাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। এটা প্রমাণিত যে, যখনই তাদের সামনে এই বন্ধুত্বের রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে তখনই তারা মুসলমানদের গোলামে পরিণত হয়েছে। আমার জন্য দুআ করবেন। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য দুআ করবেন। আরও দুআ করবেন– আল্লাহ তায়ালা যেন ভারতবর্ষের সকল হিন্দু ভাইকে আমার মতো ঈদ নসীব করেন।

প্রশ্ন : আমীন আল্লাহ কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মাদ শাহেদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, *অক্টোবর-২০০৭*

শামীম ভাই (শিয়াম চন্দ্র)-এর সাক্ষাৎকার

আমি তাদের উদ্দেশ্যে কী বলতে পারি? বলার মতো মুখ তো আমার নেই। তবে হযরতের কাছে যে কথা বারবার শুনে আসছি সে কথাই বলবো। আমাদের মুসলমানগণ যেন নিজেদের দা'য়ী মনে করেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যেন তারা দাওয়াতের ক্ষেত্র মনে করেন। তারা যদি এমনটি করতে পারেন তাহলে আমাদের এ পৃথিবী বেহেশতে পরিণত হবে। একজন দা'য়ী একজন চিকিৎসক। যাকে দাওয়াত দেয়া হয় সে তো অসুস্থ। অসুস্থের বেলায় কোনো চিকিৎসক নিরাশ হতে পারেন না। তাছাড়া কোনো চিকিৎসক রোগীকে ঘৃণা করতে পারে না। ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারে না। বেদনার বিষয় হলো, মুসলমানগণ এই রোগীদের প্রতিপক্ষ ভেবে বসেছেন। এর নির্মম পরিণতির শিকার আজ মুসলমানরাও। এ কারণেই আজ পৃথিবী ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শামীম ভাই : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : শামীম ভাই! জামাত থেকে কবে এলেন?

উত্তর : আমি ২২ এপ্রিলই ফিরে এসেছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার চিল্লা কোথায় এবং কেমন কাটলো?

উত্তর : আমার এ চিল্লা মেওয়াতে কেটেছে। বিজনুরের একটি জামাত ছিল। জামাতের আমীর ছিলেন মুফতী আব্বাস সাহেব। আলহামদুলিল্লাহ! পূর্বের জামাত থেকে এ চিল্লা ভালো কেটেছে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ : এটা তো আপনার দ্বিতীয় চিল্লা?

উত্তর : হ্যাঁ ভাই আহমদ! প্রথম চিল্লা আমি মাওলানা সাহেব হজ্জ থেকে ফেরার পর গিয়েছিলাম। হজ্জ থেকে আসার চার দিন পরেই আমি কালেমা পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিরাম। তার তিন দিন পর কাগজপত্র তৈরি করে আমাকে নিযামুদ্দীন মারকাযে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে এক চিল্লায় জামাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে চিল্লাটি কেটেছিল সীতাপুরে। তবে সেই জামাতটা অনেকটা আমার মতই ছিল। মন্দ বলবো না। বরং

বলবো, আমার মতোই জামাতের আমীর সাহেব নতুন ছিলেন। ফলে প্রতিদিনই সঙ্গীদের মধ্যে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ হতো। আমাদের চারজন সাথী চিল্লা শেষ না করেই ফিরে এসেছিল। আমি মনে করি এটা আমার কারণেই হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন আমি আমার মতো সঙ্গীদেরই মুখোমুখি হয়েছিলাম!

প্রশ্ন : শামীম ভাই! এবার আপনি আপনার বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : মুজাফফরনগর জেলার সখিরা গ্রামে আমার জন্ম। আমি জন্মেছি ১৯ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে এক জমিদার পরিবারে। পিতাজী আমার নাম রেখেছিলেন শ্যামচন্দ্র। আমার বংশ এমনিতেই শিক্ষিত। আমার চাচা সরকারী অফিসার। পিতা ছিলেন স্কুলের হেড মাস্টার। তার সহায়-সম্পদ কম ছিল না। সত্তর বিঘা জমি। আমার বড় ভাই আর্মি। একমাত্র বোন, তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী একজন স্কুল শিক্ষক। আমার লেখাপড়া হাই স্কুল পর্যন্ত হয়েছিল। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে সিনেমা দেখা, সিগারেট খাওয়া, বাউন্ডলে ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়ানোই আমার একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়ায়। আমার পিতা আমাকে পড়াশোনার প্রতি প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করেন। ফলে আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। আমার বন্ধুরা ভালো ছিল না। যার কারণে আমি সবসময় নেশা করে বেড়াতাম।

দীর্ঘদিন পর ঘরে ফিরি। আমি তখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছি। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে সম্পূর্ণ ওদের মতোই হয়ে গেছি। আমার পরিবার আমাকে খরচের পয়সা দিত না। অথচ তখন আমার খরচের পরিমাণ অনেক। ফলে বাধ্য হয়ে ঘর থেকে চুরি করতে হতো। আমার চুরির বিষয়টি যখন পরিবারের লোকেরা টের পায় তখন তারা সতর্ক হয়ে যায়। আর আমাকেও তখন ঘরের বাইরে চুরিধারিতে হাত দিতে হয়। বিষয়টা ধীরেধীরে মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকে। অবশেষে আমি লুটেরা ও ছিনতাইকারী গ্যাংদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার উপর আমার জীবন উৎসর্গিত হোক। অবশেষে এই গ্যাংই আমার জীবনে হেদায়েতের আলো বয়ে আনে।

প্রশ্ন: সাধারণত গ্যাংদের সাথে যারা মেশে তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। এটা আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ– তাঁর রহমত আপনাকে নর্দমার আবর্জনা থেকে তুলে তাঁর রহমতের কোলে ঠাঁই দিয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে আমার বংশ এবং আমার পরিবার খুবই ভদ্র শ্রেণীর। আমার পরিবারের প্রায় সবারই সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে। আমাদের ছোটবেলাটাও কেটেছে মুসলমানদের সাথে। আমার দুর্ভাগ্য। ধীরে ধীরে আমি সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরে পড়ি। কিন্তু এই মন্দ পরিবেশে গিয়েও আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারিনি। স্বভাবগতভাবেই কেমন যেন একটা দূরত্ব বরাবরই আমি অনুভব করেছি।

প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শোনাবেন কি?

উত্তর : ভাই আহমদ! গত বছরের ঘটনা। দুখিয়ারীতে আপনার আব্বাজানের একটা মাহফিল ছিল। তিনি সেখান থেকে মনসুরপুর হয়ে ঘুরে ফিরছিলেন। কিছু বদমাশ খুনি তার গাড়ির উপর হামলা করে এবং গুলি চালায়। গাড়ির ড্রাইভার সলিম মিয়ার গায়ে দুটি গুলি লেগেছিল। একটি গুলি হাতের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। আরেকটি লেগেছিল একেবারে হার্ট বরাবর বুকের উপর। গুলির আঘাতে তার জামাটি বিশ্রীভাবে ফেটে গিয়েছিল। ৩১৫ নম্বর গুলি। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ গুলি বাহু ছুঁয়ে চলে গেছে। গুলির চিহ্ন যেই দেখতো সেই আশ্চর্য হতো। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের নিজ কুদরতে এভাবেই হেফাযত করেন। এটা ছিল তারই নিদর্শন। গুলি লাগা সত্ত্বেও ড্রাইভার সলিম মিয়া দুই তিন কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি পেছনে টেনে নিয়ে যায়। তারপর সুযোগ বুঝে বাঁক নেয়। অন্তত দশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তার গুলি খাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতো ভয়াবহভাবে গুলি লাগার পরও সে সাহস হারায়নি। আমার সঙ্গীরা বলেছে– আমরা খুব সতর্কতার সাথে নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়ে ছিলাম। বিশ্বাস ছিল– ড্রাইভার অবশ্যই মারা গেছে।

যারা এই গাড়িতে হামলা করেছিল তারা সকলেই আমার বন্ধু ছিল। আমার প্রতি আমার মালিকের অসীম কৃপা আমি দুই সপ্তাহ আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মুজাফফরনগর হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। বনের আগুনের মতো এই দুর্ঘটনার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের গ্যাংয়ের সদস্য সংখ্যা ছিল আট। তাদের মধ্যে আমিই কেবল হিন্দু। অবশিষ্ট সকলেই মুসলমান। মজার বিষয় হলো, সেদিন আমি ছাড়া বাকি সকলেই অপারেশনে শরীক ছিল। ঘটনা ঘটার পর খাতুলি থানা কোতোয়ালীও সিআইডি ইনচার্জকে ডেকে পাঠায় এবং কোতোয়ালী ও সিআইডি মিলে এই মর্মে শপথ করে

বসে– আমাদের এলাকায় এমন একজন সজ্জনের উপর হামলা হয়েছে, আমাদের লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত।

আমরা শপথ করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অপরাধীদের খুঁজে বের না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার খাবো না। তাছাড়া এমন একজন ভালো মানুষের উপর যারা গুলি চালায় তারা রেহাই পাবে কী করে। দেখা গেলো তৃতীয় দিনেই তাদের মধ্যে তিনজন ধরা পড়ে গেল। তাদের যখন চাপ দেয়া হলো, মারধর করা হলো, তখন তারা অন্য সকলের নাম বলে দিল। সপ্তাহ পার হবার আগেই অবশিষ্ট চারজন গ্রেফতার হয়ে গেল। তাদের নামে আগে থেকেই থানায় লুট, ছিনতাই, চুরিসহ নানা অভিযোগের অনেকগুলো মামলা ছিল। থানা ইনচার্জ এদের বিরুদ্ধে এমন কেইস তৈরি করলো যাতে জামিনের অবকাশ নেই।

এক সপ্তাহ পর আমার শরীর কিছুটা সেরে উঠলো। এর মধ্যে দুই বার আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর দুই সপ্তাহ বাড়িতে কাটালাম। আমার সঙ্গীরা গ্রেফতার হয়েছে এ কথা আমি আগেই জেনেছি। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর শুকিয়ে যাচ্ছিল। তারা আমার নাম বলে দেয় কিনা। কিন্তু দুই মাস পরও যখন দেখলাম পুলিশ আসলো না তখন কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। এদিকে সুযোগ করে আমি একদিন তাদের সাথে জেলখানায় সাক্ষাত করতে গেলাম। সাক্ষাতের পর তারা আমাকে বিস্তারিত ঘটনা শোনালো। তারপর আমাকে এই বলে অভিশাপ দিল যে, অসুস্থ ছিলে বলে এ যাত্রায় বেঁচে গেলে নইলে এখন জেলখানায় থাকতে হতো।

মুজাফফরনগর জেলখানায় আমার বন্ধুদের এমন কিছু ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় যাঁরা মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে জানতেন। এদের শত্রুতা করে মিথ্যা হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত মাওলানা এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রচেষ্টায় তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা নিজে কয়েকবার জেলখানায় গিয়ে তাদের সাথে দেখাও করেছেন। তারা জেলখানায় বসে মাওলানা এবং তাঁর পরিবারের নানা ঘটনা শোনাতো। তারা বলতো, মাওলানা সাহেব এতোটাই সজ্জন, তিনি নিজে তার ঘরে যারা চুরি করে তাদের ছাড়িয়ে আনেন। তাদের মাফ করে দেন। তাদের ঘরে রেশন পৌঁছে দেন।

কুঁকড়াগাওয়ের এক বন্ধু ছিল আমাদের। সেই ছিল মূলত এই গ্যাংয়ের প্রধান। আমি যখন জেলখানায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করলাম তখন সে আমাকে বলেছিল– তুমি ফুলাত যাবে। মাওলানার কাছে গিয়ে আমার

দূরাবস্থার কথা বলবে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার ভান করে হলেও আমাদের পেরেশানির কথা তাঁকে অবশ্যই বলবে। আমি বললাম– তোমাদের কি সামান্যতম লজ্জাবোধ নেই? যার উপর তোমরা গুলি চালিয়েছ তার সামনে গিয়ে মুখ দেখাবো কীভাবে? কিন্তু সে আমাকে বারবার চাপ দিচ্ছিলো। বলছিল তুমি একবার গিয়ে দেখ, তিনি কী আচরণ করেন? তাকে তুমি গিয়ে বলবে, আমার সঙ্গীরা সকলেই অন্তর থেকে ক্ষমা চাচ্ছে। তারা ওয়াদা করছে, এবার জেল থেকে বেরুবার পর ভালো হয়ে যাবে। আপনার কাছে মুরীদ হবে। আমার কোনভাবেই সাহস হচ্ছিলো না।

এভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেল। তাদের চাপাচাপিতে এক সময় আমার ভেতরও করুণার উদ্রেক হয়। আমি ঠিকানা সংগ্রহ করে ফুলাত চলে যাই। তখন ছিল শীতকাল। বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি ভিজে গিয়েছিলাম। হযরত তখন যোহর নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন। কোত্থেকে এসেছো? আমি আমার গ্রামের নাম ও ঠিকানা বললাম। মাওলানা ঘরে গিয়ে আমার জন্য একটি শার্ট-প্যান্ট নিয়ে এলেন। বললেন, বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে তুমি ভেতরে গিয়ে কাপড় বদলে নাও। আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বললাম– শ্যামচন্দ্র। তিনি আমাকে বারান্দায় বসতে বললেন। ভেতর থেকে এক বাচ্চাকে চা দিতে বললেন। তারপর মসজিদের দিকে যেতে যেতে বললেন– তুমি এমন এক এলাকার অতিথি যেখানে আমাদের খুব আপ্যায়ন করা হয়েছিল। আমাদের ড্রাইভারের গায়ে গুলি লেগেছিল। তার এ কথা শুনে আমি কুঁচকে গেলাম। আমার এ কুণ্ঠিতভাব দেখে মাওলানা সাথে সাথে বললেন– তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? তুমি তো আর গুলি করোনি! তুমি আমাদের মেহমান। তারপর তিনি মসজিদে চলে গেলেন। মসজিদ থেকে ফিরে আসার পর আমি তাকে বললাম– আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলার আছে। আমি যেখানে বসা ছিলাম তার বরাবর ছোট একটি কক্ষে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। ভেতরে যাওয়ার পর আমি আমার পরিচয় দিলাম। আমার বন্ধুদের অবস্থা সবিস্তারে তুলে ধরলাম। যতটা সম্ভব সত্যমিথ্যা দিয়ে তাদের অবস্থা বললাম। এ-ও বললাম আপনি চাইলেই এরা জামিন পেতে পারে।

মাওলানা সাহেব বললেন– প্রথম কথা হলো আমরা এদের গ্রেফতার করাইনি। তাছাড়া এরা যতটা না অপরাধী তারচে' বেশি অসুস্থ। এমন শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী তাছাড়া জগতের শ্রেষ্ঠ দয়ালু নবীর প্রতি যাদের ঈমান তারা

যদি এমন নির্বিঘ্নে মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তাহলে পৃথিবীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তুমি তাদের গিয়ে বলো– তাদের চিকিৎসা হলো– হয়তো সারাজীবন জেলখানায় কাটাবে অথবা তিন চিল্লার জন্য জামাতে বের হয়ে যাবে। তারা যদি আন্তরিকভাবেই কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত বোধ করে তাহেল যেন সোজা তিন চিল্লার জন্য বেরিয়ে যায়। আমি তাদের বিরুদ্ধে তখন সাক্ষী না দিয়ে তাদের জামিনের চেষ্টা করবো। মাওলানা সাহেব আমাকে খাওয়া-দাওয়ার কথা বললেন। এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে খাবার নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর মাওলানা ফিরে এলেন। আমাকে বললেন– তুমি তোমার বন্ধুদের জেল জীবনের কথা খুব ভাবছো। অথচ মৃত্যুর পর তোমাকেও একটি জেলখানার মুখোমুখি হতে হবে। সেই জেলখানা থেকে জামিনের কোনো ব্যবস্থা নেই। সে এক চিরন্তন জেলখানা তার নাম নরক। সেখানে যেসব শাস্তি রয়েছে আমাদের পুলিশ বাহিনীর পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। একথা বলে তিনি আমার হাতে 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি তুলে দেন। তারপর আমার সাথে কথা বলার জন্য এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান। আর তিনি চলে যান।

সেই লোক আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমাকে সে বলে– তুমি খুবই ভাগ্যবান। সৃষ্টিকর্তা এক উসিলায় তোমাকে হযরতের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি তার সাথে অঙ্গীকার করি পুস্তিকাটি আমি পড়বো। তারপর আমি এই ভেবে খুশি মনে ঘরে ফিরে আসি যে, চার মাসের জন্য জামাতে যাওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

পরের দিন আমি জেলখানায় যাই। তাদের সুসংবাদ দিই। তারা আমার কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং বলে, আমরা এমন একজন ভালো মানুষের উপর হামলা করেছিলাম? তারপর তারা সেই নওমুসলিম বন্দীদের সাথে থাকতে শুরু করে। নিয়মিত নামায পড়তে থাকে। নিয়মিত তালিমে বসতে থাকে, তাদের কথায় আরও তিনজন অমুসলিম এরই মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন আমি পুস্তিকাটি নিয়ে বসি। আমার মতো একজন অপরিচিত মানুষের সাথে তিনি যে আচরণ করেছেন সে কারণে আমি ভেতরে ভেতরে তার প্রতি পরম অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। পুস্তিকাটি পড়ার পর আমার আবেগ আরও বেড়ে গেল।

তিনদিন পর আমি আবার ফুলাত যাই। কিন্তু তাকে সেখানে পাইনি। খুবই হতাশ মনে ঘরে ফিরে আসি। তৃতীয়বার গিয়ে শুনি তিনি এসেছিলেন

এবং আজই হজ্জের সফরে গেছেন। অন্তত এক মাস পর ফিরবেন। আমি একটি একটি করে দিন গুণতে থাকি। ভাই আহমদ! আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না সেই মাসটি আমি কিভাবে পার করেছি। মনে হয়েছে মাস তো নয় যেন দীর্ঘদিন ধরে আমি বন্দী অবস্থায় আছি। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ আমি ফুলাতে ফোন করে জানতে পারলাম হযরত হজ্জ থেকে ফিরেছেন। আগামীকাল পর্যন্ত বাড়িতেই থাকবেন। ১৬ জানুয়ারী সকাল দশটায় আমি তার খিদমতে হাজির হই এবং কালেমা পড়ি।

আমি হযরতকে বললাম– আমার পিতাজী আমাকে মারতেন এবং এই বলে শাসাতেন, হতভাগা! আমাদের পূর্বপুরুষরা তো বলতেন– মানুষ তো সেই যার দ্বারা শত্রুরও উপকার হয়। অথচ তুমি তোমার ঘরকে নরকে পরিণত করেছ। আমি তখন বলতাম– এমন লোক অন্য জগতে হয় এই জগতে নয়। অথচ দেখুন! আপনাকে যারা গুলি করতে চেয়েছে তারাই আমার ঈমানের উপলক্ষ হয়েছে। মাওলানা বললেন– এখানে আমার হাত নেই। যে মালিক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– তোমার প্রতি তাঁর করুণা জেগেছে। তোমার কর্তব্য হবে সেই করুণার মূল্য দেয়া। তারপর তিনি আমার নাম রাখলেন শামীম আহমদ।

প্রশ্ন: তারপর আপনি জামাতে চলে গেলেন?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পরেরদিন কাগজপত্র করার জন্য আমাকে মিরাঠে পাঠালেন। কাগজপত্র তৈরী হয়ে গেলে হযরত নিজে আমাকে নিয়ে দিল্লী গেলেন। তারপর অন্য একজন মাওলানার সাথে আমাকে মারকাযে পাঠালেন। সীতাপুরে আমি এক চিল্লা কাটালাম। সামান্য নামায ইত্যাদি শিখতে পেরেছিলাম। ফিরে এসে কিভাবে চিল্লা কাটালাম কী শিখলাম মাওলানা সাহেবকে জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন– চল্লিশ দিনে যদি তুমি অন্তত ভালো করে কালেমাটা শিখতে তাও যথেষ্ট ছিল, অথচ তুমি তো নামাযও মোটামুটি শিখে ফেলেছ। আরেক চিল্লায় গিয়ে ভালো করে শিখে নেবে। কিছুদিন আমি মুজাফফর নগরের একটি মাদ্রাসায় থাকলাম। তারপর আবার চিল্লায় গেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! এবার বেশ উপকার হয়েছে। একপারা কুরআন শরীফ পড়েছি। উর্দূটাও মোটামুটি শিখেছি। পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য দুআ করেছি। তারপর জেলখানায় ফিরে গিয়ে যখন বন্ধুদের পুরো কাহিনী জানিয়েছি তখন

তারা খুব খুশি হয়েছে। এরইমধ্যে দুজন জামিন পেয়েছে। আমি তাদের তৈরি করে তুলেছি তারা সাতজনই চার মাসের জন্য জামাতে বের হবে।

প্রশ্ন: জামাত থেকে আসার পর কি আপনি বাড়িতে গেছেন? পরিবারের লোকেরা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে?

উত্তর : আমার পরিবারের লোকেরা ভেবেছিল আমি আবার খুনিদের সাথে কোথাও বেরিয়ে গেছি। আমি সবসময় এরকম না বলেই বেরিয়ে যেতাম ঐসব জায়গায়। কিন্তু আমি যখন মাথায় টুপি দিয়ে গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবী পরে বাড়ি গিয়ে উঠেছি তখন তারা কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছে। প্রথম দিকে আমার পিতাজী খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তারপর আমি যখন তাকে ফুলাতে আসা এবং সেখানকার পুরো বৃত্তান্ত বলে শোনালাম, তখন তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

একদিন আমি তাকে নানাভাবে অনুনয় বিনয় করে কিছু সময়ের জন্য প্রস্তুত করি। অন্তত দুই ঘন্টা তার সাথে দাওয়াতি কথাবার্তা বলি। তারপর 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি তার হাতে তুলে দিই। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরও ঘুরিয়ে দিয়েছেন। পরে ফুলাতে গিয়ে মুসলমান হয়েছেন। আমাদের গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা নামে মাত্র। মাওলানা এখন আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। আমার বাবা এখন পরিবারের লোকদের বুঝাবার চেষ্টা করছেন। দুআ করি আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের পুরো পরিবারকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেন। আমিন।

প্রশ্ন: মাশাআল্লাহ! খুবই চমৎকার। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুতেই বরকত এবং কল্যাণ দান করুন। আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পয়গাম?

উত্তর : আমি তাদের উদ্দেশ্যে কী বলতে পারি? বলার মতো মুখ তো আমার নেই। তবে হযরতের কাছে যে কথা বারবার শুনে আসছি সে কথাই বলবো। আমাদের মুসলমানগণ যেন নিজেদের দা'য়ী মনে করেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যেন তারা দাওয়াতের ক্ষেত্র মনে করেন। তারা যদি এমনটি করতে পারেন তাহলে আমাদের এ পৃথিবী বেহেশতে পরিণত হবে। একজন দা'য়ী একজন চিকিৎসক। যাকে দাওয়াত দেয়া হয় সে তো অসুস্থ। অসুস্থের বেলায় কোনো চিকিৎসক নিরাশ হতে পারেন না। তাছাড়া কোনো চিকিৎসক রোগীকে ঘৃণা করতে পারে না। ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারে না। বেদনার

বিষয় হলো, মুসলমানগণ এই রোগীদের প্রতিপক্ষ ভেবে বসেছেন। এর নির্মম পরিণতির শিকার আজ মুসলমানরাও। এ কারণেই আজ পৃথিবী ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রশ্ন: মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ শামিম ভাই! খুবই চমৎকার পয়গাম দিলেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। আপনার মতো এমন চমৎকার কথা খুব কমই শুনেছি। এই উপলব্ধির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তর : ভাই আহমদ ! এটা আমার কথা কোথায়? কথাটা হযরতের। আমি মুখস্ত করে শুনিয়ে দিয়েছি মাত্র।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক ধ্যন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : আপনাকেও ধন্যবাদ। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, *জুন*– ২০০৭

মুহাম্মদ আসজাদ (বিনদ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম এক জায়গায় প্রচন্ড আগুন জ্বলছে। সে আগুনে মানুষ দগ্ধ হচ্ছে। কখনও আগুন উপরের দিকে উঠছে আবার কখনও নিচের দিকে নামছে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করছে। সে ভয়ানক অগ্নি লেলিহানে পড়ে মানুষ চিৎকার করছে। আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর আসজাদ দূর থেকে আমাকে বলছে গড্ডু ভাই! এটা হলো দোখযের আগুন। আল্লাহ তায়ালা কালেমার উসিলায় তোমাকে এই আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। তার এই কথা শোনার পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বলে বুঝাতে পারবো না এই স্বপ্ন আমার মধ্যে কতোটা ভীতির সৃষ্টি করেছিল। আমার রুমে ঘুমন্ত সঙ্গীদের কথা কোনরূপ ভাবা ছাড়াই আমি লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি পড়লাম। মনেমনে ভাবলাম আসজাদ! তুমি সত্যিই আমার কল্যাণকামী। তুমি আমাকে বিনোদ কুমার থেকে আসজাদ করেছো। তুমি আমার ভালো করেছো, তুমি আমাকে দিয়ে আমার ওয়াদা পূর্ণ করিয়ে ছেড়েছো। আমি জানিনা তুমি কি কোনো শিশু না আল্লাহ তোমাকে অন্য কিছু বানিয়েছেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ আসজাদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ: আসজাদ ভাই! মাশাআল্লাহ আপনার সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। আপনাকে এ নতুন রূপে দেখে কী যে আনন্দ লাগছে!

উত্তর: আহমদ ভাই! আপনি যখন আমাকে দেখে এতো আনন্দিত হচ্ছেন তখন ভাবুন আমি নিজেকে যখন আয়নায় দেখি তখন আমি কতোটা আনন্দিত বোধ করি! আমি যখন জামাতে ছিলাম তখন বারবার হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শুনেছি, এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ সকালে মুমিন হবে তো সন্ধ্যায় হবে কাফের। আর সন্ধ্যায় মুমিন হবে তো সকালে হবে কাফের। অর্থাৎ, একদিন এবং এক রাত নিজেকে ঈমানের উপর রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। মূলত এখন আমরা সে কালটাতেই আছি। তো যে কালটা ছিল ঈমান চলে যাওয়ার, আল্লাহ আমার মতো অধমকে কোনরূপ প্রার্থনা ছাড়াই ঈমানের ঋণ দান

করেছেন। জানিনা আমি কিভাবে আমার মালিকের শুকরিয়া আদায় করবো। আমি যখনই আমাকে আয়নায় দেখি তখন এসব কথা কল্পনা করি। তারপর আমার ভেতর এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়– যে ঘর থেকে আমি এই মায়া-মমতা লাভ করেছি আল্লাহ তায়ালা যেন এই খান্দানকে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের বাতিঘর হিসেবে কবুল করেন। মাওলানা কালিম সাহেবের একটি আলোচনা শোনার পর তো আমি এই দুআ পড়তে শুরু করেছি– হে আল্লাহ! তুমি এই খান্দানকে কেবলমাত্র জগতের জন্য নয় বরং সমগ্র জগতের হেদায়েতের উসিলা হিসেবে কবুল করো।

প্রশ্ন : আপনার মতো নেক ও পবিত্র মুসলমানের অন্তর থেকে বের হওয়া এই দুআ পরিবার এবং খান্দানের জন্যে অনেক বড় অর্জন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দুআ কবুল করুন। ভাই আসজাদ! আরমুগানের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তর : হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।

প্রশ্ন : শুরুতেই আপনার পারিবারিক পরিচয় জানালে ভাল হয়।

উত্তর : আমার দেশ নেপাল। কাঠমন্ডু থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে আমার জন্ম। আমার জন্ম তারিখ ২১ শে মে ১৯৮০ সালে। জন্মগতভাবে আমি ব্রাহ্মণ। আমার পারিবারিক নাম বিনোদকুমার। আদর করে পারিবারের লোকেরা আমাকে গড্ডু বলে ডাকতো। আমি প্রাথমিক লেখাপড়া নেপালেই করেছি। বাবা মারা গেলে আমার এক আত্মীয় আমাকে দিল্লী নিয়ে এলো। দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার পর আমার সেই আত্মীয়ও মারা গেলেন। তখন আমি উখলা জামেয়া নগরে আপনাদের বাসার কাছেই একটি দোকানে সেলসম্যানের চাকরি নিলাম। সেইসাথে আমি ইউনিভার্সিটিতে বি.কম এ ভর্তি হয়ে গেলাম। আর সেখান থেকেই আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহম আসা শুরু হয়।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আশ্চর্যের বিষয় হলো– ২১ শে মে ১৯৮০ যে দিন আপনার জন্ম সেদিনই আমার আব্বাজানের বিয়ে সম্পাদিত হয়।

উত্তর : বাস্তবেই এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। হয়তো আমার ভাগ্যে হেদায়েত লেখা ছিল। এজন্য যেদিন আমার জন্ম সেদিনই হেদায়েতের বন্ধনও আল্লাহ তায়ালা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যদি আপনার আব্বার বিয়ে না হতো তাহলে আসজাদ মিয়ার জন্ম হতো না এবং আল্লাহ তায়ালাও তার উসিলায় আমাকে হেদায়েত দিতেন না। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার।

প্রশ্ন : আসলেই বিষয়টি আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে। আপনার জন্ম তারিখ আর আমার আব্বার বিয়ের তারিখ হুবহু মিলে যাচ্ছে। এবার আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আমাদের বলুন।

উত্তর : আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আপনাদের বাসার কাছেই একটি জেনারেল মার্চেন্টে আমি চাকরি করতাম। আপনার ছোট ভাই আসজাদ মিয়া আমার সামনে দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যেত। যেতে যেতে অন্য বাচ্চাদেরও নামাযের তাগিদ করতো। যখন নামায শেষে সে ঘরে ফিরতো তখন মহল্লার নামাযীরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো। কেউবা বলতো হযরত আসজাদ! আমাদের এখানে একটু চা পান করুন। আবার কেউ তাকে খাবারের জন্য আহ্বান করতো। সে লজ্জায় পালিয়ে বাঁচতো। আপনাদের বিল্ডিংয়ে এক মুসলমান চৌকীদার থাকতো। সে নামায পড়তো না। আসজাদ মিয়া নিয়মিত তাকে নামাযের জন্য বলতো।, একদিন আমি তাকে বললাম, প্রতিদিন আসজাদ তোমাকে নামাযের জন্য ডাকছে তুমি কথা দিয়েও যাচ্ছ না কেন? বেশ শক্ত করেই বললাম। আসজাদ মিয়া তাকে দোযখের ভয় দেখিয়ে চলে গেল। কয়দিনের মধ্যে সেই চৌকিদারও নামায শুরু করলো। প্রত্যেক নামাযের সময় আসজাদই চৌকিদারকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। একদিন যোহরের নামায পড়তে গেলে চৌকিদারের জুতা চুরি হয়ে গেল। আসজাদ মিয়া তখন ঘর থেকে পয়সা এনে নতুন চপ্পল কিনে দিল এবং বলল, দেখ! তুমি নামায পড়েছ তাই আল্লাহ তায়ালা তোমার পুরনো চপ্পল সরিয়ে নতুন চপ্পলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আম্মু আমাকে বলেছেন যখন চৌকিদারের জুতা চুরি হয়ে গেল তখন আসজাদ ঘরে এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিল আর আম্মুকে বললো– আম্মু! এই চৌকিদার আর নামায পড়তে যাবে না। তার ধারণা নামায পড়লে ক্ষতি হয়। জুতা চুরি হয়ে যায়। আপনি আমাকে পয়সা দিন আমি তাকে একজোড়া নতুন জুতা কিনে দিই, তাহলে সে নিয়মিত মুসল্লি হয়ে যাবে। তারপর সে ঠিকই চৌকিদারের জন্য নতুন জুতা কিনে আনে। হ্যাঁ বলুন– তারপর কী হলো?

উত্তর : যখন চৌকিদার নিয়মিত নামাযী হয়ে গেল তখন এল আমার পালা। আসজাদ জানতো না আমি যে হিন্দু। তাছাড়া আমি যখন তাকে দেখতাম আদর করে সালাম দিতাম। আসজাদও আমাকে বলতো গড্ডু ভাই! তুমি দোকানে বসেবসে আযান শোনো অথচ নামাযে যাও না। আযান শুনে যে ব্যক্তি মসজিদে যায় না মসজিদ তার জন্য বদদোয়া করে। আমি তখন আসজাদকে বলতাম তুমি যাও, আমি আসছি। এভাবে দু সপ্তাহ কেটে যায়।

প্রতিদিনই সে আমাকে নানাভাবে নামাযের কথা বলতে থাকে। বিশেষ করে আসর-মাগরিব এবং এশার সময় আমাকে ডাকে। আমি তাকে বিভিন্ন কথা বলে পাশ কাটিয়ে যাই।

একদিন আসরের সময় এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, গড্ডু ভাই! আজ আমি তোমাকে মসজিদে না নিয়ে যাবো না। আমি তখন নিরুপায় হয়ে বললাম, আসজাদ! তুমি জান না, আমি মুসলমান নই! আমার নাম বিনোদ কুমার। তখন সে বলে উঠলো, গড্ডু ভাই! তাহলে তো বিপদ আরও বাড়লো। তুমি বেনামাযীর চে'-ও বড় বিপদের মধ্যে আছ। বললাম– সেটা কিভাবে? আসজাদ বললো– বেনামাযী তো জাহান্নামে গেলেও একদিন মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাবে। কিন্তু বেঈমান অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে থাকবে অনন্তকাল। গড্ডু ভাই! তুমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। কথা বলতে বলতে জামাতের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আমি বললাম– আসজাদ তোমার জামাত ছুটে যাবে তুমি এখন যাও।

আসজাদ বললো, আমার তো জামাত ছুটে যাচ্ছে আর তোমার যদি জীবন বেরিয়ে যায় তাহলে তো হিন্দু অবস্থায় মারা গেলে। একবার ভেবেছো, তোমার কত বড় ক্ষতি হবে? আমি বললাম– আচ্ছা আগে নামায পড়ে এসো তারপর কথা হবে। সে নামায পড়ে এসে বারবার নানাভাবে দাওয়াত দিচ্ছে। বলছে, গড্ডু ভাই! তোমার কাছ থেকে আমরা সদাই কিনি। তোমার সাথে আমাদের কত ভালো সম্পর্ক। তোমাকে কালেমা না পড়িয়ে আমি যাচ্ছি না। তোমাকে মুসলমান হতেই হবে। আমি তাকে বলি আসজাদ তুমি এখন যাও, পরে একদিন কথা হবে। সে বললো, এর কী নিশ্চয়তা আছে। আজই তোমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে।

যখন দেখলাম সে নাছোড়বান্দা তখন ভাবলাম– এ একজন শিশু মানুষ। তাছাড়া আহমদ ভাই! এখন আসজাদের বয়স কত হবে! এই এগার বছর। অর্থাৎ, আমার সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন তার বয়স ছিল আট বছর বা তার চে'-ও কম। আমি তখন ভাবলাম– আচ্ছা, এর কথা রাখতে আমার এমন কী অসুবিধা! মূলত তাকে এড়াবার জন্য অথবা তার মনরক্ষার জন্যই আমি বললাম, ঠিক আছে কালেমা পড়িয়ে দাও। আসজাদ আমাকে কালেমা পাড়িয়ে দিলো। আমি হাসতেহাসতে কালেমা পড়ে নিলাম। আসজাদ বললো– গড্ডু ভাই! তুমি একটি মুসলমান নাম রেখে নাও। আমি বললাম– নামও পরিবর্তন করতে হবে? আসজাদ বললো–

আব্বু বলেন– নাম পরিবর্তন করা জরুরী নয় তবে ভালো। যখন তুমি কালেমা পড়েই নিয়েছ তখন নামটাও বদলে ফেলো। আমি বললাম– আমার

তো তোমার নামটাই পছন্দ। আমি আমার নাম রাখবো মুহাম্মদ আসজাদ। আসজাদ বললো কোনো সমস্যা নেই, আসজাদ নামের অর্থ খুব সুন্দর। এর অর্থ হলো– অনেক বেশি সেজদা আদায়কারী। খুবই চমৎকার নাম। আমি বললাম, তাহলে তো তোমার নাম বদলাতে হবে। সে বললো–কোনো? একই নামের তো অনেক ব্যক্তি হতে পারে! কথা বলতে বলতে মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছিল। আসজাদ বললো– এখন তুমি মুসলমান। সুতরাং মসজিদে চলো। আমি তাকে বিভিন্ন বাহানায় এড়িয়ে গেলাম। আসজাদ নামায পড়তে চলে গেল। নামাযের পর আপনার আব্বাজানের লেখা কিতাব 'আপকি আমানত' নিয়ে এলো এবং বললো– আসজাদ ভাই! এই পুস্তিকাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে। তারপর বুঝতে পারবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মুসলমান বানিয়ে কী অনুগ্রহ করেছেন। একবার নয় বইটি তোমাকে বারবার পড়তে হবে।

আমি তার হাত থেকে বইটি নিলাম। মনে মনে ভাবলাম– ভারী অদ্ভূত ছেলে দেখি! একদম পিছু ছাড়ছে না। তাছাড়া আমি ভেতরে-ভেতরে যেন কারও কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম– একজন ছোট্ট শিশু সে তোমাকে এতটা দরদ ও আন্তরিকতার সাথে কালেমা পড়াচ্ছে, তোমাকে নামাযের কথা বলছে। আর তুমি তা এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি আসজাদকে বললাম– অবশ্যই পড়বো। আসজাদ বললো– পাক্কা ওয়াদা কিন্তু। আমি বললাম–পাক্কা ওয়াদা। দোকান বন্ধ করে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম। সামান্য সময় পর একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম এক জায়গায় প্রচন্ড আগুন জ্বলছে। সে আগুনে মানুষ দগ্ধ হচ্ছে। কখনও আগুন উপরের দিকে উঠছে আবার কখনও নিচের দিকে নামছে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করছে। সে ভয়ানক অগ্নি লেলিহানে পড়ে মানুষ চিৎকার করছে। আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর আসজাদ দূর থেকে আমাকে বলছে গড্ডু ভাই! এটা হলো দোখযের আগুন। আল্লাহ তায়ালা কালেমার উসিলায় তোমাকে এই আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। তার এই কথা শোনার পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বলে বুঝাতে পারবো না, এই স্বপ্ন আমার মধ্যে কতোটা ভীতির সৃষ্টি করেছিল। আমার রুমে ঘুমন্ত সঙ্গীদের কথা কোনরূপ ভাবা ছাড়াই আমি লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি পড়লাম। মনেমনে ভাবলাম, আসজাদ! তুমি সত্যিই আমার কল্যাণকামী। তুমি আমাকে বিনোদকুমার থেকে আসজাদ করেছো। তুমি আমার ভালো করেছো, তুমি আমাকে দিয়ে আমার ওয়াদা পূর্ণ করিয়ে ছেড়েছো। আমি জানিনা, তুমি কি কোনো শিশু না আল্লাহ তোমাকে অন্য কিছু

বানিয়েছেন। আমার মনে হলো আসর নামাযের পর আমি কালেমা পড়েছিলাম। কালেমা পড়ার পর আমার উপর যে নামাযগুলো ফরয হয়েছে সেগুলো আদায় করা আমার কর্তব্য। তাছাড়া আমি আসজাদের মুখে প্রায়ই শুনতাম– ও নাফিসকে বলতো এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে দুই কোটি আটাশি লাখ বছর জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আমি আমার রুমমেট ফরিদকে জাগালাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত পর্যন্ত একজন মুসলমানের উপর কয় ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়? সে বললো দুই ওয়াক্ত। আমি বললাম– আমাকে তুমি নামাযগুলো পড়িয়ে দাও। সে বললো– এখন আমাকে বিরক্ত করো না এখন ঘুমাও।

আমি তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। এক সময় আমার প্রতি তার করুণা হলো। সে উঠলো এবং আমাকে ওযু শিখিয়ে দিল। তারপর মাগরিব ও এশার নামায পড়ালো। আমি কোনমতে রুকু-সেজদা করে নামায শেষ করলাম। পরদিন সকালে আমি দোকানে গেলাম। আসজাদ স্কুল থেকে ফিরছিলো। তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম– আসজাদ বাসায় ব্যাগ রেখে খাওয়া-দাওয়া করে আমার কাছে চলে এসো। গতকাল আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কালেমা পড়েছিলাম। এখন 'আপকি আমানত' পড়ে ইসলামকে ভালো করে বুঝেছি, এবার তুমি আমাকে সত্যিসত্যি কালেমা পড়িয়ে দাও। তারপর আসজাদ আমাকে কালেমা পড়ালো। আমি নিয়মিত মসজিদে যেতে শুরু করলাম। আমার দোকানের মালিকও ছিল মুসলমান। আর দশজন সাধারণ মুসলমানের মতোই ব্যবসায়ী মুসলমান। দুই তিন দিন পর আমার মালিক লক্ষ করলো আমি মসজিদ থেকে আসছি। তখন সে আমাকে বললো– আরে গড্ডু! তুমি মসজিদে গিয়েছিলে কেন? আমি বললাম- আসজাদ জিদ ধরেছিল– আমি ভাবলাম একবার মসজিদে গিয়ে নামায পড়েই দেখি না কেমন লাগে! মালিক বললো তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে ক্রেতা অপেক্ষা করছে আর তুমি! তার কথায় আমার মন ভেঙ্গে গেল। আমি 'আপকি আমানত', বইটিতে পড়েছিলাম– একজন মুসলমানের জন্য নিয়মিত নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এক ওয়াক্ত নামায কাযা করার যে শাস্তির কথা আসজাদ বলেছিলো সেটা আমার কাছে এতোটাই ভয়াবহ লেগেছিল যে, কোনভাবেই এর খেলাফ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি মনে করতাম– আযান হলো মহান মালিকের পক্ষ থেকে এক আমন্ত্রণবার্তা। একজন সাধারণ গোলামের পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব মালিকের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণবার্তা আসবে আর গোলাম বসে থাকবে? এরচে' নীচতা আর কী হতে পারে?

আমার মনে হলো। ইনি হচ্ছেন দোকানের মালিক। আমার তো মালিক নন। আমাকে তো মানতে হবে আমার মালিকের কথা। আমি দোকানের মালিকের গোলাম নই। আমি গোলাম বিশ্বজাহানের যিনি মালিক তাঁর। আমি নিয়মিত মসজিদে যেতে থাকলাম। তিন দিন পর আমি মসজিদ থেকে এশার নামায পড়ে ফিরছি, এ অবস্থায় আমাকে দেখে দোকানের মালিক ক্ষেপে গেল। বললো, সকালে মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে পারো না? তুমি হিন্দু। তুমি নাপাক। মসজিদে যাও কেন? তুমি মসজিদে গেছো এদিকে আমার দশজন কাস্টমার ফিরে গেছে। আমি বললাম– আমি হিন্দু নই আমি মুসলমান। একথা বলার পর তিনি আমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। খুব গালমন্দ করলেন। আমাকে প্রচন্ডভাবে চাপ দিতে লাগলেন নিজের ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য। তিনি বারবার বলছিলেন– এটা নিয়ে পুরো এলাকায় দাঙ্গা বেঁধে যাবে। আমি বললাম এটা মুসলমানের এলাকা। আর আমার বাড়ি নেপাল। আমার পরিবারের সাথেও আমার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি খামোখা ভয় পাচ্ছেন কেন? যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আমিই দেখবো। আমার কথায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পায়ের জুতো খুলে আমার উপর চড়াও হলেন। খুবই বিশ্রী রকমের গালাগাল করলেন। মারের প্রচন্ডতায় আমার শরীরের কয়েক জায়গা দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। কিন্তু তার জিদ কমলো না। তিনি বললেন– এখনই আমার সামনে থেকে সরে যা। এই বলে তিনি আমার সামানপত্র বাইরে ছুঁড়ে মারলেন। তখন ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। রাত গভীর। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার বইপত্রগুলো বৃষ্টিতে ভিজছে। আমি তখন কোনো আশ্রয় খুঁজলাম না। মনেমনে প্রার্থনা করলাম– মালিক! আমি তোমার গোলাম। তোমার গোলামির জন্য যদি জীবন দিতে হয় তার জন্য আমি প্রস্তুত। তুমি আমার ঈমানটুকু কবুল করো।

প্রশ্ন : আসজাদ ভাই! আসলে আমাদের মোটেও জানা ছিল না আপনার প্রতি এমন অবিচার করা হয়েছে। আচ্ছা তারপর কী হলো?

উত্তর : পরদিন আমি সামানাপত্র তুলে নিয়ে একটি যাত্রী ছাউনীর নিচে বসলাম। এক ভদ্রলোক প্রাইভেট কার নিয়ে তার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যাত্রী ছাউনীর কাছে এসে তিনি গাড়ি থামালেন। আমাকে ডেকে বললেন– আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আমি বললাম– এমনিই। তিনি বললেন– না-না। সত্যি করে বলুন! তখন আমার বেশ লজ্জা হলো। ভাবলাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আমার সমস্যার কথা বলবো? ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বললেন– দেখুন! আল্লাহ তায়ালা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনি তো আমাকে বলেননি এখানে গাড়ি থামাও। আল্লাহ

তায়ালাই আমাকে এখানে গাড়ি থামাতে বাধ্য করেছেন। সবকিছু আল্লাহ তায়ালাই করেন। তবে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে সবকিছু উপায়–উপকরণের মাধ্যমে করেন। তার পীড়াপীড়িতে আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে বাধ্য হলাম। তিনি আমার সামানপত্র তার গাড়িতে তুলে নিলেন। বললেন– আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। আমার কোনো সন্তান নেই। আমি বললাম– আপনি তো আমাকে ছেলে বানিয়ে পরাধীন করে ফেললেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি– আল্লাহ ছাড়া আর কারও গোলামি করবো না। আমি এক শর্তে আপনার সাথে যেতে রাজি আছি– আপনি আমাকে নামায এবং ধর্মীয় কাজে বাঁধা দিতে পারবেন না।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক কাঁদতে লাগলেন। বললেন– একজন মুসলমান না বুঝে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করেছে। এর অর্থ এই নয় আল্লাহর পৃথিবীতে আর কোনো মুসলমান নেই। আমি তার সাথে জাফরাবাদ চলে গেলাম। তিনি মুক্তার ব্যবসা করতেন। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক বড় ব্যবসা। আমি আগে বি,কম কমপিণ্টট করেছিলাম। ছুটিতে তিন চিল্লার জন্য ব্যাঙ্গালোর চলে গেলাম। আমাদের জামাতের আমীর ছিলেন একজন আলেম– তিনি মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে জানতেন। জামাতে থাকাকালীন তিনি আমার অনেক খিদমত করেছেন। তাছাড়া অন্য সাথীদেরও খেদমত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সময়টা খুব সুন্দর কেটেছে। জামাত থেকে ফিরে আমি এম.বি.এতে ভর্তি হই। এম.বি.এ কমপিণ্টট করার পর একটি আমেরিকান কোম্পানীতে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকুরি নিই। আলহামদুলিল্লাহ! গুড়গাঁওয়ে কাজ করছি। পূর্ব দিল্লীতে একটি ফ্ল্যাটও কিনেছি।

প্রশ্ন : আব্বুর সাথে আপনার কবে সাক্ষাত হয়েছিল?

উত্তর : দোকানে তো প্রতিদিনই দেখা হতো। তিন চিল্লা থেকে আসার পর একদিন নিযামুদ্দিন দেখা হলো। মাওলানার একজন মেহমান তখন নিযামুদ্দিনে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা মূলত তার সাথে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। নিযামুদ্দিনে প্রধান গেটের সামনে তাঁর সাথে দেখা হয়। তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। আমি বললাম– আমি গড্ডু। আপনার বাসার সামনের দোকানে বসতাম। তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমার মুসলমান হওয়ার কাহিনী জানতে চাইলেন। আমি তাকে সমস্ত কাহিনী শোনালাম। তিনি আমাকে বাসায় যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন। তার সাথে যখন বাসায় গেলাম আসজাদ অনেক খুশি হলো। বললো– নাফিস আমাকে বলেছিলো– তোমার মালিক তোমার সাথে খুব অবিচার করেছে। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করেছিলাম– হে আল্লাহ!

তুমি এর বিচার দুনিয়াতেই করো। একজন বিদেশী মুসলমানের প্রতি সে অবিচার করেছে। আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তার বিচার করেছেন। তার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কোটি টাকার পণ্টট বদমাশরা কব্জা করে নিয়েছে। তার সামানা পত্র ওরা গলিতে ছুঁড়ে ফেলেছে। মহল্লার লোকজন তাকে একসময় খানাপিনা দিত।

এই কাহিনী শুনে আমার মনেও বেশ কষ্ট লাগলো। আমি দুআ করলাম– হে আল্লাহ্! তুমি তাকে মাফ করে দাও। বেচারা ঘরহারা হয়ে পড়েছে। তুমি তাকে ঘরের ব্যবস্থা করে দাও!

প্রশ্ন : এখন কিভাবে সময় কাটছে?

উত্তর : আলহামদুল্লিাহ! বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীও দীনদার গ্রাজুয়েট। পুরনো দিল্লীর পাঞ্জাবী খান্দানের মেয়ে। আমরা খুব সুখে আছি। সেও মেয়েদের সাথে মাস্তরাত জামাতে বের হয়। তাছাড়া আমি কেনিয়াতেও এক চিল্লা দিয়েছি।

প্রশ্ন : স্বদেশে আপনার আত্মীয়-স্বজনের কথা কিছু ভেবেছেন?

উত্তর : এ বিষয়ে আমার স্ত্রী সবসময় আমাকে বলে। আগামী মাসে আমরা কাঠমন্ডুতে যাচ্ছি। দুআ করবেন এই সফর যেন সফল হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই কাহিনীই এক পয়গাম। এর মধ্যে শিক্ষার অনেক উপকরণ আছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অমুসলিমরা মুসলমানদের কষ্ট দিত। বলত কেন মুসলমান হয়েছো? আর এখন মুসলমানরাই নওমুসলিমদের এই প্রশ্ন করছে। এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে নেতৃত্ব পাওয়ার আশা করতে পারি?

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক-অনেক শোকরিয়া। আসলালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : আপনাকেও অনেক শোকরিয়া। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, *এপ্রিল*– ২০০৭

আবদুল হালিম (নির্মল কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। এখন মানুষের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া আমাদের কাজ। আমরা এখন জ্ঞান ও যুক্তির কাল পার করছি। হয়তো আমার এবং আমার পিতাজীর মতো আরও অসংখ্য মানুষ আছে যারা অমুসলিম পরিবারে জন্মেছেন ঠিক কিন্তু তারা স্বভাবজাতভাবে মুসলমান। আমাদের তাদের কথা ভাবতে হবে। তাদের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে কবুল করুন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি উম্মত হিসেবে কবুল করুন। যেন বেহেশতে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারি।

জানা নেই কখন মৃত্যুর পয়গাম এসে হাজির হয়।
জীবনের শেষ সন্ধ্যা কখন এসে হাজির হয়।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আব্দুল হালিম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : আবদুল হালিম ভাই! আপনার সাথে আরমুগানের পক্ষে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ! অবশ্যই বলুন, এটা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আরমুগানে আমার সাক্ষাৎকার ছাপা হবে। এত বড় একটা দাওয়াতী ম্যাগাজিনে আমার নাম যাবে এটা অবশ্যই খুশির কথা।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার পারিবারিক পরিচয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে জানতে চাইবো।

উত্তর : আমি বিহারের বেগুসারায় জেলার এক রাজপূত খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার জন্ম এখন থেকে ২৩ বছর আগে। আমার পারিবারিক নাম নির্মল কুমার। আমার পিতাজীর নাম গঙ্গাপ্রসাদ। তিনি ছিলেন একজন ফার্মাসিস্ট। আমরা ছয় বোন এবং তিন ভাই। তারা সবাই আলাদা থাকছে। আমার মা হেলথ বিভাগে এলএইচবি করা শিক্ষিতা মহিলা। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে শাহ্পুরে। তারপর সমস্তিপুর মহাবিদ্যালয় থেকে বিএ করেছি। আমার পিতাজি ছিলেন স্বভাবগতভাবেই মুসলমান। মূর্তিপূজাকে তিনি চরম পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা মনে করতেন। এর প্রতি তার ঘৃণা ছিল চরম পর্যায়ের। তাছাড়া ছোটকাল থেকেই লোকেরা যখন মন্দিরে পূজা করতে

যেতো আমি বলতাম– এই পাথরগুলোর মধ্যে এমন কী আছে? বিজ্ঞানের এই যুগে তোমরা স্বহস্তে তৈরি মূর্তি পূজা করছো এর কোনো মানে হয়?

পাঁচ বছর আগের কথা। আমি একটি কাজে পানিপথ এসেছি। আমার এক বন্ধু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পানিপথ ইন্টারন্যাশনালে সে আমাকে ডায়িং অপারেটর হিসাবে চাকুরি ধরিয়ে দিয়েছিল। চাকুরির ভেতর দিয়েই সে আমাকে কাজ শিখিয়েছে। তারপর সেই ফ্যাক্টরিটা তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। আমিও পানিপথ ছেড়ে দিই। সেখান থেকে হিমাচলে চলে যাই। স্বরস্বতী স্পিনিং মিল্‌ে আমি ডায়িং অপারেটর হিসেবে নতুন চাকরি নিই।

প্রশ: আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রতিটি শিশুই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতপর তার বাবা-মাই তাকে ইহুদি-খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়। এই পৃথিবীকে যিনি সত্য শিখিয়েছেন তাঁর কথায় কী কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? ছেলেবেলা থেকেই ইসলাম আমার পছন্দের ধর্ম। আমি আগেও বলেছি মূর্তিপূজারীদের দেখে আমার হাসি পেত। আমি এমনও দেখেছি একটি কুকুর মন্দিরে ঢুকে পূজারীর প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে। প্রসাদ খেয়ে অন্য কোনো দেবতার মুখ চাটছে। এমনকি পা উঁচু করে মূর্তির মুখে প্রস্রাব করতেও দেখেছি। এই অবস্থা দেখে আমি পূজারীদের ডেকে বলতাম– তোমাদের ভগবানের উপর কিভাবে তার কুকুর প্রস্রাব করছে তোমরা তোমাদের ভগবানকে জলদি বাঁচাও। আমি যখন কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ঘটনা পড়ি তখন আমার মনে হয় আমার মনের অবস্থাও অনেকটা ইবরাহীম আ.-এর মতই। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। আমি তাঁর পায়ের ধূলার সমানও নই। তবে এতোটুকু অবশ্যই বলবো, স্বভাবগতভাবেই আমি ছিলাম ইবরাহিমী চরিত্রের মানুষ।

ভাই আহমদ! আপনাকে কিভাবে বুঝাবো, যখনই আযানের আওয়াজ আমার কানে আসতো মনে হতো আমার মালিক যেন আমাকেই ডাকছেন। আমাদের বাড়ির পাশে একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদে একজন কারী সাহেব এতো চমৎকার আযান দিতেন আমি সবকিছু ভুলে সেই আযান শুনতাম। এমনও হতো আমি খাচ্ছি আর আযান শুরু হয়েছে আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। পান করবো হাতে পানি নিয়েছি এমন সময় আযান। সব কাজ ফেলে আগে আযান শুনতাম তারপর কাজ শুরু করতাম। মাঝেমধ্যে বলতাম– একদিন আমিও আমার মালিকের ডাক শুনে চলে আসবো এবং মালিকের ঘরে গিয়ে কেবল তাঁর সামনেই লুটিয়ে পড়বো।

আমার আল্লাহ আমাকে এমন একজন পিতা দিয়েছিলেন যিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবেই মুসলমান। তিনি আমাকে মূর্তিপূজারী হতে দেননি। আজ ভাবতেও কষ্ট হয় আমার পিতাজী কালেমা ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। (দীর্ঘশ্বাস....) আমার আল্লাহ আমাকে পথ দেখিয়েছেন। কালা আমারেতে যখন আমি চাকরি নিই তখন ঐ ফ্যাক্টরিতে একজন মোল্লাজী ছিলেন। নাম তাওহিদ। দেখতে যেমন চমৎকার– তার ঘন দাড়ি, গোল টুপি, ইসলামী পোশাক এসব তার সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলতো। পুরো ফ্যাক্টরিতে এই যুবক ছিল আমার কাছে সবচে' সুন্দর মানুষ। আমি একবার মনে– মনে ভাবলাম, আমার মালিক আমাকে হিন্দু পরিবারে সৃষ্টি করেছেন। আমার ভেতরটা যেমনই হোক, আমি তো চাইলে লেবাসে আকার-আকৃতিতে বাইরে থেকে সুন্দর হতে পারি।

একবার সুযোগ পেয়ে আমি তাওহিদকে বললাম, আমি তোমার মতো পোশাক পরবো এবং দাড়ি রাখবো। তুমি আমাকে দুই সেট পোশাক এবং টুপি বানিয়ে দাও। সে বললো শুধু পোশাক দিয়ে কী হবে যদি পার পুরো মুসলমান হয়ে যাও। আমি বললাম– আমি তো হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, আমার মালিকই আমাকে হিন্দু বানিয়েছেন। আমি মুসলমান হব কী করে! তাওহিদ বললো আমি যেভাবে হয়েছি। আমি বললাম– তুমি তো জন্মেছই মুসলমান ঘরে। সে বললো না, আমি হিন্দু পরিবারেই জন্মেছিলাম। যৌবনে আমি শিবসেনার অত্যন্ত জানবাজ কর্মী ছিলাম। পরে আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। আমি কালেমা পড়েছি। আমি বললাম– তুমি কোথায় গিয়ে কালেমা পড়েছ? সে বললো দিল্লীতে আমাদের এক আব্বুজী আছেন, নাম মাওলানা কালিম সিদ্দীকি। তুমি চাইলে তাঁর কাছে গিয়ে মুসলমান হতে পারো।

তার সাথে আলাপ করে প্রোগ্রাম করলাম। শনিবার দিল্লী চলে গেলাম। হযরত তখন দিল্লীর খলিলুল্লাহ মসজিদে আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমার নাম রাখলেন– আব্দুল হালিম। তারপর আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে তাবলীগে চলে গেলাম। আমাদের জামাত ছিল রাজস্তানে। আলহামদুলিল্লাহ! আমির সাহেব খুবই আন্তরিক মানুষ ছিলেন। আমার সাথে তিনি খুবই সহায়তার পরিচয় দিয়েছেন। মাত্র চল্লিশ দিনে পুরো নামায শিখিয়েছেন এবং সামান্য বয়ান করতেও শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন : মুসলমান হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছিল?

উত্তর : পূর্ব থেকেই কুফর ও শিরকের পরিবেশ আমার কাছে খুবই অপছন্দ ছিল। মুসলমান হওয়ার পর মনে হয়েছে, এতো দিন খাঁচায় বন্দী

আত্মা মুক্ত হয়েছে। মনে হয়েছে আমি যেন এতোদিন এক অপরিচিত জগতে বাস করছিলাম, এখন আমি আমার পরিচিতজনদের ফিরে পেয়েছি। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি গভীর স্বস্তি অনুভব করেছি। হযরত আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন– ইসলামের পূর্ণ স্বাদ পেতে হলে আপনাকে গভীরভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। মূলত এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে ফুলাতের জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি খুবই আন্তরিকভাবে এবং মনে প্রাণেই ইসলামকে পড়ছি। জানবার চেষ্টা করছি।

প্রশ: আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা আপনার পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনকে বলেছেন?

উত্তর: এখনও আমি বাড়িতে যাইনি। হ্যাঁ, আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। তাকে এবং মাকেও বলেছি। আমার ছোট ভাই ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার তাকে আমি ফোনে ইসলামের দাওয়াতও দিয়েছি। চার-পাঁচবার কথা হওয়ার পর ফোনেই কালেমা পড়েছে। ফোনে মায়ের সাথে কথা বলেছি। মুসলমান হয়েছি শুনে খুব খুশি হয়েছেন। বলেছেন– যেটা সত্য সেটাই মেনে চলবে। আমাদের সাথে তোমার সম্পর্ক তো ছিল খুবই কাঁচা। মৃত্যু আসার সাথে সাথেই সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। পাকা এবং প্রকৃত সম্পর্ক তো হয় মালিকের সাথে। মালিকের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক হয় তা সাত জনমেও ভাঙ্গে না। তুমি ভালোই করেছো তোমার মালিকের সাথে সম্পর্ক তুমি পাকা করে নিয়েছো।

প্রশ্ন : আপনার আব্বার ইন্তেকাল হয়েছে কতদিন আগে?

উত্তর : ভাই! এই প্রশ্ন আমার অন্তরের জন্য গভীর বেদনাদায়ক। ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রশ্নটিই আমাকে সবচে' বেশি কষ্ট দেয়। এটা আমার অন্তরে একটা গভীর ক্ষত। আমার বাবা মূর্তিপূজাকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করতেন, বিরোধিতা করতেন। সবসময় তার বন্ধুত্ব ছিল মুসলমানদের সাথে। অথচ তিনি ছিলেন হিন্দু রাজপূত। হালাল গোশত খেতেন। হিন্দুদের হোলি ইত্যাকার উৎসবকে উপহাস করতেন। মুসলমানদের সাথে ঈদ পালন করতেন। অথচ কোনো মুসলমান কখনও তাকে কালেমা পড়ার কথা বলেনি। আমার পিতাজী কারও মনে কষ্ট দেয়াকে ভয়াবহ অপরাধ মনে করতেন। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ছিল তার কাছে বড় পূণ্যের কাজ। আহমদ! হঠাৎ কী হলো– এক দুই ঘন্টার অসুস্থতা। তারপর বিদায়। কালেমা ছাড়া পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। কালেমা ছাড়া তো কোনো আমল কবুল হয় না। আমার বাবা হয়তো জাহান্নামে জ্বলছেন। অথচ আপনি কতো ভাগ্যবান। আপনি একজন মুসলমান পিতার সন্তান। আপনার পক্ষে আমার মনের এই

ক্ষত এবং বেদনার গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একবার ভেবে দেখুন, পুত্র জানে তার প্রিয়তম পিতা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে জ্বলবে। মাঝে মধ্যে আমার ভেতরে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে।

মনে চায় আমি আমার পিতাজীর জাহান্নামের প্রতিশোধ সকল মুসলমান থেকে নেবো। কখনও-কখনও এই যন্ত্রণা আমাকে সারারাত ঘুমাতে দেয় না। মাঝেমাঝে চেঁচিয়ে উঠি। বলি হে আল্লাহ! আমার বাবা কালেমা ছাড়া মারা গেল আর এই জালেম মুসলমান সম্প্রদায় আমার বাবাকে একবার কালেমা পর্যন্ত পড়ালো না। আমার বিশ্বাস কোনো মিথ্যাবাদী মুসলমানও যদি তাকে কালেমা পড়ার দাওয়াত দিতো তাহলে তিনি কালেমা পড়ে নিতেন। আহা! আমার পিতাজী যদি একবার মাওলানা কালিম সিদ্দীকির সাক্ষাত পেতেন! (কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন....) আহ! যদি আমার জন্মই না হতো। আমার বাবা জাহান্নামে জ্বলছেন এই যন্ত্রণা লাঘবের কোনো ঔষধ নেই। আর এই যন্ত্রণায় আমার কোনো শরীক নেই।

প্রশ্ন : ভাই! আপনি এতো চিন্তা করবেন না। আপনাকে তো একজন মুসলমানই কালেমা পড়িয়েছে। তাছাড়া আপনার পিতাজী ছিলেন একত্ববাদী। তিনি কেবল আল্লাহকেই মানতেন। আপনি আশা রাখেন আল্লাহ তায়ালা আপনার পিতাজীকে কাফেরদের সাথে জাহান্নামে জ্বালাবেন না। আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রতি আশাবাদী থাকুন।

উত্তর : ভাই আহমদ! আমার অবস্থা আজ এমন- বাবার কথা যখন ভাবি তখন মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। হ্যাঁ, আমার ইসলাম গ্রহণ আমার প্রতি আল্লাহ পাকের সবচে' বড় করুণা। যখন আল্লাহর এই করুণার কথা ভাবি তখন মনেমনে লজ্জিত হই, তবে আমার বাবার প্রতি আমার যে যন্ত্রণাবোধ এটা কাউকে বোঝাতে পারবো না।

প্রশ: হ্যাঁ, এটি ভাবার অধিকার আপনার আছে। তবে সেইসাথে আপনাকে এ-ও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মুসলমানদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন। আপনি যেন মুসলমানদের মতো গাফেল হয়ে না পড়েন। আপনার পিতাজীর মতো আর কেউ যেন এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় না নেন। আব্বু প্রায়ই বলেন, আমরা সকলেই বলি– মুসলমান এটা করছে না ওটা করছে না। এই হক আদায় করছে না, ওই হক আদায় করছে না। অথচ এখন এটাই ভাবা সবচে' ভালো যে, আমাকে আমার কর্তব্য আদায় করতে হবে।

উত্তর : হ্যাঁ! ভাই, হযরত আমাকেও একথা বলেছেন। কয়েকবার বিশেষভাবে বলেছেন– শয়তান খুবই সতর্ক। বিশেষ করে দাওয়াতের কাজ

থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে শয়তান কখনও ত্রুটি করে না। একজন মানুষ ঈমান ছাড়া মারা গেলে তার কী পরিণতি হবে একথা আমাদের ভাবতে হবে। তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর কথা ভাবতে হবে। যেন আমাদের আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জন দোযখে না পোড়ে। যারা খুব কাছের আত্মীয় তাদের প্রতি অধিকার বেশি। আলহামদুলিল্লাহ! বিষয়টা আমার বুঝে এসেছে। আমি এ বিষয়ে চেষ্টাও করছি। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি যে, এ পথে সফলতাও পেয়েছি। তবে আহমদ ভাই! আমার পিতাজির বন্ধন এমন এক সুদৃঢ় বন্ধন– তিনি ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন– এ কথা যখনই ভাবি আমি স্থির থাকতে পারি না।

প্রশ্ন: আপনার পিতাজির বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হোন। তিনি যদি শিরক না করে থাকেন। শিরকের প্রতি যদি তার ঘৃণা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই দয়াময় তাকে ঈমানদারদের সাথেই হাশরের মাঠে ওঠাবেন।

উত্তর : আপনার কথা সত্য হোক

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো উপদেশ?

উত্তর : আমি শুধু এতটুকুই বলবো, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। এখন মানুষের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া আমাদের কাজ। আমরা এখন জ্ঞান ও যুক্তির কাল পার করছি। হয়তো আমার এবং আমার পিতাজীর মতো আরও অসংখ্য মানুষ আছে যারা অমুসলিম পরিবারে জন্মেছেন ঠিক কিন্তু তারা স্বভাবজাতভাবে মুসলমান। আমাদের তাদের কথা ভাবতে হবে। তাদের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে কবুল করুন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি উম্মত হিসেবে কবুল করুন। যেন বেহেশতে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারি।

জানা নেই কখন মৃত্যুর পয়গাম এসে হাজির হয়।
জীবনের শেষ সন্ধ্যা কখন এসে হাজির হয়।

প্রশ: ভাই আব্দুল হালিম! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ তায়ালা আপনার এই আবেগকে কবুল করুন। এই আবেগের কিছু অংশ আমাদেরও দান করুন।

উত্তর : আপনাকেও ধন্যবাদ। আমিন!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, *মার্চ*– ২০০৭

মুহাম্মদ উমর (রাজবীর ঠাকুর)-এর সাক্ষাৎকার

ইসলাম প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রকৃত চিকিৎসা হলো ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন পুরো মানবতার সকল ব্যাধির সমাধান ও চিকিৎসার ভার। সুতরাং আমি মুসলমানদের আমন্ত্রণ জানাবো মানবতার প্রতি আপনারা আন্তরিক হোন। মানুষকে দোযখ থেকে বাঁচানোর কথা ভাবুন। ইনশাআল্লাহ! পরবর্তী সাক্ষাতে আমার দাওয়াতী অভিজ্ঞতা এবং আগামী দিনের ইচ্ছা– এসব বিষয়ে কথা বলবো। আমি আশা করি আমার উদ্দেশ্য সাধনে আপনার সহযোগিতাও পাব।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

ডা. মুহাম্মদ উমর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : ডাক্তার সাহেব! আব্বু আলীগড় থেকে ফিরে আপনার কথা বলেছিলেন। আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। গতকাল আব্বু বললেন– আপনি দিল্লী আসছেন। মথুরা যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেছেন আমি যেন আপনার সাথে সাক্ষাত করি এবং আরমুগানের জন্য একটা সাক্ষাতকার নিই। প্রথমেই আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : স্কুল সার্টিফিকেট হিসেবে আমার জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩০ অক্টোবর বেনারসের একটি গ্রামে। আমি একটি রাজপূত খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার পিতাজী ছিলেন বড় জমিদার। আমার নাম রেখেছিলেন রাজবীর ঠাকুর। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে গ্রামের স্কুলেই। হাই স্কুল শেষ করার পর বেনারস চলে গিয়েছি। বি.কম শেষ করেছি ওখানে। আমার চাচা ছিলেন বেনারস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তিনি আমাকে ইংল্যান্ড গিয়ে এম.বি.এ করার পরামর্শ দেন। তাছাড়া ওখানে যাওয়ায় আয়ও বেড়ে গেল। আমি পি.এইচ.ডিতে রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম। এরই মধ্যে সংবাদ পেলাম হার্ট এ্যাটাক করে বাবা মারা গেছেন। একজন প্রবাসী পুত্রের কাছে পিতৃবিয়োগের এই দুঃসংবাদ কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটা ছিল আমার জীবনের সবচে' কষ্টদায়ক সময়। আমি বসেবসে ভাবতাম, নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য পরিবারিক জীবনের মাথায় কুড়াল মেরে বাইরে চলে এলাম। আজ যদি আমি পারিবারিক জমিদারী দেখাশোনা করতাম। পিতা-মাতার সেবায় উপস্থিত থাকতাম

তাহলে কতো ভালো হতো! আমি এসব ভাবতেভাবতে হতাশ হয়ে পড়তাম।

অবশেষে দেশে ফিরে এলাম। ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া বন্ধ করে দেব। কিন্তু মা বাঁধা দিয়ে বললেন– আমার পি.এইচ.ডির খবর শুনে আমার পিতাজী নাকি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি নাকি মানুষকে বলতেন আমাদের তো সহায়-সম্পদের অভাব নেই। এবার ছেলেটা যদি পি.এইচ.ডিটা করতে পারে তাহলেই ভালো। আমার মা আমাকে বলেছেন তুমি যদি পি.এইচ.ডিটা শেষ করো তাহলে তোমার পিতাজীর আত্মা খুশি হবে। আমি পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে যাই। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পি.এইচ.ডি শেষ করি। তারপর বাড়িতে ফিরে আসি। আমি যখন ব্যবসায় পি.এইচ.ডি করি তখন আমাদের এদেশে এমবিএ করা লোকও ছিল হাতে গোনা। তাছাড়া আমাদের দেশে তখনও বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পি.এইচ.ডি চালুই হয়নি।

আমার ধারণায় আমরা খুব অল্প কজনই এ বিষয়ে তখন পি.এইচ.ডি করেছি। ইচ্ছা ছিল দেশে কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করবো। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমার আগ্রহ ছিল কোনো মানসম্পন্ন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করার। আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে জমশেদপুর টাটানগর থেকে সেখানকার প্রধান জেনারেল ম্যানেজার আসলো। আমাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং একটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার বানিয়ে দিল। অথচ আমার মন ছিল শিক্ষকতায়। পাঁচ বছর চাকরি করার পর সুযোগ পেয়ে গেলাম। বেনারস ইউনিভার্সিটিতে ভালো একটি চাকরি হয়ে গেল আমার। এদিকে আমার মা বিয়ে-শাদির জন্য পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে আমাকে বিবাহ করতে হয়। আমার স্ত্রী দিল্লী সেন্ট স্ট্যাফিন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। সে ইউনিভার্সিটির একজন রেজিস্টার। মূলত তার সহযোগিতায়ই আমি খুব দ্রুত প্রফেসর-এ উন্নীত হই। তারপর ১৯৯৯ সালে ডীন হিসেবে অবসর গ্রহণ করি।

এই ছিল আমার প্রথম জনমের ইতিহাস। এই জীবনে আমি অনেক বাঁকের মুখোমুখি হয়েছি। কত বন্ধুর সাথে পরিচয় হয়েছে। কত অফিসার ছাত্রের সাথে ওঠাবসা হয়েছে। আমার এই জীবন এক দীর্ঘ ইতিহাস। তাছাড়া আমার বিয়ের কাহিনীও দীর্ঘ এবং রোমাঞ্চকর। তবে এসবই হলো আমার প্রথম জন্মের কাহিনী। এই জন্মের কাহিনী বলেই বা লাভ কী।

প্রশ্ন: আলহামদুলিল্লাহ! আপনি এখন মুসলমান। আপনি বারবার প্রথম জন্মের কথা বলছেন। ইসলামে এর কোনো স্থান নেই।

উত্তর : হ্যাঁ, পূর্বজন্মের কথা যেটা বলছি সেটা হলো হিন্দুধর্মের কথা।

আমি আগেও এতে বিশ্বাসী ছিলাম না। অবশ্য ইসলামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনমের কথা আছে। আমরা একসময় রূহের জগতে ছিলাম। সেখান থেকে এই দুনিয়ায় জন্মলাভ করেছি। আমাদের সামনে আখেরাতের একটা জগত অপেক্ষা করছে। আর আমি এখানে যে প্রথম জীবনের কথা বলছি সেটা কেবল আমার জীবনেরই বিষয়। অবশ্য আমার মতো আরও যারা ভাগ্যবান আছে তাদের জীবনের একটা অধ্যায় যারা এই পৃথিবীতে আসার পর দ্বিতীয়বার নতুন জীবন লাভ করেছে। আপনি আমার কথা শোনলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন– প্রথম এবং দ্বিতীয় জনম বলতে একটা কিছু আছে।

প্রশ্ন: হ্যাঁ, ইসলাম গ্রহণের পর নতুন একটি জীবন অবশ্যই শুরু হয়।

উত্তর : হ্যাঁ, এইতো বুঝেছেন। তাহলে আপনিও দ্বিতীয় জনমে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন: এবার তাহলে এই দ্বিতীয় জনমের কথাই বলুন!

উত্তর: অবসর গ্রহণ করার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে অফার আসতে থাকে চাকরির। অবশেষে আমি বাজাজ কোম্পানির আমন্ত্রণে সাড়া দিই।

বাজাজ কোম্পানির ইচ্ছা ছিল ইউপিতে কিছু সুগার মিল করবে। এজন্য তাদের একজন এডভাইজার দরকার ছিল। আমি আমার সার্বিক দিক বিবেচনায় এই কাজটাকে উপযুক্ত মনে করি এবং তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিই। ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। একটি মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে মুম্বাই যাবো। ফেরার পথে আলীগড়ের কাছাকাছি একটা এলাকা পরিদর্শনে যেতে হবে। বিমানে দিল্লী পৌঁছে পরমুহূর্তে লম্বা সফর। এটা আমার কাছে খুবই কষ্টকর মনে হচ্ছিলো। ভাবছিলাম অগ্যস্ত ক্রান্তিতে মথুরায় এসে সেখান থেকে সাইডে চলে গেলে ভালো হবে। এই ভেবে ফার্স্টক্লাসে রিজার্ভেশন করলাম। মুম্বাইয়ের সড়কপথে কী যে জ্যাম হয়। গাড়ি ছাড়ার আধা মিনিট আগে আমি এসে ট্রেনে বসলাম।

চলতি গাড়িতেই হাঁটতে হাঁটতে আমার কেবিনে পৌঁছে দেখি একজন মুসলমান ভদ্রলোক আমার কেবিনে বসে আছেন। তার সাথে কথা হলো এবং করমর্দন হলো। মনেমনে খুশি হলাম একজন ধার্মিক মানুষের সাথে সফরটা ভালোই কাটবে। সিটের নীচে সামান রেখে কাপড় পরিবর্তন করলাম। হাতমুখ ধুয়ে এসে আরাম করে বসলাম। ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারলাম, তিনি ইউপির মুজাফফরনগর জেলার খাতুলির নিকটবর্তী একটি বিদ্বান ও বুযুর্গ পরিবারের মানুষ। বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মহাপুরুষ মাওলানা আলী

মিয়া নদবীর সাথে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। মূলত সেই ধার্মিক ভদ্রলোক ছিলেন আপনার বাবা কালিম সিদ্দীকি। কয়েকটা দিক তার সাথে আমার মিলে গেল। একে তো ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করা অবস্থায় খাতুলিতে আমি বারবার গেছি। আমার এক বন্ধুর সুবাদে ওখানে আমার আরো বেশি যাওয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন খাতুলি সুগার মিলের জিএম। তিনি তার মিলের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেয়ার জন্য আমাকে বহুবার ডেকে এনেছেন। তাছাড়া কয়েকবার পরিবারে ওখানে ছুটি কাটাতেও গিয়েছি। দ্বিতীয়ত এই ধার্মিক লোক ইউপির অধিবাসী। তৃতীয়ত মুসলমানদের ভেতর আমি সর্বাধিক প্রভাবিত ছিলাম মাওলানা আলি মিয়া নদবির দ্বারা। আমি ছয়-সাতবার লক্ষ্মৌ তাঁর খেদমতে গিয়েছি। পয়গামে ইনসানিয়াত–এর প্রোগ্রামে চার-পাঁচবার অংশগ্রহণ করেছি। আমি আমার ব্যাগ থেকে কিছু নাশতা বের করে মাওলানার খেদমতে পেশ করলাম।

প্রথমে তিনি খেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে সামান্য কিছু তুলে নিলেন। আমি একটি দীর্ঘ মিটিং থেকে ফিরেছি ফলে ক্লান্ত ছিলাম। মাওলানা সাহেবও মুম্বাইয়ে অনেক ব্যস্ত সময় কাটিয়ে এসেছেন। ফলে এক-দুই ঘন্টা আমাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয়নি। সাতটার পর আমি মাওলানাকে বললাম অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় গাড়িতে চড়েছিলাম। ভেবেছিলাম গাড়িতে ওঠার পরই ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হলো একজন ধার্মিক সঙ্গী পেয়েছি। বিশ্রাম কালও করতে পারব, আজ না হয় আত্মার শান্তির জন্য ঘুমটা ছেড়েই দিলাম। ধর্মের প্রতি আমার বেশ আগ্রহ রয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক লোকের সাথে মিশেছি। তাছাড়া বেনারস তো এমনিতেই হিন্দু পণ্ডিতদের নিবাস। এলাহাবাদ, ঋষিকেশ, হরিদুয়ার ছিল আমার নিয়মিত যাতায়াতের জায়গা। জায়গুরুদেব, ব্রহ্মাকুমারী, রামকৃষ্ণ মিশন, রাধাস্বামী সত্যসংঘ, নরিনকারী সত্যসংঘ, এনিনাথ ছাড়াও গোল্ডেন টেম্পলে গিয়েছি। আমি বৌদ্ধমতের অনুসারীদের সাথে অনেক মেলামেশা করেছি। দালাইলামার সাথেও সাক্ষাত করেছি। দক্ষিণাঞ্চলের আশ্রমগুলোতেও সময় কাটিয়েছি। বেরেলি আজমীর গিয়েছি।

আসলে আমার স্বভাবটাই হলো অনুসন্ধানী। এতোসব জায়গা ঘুরেও আমি মানসিক শান্তিটা আজও পাইনি। মাওলানা সাহেবকে বললাম– মাঝে মধ্যে আত্মার শান্তির জন্য আমি মসজিদে চলে যাই। সেখানে গেলে অন্তরে শান্তি অনুভূত হয়। তাছাড়া মাওলানা আলি মিয়া নদবির সাথে যখনই সাক্ষাত করেছি অদ্ভূত রকমের এক শান্তি পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে যেন গরম

রৌদ্রতাপ থেকে হালকা শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। এই দুই-আড়াই ঘন্টা যে আমি আপনার সামনে বসে আছি মনে হচ্ছে আমি যেন আলী মিয়াজির পাশেই বসে আছি।

মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, আপনার অন্তরটা খুবই পরিষ্কার এটা তারই প্রমাণ। আসলে মানুষের অন্তর হলো আয়নার মতো একটা বিষয়। যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে তাহলে তার সামনে যা আসে তাই পরিষ্কার দেখায়। সত্য কথা হলো আমি মুজাফফরনগরের একজন গোয়ার মানুষ। জীবনে যা কিছু লাভ করেছি তা কেবলই আমার মালিক এবং হযরত মাওলানা আলী মিয়া সাহেবের সংস্পর্শের উসিলায়। তাঁর চরণধূলির বরকতেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের কিছু দান করেছেন। এখানে নিজের কিছুই নেই। মাওলানা বারবার বলছিলেন– আপনার অনুভূতি সত্যি বিস্ময়কর। আসলে মাওলানা আলী মিয়া নদবীর কারণে আমরা উভয়ে নিজেদের একই ঘরের সদস্য মনে করতাম। মাওলানা সাহেব আমাকে বিস্তারিত প্রশ্ন করতে থাকেন। তিনি জানতে চাইলেন– প্রথমে আপনি কোনো ধর্মগুরুর সাথে দেখা করেছেন।

আমি বেনারসের বিভিন্ন আশ্রম, হিন্দুদের বিভিন্ন পন্ডিতের সাথে আমার সাক্ষাত ও বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে সাক্ষাতসহ সেইসব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসা এবং আমার মনের অস্থিরতার বিস্তারিত বিবরণ মাওলানার সামনে তুলে ধরি। আমার কাহিনী মাওলানা নীরবে শুনতে থাকেন। রাত বারটার সময় কাহিনী শেষ হয়। তখন হযরত বলেন আমিও আপনাকে কিছু শোনাতে চাই। কিন্তু আপনি মুম্বাই সফর থেকে এসেছেন। খুব ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম করুন। আমি আগামী কাল সকালে কয়েক মিনিট সময় আপনার কাছ থেকে নেব। এবার আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। একজন ধার্মিক মানুষ যার সঙ্গলাভের প্রভাব আমি অন্তরে অনুভব করছিলাম। তার সামনে 'মুখ' না হয়ে 'কান' হয়ে থাকা উচিত ছিল। আমি কোনো এক সুফির এই উপদেশ পড়েছিলাম– কোনো পীরের সঙ্গ থেকে উপকার পেতে হলে মুখ বন্ধ রেখে কান খোলা রাখতে হয়। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম– আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি, আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলেছি। মাওলানা পরম আন্তরিকতার সাথে আমার হাত চেপে ধরলেন। মমতার সাথে বললেন– ঠাকুর সাহেব! এ কেমন কথা! আপনার কথা শুনে আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি। অল্প সময়ের ভেতর আমি অনেক কিছু শিখতেও পেরেছি। আপনি বরং আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন।

আমি মাওলানা সাহেবের আচরণে মুগ্ধ হই। সোয়া বারোটার দিকে আমরা

উভয়ে শুয়ে পড়ি। খুব সকালে মাওলানা ঘুম থেকে উঠলেন এক আধবার আমারও চোখ খুলেছে। দেখেছি কেবিনে তিনি নামায পড়ছেন। দুআ করছেন। সকাল আটটায় লোকজন আমাকে নাস্তার জন্য জাগিয়ে দেয়। আমি টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে আসি। নাশতা করার পর মাওলানা সাহেব তার কথা শুরু করেন। ট্রেন রাস্তায় এক ঘন্টা লেট করেছিল। তখনও মথুরায় পৌঁছতে আরও দেড় ঘন্টা সময় লাগবে। মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। তারপর আমাকে জোর দিয়ে বললেন আপনি কালেমা পড়ে নিন। আর আমাকে তিনি বারবার বলছিলেন– আপনার এই দীর্ঘ কাহিনী শুনে আমি নিশ্চিত হয়েছি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কেবল মুসলমানই বানাননি। মুসলমান তো জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুসলমানই রেখেছেন। আমার আশা আপনার মৃত্যু হবে মুসলমান অবস্থায়। সুতরাং আপনি আজই কালেমা পড়ে নিন। তাছাড়া আমি আপনার একটি নামও ঠিক করে ফেলেছি– 'মুহাম্মদ উমর', তারপর তিনি তার ব্রিফকেস থেকে 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি বের করে দিলেন। আমি পড়তে লাগলাম।

মাওলানা সাহেব বললেন– এটা আপনি পরেও পড়তে পারবেন। এটা দিয়েছি এজন্য যে, এটা পড়ে আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমার ইচ্ছা আপনি এখনই কালেমা পড়ে নিন। আমি বললাম, এত সহজেই তো আর সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব নয়। আমি আরো চিন্তা ভাবনা করি। তারপর ফুলাতে আপনার কাছে আসবো। তিনি বললেন– দুই দিন পর আলীগড়ে আমার একটি সফর আছে। একদিন রাত ওখানে থাকবো। ফোনে যোগাযোগ করে আপনি সেখানেও দেখা করতে পারেন। সেই সাথে এ-ও বলে দিলেন– এ বিষয়ে দেরী করা ঠিক হবে না। কারণ, কখন মৃত্যু এসে যায় তাতো বলা যায় না। আমি বললাম, আমি খুব দ্রুত এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করবো। আর আলীগড়ে তো অবশ্যই দেখা করবো।

ট্রেন মথুরায় চলে এসেছে। মাওলানা সাহেব দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসলেন। গাড়ি যখন চলছে তখনও লক্ষ্য করলাম– জানালা দিয়ে তিনি আমাকে দেখছেন। আমি গাড়ি থেকে নেমে আসলাম ঠিক, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কে যেন ভেতর থেকে আমাকে বারবার চাপ দিচ্ছে। এই অনুভুতি ক্রমে প্রখর হচ্ছিলো– দুপুরের দিকে আমি মাওলানা সাহেবকে ফোন করলাম। কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য তাকে পেলাম না। পরের দিন অন্তত পঞ্চাশবার

চেষ্টার পর তাঁকে পেলাম। জানতে পারলাম তিনি চন্ডিগড়ে প্রোগ্রামে গেছেন। আমি ওখানেই দেখা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন– আমি তো এখনই বের হয়ে যাচ্ছি আপনি আলীগড়েই আসেন। একদিন অপেক্ষা করা আমার জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। যখনই আমার অনুভূতি চরমে উঠতো 'আপকি আমানত' নিয়ে বসতাম। দিনে অন্তত দশবার আমি পুস্তিকাটি পড়েছি। চরম অস্থিরতার ভেতর দিয়ে পরের দিন দশটায় আমি আলীগড়ে পৌঁছি। গেস্ট হাউজে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। নির্ধারিত রুটিন মাফিক বারটায় এসে তিনি আমাকে অপেক্ষারত দেখে খুব খুশি হন। সাক্ষাতের পর ওখানেই আমি তাকে কালেমা পড়াতে বলি। তিনি সাথেসাথেই আমাকে কালেমা পড়িয়ে দেন। গভীর ভালোবাসায় আমার মাথায় চুমু খান। বলেন– ট্রেনেই তো আপনার নাম রেখে দিয়েছি 'মুহাম্মদ উমর'। সুতরাং এখন থেকে আপনি মুহাম্মদ উমর।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পর আপনার অনুভূতি কী হয়েছিল?

উত্তর : আহমদ মিয়া! ইসলাম গ্রহণের পর আমার মনে হয়েছিল যেন আমি নতুন করে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমার কাছে আরও মনে হয়েছে যেন কোনো ভয়ানক দূর্ঘটনার হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি। ২০০৩ সালের ২৮ শে নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তেই আমার কাছে হযরত মাওলানার এই কথার সত্যতা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে– প্রতিটি সন্তানই মুসলমান অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সেই স্বভাবজাত মুসলমান হিসেবেই রেখেছেন। আসলে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার কাছে কোনো অপরিচিত কিছু মনে হয়নি। বরং আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আপন ঠিকানায় আছি। আমি আমার বিশ্বাসেই আছি।

ইসলাম গ্রহণের আগের দুইদিন আমি এমন অস্থিরতায় কাটিয়েছি– সাইড পরিদর্শনের জন্য যেতে পারিনি। ফলে তিনদিন পর্যন্ত আমি সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখেছি। তাছাড়া হযরতও আমার ইসলাম গ্রহণে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন– আমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ফার্স্টক্লাস এসি তো দূরের কথা থার্ড এসিতেও সফর করে না। আমি তো বরাবরই স্লিপার ক্লাসে সফর করি। আসলে ঐদিন আমার ফেরার কথা ছিল না। ফলে আমাদের বন্ধু মুফতী মুহাম্মদ হারুন সাহেব আগ্যস্ত ক্রান্তিতে রিজার্ভেশন করিয়ে দেন। একদিন আগেই অবশ্য টিকিট করা ছিল। কিন্তু তিনি আমাকে টিকিট দেননি। বরং নিজে এসে আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছেন। যখন তিনি আমাকে নিয়ে ফার্স্ট এসির বগির দিকে যাচ্ছিলেন তখন আমি পেছন

থেকে বারবার বলছিলাম– এতো ফার্স্ট এসি। মুফতী সাহেব এবং নওমুসলিম ভাই আব্দুল আজীজ আমাকে বললো, আমাদের সামনে দিয়ে এগুলো চলে যাবে আর আমরা কম্পার্টমেন্টের ভেতরে থেকেও দেখতে পাবো না এটা কোনো কথা হলো! তারা যখন আমাকে ফার্স্ট এসির ভেতর এনে বসিয়ে দিলেন তখন আমি বললাম আমি এতে সফর করবো না। মুফতী সাহেব বললেন, আসলে অগ্যস্ত ক্রান্তিতে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। তারপর আব্দুল আজীজ পয়সা নিয়ে গেল। বললো আমি রিজার্ভেশন করিয়ে আনছি। যখন ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখলাম তাকে বললাম– মাওলানা তো ফার্স্ট এসিতে সফর করবেন না! ভাই আব্দুল আজীজ বললো আমি মাওলানাকে রাজি করবো।

যখন কোনভাবেই আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম না তখন আবুল আজীজ বললো, দেখুন, বিমানে তিন ঘন্টা সফরের সময় ড. কাসেমের মতো মানুষ মুসলমান হয়েছেন। আর এখানে আপনার সাথে অন্তত আরও তিনজন ব্যক্তি থাকবেন। পথে সময় পাবেন ঘোল ঘন্টা। সামান্য কিছু টাকা খরচ হওয়ার বিনিময়ে যদি তিন জন ভিআইপি ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পান তাহলে তো আমি মনে করি এটা খুবই সস্তা সদাই।

একথা শোনার পর আমি চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু ফার্স্ট এসিতে কে কতো সফর করে? যারা পরের পয়সায় সফর করে তারাই না ফার্স্ট এসিতে ওঠে। গাড়ি যখন ছাড়ার সময় হলো অথচ কেউ এলো না তখন মনেমনে ভাবলাম– আচ্ছা ঠিক আছে, আমি অন্য কেবিনে গিয়ে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবো, তারপর যখন আপনি এলেন এবং মুখোমুখি একজন দাড়িওয়ালা মানুষকে দেখে বিস্মিত না হয়ে বরং আনন্দ প্রকাশ করলেন তখন সত্যিই আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়েছি। আমিও মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনাকে ফার্স্ট এসিতে দেখে আমিও কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হয়েছি। কিন্তু পরে ভেবেছি হয়তো কোনো ভক্ত টিকিট কিনে দিয়েছে। কিন্তু আজ অনুভূত হচ্ছে– কোনো ভক্ত নয়; বরং আমার দয়াময় মালিক আমার মতো তৃষিত এবং অস্থির বান্দার প্রতি করুণা করে আপনার মতো হৃদয়বান স্বজনকে এসি বগিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : আমি বারবার আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের জন্য তাঁর দরবারে সেজদা আদায় করি। তাঁর প্রশংসা করি তিনি স্বভাবগতভাবেই আমার জন্য ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনার পরিবারের অবস্থা কিছু বলবেন?

উত্তর : আমার স্ত্রীকে নিয়ে অবশ্য আমাকে কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে সে আমার সংসার ছেড়ে চলে যায়। প্রায় এক বছর আমরা আলাদা থাকি। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে খুব দুআ করতে থাকি। আল্লাহ তায়ালা অবশেষে আমার দুআ কবুল করেন। সে নিজ থেকেই ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করার পর মাওলানা সাহেব তার নাম রাখেন আয়েশা। ইসলাম সম্পর্কে সে অনেক পড়াশোনাও করেছে। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে। আমি এ পর্যন্ত দুই চিল্লা দিয়েছি। আমার ছেলে এবং তার স্ত্রী দুই সন্তানসহ আমেরিকার নিউইয়র্কে থাকে। তারাও পুরো পরিবারসহ মুসলমান হয়েছে। অবশ্য তাদের মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি। আমার মেয়েও মুসলমান। এখন ফ্রান্সে থাকে। আমার পরামর্শে সে এক আরব যুবককে বিয়ে করেছে। তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বেশ দীর্ঘ। মৌলভী আহমদ! সেই কাহিনী শোনার মতই। কিন্তু আমার ফ্লাইটের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে চীন যেতে হবে। তো ইনশাআল্লাহ! পরে কখনও এ বিষয়ে কথা বলবো।

প্রশ্ন: এক মিনিটে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : ইসলাম প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রকৃত চিকিৎসা হলো ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন পুরো মানবতার সকল ব্যাধির সমাধান ও চিকিৎসার ভার। সুতরাং আমি মুসলমানদের আমন্ত্রণ জানাবো মানবতার প্রতি আপনারা আন্তরিক হোন। মানুষকে দোযখ থেকে বাঁচানোর কথা ভাবুন। ইনশাআল্লাহ! পরবর্তী সাক্ষাতে আমার দাওয়াতী অভিজ্ঞতা এবং আগামী দিনের ইচ্ছা– এসব বিষয়ে কথা বলবো। আমি আশা করি আমার উদ্দেশ্য সাধনে আপনার সহযোগিতাও পাব।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক অনেক শোকরিয়া। জাযাকাল্লাহ! যে কোনো মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, *ফেবরুয়ারী* - ২০০৭

মুহাম্মদ আকবর (মহেশচন্দ্র শর্মা)-এর সাক্ষাৎকার

আমাদের মুসলমান ভাইগণ আমার মতো অসহায়দের প্রতি একটু করুণাপ্রবণ হোন। কত মানুষ পথ জানা না থাকার দরুন জাহান্নামে যাচ্ছে– একটু তাদের কথা ভাবুন। প্রসঙ্গত নওমুসলিম ভাইদের সম্পর্কে আমি একটি কথা বলবো। তাদের দুরাবস্থার কথা আমাদের ভাবতে হবে। তাদের অন্যের উপর নির্ভরশীল না রেখে কিভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায় সেটা ভাবতে হবে। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুখোপেক্ষিতার চরিত্র কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে জোর দিতে হবে। সকল খোদা থেকে বেরিয়ে এসে একমাত্র মালিকের উপর ঈমান আনার পর দুনিয়ার কারও সামনে হাত পাতা কী করে সম্ভব? অনেকেই অসহায় নওমুসলিমদের দান সদকা করে তাদের অভ্যাসটাই বিকৃত করে ফেলেন। তাদের আত্মা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি মনে করি, তাদের সহযোগিতা করা কর্তব্য। সেই সাথে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাও আমাদের কর্তব্য। তাদের পরনির্ভরশীল করে রাখা এটা তাদের জন্যও একটা আত্মঘাতী বিষয়।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ আকবর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তর : অবশ্যই বলুন।

প্রশ্ন: আপনার বংশগত পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমার নাম মুহাম্মদ আকবর, কর্নাল জেলার একটি গ্রামে আমার জন্ম। (সামান্য থেমে) এখন থেকে নয় বছর তিন মাস আট দিন তিন ঘন্টা আগে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। আমি ব্রাহ্মণ খান্দানে জন্মেছি। আমার পিতা আমার নাম রেখেছিলেন মহেশচন্দ্র শর্মা। আমার পিতার নাম পন্ডিত সুন্দর লাল শর্মাজী। তিনি আমাদের অঞ্চলের বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। কুষ্ঠি তৈরি করা এবং বিভিন্ন ধার্মিক রেওয়াজ সম্পাদন করাই ছিল তার কাজ। আমার ইসলাম গ্রহণের এক বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমার মা আছেন ও একটি বোন

আছেন। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ তারা উভয়ে মুসলমান। বোনের নাম ফাতেমা ও মায়ের নাম আমেনা। তারা আমার সাথেই থাকেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আমরা বেশ সুখেই আছি এবং দিল্লীতেই আছি।

প্রশ্ন: আপনার বয়স কত?

উত্তর : আমার প্রকৃত বয়স তো নয় বছর আট দিন তিন ঘন্টা এবং পনের মিনিট। তবে আমি আমার পিতা-মাতার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে এসেছি এখন থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে, ১৯৭৭ সালের ৭ জুলাই।

প্রশ্ন: আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি তখন স্কুলের ছাত্র। আমার আব্বুর কাছে পৃথিবীর সব পেশা ধোকাবাজি মনে হতো। ফলে তিনি বাধ্য হয়েই আমাদের বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট মন্দির তৈরি করেন। আমার মনে যখনই কোনো প্রশ্ন জাগতো আমি আমার আব্বুর নিকট জানতে চাইতাম। তিনি আমাকে তার উত্তর বুঝিয়ে দিতেন। মাঝেমাঝে বলতেন– বেটা! আসলে পেট পালতে হয়। নইলে এই অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে আর এমন কী আছে! মূলত পিতাজীর একথা শোনার পর ধর্মের প্রতি আমার আস্থা কমে যায়। ছোটবেলা থেকেই আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠায় অভ্যস্ত ছিলাম। পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে মন্দিরে পূজা দিতাম।

আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। যেদিন পরীক্ষা শুরু হবে সেদিনের কথা। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করলাম। ভাবলাম, আজ ভগবান মহারাজ মূর্তির কাছে পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন চেয়ে প্রার্থনা করবো। চলে গেলাম মন্দিরে। সেখানে গিয়ে দেখি একটি কুকুর পূজারীদের দেয়া মিষ্টি খেয়ে জিহ্বা চাটছে। আমি থেমে গেলাম। দেখি এই কুকুর কী করে! এখন ভাবি আল্লাহ তায়ালাই হয়তো আমার মনে এ কথা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন– তোমাকে সত্য বুঝতে হবে। আর সেজন্য দেখ এই মূর্তিশালায় কী তামাশা হচ্ছে! আমি দেখলাম প্রসাদ খেয়ে কুকুর তার জিহ্বা দিয়ে ভগবানের মুখ চাটছে। ভাবতে লাগলাম– এই মূর্তি তার মুখটাকে পর্যন্ত কুকুর থেকে বাঁচাতে পারছে না! কিন্তু আমার খান্দানী বিশ্বাস সাথেসাথে আমাকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করলো– বোকা কোথাকার! এই কুকুরও পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে ভগবানের কৃপা সন্ধানে সেবা দিচ্ছে। জিহ্বা দিয়ে ভগবানের মুখ চাটছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমার সমস্ত আস্থা ধূলোর সাথে মিশে গেল দেখলাম– কুকুরটি প্রসাদ খাওয়া শেষ করার পর একটা পা উঁচু করে একেবারে ভগবানের উপর প্রস্রাব করে

দিল। সেই প্রস্রাব মাটি থেকে সোজা ভগবানের মুখ স্পর্শ করলো। আমি আর মন্দিরে ঢুকলাম না। পূজা রেখে ফিরে এলাম। আমি আমার ঘরে এসে চোখ বন্ধ করে একক ও অদ্বিতীয় মালিককে স্মরণ করলাম এবং মনেমনে বলতে লাগলাম– হে মালিক! এই মূর্তি যখন নিজেকেই কুকুরের প্রস্রাব থেকে রক্ষা করতে পারছে না তখন আমাকে কিভাবে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবে? মালিক তুমি আমার প্রতি করুণা করো। তারপর থেকে আমি মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দিই। প্রতিদিন সকালে চোখ বন্ধ করে একক মালিকের কাছে প্রার্থনা করি। আমার পরীক্ষাও ভালো হতে থাকে। একসময় পরীক্ষা শেষ হলো। এবার ফলাফল প্রকাশের পালা। যেদিন পরীক্ষার ফল বের হলো একটা পত্রিকা কিনে আনলাম। দেখলাম আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। মনেমনে মালিককে ধন্যবাদ দিলাম।

আমি যখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ি হঠাৎ একদিন আমার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার পেটে ব্যথা হচ্ছিল। মা আমাকে জোর করে মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন– মন্দিরে গিয়ে পিতার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে এসো। আমি বারবার না করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, এভাবে বলতে হয় না, ভগবান নারাজ হবেন। শেষে আমি মন্দিরে গিয়ে খুব করে প্রার্থনা করলাম। শিবজীর চরণে মাথা রেখে এক ঘন্টা পর্যন্ত বিলাপ করে কাঁদলাম। আমি আমার পিতাকে খুব ভালোবাসতাম। বারবার আমি বলছিলাম– আমার পিতাজীকে সুস্থ করে দিন। প্রায় এক ঘন্টা পর ঘরে ফিরে এলাম। আমার মন বলছিল নিশ্চয়ই আমার পিতাজী এতোক্ষণ সুস্থ হয়ে গেছেন। ঘরে এসে দেখলাম, পিতাজী মারা গেছেন।

এ ঘটনাটায় আমি নিদারুণভাবে আহত হলাম। আমি ভাবছিলাম আমার বিবেক কোথায় চলে গিয়েছিল। আমি কেন মন্দিরে গেলাম। যেখানে আমি কুকুরকে ভগবানের মুখ চাটতে দেখেছি। সে ভগবান কিভাবে আমার পিতাজীকে সুস্থ করবে? আমি কেন আমার একক মালিকের কাছে প্রার্থনা করলাম না?

সত্যি বলতে কী, এর পর থেকে আমার ধর্মের প্রতি আস্থা পরিপূর্ণভাবে উঠে যায়। আমি তখন মনেমনে কোনো একটা পথ খুঁজতে থাকি। একসময় আমি চার্চে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি হযরত ঈসা আ.-এর মূর্তি। তখন আমার এক বন্ধু আমাকে বললো, এখানে মাদরাসা-মসজিদে একজন ধর্মগুরু মাঝেমাঝে আসেন। তাঁর নাম মাওলানা কালিম সিদ্দীকি। আগামীকাল সকাল দশটায় তিনি এখানে আসবেন। তার কথা শুনে আমি মনেমনে প্রস্তুত হলাম।

সকাল আটটার সময় আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। দশটা বেজে গেল তবুও তিনি এলেন না। তিনি এলেন বেলা এগারটায়। আশপাশের মুসলমানরা মসজিদে আগে থেকে বসা ছিলেন। মাওলানা সাহেব সোজা মসজিদে চলে এলেন। প্রথমেই তিনি রাস্তায় গাড়ির সমস্যার কারণে বিলম্ব হওয়ায় সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তার এই কথায় আমি বেশ প্রভাবিত হলাম। তারপর তিনি আলোচনা করলেন। তার আলোচনার বিষয় ছিল– কোনো মানুষের প্রতি কেউ যদি উপকার করে তবে সারা জীবন সে তার গুণ গায়। সে তাকে নারাজ করতে চায় না। অথচ আমাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের কত অসংখ্য অনুগ্রহ। তাই মানুষ হিসেবে তাঁকে খুশি রাখার চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য। আলোচনা শেষ হওয়ার পর চা পান করার জন্য তিনি উপরের মাদ্রাসায় গেলেন। আমি তার সাথে দেখা করে পিতাজীর ইন্তেকালের কথা তাকে জানালাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পাশে বসিয়ে চা খাওয়ালেন। বললেন– আপনার মালিক আপনাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলেই আপনাকে পথ দেখাতে চান। হয়তো এ কারণেই এ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন।

তারপর তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বললেন। আপকি আমানত পুস্তিকাটি আমাকে দিলেন। এ-ও বললেন– খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। কারণ, আপনার পিতাজী যেভাবে হঠাৎ চলে গেছেন ঠিক সেভাবে আমি আপনি যে কেউ চলে যেতে পারি। মৃত্যুর পর আমাদের জন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। যে নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে সেটা আর ফিরে আসার নয়। আমাদের জীবনের এক মিনিটের ভরসা নেই। তিনি আরও বলেন– আমার অনুরোধ হলো আপনি এখনই কালেমা পড়ে নিন। আমি বললাম বইটি পড়ে নিই। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি বাইরে এসে বইটি পড়ে ফেললাম। ৩২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা। অল্প সময়ে পড়ে ফেললাম। আমার সামনে থেকে সবগুলো পর্দা সরে গেল। ১৯৯৪ সালের ৯ মে ১২টায় আমি কালেমা পড়েছি। মাওলানা আমার নাম রাখলেন মুহাম্মদ আকবর। তিনি আমাকে জোর দিয়ে বললেন– মুসলমান হওয়ার কথা এখনই প্রকাশ করবেন না। এখানকার ইমাম সাহেবের কাছে নামায শিখে নেবেন। গোপনে গোপনে নামায আদায় করতে শুরু করে দিন।

আর আপনি চাইলেও ঈমান লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। সত্য কখনও চেপে রাখা যায় না। তবে আজকাল রাষ্ট্রের পরিবেশ ভালো না। আপনার ঈমান প্রকাশ পেয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন শত্রু হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো? আপনার মা-বোন কি মুসলমান হলো?

উত্তর : আমি চুপে চুপে ইসলাম সম্পর্কে পড়া-শোনা করতে লাগলাম। এর মধ্যে নামাযও শিখে নিলাম। আমার পিতাজী অমুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন একথা আমাকে সবসময় ভাবাতো। তিনি আমার খুবই প্রিয় মানুষ ছিলেন। আমি বারবার ভাবতাম, এই মুসলমান সমাজ যদি আরো আগে আমাকে ইসলামের কথা বলতো। আমি যদি আমার পিতাজি বেঁচে থাকতে মুসলমান হতে পারতাম তাহলে পায়ে ধরে হলেও আমার পিতাজীকে আমি মুসলমান বানাতাম। আমার ভেতরে দুর্ভাবনার সৃষ্টি হলো। আবার কখন আমার মা, আমার বোন এভাবে ঈমান ছাড়া দুনিয়া থেকে চলে যায়। আমি একটি দোকানে চাকরি নিলাম। যেদিন প্রথম বেতন পেলাম বেতনের টাকায় আমার মা-বোনের জন্য কাপড়-চোপড় এবং মিষ্টি কিনে নিয়ে গেলাম। তারা খুবই খুশি হলো। সুযোগ বুঝে আমি তাদের সামনে মুসলমান হওয়ার ঘটনা বললাম। সেই সাথে তাদেরও মুসলমান হওয়ার আবেদন জানালাম। কেঁদে কেঁদে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলাম। আমার কথায় মা ও বোন ক্ষেপে গেল। কেনা কাপড় আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো। মিষ্টির প্যাকেট বাইরে ছুঁড়ে ফেললো। আমি ধর্মহারা হয়ে পড়েছি বলে তারাও খুব কাঁদলো। মা আমাকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

আমি যখন কোনভাবেই রাজি হচ্ছিলাম না তখন আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত তারা আমার সাথে কথা বলেনি। আমার উপার্জন থেকে কিছু খায়নি। এমনকি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। আমি একটি আলাদা কামরা ভাড়া নিয়ে সেখানে থাকতে লাগলাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে মা-বোনের হেদায়েত চেয়ে দুআ করতে থাকি। তবে তারা অন্য কারও কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেনি। যে ঘরটায় আমি থাকতাম তার পাশেই একটি মন্দির ছিল। আমি দেখতাম প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা মানুষ সেখানে এসে মাথানত করে আছে। এই দৃশ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। একটি হাতুড়ি নিয়ে একেবারে ভোর বেলা গিয়ে সেই মন্দিরে মূর্তির মাথা ভেঙ্গে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি যখন সত্যর উপর আছি তখন আর কতদিন এভাবে মাথা নিচু করে থাকবো? এরা প্রকাশ্যে শিরক করবে আর আমরা মালিকের দুনিয়াতে থেকে আমাদের অন্তরের সত্যকে গোপন করবো? এভাবে বেঁচে থাকার চে' মরে যাওয়া ভালো। আর এ আবেগেই লাল রঙ্গের পেন্সিল পেয়ে মাথা ভাঙ্গা মূর্তির বুকে আমার নাম লিখে দিলাম। মুহাম্মদ আকবর। পুত্র -

পন্ডিত সুন্দর লাল শর্মা (মহেশচন্দ্র শর্মা)। সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো এলাকায় একটা হইচই পড়ে গেল। কে এই মুহাম্মদ আকবর। পিতাজীর নাম ধরে তারা চলে গেল আমাদের ঘরে। আমার মা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, অনেক দিন আগেই আমি ওকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। মানুষ তখন আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু লোক আমাকে ধরে পুলিশের কাছে পৌঁছে দিল। পুলিশ আমাকে খুব মারধর করলো। সত্যের জন্য আগে থেকেই আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম। ফলে এই মার আমাকে আমার ঈমানের উপর আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। আমার ঈমানী আবেগ তখন শতগুণে বলীয়ান। কে যেন আমার মাকে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তোমার ছেলেকে থানায় মারা হচ্ছে। মায়ের মমতাময়ী হৃদয় স্থির থাকতে পারেনি। আমার বোনসহ মা ছুটে এসেছেন থানায়। পুলিশ তখন আমাকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিল। বললো, আমার ছেলে মুসলমান হয়েছে বলে মারছো? যাও আমিও মুসলমান। আমার মায়ের কথায় আমার আনন্দের সীমা রইলো না। আমি এ প্রহৃত অবস্থায়ই মাকে বলতে লাগলাম, মা কালেমা পড়ে নাও। আমার মা এবং বোন উভয়েই কালেমা পড়ে নিল।

এই দৃশ্য দেখে পুলিশের লোকেরাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমার আল্লাহ ঐ মুহূর্তেই কুদরতের আরেকটি কারিশমা দেখালেন। ক্রমশ বিজেপি এম এল এ সহ সর্বমহলেই ছড়িয়ে পড়েছে, এক অধার্মিক মূর্তির সাথে এই আচরণ করেছে। তারপর সে ধরা পড়েছে এবং এখন তাকে থানায় পেটানো হচ্ছে। সংবাদ শুনে এক বিজেপি এম এল এ ছুটে এল। থানায় সে কোতয়ালকে এই বলে ধমক দিল, তাকে যদি আর মারা হয় তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। এটা তার বিশ্বাস। এটা তার আস্থা। ভারতে প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন। যার যা খুশি সে সেই ধর্ম মানতে পারে। আমাকে বলল বেটা! তোমার যে ধর্ম ইচ্ছা পালন করো, কিন্তু পরধর্মের কাউকে আঘাত করো না। তোমার ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয় না? তারপর তিনি আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। আমার মা এবং বোন মুসলমান হওয়ায় আমি তখন এতোটাই আনন্দিত ছিলাম যার তুলনায় এভাবে শতবার মার খাওয়াও তুচ্ছ ব্যাপার। আমি আনন্দে আমার মায়ের গলা ধরে কাঁদছিলাম। হাফেয সাহেবের সাথে কথা বলে আমি আমার মায়ের নাম রাখলাম আমেনা আর বোনের নাম রাখলাম ফাতেমা।

প্রশ্ন: তারপর দিল্লী চলে গেলেন কেন?

উত্তর : আসলে আমার কারণে শহরের অবস্থা বেশ গরম হয়ে পড়েছিল। সেখানে এমনিতেই মুসলমানদের অবস্থা খানিকটা দুর্বল। মূলত ১৯৪৭ এর

পরে পুরো হারিয়ানা অঞ্চল উজাড় হয়ে গিয়েছিল। এক সময় এখানেও মুসলমানরা হিন্দুর মতোই বসবাস করতো। তাদের নামও হতো হিন্দুদের মতোই। আমাদের মসজিদ কমিটির একজনের নাম ধর্মা আরেকজনের নাম অনুপ সিং। সবাই মিলে পরামর্শ দিলো এখন তোমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না। তাছাড়া হযরত মাওলানাও বললেন, এখন এখানে না থাকাই ভালো হবে। এদিকে আমি কারও দয়ায় বেঁচে থাকবো এটাও ভালো লাগছিল না। আমি কখনও আমার পিতাজীর কাছেও কিছু চাইতাম না। আমি আমার মনের কথা হযরত মাওলানাকে বললাম। তিনি আমাকে একটি স্কুলে হিন্দী শিক্ষক হিসেবে ফরিদাবাদ পাঠিয়ে দিলেন। আমি মনে মনে অঙ্গীকার করে রেখেছিলাম যে, সকল মূর্তি পূঁজার সকল ভগবান ছেড়ে যখন এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস এনেছি তখন একমাত্র তাকে ছাড়া আর কারও কাছে কিছু চাইবো না। কারও কাছে হাত পাতবো না। আমার আল্লাহ বার বার আমাকে পরীক্ষা নিয়েছেন। তারপর আমাকে বুঝ দান করেছেন। আমাকে আমার বিশ্বাসের উপর অবিচল রেখেছেন। আমি আমার মা এবং বোনকে দিল্লী নিয়ে এলাম। নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে দিল্লীতে ছোট একটি বাড়ি কিনলাম। আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে তার মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিলেন। জীবনের সকল বাঁকেই আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : বিশেষ কোনো ঘটনা থাকলে বলুন।

উত্তর : আমি তখন একটি দোকানে চাকরি নিয়েছি। প্রথম মাসের বেতন পেলাম দুই হাজার পাঁচশ রুপি, তখন আমার বাড়ির মূল্য পরিশোধের শেষ কিস্তি বাকি। তা-ও দুই হাজার পাঁচশ রুপি। বাড়িওয়ালা যখন তাগাদা করতে এলো তখন লজ্জাবোধ হওয়ায় পুরো বেতনটাই তাকে দিয়ে দিলাম। এদিকে ঘরে মা সদাই পাতির অপেক্ষায় আছে। কয়েকদিন হলো ঘরে কিছুই নেই। একদিন অবস্থা এমন হলো যে, ঘরে একটুও খাবার নেই। আমি মাগরিব নামাযের পর দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়লাম। আল্লাহ তায়ালার দরবারে খুব কান্নাকাটি করলাম। আমি তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও কাছে চাইব না। নামায পড়ে যখন বের হলাম তখন দেখলাম, জুতার সামনে পাঁচশ রুপির একটি নোট পড়ে আছে। আমি খুব খুশি হয়ে নোটটি তুলে পকেটে পুরে নিলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই এটা আমার দুআর ফসল। দোকানের দিকে যাচ্ছি আর ভাবছি কিছু আটা ইত্যাদি কিনবো। সাথে সাথেই মনে হলো আচ্ছা, এই নোটটি কারও পকেট থেকে আবার পড়ে যায়নি তো? এটা কি

আমার জন্য হালাল হবে? তখন আমি দোকানে না গিয়ে মাওলানা সাহেবের কাছে চলে গেলাম। আমি আমার অবস্থা গোপন রেখে কেবল জুতার সামনে পাঁচশ রুপির নোট পাওয়ার ঘটনাটাই তাকে বললাম। ইমাম সাহেব বললেন, মসজিদে এই রুপি পাওয়ার ঘোষণা করতে হবে। আপনার জন্য এটা হালাল হবে না। আমি নোটটি ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিলাম। খালি হাতে ঘরে ফিরে এলাম। তবে এই ভেবে আনন্দ হচ্ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর হুকুম মানার তাওফিক দিয়েছেন। আবার কষ্ট হচ্ছিল, মা'র অপেক্ষার কথা ভেবে।

তখন রাত এগারোটা। দরজায় আওয়াজ পেয়ে আমি দরজা খুললাম। মহল্লার এক ব্যক্তি এক হাজী সাহেবকে নিয়ে এসেছে। পরিচয় দিয়ে বললো, এই হাজী সাহেব আপনার সাথে কথা বলতে চান। হাজী সাহেব বললেন, আমি পশ্চিম দিল্লী থেকে এসেছি। এই এলাকায় মাগরিবের সময় পৌঁছেছি। বিভিন্ন মহল্লায় আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে গেল। তারপর বললেন, আমার একটি মাড়াইয়ের কারখানা আছে। আমার ছেলে এতোদিন এর দেখাশোনা করতো। এখন সে দেশের বাইরে চলে গেছে। কারখানা দেখাশোনার জন্য এই মুহূর্তে একজন লোক দরকার। এলাকার এক ব্যক্তি বললো, আপনি এর আগে কারখানার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। আমি আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে নিতে চাই। প্রতি মাসে আপাতত পাঁচ হাজার রুপি দেব। পরে বেতন বাড়িয়ে দিব। আমাদের এলাকার লোকজন আপনার খুব প্রশংসা করে। তারপর তিনি পাঁচ হাজার রুপির একটি বান্ডিল বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা এক মাসের অ্যাডভান্স বেতন। প্রতি মাসের বেতন মাসের প্রথম তারিখে আপনাকে অ্যাডভান্স দেয়া হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উপহার। তার সাথে কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল। আমি হোটেল থেকে রাতের খাবার কিনে আনলাম। মা এবং বোনকে নিয়ে খেলাম। তারাও খুব খুশি হলো। দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করলাম, আমাকে হারাম পাঁচশ রুপি থেকে রক্ষা করেছো। বিনিময়ে পাঁচশ'র জায়গায় পাঁচ হাজার দান করেছো। এমন ঘটনা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে।

প্রশ্ন: দাওয়াতের কাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! হযরত মাওলানা কালিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে জীবনের মিশন হিসেবে দাওয়াতকেই গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তায়ালা এই অধমকে

দিল্লী এবং হরিয়ানায় অন্তত পঞ্চাশ ব্যক্তির হেদায়েতে উসিলা হিসেবে কবুল করেছেন। তাছাড়া নিয়মিত তাবলীগের রুটিন এবং বার্ষিক চিল্লাও চালু আছে।

প্রশ্ন: আরমোগানের মাধ্যমে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে কি?

উত্তর : আমি কী, আর আমার বলবারই বা থাকবে কী? মন চায়, আমাদের মুসলমান ভাইগণ আমার মত অসহায়দের প্রতি একটু করুণাপ্রবণ হোন। কত মানুষ পথ জানা না থাকার দরুন জাহান্নামে যাচ্ছে। একটু তাদের কথা ভাবুন। প্রসঙ্গত নওমুসলিম ভাইদের সম্পর্কে আমি একটি কথা বলবো। তাদের দুরাবস্থার কথা আমাদের ভাবতে হবে। তাদের অন্যের উপর নির্ভরশীল না রেখে কিভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায় সেটা ভাবতে হবে। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুখোপেক্ষিতার চরিত্র কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে জোর দিতে হবে। সকল খোদা থেকে বেরিয়ে এসে একমাত্র মালিকের উপর ঈমান আনার পর দুনিয়ার কারও সামনে হাত পাতা কী করে সম্ভব? অনেকেই অসহায় নওমুসলিমদের দান সদকা করে তাদের অভ্যাসটাই বিকৃত করে ফেলেন। তাদের আত্মা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি মনে করি তাদের সহযোগিতা করা কর্তব্য। সেই সাথে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাও আমাদের কর্তব্য। তাদেরকে পরনির্ভরশীল করে রাখা এটা তাদের জন্যও একটা আত্মঘাতী বিষয়।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আপনি খুবই জরুরী কথা বলেছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : যা বাস্তব আমি কেবল তাই বলেছি। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **সেপ্টেম্বর–** ২০০৩

আব্দুর রশিদ দুস্ড়ম (সুনিত কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আমার কাছে মনে হয়, আমদের যেসব ভাই কুফর এবং শিরকের মধ্যে পড়ে আছে তাদের কথা সকলেরই ভাবা উচিত। বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী, ক্ষুদ্র বলে যাদের অন্যরা দূরে সরিয়ে রেখেছে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন আমাদের অঞ্চলে কাওড়ে শরীক হওয়ার প্রবণতা কী রকম বাড়ছে। এর আগে মাত্র তিন দিনের জন্য রাস্তা বন্ধ হতো। আর এখন রাস্তা বন্ধ থাকে প্রায় ১৫ দিন। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে মানুষের কষ্ট বাড়ছে। শত শত মাইল গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে মানুষ আসছে। এটা আমাদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটা প্রমাণ করে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। মালিককে সন্তুষ্ট করার অনুভূতি শক্তিলাভ করেছে। আমরা যদি আমাদের জীবনের মূল মিশন হিসেবে দাওয়াতকে গ্রহণ করি এবং তাদের বুঝাতে সক্ষম হই– এটা মালিককে খুশি করার পথ নয় বরং নারাজ করার পথ। শিরকের দিকে এই পথচলা ধর্মকর্ম নয় বরং কেবলই পাপ। আমার ধারণা, তাহলে আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়েই তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। আসলে আমরা এখন রেওয়াজী মুসলমান। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ নেই। আমি হরযতকে বলেছি। এই সাত বছরে আমি ২২টি বিয়েতে অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে কেবল পাঁচজনকে এমন পেয়েছি যাদের দাড়ি আছে। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ দাড়ি ছিল মাত্র দুই জনের। এই যখন ইসলাম এবং নবীর তরিকার সাথে আমাদের সম্পর্ক তখন আমরা অন্যদের কীভাবে দ্বীনের পথে ডাকবো? আমরাই তো আমাদের জীবনে ইসলামকে অনুসরণ করতে পছন্দ করি না। আমাদের নামাযের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা দশজনও নামাযী নয়। যারা নামায পড়ে তাদের কাছে সকল কাজ সম্পাদনের পর দ্বিতীয় স্তরে আসে নামায।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু?

আব্দুর রশিদ দুস্তোম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় বলুন!

উত্তর : আমার নাম আব্দুর রশিদ দোস্তাম। আলহামদুলিল্লাহ! আমি একজন মুসলমান। এখন থেকে ছয় বছর আগে আমি মুসলমান হয়েছি। আমার

পূর্বনাম ছিল সুনীত কুমার সুরিয়াউনসি। আমি হরিদুয়ারের নিকটবর্তী একটি গ্রামে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি সায়েন্স বায়ো সাইড এ গ্রাজুয়েশন করেছি।

প্রশ্ন : আপনার এ নাম কে রাখলো?

উত্তর : আসলে মাওলানা আসলাম কাযেমী আমার নাম রেখেছিলেন আব্দুর রশিদ। আমি কোর্টে সার্টিফিকেট বানাতে গেলাম। তখন আফগানিস্তানে আব্দুর রশিদ দোস্তাম পৃথিবীময় এক আলোচিত ব্যক্তি। উকিল সাহেব যখন আমার নাম জানতে চাইলেন আমি বললাম আব্দুর রশিদ। তিনি বললেন আব্দুর রশিদ দোস্তাম? আমি বললাম হ্যাঁ, আব্দুর রশিদ দোস্তাম। তাছাড়া দোস্তি মানে তো বন্ধু। বন্ধুত্ব তো ভালো বিষয়।

প্রশ্ন : কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন বলবে কী?

উত্তর : আমি গুরুকুলের ছাত্র ছিলাম। গুরুকুল ধার্মিক হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। স্কুলের যে কোনো বিষয়েই আমি অংশগ্রহণ করতাম এবং আগে আগে থাকতাম। ছাত্র জীবনে আমি লেখাপড়া খেলাধুলা সবটাতে বেশ অগ্রসর ছিলাম। বিশেষ করে ব্রেক ড্যান্সে আমার দক্ষতা ছিল দেখার মতো। ব্রেক ড্যান্সে ভালো করার জন্য মানুষের শরীরের জোড়ায় একটা বিন্যাস থাকতে হয়। আল্লাহ তায়ালা জন্মগতভাবেই আমাকে সে রকম করে সৃষ্টি করেছিলেন। মুম্বাই থেকে কয়েকটি সংগঠন আমাকে নিতে এসেছে। তারা বলেছে, তুমি ব্রেক ড্যান্সে পৃথিবীব্যাপী সুনাম কুড়াতে পারবে। তোমার শরীরের প্রতিটি জোড়ায় ঘূর্ণনের বিশেষ দক্ষতা আছে। এমনটি সাধারণত দেখা যায় না।

আমাদের গ্রামে মন্দির মসজিদ পাশাপাশি। আমি ভাবলাম মন্দির মসজিদ দুটোই মালিকের পূজোর জায়গা। এ দুয়ের মাঝে আবার পার্থক্য কী? আমাদের গ্রামে চমৎকার স্বভাবের একজন মানুষ বারবার আমাকে নাচতে নিষেধ করতো। বলতো, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এতো সুন্দর শারীরিক অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমার এই সৌন্দর্যের হিসাবও নেবেন। সে সবসময় প্রার্থনা করতো আমি যেন হেদায়েত পাই। আমাকে মসজিদে যাওয়ার জন্য বলতো। আমি মসজিদে বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃশ্য দেখতাম প্রতিদিন। অভিভূত হতাম। গরম-ঠান্ডা, ঝড়-বৃষ্টি সর্বাবস্থায় চমৎকার শৃঙ্খলা এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এরা মালিকের পূজা করে।

নামাযীদের এই দৃশ্য আমার খুব ভালো লাগতো। আমি যখন মন্দিরে যেতাম আমার ভেতরে তখন সে অনুভূতিটুকু পেতাম না। মনে হতো মন্দিরে একটা রেওয়াজ পালন হয় মাত্র। মাঝে মাঝে আক্ষেপ হতো। আহ! আমি যদি মুসলমান হতাম। তাহলে মসজিদে গিয়ে ওরকমভাবে নামায পড়তে পারতাম। মুহাম্মদ উমর ভাই একবার আমাকে দেওবন্দ নিয়ে গেলেন। সেখানে মুহাম্মদ আসলাম কাযেমীর কাছে আমরা আতর আনতে গেলাম। আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি একজন ভালো দাঈ। আমাকে খুব ভালো করে ইসলাম সম্পর্কে বুঝালেন। তাওহিদ, রেসালাত এবং আখেরাতের বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আর বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমান হয়ে নামায পড়তে পারাই একজন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা। আমি ইসলাম কবুল করে ফেললাম। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে ফুলাতে মাওলানা কালিম সিদ্দীকির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যাকে আমরা আব্বাজী বলি।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার অনুভূতি কি হয়েছিল?

উত্তর : আমি আল্লাহ তায়ালার লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। এর কথা যখন ভাবি তখন আমার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ না করতাম তাহলে আমার কী সর্বনাশ হতো! আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা, তিনি আমাকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করেছেন। নইলে খেলাধূলা, নাচগানসহ প্রিয় কাজগুলোর সব সরঞ্জামই আমার হাতের নাগালে ছিল। রেডিওতে আমি সমবেত সঙ্গীত গেয়েছি। এখনও নজীবাবাদ রেডিও থেকে আমার গাওয়া দলীয় সংঙ্গীত প্রচারিত হয়। বহু দিন আগে রেডিওতে আমি একটি গান গেয়েছিলাম। গানটি ছিল এরকম–

আও মিলকর ইতিহাস রচাঁয় .....
এসো মিলে রচি নতুন ইতিহাস ....

আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ–উমর ভাই, মাওলানা আসলাম মিলে আমাকে মাওলানা কালিম সিদ্দীকির কাছে পাঠিয়েছেন। আসল কথা কী, ফুলের স্বভাব হলো প্রস্ফুটিত হওয়া। কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয়, গাছে পানি না দেয়া হয় তাহলে ফুল মরে যায়। প্রতিটি মানুষও স্বভাবগতভাবে মুসলমান। ইসলাম একটি স্বভাব ধর্ম। কিন্তু সেই স্বভাবজাত ধর্মকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিবেশ ও দাওয়াতের পানি না পায় তাহলে ফোটার আগেই

মরে যায়। আমি মহান আল্লাহর লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা আদায় করি। তিনি আমাকে শুকিয়ে ঝরে পড়ার আগেই রক্ষা করছেন।

প্রশ্ন: ইসলম গ্রহণ করার পর আপনি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন কি?

উত্তর : সত্যিকথা কী, মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহর সাথে বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে তাহলে সর্বাবস্থায় আল্লাহর তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ তার সাথে থাকে। কিন্তু মানুষ খুবই দুর্বল। মানুষ ভুলে যায় গাফেল হয়ে পড়ে। তাছাড়া আমার মধ্যে ধৈর্যশক্তি খুবই কম। মানুষের উচিত চিন্তা করা আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ কত বেশুমার! তাই ঈমান ও ইসলাম তো হবে কেবল আল্লাহর জন্য। তিনিই সকাল বেলা সূর্য উদিত করেন। যদি একজন মানুষ চিন্তা করে, যে সূর্যটা উঠেছে এটা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য উদিত করেছেন এই দিনটি আল্লাহ তায়ালা কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এই রাত সৃষ্টি করেছেন আমার আরামের জন্য। আমার সামান্য সুখের জন্য এই শীতল বাতাস প্রবাহিত করেছেন। এভাবে মানুষ যদি ভাবে তাহলে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার ভালবাসা কত গভীরে গিয়ে পৌঁছবে? কিন্তু মানুষ খুবই দুর্বল। যখন সে এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশে যায় তখন তার জন্য নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। বিশেষ করে আমাদের এই সময়ে যখন সন্দেহ প্রবণতা একটা স্বাভাবিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমি সবচে' বেশি কষ্ট পেয়েছি আমার মুসলমান ভাইদের এই আচরণে যে, তারা আমাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকে। তাদের প্রশ্ন থেকে এক রকমের সন্দেহ ঝরে পড়ে। তবুও আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া। আমাকে ভালোবাসেন এমন মানুষও কম পাইনি। বিশেষ করে আমাদের হযরত আমাকে ভালোবাসেন এবং জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন: আপনার মা-বাবা বেঁচে আছেন, তাদের সাথে আপনার কোনো রকম যোগাযোগ আছে? তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমার মা-বাবা জীবিত। কয়েক বছর আগে আব্বু আদেশ করেছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাত করতে। বিশেষ করে তাদের হেদায়েতের জন্য দুআ করতে বলেছেন। আমি ফোনে মায়ের সাথে কথা বলেছি। আমার বোনের বিয়ে উপলক্ষে তিনি আমাকে ঘরে যেতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন এক বোনের বিয়েতে তিন ভাই থাকবে আর এক ভাই থাকবে না এতো এক মৃত উৎসব। এটা হয় না। আমি আমার বোনের শ্বশুরলায়ের লোকদের সাথে কথা বলেছি। তারাও অনুমতি দিয়েছে। বলেছে, সে যদি ধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে থাকে, অর্ধম হয়ে গিয়ে থাকে তাতে আমাদের কী? আমি তখন আমার বোনের জন্য কিছু উপহার কিনলাম। বোনের বিয়ের উৎসবে অংশগ্রহণ করলাম। সকলেই খুশি হলো। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমার ভাই এবং কয়েকজন আত্মীয় ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে আমাকে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর জোর করে নাপিতের দোকানে ঢুকিয়ে দেয়। সোজা বলে দেয়, এর দাড়ি কামিয়ে দাও। আমি কেঁদে কেঁদে অনুনয় বিনয় করতে থাকি। ক্ষুর হাতে চেপে ধরি। আমি কাতর কণ্ঠে বলি, আমার গলা কেটে দাও কিন্তু আমার নবীর সুন্নাত কেটো না। নাপিতও বাঁধা দেয়। কিন্তু তারা জোর করে আমার দাড়ি কামিয়ে দেয়। আমি কোনো মতে জান নিয়ে সেখান থেকে পালাই। তারপর পথেপথে কেঁদে ফিরি। আয়না দেখা আমার একটা অভ্যাস। কিন্তু এ কথা মনে হলেই আমার কান্না পেতো।

আমার নবীর সুন্নাত বঞ্চিত মুখ আমি কীভাবে দেখবো? লজ্জায় আমি আর ফুলাতে আসিনি। এদিকে হযরত আমার সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠান। এ-ও বলে পাঠান, লজ্জার কী আছে? তুমি দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলে, তারা জোর করে তোমার দাড়ি কেটে দিয়েছে। এক একটি কাটা দাড়ির বিনিময়ে তুমি নেকি পাবে। এ ঘটনার পর আমি খোলামেলা আর বাড়িতে যাইনি। মাঝে মাঝে রাতের বেলা মায়ের সাথে দেখা করতে গেছি। আমার মা ইসলামের অনেকটা কাছে চলে এসেছেন। আমরা সবাই তার জন্য দুআও করছি। আমার বিশ্বাস সামনের বার যখন যাবো তখন তিনি অবশ্যই কালেমা পড়ে নেবেন। আমার মা সন্তানদের মধ্যে আমাকে সবচে' বেশি ভালোবাসেন। তার ভালোবাসা এখন আরো বেড়েছে। আমার মায়ের পর বাবার জন্য কাজ করবো।

প্রশ্ন : শুনেছি আপনি দাওয়াতের একজন প্রাণোচ্ছল কর্মী। আপনার দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পর আমি সামান্য দীনি শিক্ষা অর্জন করেছি। তারপর হযরত আমাকে কম্পিউটার কোর্স করিয়েছেন। আজকাল মেওয়ানায় ডিটিপি ওয়ার্ক করছি। তবে জীবনের মূল লক্ষ্য হলো দাওয়াত। হযরত

আমাকে সফরে সঙ্গে নিয়ে যান। পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে দ্বীনের বাণী পৌঁছে দেয়া আমাদের কর্তব্য। সবসময় বলি টেন্ডুলকার, সালমান খান তো আমাদের আইডল হতে পারে না। আমাদের আইডল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার জীবনই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম নমুনা। আমাদের নবী মানুষের কাছে সত্তর বার পর্যন্ত যেতেন। নিজ হাতে শত্রুর পায়খানা-প্রসাব পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন। তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন। পাথরের আঘাত সহ্য করেছেন। আহত অবস্থায় আঙ্গুরের বাগানে গিয়ে উঠেছেন। তারপর সেখানে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন, ইয়া আরহামার রাহিমীন' বলে কাতর প্রার্থনা করেছেন। যারা কষ্ট দিয়েছে যারা পাথর মেরেছে তাদের জন্য দুআ করেছেন। আমার দুঃখ হয় আমিও যদি একজন মানুষের কাছে সত্তরবার না হলেও অন্তত সাতবার যেতে পারতাম। আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে হলেও মালিকের দরবারে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' বলে প্রার্থনা করতে পারতাম। পারতাম রক্তের ভাইদের হোদায়েত কামনা করে মুনাজাত করতে।

গত কয়েক মাস ধরে আল্লাহ তায়ালা আমাকে কিছুটা শক্তি দিয়েছেন। হযরত আমার কাজের রিপোর্ট শোনেন। খুশি হন, সাহস দেন ও দুআ করেন। আল্লাহ তায়ালার এক নেক বান্দাকে তাঁর দীনের এক দাঈকে সামান্য আনন্দ দেয়ার নেশা আমাকে এপথে আরও উদ্দীপ্ত করে। আলহামদুলিল্লাহ! কয়েক মাসে তেইশ ব্যক্তি এই অধমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লোকও রয়েছে। এর জন্য আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে বার বার শুকরিয়া আদায় করি। আমার আশা এক্ষেত্রে আমি একটি পথ পেয়ে গেছি। আল্লাহ তায়ালা হয়তো আমাদের তার দীনের কাজে সামান্য খেদমত করার সুযোগ দিবেন। এর আগেও কিছু লোক হয়তো মুসলমান হতো কিন্তু আমি তাদের কালেমা পড়াতাম না। পরে হযরত বলেছেন, কালেমা পড়ার জন্য বিশেষ কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কী হবে! এরপর থেকেই মূলত আমি কালেমা পড়াতে শুরু করেছি।

প্রশ্ন : মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পয়গাম?

উত্তর : আমিই কী আর পয়গামই বা দেবো কী! আমার কাছে মনে হয়, আমদের যেসব ভাই কুফর এবং শিরকের মধ্যে পড়ে আছে তাদের কথা

সকলেরই ভাবা উচিত। বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী, ক্ষুদ্র বলে যাদের অন্যরা দূরে সরিয়ে রেখেছে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন আমাদের অঞ্চলে কাওড়ে শরীক হওয়ার প্রবণতা কী রকম বাড়ছে। এর আগে মাত্র তিন দিনের জন্য রাস্তা বন্ধ হতো। আর এখন রাস্তা বন্ধ থাকে প্রায় ১৫ দিন। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে মানুষের কষ্ট বাড়ছে। শত শত মাইল গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে মানুষ আসছে। এটা আমাদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটা প্রমাণ করে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। মালিককে সন্তুষ্ট করার অনুভূতি শক্তিলাভ করেছে। আমরা যদি আমাদের জীবনের মূল মিশন হিসেবে দাওয়াতকে গ্রহণ করি এবং তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হই। এটা মালিককে খুশি করার পথ নয় বরং নারাজ করার পথ। শিরকের দিকে এই পথচলা ধর্মকর্ম নয় বরং কেবলই পাপ। আমার ধারণা, তাহলে আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়েই তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। আসলে আমরা এখন রেওয়াজী মুসলমান। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ নেই। আমি হরযতকে বলেছি। এই সাত বছরে আমি ২২টি বিয়েতে অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে কেবল পাঁচজনকে এমন পেয়েছি যাদের দাড়ি আছে। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ দাড়ি ছিল মাত্র দুই জনের। এই যখন ইসলাম এবং নবীর তরিকার সাথে আমাদের সম্পর্ক তখন আমরা অন্যদেরকে কীভাবে দ্বীনের পথে ডাকবো? আমরাই তো আমাদের জীবনে ইসলামকে অনুসরণ করতে পছন্দ করি না। আমাদের নামাযের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা দশজনও নামাযী নয়। যারা নামায পড়ে তাদের কাছে সকল কাজ সম্পাদনের পর দ্বিতীয় স্তরে আসে নামায।

প্রশ্ন: মাশাআল্লাহ! নামাযের ব্যাপারে আপনি খুবই যত্নবান। নামায সম্পর্কে আপনি খুবই ভাবেন। এ সম্পর্কে আর একটু খুলে বলবেন কি?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া। নামাযের আকর্ষণেই আমি মুসলমান হয়েছি। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ গত পাঁচ বছরে আমার এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা হয়নি। এ পর্যন্ত সর্বমোট সাতষট্টি ওয়াক্ত নামাযের জামাত ছুটেছে। ২০০২ সালে সাত ওয়াক্ত, ২০০০ সালে তের ওয়াক্ত, ১৯৯৯ সালে ষোল ওয়াক্ত এবং ১৯৯৮ সালে একুশ ওয়াক্ত। এ বছর সফর কম হয়েছে এবং দশ ওয়াক্ত জামাত ছুটেছে। আলহামদুলিল্লাহ। কোনো জামাতই আমার শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া ছুটেনি।

প্রশ্ন : আপনি তো একেবারে হিসাব করে রেখেছেন!

উত্তর : প্রতিটি মানুষই লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে। প্রোপার্টি পকেট, ব্যাংক ব্যালেন্স, দোকানপাট, বাড়িঘর-সবকিছুরই মানুষ হিসাব রাখে। অথচ একজন মুসলমানের প্রকৃত সম্পদ তো এগুলো। আমি বুঝি না, নামাযের মূল্য কি দোকানপাট এবং ধনসম্পদ থেকে কম! মানুষ কত রকমের ক্ষতির কথা মনে রাখে। কিন্তু নামায ছুটে গেলে কিংবা জামাত ছুটে গেলে ভুলে যায়। যেন এর মূল্য দোকান পাটের ক্ষতির চাইতেও তুচ্ছ। আসলে আমাদের অন্তরে নামাযের মূল্য নেই। হযরত তো বলেন, যদি কোনো মানুষ নামাযের প্রতি যত্নবান হতে পারে তাহলে তার পুরো জীবনটাই শুদ্ধ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন: জাযাকাল্লাহ! আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া! অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন।

উত্তর : আমার জন্য দুআ করবেন। এই কথাগুলোই যেন আমার জীবনে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার জীবনটাকে কুরআনী দাওয়াতের দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন। তিনি যেন আমার জীবনটা এই দাওয়াতের পথে কবুল করেন এবং আমাকে যেন শাহাদাতের মৃত্যু দেন। শাহাদাতের মৃত্যুই একজন মুমিনের জীবনের মেরাজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **মার্চ-** ২০০৩

মুহাম্মদ আকরাম (বিক্রম সিং)-এর সাক্ষাৎকার

পৃথিবীর সকল মানুষ একই মা-বাবার সন্তান। আমরা একই রক্তের ভাইবোন। যদি কেউ ভুল বুঝে কিংবা না বুঝার কারণে ইসলামকে ঘৃণা করে, তাহলে মনে রাখতে হবে আমরা তো সর্বশেষ নবী এবং পবিত্র কুরআনের অনুসারী। তাই তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। বিশেষ করে আমাদের ভারতে 'দলিত' বলে যে তেত্রিশ কোটি আদম সন্তান রয়েছে যাদের ধর্মের ঠিকাদাররা অচ্ছুত করে অপমান করে রেখেছে আমি মনে করি এদের মধ্যে কাজ করা খুব সহজ। এদের ভেতরটা ভেঙ্গেচুরে পড়ে আছে। আমরা যদি ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে আমরা তাদের অন্তর জয় করতে পারবো। এর দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রও উপকৃত হবে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ আকরাম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

প্রশ্ন : আকরাম ভাই! আরমুগানের পাঠকদের জন্য আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার পরিচয় বলুন।

উত্তর : এখন তো মুহাম্মদ আকরাম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার নাম ছিল বিক্রম সিং। মিরাঠ জোলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি। অবশ্য সেই গ্রামটি এখন শহরেই অন্তর্ভুক্ত। আমার পিতাজীর নাম শ্রী তিলক রাম। তিনি একজন মাঝারী মানের কৃষক। আমরা চার ভাই ও তিন বোন। আমি নানক চাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে এমএ করেছি। তারপর এলএল বিতে ভর্তি হয়েছিলাম। দ্বিতীয় বর্ষে এমন কিছু অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি যার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে মাঝখানে এসে লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছিল। তারপর ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

প্রশ্ন : কোনো বিষয়টি আপনাকে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করেছিল একটু বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে খুবই অদ্ভুতভাবে। আমার পরিবার ছিল খুবই ধার্মিক। আমি যখন সামান্য বড় হয়েছি তখন আমার চিন্তা-ভাবনায় সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে আমি একাকী বসে চিন্তা করতাম– আচ্ছা, এই বিশাল জগত সংসার কে সৃষ্টি করেছেন? বিশাল মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তা কে? পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কি এক মায়ের সন্তানদের মধ্যেও কী বিচিত্র পার্থক্য! কোনো একটি কোম্পানি যখন কিছু গাড়ি তৈরি করে তখন সবগুলো গাড়ি হয় একই রকম, নম্বর পেণ্টট দেখে আমাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। অথচ এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ। এর সৃষ্টিকর্তা একজন। মালিক একজন। কিন্তু, এই মানুষকে চেনার জন্য কোনো নম্বর পেণ্টটের প্রয়োজন হয় না। এমন নিখুঁত সৃষ্টিকর্তা কে? সূর্য ওঠে। মাথার উপর থেকে যেন আগুন ঝরে। চাঁদ ওঠে। পুরো পৃথিবী স্নিগ্ধ আলোয় শীতল হয়ে পড়ে। বিশাল আকাশ অথচ কোনো খুঁটি নেই। কোনো দেয়াল নেই। কে ধরে রেখেছেন এই বিশাল আকাশ? এই যে মানুষের শরীরে চোখ, কান এবং পা। এত চমৎকার এক জীবনব্যবস্থা। কে এই জীবন ব্যবস্থার পালনকর্তা? কোনো মানুষের একটি চোখ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ডাক্তার বড় জোর একটি পাথরের চোখ বসাতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সকল ডাক্তার মিলেও একটি প্রকৃত চোখ বানাতে পারে না।

মূলত এই প্রশ্নগুলো ছোটকাল থেকেই আমাকে তাড়া করে ফিরতো। মালিকের যে কোনো সৃষ্টির দিকে তাকালেই আমার ভেতর এসব প্রশ্ন জেগে ওঠতো। সৃষ্টিকর্তাকে অনুসন্ধান করতে বাধ্য করতো। আমি আমার অন্তরের সুখ ও স্বস্তির জন্য মনে করতাম ধর্মই একমাত্র ভরসা। প্রথম দিকে আমি মন্দিরে যেতাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতাম, মানুষ হাতের তৈরি মূর্তিগুলোর পূজা করছে। কিছুটা আশ্চর্য হতাম। পূজারীদের বিবেকের উপর আমার আক্ষেপ হতো। আমার পরিবারের লোকজন মূর্তিদের খেতে দিত আবার শীতের সময় কাপড় দিত। গরমের সময় বাতাস করতো। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, তোমরা এদেরকে খেতে পরতে দাও অথচ প্রসাব-পায়খানার জন্য একটু জঙ্গলে নিয়ে যাওনা কেন? তারা তখন আমাকে শাসাতো, বলতো– এই ছেলে পাগল হয়ে গেছে। ভগবান এর আকল বুদ্ধি ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

একবার আমি আমার ছোটভাইকে নিয়ে হরিদুয়ার গেলাম। আমরা মূলত গিয়েছিলাম নীলকণ্ঠ পাহাড় দর্শনে। সেখানে গিয়ে একজায়গায় প্রচুর পুলিশ দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে এতো পুলিশ কেন? তারা বললো এই পাহাড়ে ভগবান শিবাজির একটি স্বর্ণের তৈরি সাপমূর্তি রাখা আছে।

মূর্তিটি ভারী এবং মূল্যবান। এজন্য এতো পুলিশ মিলে পাহারা দিচ্ছে। ভগবানের মূর্তি আবার কেউ চুরি করে নিয়ে না যায়।

তাদের এ কথা শুনে মনে মনে আমি বেশ ধাক্কা খেলাম। ভাবলাম ভগবান শিবাজি নিজের মূর্তিটাকে রক্ষা করতে পারছে না। সে তার পূজারীদের রক্ষা করবে কিভাবে? নিজের আত্মরক্ষার জন্য যার পুলিশের দরকার হয় সে কীভাবে পূজা পেতে পারে? আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি বরং ভাবছিলাম মূর্তিগুলোর যদি অনুভূতি থাকতো কিংবা যদি এদের কোনভাবে জীবন দেয়া যায় তাহলে বরং এরাই আমাদের পূজা করবে। কারণ আমরা এদের বানিয়েছি।

অনেকবার খবরে পড়েছি আজ অমুক মন্দিরে রূপার তৈরি অমুক ভগবানের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। আবার কখনও বা পড়েছি অমুক মন্দিরে অমুক ভগবানের ত্রিশূল চুরি হয়ে গেছে। এসব শুনে শুনে আমার মনে মন্দিরের প্রতি একটা ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমি আমার মনের শান্তির জন্য সৎসঙ্গে যেতে শুরু করেছি। সৎসঙ্গে গিয়ে দেখলাম যখন গুরু মহারাজ প্রাচন প্রদান করেন তখন অন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, মোহ-মায়া অর্থাৎ, জগতের লোভ-লালসা থেকে দূরে থেকো। অথচ যখন কোনো ব্যক্তি তাকে পাঁচশ রুপির একটি নোট দেয় তখন সে খুব খুশি হয়। নোটটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে নেয়। তাদের আদর করে পাশে বসায়। যারা কিছু দেয় না তাদের প্রতি ফিরেও তাকায় না। এই অবস্থা দেখে আমার মনে হলো এ কেমন ধর্ম? নিজে সম্পদের প্রতি লোভী আর অন্যদের বলে এসবের লোভ থেকে দূরে থাকো। আমি গুরুদের বহু অপরাধ এবং যুবতীদের সাথে তাদের হাস্য-রসিকতা সবই দেখেছি। আমি দেখেছি গুরুরা ভক্তদের উপদেশ দেয় তাদের মৃত্যুর পর যেন সমাধী নির্মাণ করা হয়। তাদের যেন পোড়ানো না হয়। অথচ তাদের সামনে যখন লোকদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় তখন তারা বাঁধা দেয় না।

এসব দেখে আমার মনে হতো এই গুরু সমাজ আসলে ভেতরে ভেতরে মুসলমান। অথচ অন্যদের এরা ইসলাম থেকে দূরে রাখে। এসব দেখে, সৎসঙ্গের প্রতিও আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আমি হিন্দুধর্ম ছেড়ে খৃষ্টধর্মের প্রতি মনোযোগী হই। কিন্তু সেখানেও গিয়ে দেখি হযরত ঈসা এবং মরিয়মের ছবির পূজা করা হয়। আমি ভেবে পাই না খোদার আবার পুত্র হয় কী করে! খৃষ্টানদের দেখি তারা ঈসা আ.-এর মূর্তির পূজা করে তার কাছে প্রার্থনা করে। অথচ তারাই মনে করে প্রভু ঈসা আ.-কে শুলিতে চড়ানো হয়েছিল। যাকে শুলিতে চড়ানো হয়েছে তার পূজা করা কীভাবে বিবেকে আসে আমি

বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া খোদ সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে তার পুত্রের কাছে প্রার্থনা করা এটাই বা কেমন কথা? আমি এখানেও নিরাশ হই।

একদিন গির্জা থেকে নিরাশ মনে ফিরছিলাম। পথে দেখলাম, জৈন মুনিদের একটা কাফেলা যাচ্ছে। চার-পাঁচজন উলঙ্গ মানুষ নির্লজ্জভাবে হেঁটে যাচ্ছে। পথে এক জায়গায় তাদের সংবর্ধনা হওয়ার কথা। তারা সেখানে যাওয়ার পর যুবতী মেয়েরা তাদের উদোম শরীর ধুয়ে সেই পানি পান করেছিলো। আমি এই দৃশ্য দেখে খুবই হতাশ হলাম। ভাবছিলাম, মানুষের বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন প্রচলিত প্রথার সামনে কিভাবে বলি হতে পারে!

আমি সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করি। আমাদের গ্রামে প্রচুর মুসলমানদের বাস, যখন আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম তখন আমার মধ্যে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো এটাই প্রাকৃতিক ধর্ম। ইসলামের পরকাল বিশ্বাস আমাকে সবচে' বেশি প্রভাবিত করেছে। এই পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার সামনে সবকিছুরই হিসাব দিতে হবে। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই রেখেছে, দেবতা বানায়নি এই ব্যাপারটি আমার খুবই ভালো লাগে। এই জগত ছেড়ে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে এবং উপস্থিত হতে হবে এক মালিকের সামনে যিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা, জগতের সকলেই যার দাস। ইসলামের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার একজন বান্দা এবং মানুষ।

আমি ইসলামকে জানার জন্য কয়েকজন মুসলমান ছেলের সাথে বন্ধুত্ব পাতি। আমার বন্ধুর নাম ছিল ফারুক। তার নানী মারা গেলে আমি তার দাফনে শরীক হলাম। কিভাবে একজন মুসলমানকে কবরে দাফন করা হয় তাই দেখলাম। পদ্ধতিটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমাদের হিন্দু সমাজে একজন মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে পুড়িয়ে ফেলে সেই তুলনায় ইসলামের এই পদ্ধতি আমার কাছে একেবারে স্বর্গের মতো মনে হলো। এরপর আমি যখন ঘরে ফিরে ঘুমালাম স্বপ্নে দেখলাম দুটি কবর। কয়েকজন ভালো মানুষ আমাকে খুলে দেখাতে লাগলো। দেখলাম, এক ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে আরামে ঘুমিয়ে আছে। অপরজনের কবরে রক্ত। উপস্থিত লোকেরা আমাকে বললো, ঘুমিয়ে আছে যে লোকটি সে একজন সৎ মুসলমান। আর রক্তে পড়ে থাকা ব্যক্তিটি একজন মন্দ মানুষ। তারপর আমি আমার বন্ধুর নানীকে দেখলাম। তাকে দেখে মনে হলো যেন আনিন্দ্য সুন্দরী এক শাহজাদী। অথচ তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধা। তার গায়ের রং-ও ছিল কালো। আমি অবাক হলাম। তারা আমাকে বললো, এই মহিলা সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। তার

কৃতকর্মের কারণেই তাকে সুন্দরী করে দেয়া হয়েছে।

তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই স্বপ্ন আমাকে মরণ পরবর্তী জীবনকে সত্যের মতো বিশ্বস্ত করে তুললো। এরপর আমি আরো সুন্দরসুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। এদিকে মুসলমানদের সাথে অতিরিক্ত মেশার কারণে আমার পরিবার আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করলো। তারা যখন আমাকে শাসাতে লাগলো তখন আমি বলে দিলাম আমি মুসলমান হয়ে যাবো আমাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। তারপর আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করলেন। ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর আমাদের গ্রামে আগমন করলেন আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা, মানবতার সত্যবন্ধু মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। আমার বন্ধুরা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। মৃত্যুর ভয়ে দেরি করা তিনি পছন্দ করলেন না। আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন ইসলামের দৃষ্টিতে নাম পরিবর্তন করা তেমন জরুরী বিষয় নয়। কিন্তু আমি আমার নাম বদলে ফেলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার নাম মুহাম্মদ আকরাম।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়ে গেল। আমি নামায শিখতে লাগলাম। মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে লাগলাম। কথাটা আশপাশের গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। কিছু কিছু মুসলমানও শংকিত হয়ে পড়লো। আমি বললাম, তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? পুলিশ কিছু বললে আমিই তার জবাব দিব। আমি সাবালক। পোস্ট গ্রাজুয়েট। আমি কোনো মুর্খ মানুষ নই। আমি জেনে বুঝে সবগুলো ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরপর আমার পরিবারের লোকেরা আমার সাথে কঠোর আচরণ শুরু করলো। এমনও হয়েছে, আমার বাবা পাঁচদিন পর্যন্ত আমাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। কিন্তু বন্ধ ঘরেও আমি নামায ছাড়িনি । আমি তখন ভাবতাম, মানুষ অন্যায় করে জেলখানায় বন্দী হয়। পুলিশের নির্যাতন ভোগ করে। আর আমি আমার মালিকের সত্যধর্ম মেনে বন্দী হয়ে রয়েছি। মার খাচ্ছি শুধু মালিকের কথা মানার কারণে। তখন আমি ঐ অত্যাচারের মধ্যে বিস্ময়কর সুখ অনুভব করতাম।

একদিন সুযোগ বুঝে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নিযামুদ্দীন মারকাযে গিয়ে এক চিল্লার জন্য জামাতে চলে গেলাম। ফিরে এসে আমার গ্রামের মুসলমানদের সাথে বসবাস শুরু করলাম। পরিণতিতে আমার এলাকায় দাঙ্গা শুরু হলো। আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে মেরে

ফেলতে চাইছিল। আমি তখন আদালতে এবং থানায় জীবনের আশংকার কথা জানিয়ে ডায়েরী করলাম। পুলিশ তখন আমাকে প্রতাপপুর থানায় নিয়ে গেল। আমাকে চাকরীর লোভ দেখালো। বললো, তুমি স্বধর্মে ফিরো এসো তোমাকে আমরা দারোগা বানাবো। আমি বললাম, দুই দিন দারোগাগিরি করে অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবো? আমাকে জাহান্নামের জেল থেকে কে রক্ষা করবে? আমাকে বিয়ে-শাদির লোভ দেখানো হলো।

আমার সামেনে ছিল আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস। পরকালের সফলতার বাণী আমার সামনে উজ্জ্বল ছিল। ফলে তারা আমাকে কোনভাবেই টলাতে পারেনি। এসপিসিটি আমাকে প্রশ্ন করলো তুমি কি তোমার গ্রাম থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে? আমি বললাম দিল্লী নিযামুদ্দিনে চলে যেতে পারি। কিন্তু ওখানের লোকেরা আমার দায় গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলো। পুলিশ রাগান্বিত হয়ে বললো, এখন আমরা তোমাকে কী করতে পারি? আমি বললাম ফুলাত নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার লোকেরা হয়তো আমাকে রাখতে রাজি হবে। দুজন পুলিশ আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলো। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্ষুর্ধাতও ছিল। যখন খাতুলি নদীর তীরে আমরা পৌঁছলাম তখন তারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলো, একে মেরে নদীতে ফেলে দিই। এ খামোখাই আমাদের পেরেশান করছে। আমি বললাম, আমার আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি আমার কিছু করতে পারবে না। তারা বললো, মাত্র চল্লিশ দিনে মুসলমানরা একে মৌলভী বানিয়ে ফেলেছে। যখন ফুলাত পৌঁছলাম তখন অনেক রাত, মাদরাসায় মাওলানা কালিম সিদ্দীকি ছিলেন না। পুলিশ মাদারাসার দায়িত্বশীলদের বললো, আপনারা যদি এর হেফাযতের ভার গ্রহণ করেন এবং একথা লিখে দেন তাহলে একে আমরা এখানে রেখে যাবো। তা না হলে মেরে একে নদীতে ফেলে দেব। আল্লাহ তায়ালা ভাই ইলিয়াস এবং ভাই সাখাওয়াতকে উত্তম প্রতিদান দিন। তারা আমার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পুলিশকে লিখেও দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন ফুলাতে বেশ সুখেই আছি। আমাদের আব্বু মাওলানা কালিম সিদ্দীকি তিনি আমাকে মা-বাবার চে'ও বেশি আদর করেন। বাড়ির কথা আমার মনেও পড়ে না।

প্রশ্ন : তারপর কি আপনি পরিবারের লোকদের সাথে আর যোগাযোগ রাখেননি?

উত্তর : আমার বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনরাও এখানে আসে। আমাকে

পুরোনো ধর্মে ফিরে যেতে বলে। প্রথম দিকে আমি খুব কঠোর জবাব দিতাম। পরে হযরত আমাকে বুঝালেন, তোমার পরিবারের লোকজন বিশেষ করে তোমার মা-বাবা তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। তারা তোমাকে লালন-পালন করেছেন। তোমার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। আদব ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। তার এই কথা আমার ভালো লেগেছে। এখন আমার পরিবারের কেউ এলে অত্যন্ত সম্মান করি। তারা আমাদের এখানে খানাপিনাও করেন। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআও করছি।

প্রশ্ন : এছাড়াও কি আপনি দাওয়াতের কথা চিন্তা করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, পরিবারের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! তাদের মধ্যে কয়েকজন এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি আশাবাদী আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হবেন।

প্রশ্ন : আরমোগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি শুধু এতোটুকুই বলতে চাই পৃথিবীর সকল মানুষ একই মা-বাবার সন্তান। আমরা একই রক্তের ভাইবোন। যদি কেউ ভুল বুঝে কিংবা না বুঝার কারণে ইসলামকে ঘৃণা করে, তাহলে মনে রাখতে হবে আমরা তো সর্বশেষ নবী এবং পবিত্র কুরআনের অনুসারী। তাই তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। বিশেষ করে আমাদের ভারতে 'দলিত' বলে যে তেত্রিশ কোটি আদম সন্তান রয়েছে যাদের ধর্মের ঠিকাদাররা অচ্ছুত করে অপমান করে রেখেছে আমি মনে করি এদের মধ্যে কাজ করা খুব সহজ। এদের ভেতরটা ভেঙ্গেচুরে পড়ে আছে। আমরা যদি ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে আমরা তাদের অন্তর জয় করতে পারবো। এর দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রও উপকৃত হবে।

প্রশ্ন : জাযাকাল্লাহ! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর : আপনি আমাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সম্মানিত করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **অক্টোবর- ২০০৩**

শেখ মুহাম্মদ উসমান (সতীশ চন্দ্র গোয়েল)-এর সাক্ষাতকার

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন ইসলামের আমানত অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। ইসলামের প্রতিটি কথার মধ্যেই আকর্ষণ রয়েছে। আমরা যদি ইসলামের সামাজিক বিষয়, ইসলামের চরিত্র এমনকি ইসলামের ইবাদতগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরি তাহলে এর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারবে না। আমরা আসলে সে কথাটিই ভুলে গেছি। দেখুন, এক মুহাম্মদ ইরফান। সে ভুল ব্যবহার এবং আমাদের এই ভারতীয় আচরণ থেকে সরে এসে যখন ইসলামের একটি বিধান মেনেছে তখন তার এই সামান্য পরিবর্তনে কেবল আমার নয় বিশাল একটি শ্রেণীর হেদায়াতের উপলক্ষ হয়েছে। পরিণতিতে তার পার্থিব ক্ষতিও লাভে পরিণত হয়েছে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শেখ মুহাম্মদ উসমান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : শেট সাহেব! আপনি দিল্লী কবে এলেন?

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আজ সকালে এসেছি। আবার রাতেই চলে যেতে হবে। মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে মন চাচ্ছিল। ফোন করে জানতে পারলাম, তিনি দিল্লীতেই আছেন। মাওলানা বললেন, আপনার সাথেও আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন রয়েছে। পুরান দিল্লী থেকে কিছু মাল কেনা জরুরী ছিল। সদর এবং চাঁদনীচকে কিছু কাজ ছিল। সবগুলো কাজ শেষ করেছি। অবশ্য কাজ এখনও বাকী আছে যা বিকেলে হবে। ভাবলাম দুপুরে হযরতের সাথে দেখা করে আসি। হযরত বললেন, আরমুগানের জন্য আহমদ একটি ইন্টারভিউ নেবে।

প্রশ্ন : আব্বুর সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ! সাক্ষাত হয়েছে। আসলে পীর এবং শেখ হলেন অনেকটা চার্জারের মতো, হযরতের সাথে দেখা করলে কিছু কথা শুনলে ঈমানের ব্যাটারী চার্জ হয়ে যায়। হাদীস শরীফেও সৎলোকের সাক্ষাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতে ধন্য হতে পেরেছিলেন বলেই সাহাবায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরাম হতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি একেবারে সত্য বলেছেন। আচ্ছা এবার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আসি। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।

উত্তর : এতে কষ্টের কী আছে। এটা বরং আমাদের জন্য মহা সৌভাগ্যের বিষয়। একটি দ্বীনি কাজে আমার মতো একজন সামান্য মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ হলো। কোথায় আমি আর কোথায় ঈমানের মতো সম্পদ! সবই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইবো।

উত্তর : আমার জন্ম ইউপির প্রখ্যাত জেলা বুলন্দশহরে। এই শহর রাজা বরুণের রাজধানী ছিল। সেখানেই একটি মর্যাদাশীল ব্যবসায়ী পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় ঠিকাদার ব্যবসায়ী। তিনি আমার নাম রেখেছিলেন সতীশচন্দ্র গোয়েল। আমার একজন ছোট ভাই আছে। পিতাজীর মৃত্যুর পর আমি ব্যবসার হাল ধরি। ছোট ভাইকে ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে খুব উন্নতি দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ! পিতাজীর ব্যবসাকে আমরা আরও বাড়াতে পেরেছি। লেখাপড়া শিখেছিলাম ইন্টার মিডিয়েট পর্যন্ত। বাবা মারা গেলে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হলো না। ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরতে হলো। বিয়ে করেছি মুজাফফরনগরের বড় এক ব্যবসায়ী পরিবারে। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র, পোস্ট গ্রাজুয়েট। আমাদের দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। আমার মা আমাদের সাথেই থাকেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বলবেন কি?

উত্তর : আসলে গোড়া থেকেই আমাদের পরিবার ছিল খুব ধার্মিক। আমার পিতাজীকে দেখেছি ধর্মীয় কাজে তিনি খুব খরচ করতেন। বিশেষ করে মানুষকে দান করা এবং লঙ্গরখানা খোলা এসব বিষয়ে তাকে দুই হাতে খরচ করতে দেখেছি। এও লক্ষ্য করেছি এর দ্বারা বাবার ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে। মূলত সেখান থেকেই ধর্মীয় কাজে খরচের প্রতি আগ্রহ আমার মধ্যেও এসেছে। তাই কেবল হিন্দুধর্ম নয়, অন্যান্য ধর্মের জন্যও পয়সা খরচ করতাম। যদি কোথাও দেখতাম মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, ভাবতাম এটাও মালিকের ঘর। মুসলমানরা না চাইলেও আমি পীড়াপীড়ি করে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের এখানে তাবলীগি ইজতেমা হতো। দায়িত্বশীলদের খোশামোদ করে আমি কিছু পয়সা নিতে বাধ্য করতাম। হয়তো এই কাজ আমার মালিক পছন্দ করেছেন এবং আমার হেদায়েতের উসিলা করেছেন।

প্রশ্ন: সন্দেহ নেই হেদায়েতের ফয়সালা আল্লাহই করেন। তবে দুনিয়াতে কাউকে না কাউকে উপলক্ষ বানান। তাই আপনি কিভাবে কার মাধ্যমে ইসলাম পেলেন বলবেন কি?

উত্তর : আমার পিতাজি মুসলমানদের মহল্লার কাছে একটি মার্কেট বানিয়েছিলেন। মার্কেটের দশটি দোকানের ছয়টিই ভাড়া নিয়েছিল মুসলমান ব্যবসায়ীরা। আমার ব্যবসা যখন বাড়লো তখন গুদামের প্রয়োজন পড়লো। ভাবলাম, এই মার্কেটটি খালি করে নতুন নকশার মার্কেট তৈরি করবো। সেখানে আমার বড় একটি গুদাম থাকবে। যোগাযোগ করার পর একটি ব্যাংক আমাদের জায়গাটি ভাড়া নিয়ে সেখানে তাদের উদ্যোগেই বিল্ডিং করে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলো। মৌখিকভাবে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেল। অ্যাডভান্সের টাকা নিয়ে দোকান খালি করে দেয়ার জন্য ভাড়াটিয়াদের অনুরোধ করা হলো। প্রায় অর্ধেক ভাড়াটিয়া এতে রাজি হয়ে দোকান ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হলো। যারা অমত করলো তাদের দোকান খালি করে দেয়ার জন্য নোটিশ দেয়া হলো। আমাদের একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন, নাম সাঈদ আহমদ। আরেকজন ভাড়াটিয়া মুহাম্মদ ইরফান।

মুহাম্মদ ইরফানের ছিল একটি জেনারেল স্টোর। আল্লাহর ইচ্ছা তার স্টোরটি আগে খুব ভালো চলতো। হঠাৎ করেই তার ব্যবসা ঠান্ডা হয়ে পড়লো। সে দোকান ছাড়তে অস্বীকার করে উল্টো আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলো। সাঈদ আহমদ মহল্লার ইমাম সাহেবের কাছে দুআ চেয়ে বললো– মার্কেটের মালিক আমাদের দোকান থেকে তুলে দিচ্ছে। মসজিদের ইমাম সাহেব মাওলানা মুঈনদ্দীন, মাওলানা কালিম সিদ্দীকির মুরীদ। ইমাম সাহেব সাঈদ আহমেদকে জিজ্ঞাসা করলেন– যখন ভাড়া নিয়েছিলে তখন কত দিনের চুক্তি হয়েছিল? সে বললো এগার মাসের। তারপর কথা ছিল প্রতি বছর চুক্তি নবায়ন হবে। কিন্তু তিন বছর ধরে আর নবায়ন করা হচ্ছে না। ইমাম সাহেব বললেন, মুখে মুখেও কোনো কিছু হয়নি। সে বললো, না।

মাওলানা সাহেব বললেন, শেঠজী দোকানের মালিক। তুমি তার দোকান দখল করতে চাচ্ছো। আমি তো দুআ করবো শেঠজীর জন্য। তুমি অন্যের সম্পদ গ্রাস করতে চাচ্ছ। তোমার জন্য কীভাবে দুআ করি? ইমাম সাহেবের কথায় বেচারা সাঈদ আহমদ হতাশ হয়ে ফিরে এলো। মুহাম্মদ ইরফানও ইমাম সাহেবের মুসল্লী। ইরফান গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করলো। বললো, শেঠজী প্রথমে দোকান খালি করে দিতে বলেছিল এখন লিখিত নোটিশ

দিয়েছে। তাছাড়া দোকানও ভালো চলে না। পরামর্শ দিন এখন কী করবো? ইমাম সাহেব লেনদেনের বিস্তারিত কথাবার্তা শুনলেন। তারপর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিলেন, এখনই দোকান খালি করে দাও। যদি মামলায় তোমার পক্ষে রায়ও হয়ে যায় তাহলে মনে রেখো পরকালের আদালতে ধরা পড়ে যাবে।

আমরা মুসলমানরা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। নামায পড়ার সময় তো মুসলমান থাকি কিন্তু লেনদেন করতে গিয়ে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাই। আমাদের হযরত সত্যই বলেন। তিনি প্রায়ই আমাদেরকে বলে থাকেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রায় ভাষণেই বলতেন, লা- ঈমানা লিমান লা আমানাতালাহু ওয়ালা দীনা লিমান লা আহদা লাহু। যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই; যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই। তোমাদের চুক্তি যখন ছিল এগার মাসের তখন শেঠজীর অনুমতি ছাড়া তো একদিনও দোকান তোমাদের দখলে রাখার অনুমতি নেই। এ ধরনের অপরাধ সরাসরি ঈমান–পরীপন্থী। আমার মত হলো, এখন গিয়ে দোকান খালি করে দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যবসায় বরকত দিবেন। মুহাম্মদ ইরফান এমনিতেও স্টোর ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। ইমাম সাহেবের কথায় সে আর দেরি করলো না। পরদিন সে দোকান খালি করতে লাগলো। তড়িঘড়ি করে দোকান খালি করতে দেখে আমি কিছুটা ভয় পেলাম। কারণ, আমাদের এখানে একজন চরম বদমাশ আছে। সে সুযোগ বুঝে মানুষের জায়গা জমি এবং ঘরবাড়ি দখল করে এবং অন্যকে দখল করে দেয়। তাকে কিছু বলার মতো সাহস আমাদের এখানে কারও নেই।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ইরফান আবার ঐ দোকান বদমাশটাকে দিয়ে দিচ্ছে কিনা। কিন্তু দেখলাম কিছুই হলো না। পরদিন সন্ধ্যায় ইরফান আমাদের ঘরে এলো। তার আচরণ ছিল খুবই ভদ্রতাপূর্ণ বললো, লালাজি! আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া। আপনার দোকানে আমাদের দীর্ঘদিন ভাড়ায় থাকতে দিয়েছেন। আমি আপনার নির্দেশে দোকান খালি করে দিয়েছি। খালি করতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল। এজন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি বললাম, এডভান্সের এক লাখ টাকা ফিরিয়ে দেই? ইরফান বললো, না না, লালাজি! এটা কেমন কথা! অ্যাডভান্স আবার কিসের? আমি আপনার দোকান আপনাকে ফিরেয়ে দিয়েছি। আমি তখন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। ঐ বদমাশ আবার আসছে কি না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি হাতে চাবি তুলে নিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। বললাম, ইরফান! তুমি ঠিক আছ তো? ও বললো, লালাজি! আমি পুরোপুরি ঠিক আছি। আমি বললাম, এতো তাড়াতাড়ি কেউ দোকান খালি করে দেয়? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। ইরফান বললো লালাজি! আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে। লেনদেনকে আমরা ইসলামের বাইরে নিয়ে এসেছি। এ কারণেই আপনি এখন আমাদের ইসলামী লেনদেন দেখে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি বললাম, তুমি তো প্রথমে দোকান খালি করতে চাইছিলে না। ইরফান বললো, এটা আমার ভুল ছিল।

আমি মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যখন গেলাম তিনি আমাকে খুব ধমক দিলেন। বললেন, ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী তুমি যদি এখনই দোকান খালি করে না দাও তাহলে মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালার আদালতে আটকা পড়বে। তারপর মাওলানা সাহেব যা যা বলেছিল সবকিছু সে আমাকে শুনালো। আমি বললাম, তোমার মাওলানা সাহেবের সাথে আমি কি দেখা করতে পারবো? ইরফান বললো, এখনই চলুন। আমি একটি স্কুটার নিয়ে সোজা ইরফানের সাথে মসজিদে গিয়ে উঠলাম। মাওলানা সাহেব কিতাব পড়ছিলেন। মসজিদের কক্ষেই তার সাথে সাক্ষাত হলো।

আমি বললাম, ইরফানকে দোকান খালি করে দিতে আপনি কেন বললেন? তিনি বললেন, এটা আমাদের ধর্ম এবং কুরআনের বিধান। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কুরআনে কি ভাড়া লেনদেনের বিধানও রয়েছে। ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে খেতে হয়, খাওয়ার পর কিভাবে আঙ্গুল চাটতে হয় এমনকি হাতের নখ কি ভাবে কাটতে হয় তাও শিখিয়েছেন। আমি বললাম, আচ্ছা, এই বিধান কি শুধু মুসলমানদের জন্য না কি আমরাও পারি? ইমাম সাহেব বললেন, এটাই তো আমাদের সবচে' বড় অপরাধ। আমরা আমাদের ধর্মের বিধান আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি।

ইসলামের আইন এবং কুরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয় বরং এর অনুসরণ প্রতিটি মানুষের জন্যই অপরিহার্য। আমাদের মালিক আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এই বার্তা আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য। অথচ আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলা করছি। যার কারণে আজ পৃথিবীর সর্বত্র আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি। আমি বললাম, তাহলে এসব কথা আপনারা আমাদের বলেননি কেন? তিনি বললেন, এটাই তো ভুল। এখন আপনি সামান্য সময়

বসুন। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমি তার সামনে বসে গেলাম। তারপর তিনি কথা বলতে বলতে কিতাব তুলে দিলেন। আমি বললাম। আমি কি প্রতিদিন আপনার কাছে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য আসতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই আসবেন এবং কোনরূপ সংকোচ করবেন না।

আমি নিয়মিত ইমাম সাহেবের কাছে যাতায়াত শুরু করলাম। যখনই তার কাছে যেতাম কথা শুনতাম আর উঠতে মন চাইতো না। তারপরও তার আরামের কথা ভেবে উঠে আসতাম। পঞ্চম দিন আমি মাওলানা সাহেবের কাছে মুসলমান হওয়ার আবেদন জানালাম।

১৯৯২ সালের ১২ জানুয়ারী এশার পর তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। তিনি প্রতিদিনই কথা প্রসঙ্গে মাওলানা কালিম সিদ্দীকি সাহেবের কথা বলতেন। সেদিনই আমি হযরতের সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম করলাম। রোববার সকালে ফুলাত পৌঁছলাম। আমাদের সাক্ষাতে হযরত মাওলানাও খুব খুশি হলেন। সেদিন তিনি আমার নাম রাখলেন মুহাম্মদ উসমান। এ-ও বললেন, হযরত উসমান রাযি. আমাদের নবীজির অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। প্রচুর দান করতেন। এ কারণেই আপনার নাম রাখলাম মুহাম্মদ উসমান।

হযরত আমাকে মা এবং সন্তানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করার নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, পরিবারের লোকদের সাথে আমার আচরণ বদলাতে হবে। তাদের বেশি করে যত্ন নিতে হবে। তাদের প্রতি খরচের মাত্রাও বাড়াতে হবে। হযরত বললেন, সময়ও বেশি দিতে হবে। মন না চাইলেও তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের কাছে বসিয়ে দরদ ও মমতার সাথে 'আপকি আমানত' পড়ে শুনাতে হবে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, একদিন পরিবারের সকলের প্রিয় খাবারের ব্যবস্থা করুন। একসাথে বসে খান। তারপর 'আপকি আমানত' পড়ে শুনান। বরং পড়ার আগে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করুন যেন তারা শুনার জন্য আবদার করে। তারপর 'মরনে কে বাদ কেয়া হোগা' একটু একটু করে পড়ে শুনাবেন।

প্রশ্ন : তারপর আপনি কিভাবে পরিবারের মধ্যে কাজ শুরু করলেন?

উত্তর : আমি ঘরে ফিরে এলাম। আসার পথে পরিবারের সকলের জন্য তিন চার সেট করে গরম কাপড়, মা এবং স্ত্রীর জন্য কয়েকটি শাল এবং মোজা কিনলাম। তারপর প্রতিদিনই ঘরে ফেরার সময় কিছু না কিছু সকলের জন্যই

নিয়ে আসতে লাগলাম। আমার এই হঠাৎ পরিবর্তনে সকলেই বিস্মিত। একদিন আমার স্ত্রী এর কারণ জানতে চাইলো। আমি তার কথাকে এড়িয়ে যেতে চাইলে সে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আমি তখন বললাম, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচে' ভালো মানুষ সে যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। আর সে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা।

আমার কথায় ইসলামের প্রতি আমার স্ত্রীর আকর্ষণ বেড়ে গেল। একদিন আমি স্ত্রীকে বললাম, আজ ঘরে রান্নার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের জন্য বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসবো। অত্যন্ত উন্নত মানের একটি রেস্টুরেন্ট থেকে নানা ধরনের খাবার নিলাম। বাসায় গিয়ে সকলে মিলে খুব মজা করে খেলাম। তারপর বললাম, আজ আমি তোমাদের জন্য মানবতার প্রকৃত প্রেমিকের পক্ষ থেকে একটি উপহার নিয়ে এসেছি। দেখো এর নামও কত চমৎকার। 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে'। আজ আমরা এ পুস্তিকাটি পড়বো। এটা কে পড়বে? আমার স্ত্রী বললো, আমি পড়বো। আমি বললাম, ঠিক আছে তুমিই পড়ো। পড়তে পড়তে সে কাঁদতে লাগলো। অবশেষে সে আর পড়তে পারছিলো না। কিতাবটি হাতে নিয়ে আমি পড়া শুরু করলাম। পুরো কিতাবটা শেষ করে দেখলাম। আমার মা-ও কয়েকবার কাঁদলেন। আমি মাকে বললাম, মা! বলো তোমার মত কী? নরকে জ্বলতে না নরক থেকে বাঁচতে চাও? মা বললেন, একটি কয়লা হাতের উপর রাখতে পারি না নরকে জ্বলবো কিভাবে? এই কিতাবে যা লিখেছে একেবারে সত্য লিখেছে।

আমি মাকে কালেমা পড়ার জন্য আবদার করলাম। মা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর আর কিসের অপেক্ষা? আমার স্ত্রী এবং তিন সন্তানও কালেমা পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা সকলে মিলে আমার মুসলমান হওয়ার একাদশ দিনে কালেমা পড়লো। মাওলানা সাহেব আমার মায়ের নাম রাখলেন আমেনা। স্ত্রীর নাম রাখলেন যায়নাব। আমার দুই ছেলের নাম হাসান ও হুসাইন এবং মেয়ের নাম ফাতেমা। হযরত খুব খুশি হলেন। আমাকে বারবার দুআ দিলেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা আপনার খান্দানের লোকদের বলেছেন?

উত্তর : হযরত অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। কারণ, আমাদের একান্নভুক্ত সংসার। এ কারণে শুরুতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। ১৯৯২ সালের অবস্থা তো আপনাদের অজানা নয়। রাষ্ট্রে চূড়ান্ত

পর্যায়ের আগুন জ্বলছিল। বাবরী মসজিদের বেদনাদায়ক শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে মাত্র একমাস হলো। এক বছর পর ধীরে ধীরে ব্যাপারটি প্রকাশ পেতে লাগলো। জানাজানি হওয়ার পর খান্দানের লোকেরা প্রচন্ড বিরোধিতা করেছে। হিন্দু সংগঠনগুলো নানাভাবে শাসিয়েছে। বারবার অত্যাচার করেছে। শ্বশুরালয়ের পক্ষ থেকে আমার স্ত্রীকে এবং সন্তানদের তুলে নিয়ে গেছে। তাদের সাথেও কঠোর আচরণ করেছে। আমি নিজে জামাতে সময় দিয়েছিলাম। তাছাড়া ঘরে নিয়মিত হায়াতুস সাহাবা এবং হেকায়েতে সাহাবা পড়া হতো। স্ত্রী এবং সন্তানদের পড়ে শুনাতাম। আলহামদুলিল্লাহ! তাদের অত্যাচারে আমাদের উপকারই হয়েছে।

প্রশ্ন: বিশেষ কোনো ঘটনা একটু বিস্তারিত খুলে বলবেন কি? আব্বুর কাছে শুনেছি আপনি নাকি অনেক বড় বড় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন।

উত্তর : আহমদ ভাই! আসল কথা কী, আমার অনুভূতি হলো, যখনই এসব কথা আলোচনা করি তখনই মনে হয় আমি আমার পুঁজি ক্ষয় করে ফেলছি। তাই এসব ঘটনা যতটা পারি মনের মধ্যেই চেপে রাখার চেষ্টা করি। যদি কোনো ব্যক্তির জীবন বিনাশ হয়ে যায়, তার শরীরের চামড়া তুলে নেয়া হয়, তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় আর তার বিপরীতেও যদি ঈমান বিদায়ের এই সময়ে কোনো ব্যক্তি ঈমানপ্রাপ্ত হয় তাহলে এটা তার অনেক সস্তা অর্জন। আমার সাথে যেসব আচরণ হয়েছে তা খুবই সামান্য। আল্লাহ তায়ালা আমাকে খুবই সস্তায় এবং ফ্রি ঈমান দান করেছেন। মাত্র কয়েক বছরের সামান্য কষ্ট ও অত্যাচারের কথা আমি বলবো। আমার মনে হয় এটা দয়াময় মালিকের বিরুদ্ধে অন্যের কাছে নালিশ করা। তাছাড়া আমাদের সাথে যারা অবিচার করেছে তারা তো বুঝে করেনি। বরং তারা আমার খান্দানেরই মানুষ। এই অত্যাচারে যে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে তাও নয়। আমাদের ঈমানের আলো বৃদ্ধি পেয়েছে। যখনই কোনো বিপদে পড়েছি আমার মনে হয়েছে প্রিয়তম মালিক অত্যন্ত মমতার দৃষ্টিতে আমার এই ত্যাগকে দেখছেন। এই অনুভূতির ফলে বিপদে কষ্টের বদলে আমার কাছে বরং সুখ অনুভূত হয়েছে।

প্রশ্ন : অবশেষে কি আপনি আপনার এলাকা ছেড়ে দিয়েছিলেন?

উত্তর : হযরতের পরামর্শেই আমি অবশেষে গাজিয়াবাদে নিবাস পেয়েছি। তারপর যখন প্রতিকূলতা কেটে গেছে তখন দাওয়াতের স্বার্থে আবার নিজ এলাকায় ফিরে এসেছি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, মুহাম্মদ ইরফানকে কি আপনি পুনরায় দোকান ভাড়া দিয়েছিলেন?

উত্তর : আমি ভাবলাম, এই ভাড়াটিয়া এবং মার্কেট আমার হেদায়াতের উপলক্ষ হয়েছে। তাই আমি নতুন করে মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা মুলতবি করে দিই। ইরফানকে দোকানের চাবি ফিরিয়ে দিই। বলে দিই, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই দোকান তুমি করবে। তাকে আমি এক লাখ রুপি করযে হাসানা দিই। আলহামদুলিল্লাহ! তার ব্যবসাও ভালো চলতে শুরু করেছে। তারপর আদালত সাঈদের বিরুদ্ধে দোকান খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনায় সে-ও মাওলানা মঈনুদ্দীন সাহেবের ভক্ত হয়ে যায়। কারণ, মাওলানা সাহেব লালাজির জন্য দুআ করেছিলেন আর-আদালতও লালাজির পক্ষে ফয়সালা করে। সাঈদ গিয়ে বারবার মাওলানা সাহেবের কাছে ক্ষমা চায়। আমার কাছে এসেও ক্ষমা চায়। বলে, আমি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছি। পরিণতিতে আপনাকে মামলায় অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। এই টাকা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আমি তাকেও দোকান ফিরিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : শুনেছি অন্যদের মাঝেও আপনি দাওয়াতের কাজ করছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : ব্যস, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের কাজে ব্যবহার করেছেন। কিছু বান্দা হেদায়েত লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নতুবা দাওয়াতের মতো মহান কাজের উপযুক্ত তো আমি নই? আমি একটি ইটের ভাটা দিয়েছিলাম। ইটের ভাটায় আগুন দিয়ে উদ্বোধন করার জন্য আমি হযরতের কাছে আবেদন করেছিলাম। হযরত আমার দাওয়াত কবুল করেছেন। বলেছিলেন, এখানে যারা কাজ করবে তাদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। তিনিও বলেছিলেন, ইটের ভাটায় দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন দোযখের উপলব্ধিকে সহজ করে দেয়। আপনি চাইলে এটাকেও দাওয়াতের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ! আট বছরে একশর চাইতে বেশি শ্রমিক মুসলমান হয়েছে। এর মধ্যে ৮৬ জন এ পর্যন্ত চিল্লা দিয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা অধমকে বিভিন্ন দ্বীনি কাজে এবং তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা তার অনুগ্রহ।

প্রশ্ন : শুনেছি ভালো কাজে খরচ করার প্রতি আপনার আগ্রহ প্রবাদের মতো?

উত্তর : সত্যকথা হলো, আমরা তো চৌকিদার মাত্র। সম্পদ আমাদের কাছে আমানত। যার যত বেশি তার ভয়ও তত বেশি। আল্লাহ তায়ালার

কাছে পাই পাই হিসেব দিতে হবে। আমরা যা খরচ করি তা আমানতের বদলে মালিকানায় চলে যায়। আমি মনে করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের হাতে এই সম্পদ আমানত রেখেছেন। আমরা চাইলে এই আমানত আমাদের স্বার্থে আখেরাতের একাউন্টে সঞ্চয় করে রাখতে পারি। তাছাড়া দেখা গেছে এমন করলে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। আমি হযরতের কাছে বাইয়াত হয়েছি। দুই বছর যাবত হযরত আমার দায়িত্বে একটি মাদ্রাসা দিয়েছেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কাজ অনেক সম্প্রাসারিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু করে দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ইসলামের আমানত অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। ইসলামের প্রতিটি কথার মধ্যেই আকর্ষণ রয়েছে। আমরা যদি ইসলামের সামাজিক বিষয়, ইসলামের চরিত্র এমনকি ইসলামের ইবাদতগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরি তাহলে এর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারবে না। আমরা আসলে সে কথাটিই ভুলে গেছি। দেখুন এক মুহাম্মদ ইরফান। সে ভুল ব্যবহার এবং আমাদের এই ভারতীয় আচরণ থেকে সরে এসে যখন ইসলামের একটি বিধান মেনেছে তখন তার এই সামান্য পরিবর্তনে কেবল আমার নয় বিশাল একটি শ্রেণীর হেদায়াতের উপলক্ষ হয়েছে। পরিণতিতে তার পার্থিব ক্ষতিও লাভে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন: শেট মুহাম্মদ উসমান সাহেব! আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর : আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাকে আরমুগানের কাফেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **ডিসেম্বর– ২০০৮**

আলাউদ্দীন(রাজেশ্বর)-এর সাক্ষাৎকার

সারা পৃথিবী এখন হেদায়েতের পিপাসায় কাতর। আমার মতো পাপীকেই দেখুন, শরাবের মতো নাপাক বস্তু আমার হেদায়েতের উপলক্ষ হয়েছে। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। আমাদের কর্তব্য এই উম্মত হওয়ার হক আদায় করা। পৃথিবীর সকল মানুষই তো এই নবীর উম্মত। অথচ আমরা তাদের পর মনে করে তাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছাইনি। এটা বড় জুলুম। মসুলমানদের জালেম হওয়া উচিত নয়। তাদের তাদের আমানত পৌঁছে দেয়া এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আলাউদ্দীন : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : আলাউদ্দীন ভাই! এখন আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

উত্তর : আমি নন্দীগ্রাম থেকে এসেছি। হযরতের সাথে সাক্ষাত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘদিন হলো দেখা হয়নি। এদিকে আমরা অনেক বড় হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিলাম। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, হযরতের দুআর বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এলাকায় এখন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন : আপনি দুই বছর পূর্বে ফুলাত এসেছিলেন। তখনই আব্বাজান আরমুগানের জন্য আপনার একটা ইন্টারভিউ নেয়ার করা কথা বলেছিলেন। আমি তখন জরুরী একটা কাজে খাতুলি চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আপনি নেই।

উত্তর : হ্যাঁ, ভাই আহমদ! হযরতও আমাকে বলেছিলেন। আমি সেই অপেক্ষায় ছিলাম। তারপর হযরত বললেন এখনও যাও, পরে আবার কখনও আসলে ইন্টারভিউ নেয়া হবে।

প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সব কাজেরই একটা নির্ধারিত সময় আছে। হয়তো আজই আপনার ইন্টারভিউ নেয়ার কথা আল্লাহ তায়ালার কাছে নির্দিষ্ট ছিল। ভালোই হলো। দেরীতে হলেও ভালো হলেই ভালো। প্রথমেই আমি আপনার নিকট আপনার পারিবারিক পরিচয় জানতে চাইবো।

উত্তর : আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুণ।

আমি হরিয়ানার পানিপথ জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি একজন দিনমজুরের ছেলে। পিতাজী আমার নাম রেখেছিলেন রাজেশ্বর। দুই তিন ক্লাস পড়ার পর আমি আমার পিতাজীর সাথে মাঠে যেতে শুরু করি। আমাদের কিছু জমি ছিল। সেখানেই সামান্য সবজি চাষ করা হতো। এটাই ছিলো আমাদের পারিবারিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। আমি ছিলাম পিতার একমাত্র ছেলে। আমার দুই বোন ছিল আমার বড়।

প্রশ্ন : মুসলমান হওয়ার কথা আপনার মাথায় কিভাবে এলো? কিভাবে এবং কেন মুসলমান হলেন এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : আহমদ ভাই! ইসলাম গ্রহণের কথা আমি কিভাবে ভাববো! আমার মালিক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। প্রার্থনা ছাড়াই তিনি আমাকে খান্দানী মুসলমানদের মতোই ইসলাম দান করেছেন। আগেই বলেছি, আমার দুজন বোন ছিল। তাদের বিয়ের পর আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমাদের হরিয়ানায় মদপান একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বন্ধুদের সাথে মদের আড্ডা আমার কাছে একটু বেশিই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যমুনার তীরে খুব কম দামে কাঁচা মদ পাওয়া যায়। আমার বিয়ের তিন বছর পর পিতাজী মারা যান। পরের বছর মাও মারা যান।

মা-বাবার মৃত্যুকষ্ট ভোলার জন্য আমি আরও বেশি মদ্যপ হয়ে পড়ি। শরাবের নেশায় আমি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ি। আমার স্ত্রী ছিল খুবই ভালো। স্বাভাবগতভাবেই অত্যন্ত পরিশ্রমী। আমি নেশা করে পড়ে থাকতাম আর আমার স্ত্রী আমাকে খোঁজ করে নিয়ে আসতো। বেচারী না খেয়ে থাকতো। এদিকে আমার একের পর এক সন্তান হতে থাকলো। আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঁচজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে সন্তান দিয়েছেন। সন্তান প্রসবকালে আমি আমার স্ত্রীকে কখনও এক পোয়া ঘিও এনে খাওয়াতে পারিনি। তাছাড়া ভালো কোনো খাবারেরও ব্যবস্থা করিনি। এদিকে শরাবের নেশায় আমি আমার পিতার রেখে যাওয়া জমিটুকুও একটু একটু করে বিক্রি করে দিই। আমার স্ত্রীকে সন্তানদের খাবারের জন্য মজদুরী করতে হয়েছে। অবেশেষে সে কিছু পয়সা সঞ্চয় করে গ্রামেই একটি সবজির দোকান খুলে বসেছে। এভাবে প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। আমার স্ত্রীকে একাধারে দোকান করতে হয়েছে। সন্তানদের লালন-পালন করতে হয়েছে। আবার আমাকে খুঁজেখুঁজে তুলে আনতে হয়েছে। মদ আমার জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছিল। মদ্যপ অবস্থায় আমি তাকে মাঝে মাঝে মারপিটও করতাম।

আমাদের গ্রামে একজন হাফেয সাহেব ছিলেন। তিনি একটি মাদ্রাসা চালাতেন। এক রাতে মদ খেয়ে আমি পুকুর পাড়ে বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে সেখান থেকে গভীর রাতে তুলে এনেছে। সকালে সে হাফেয সাহেবের নিকট গিয়ে খুবই কান্নাকাটি করলো। অনুনয় বিনয় করে বললেন, হাফেয সাহেব! আমার স্বামীকে মদ ছাড়াবার একটি তাবিজ লিখে দিন। হাফেয সাহেব আমার স্ত্রীকে বললেন ঠিক আছে আমি তোমাকে আমাদের হযরতের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিব। তিনি তাবিজ নয় দুআ দেন। তিনি মালিকের খুবই প্রিয় বান্দা। মালিক তার কথা শোনেন। আমি আশাবাদী তিনি দোআ দিলে তোমার স্বামী শরাব ছেড়ে দেবে। তবে শর্ত হলো, তারপর তোমাদের সকলকে মুসলমান হতে হবে। আমার স্ত্রী বেচারী বললো, হাফেয সাহেব আগে শরাব ছাড়িয়ে দিন। মুসলমান কেন প্রয়োজনে আমাদের আপনাদের মেথর বানিয়ে নেবেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

হাফেয সাহেব মাওলানা কালিম সিদ্দীকী সাহেকে ফোন করলেন। আমার স্ত্রীকে ফুলাত নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। সাথে আমার স্ত্রীর সকল পেরেশানীর কথাও তাকে জানালেন। হযরত বললেন, মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যাথায় অংশীদার হওয়া আমাদের কর্তব্য। কিন্তু তার স্বামী সুস্থ হলে সকলকে মুসলমান হতে হবে এ কথা আপনি ঠিক বলেননি। তার এই পেরেশানি দূর হওয়ার পর আখেরাতের পেরেশানি থেকে বাঁচার জন্য তাকে দাওয়াত দেয়া যায়।

তারপর মাওলানা সাহেব বললেন, আমি অবশ্যই তার স্বামীর জন্য দুআ করবো। সাথে এ-ও বলে দিলেন, এই অসহায় পরিবারের প্রতি আপনি আন্তরিকভাবে খেয়াল রাখুন এবং শংকর ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তার ভিসি আগরওয়ালকে আমার কথা বলুন। তিনি মদ ছাড়ার ভালো ভালো ঔষধ দেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার দ্বারা ধর্মীয় কোনো কাজ হয় তাহলে আমি বিনা মূল্যে করতে প্রস্তত আছি। আপনি ডাক্তার সাহেবকে আমার সালাম বলবেন এবং আমার নাম বলে ঔষুধ নিয়ে আসবেন। এমনিতেও তিনি পয়সা কম নেন। এই পরামর্শের পর হাফেয সাহেব মুজাফফরনগর যান। ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা করেন। ডাক্তার সাহেব হযরতের নাম শুনে খুব খুশি হন এবং পনের দিনের ঔষুধ দেন। অনেক পীড়াপীড়ির পরও তাকে ঔষুধের দাম দেয়া যায়নি। তিনি বলেন, মাওলানা সাহেব মানুষের জন্য এতো কাজ করেন। আর আমরা এই সামান্য কাজও

করতে পারবো না। ডাক্তার সাহেব ওষুধ দিয়ে নিয়মমত খাওয়াতে বলেন। আমার স্ত্রী সেই ওষুধ দুধ চায়ের মধ্যে মিশিয়ে দশ দিন খাওয়ায়। দশ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার শরাবের নেশা কেটে যায়।

১৯৯৬ সালের পহেলা জানুয়ারী হাফেয সাহেব আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে হযরতের সাথে সাক্ষাত করানোর জন্য সোনিপথে নিয়ে যায়। সেখানে প্রতি মাসের প্রথম দিন হযরত তাশরিফ আনেন। প্রচন্ড ভীড় ছিল। অনেক কষ্টে হাফেয সাহেব হযরতের কাছ থেকে সময় নিয়ে আমাদের আলাদা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। আমার স্ত্রী হযরতের পায়ের উপর পড়ে বলতে থাকে, হযরতজী আপনি আমাদের ভগবান। হযরত এতে খুব পেরেশান হয়ে যান। তাকে পায়ের উপর থেকে উঠিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে বুঝিয়ে বলেন। দেখ, ভগবান বা খোদা কেবল তিনিই যিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই অনুগ্রহ করে তোমাকে পেরেশানি থেকে উদ্ধার করেছেন। তারপর তিনি বলেন, যেভাবে একজন মদ্যপ ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারে না।

একই ভাবে যারা বাপ-দাদাদের থেকে ভুল পথ পেয়ে এসেছে, তারাও পারে না নিজেদের ভালো-মন্দ উপলব্ধি করতে। মদ খাওয়ার চেয়েও কোটি গুণ বড় অপরাধ হল সৃষ্টিকর্তা অদ্বিতীয় মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে ভগবান কিংবা খোদা মনে করা এবং তার পূজা করা ও তার সামনে মাথা নত করা। হাফেয সাহেব হযরতকে বললেন, এরা কালেমা পড়ার জন্য এসেছে। হযরত তখন আমাকে বললেন, শরাবের নেশা তো ছুটেছে এবার তোমাকে মদ্যপদের সঙ্গ ছাড়তে হবে। এর জন্য অবশ্য কালেমা পড়ার প্রয়োজন নেই। হাফেয সাহেব না বুঝেই বলে দিয়েছেন মুসলমান হতে হবে। তবে মালিককে রাজি করা এবং মৃত্যুর পর অনন্তকালের নরক থেকে বাঁচার জন্য অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে হবে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সকলকে নিজের মন থেকে। আমার স্ত্রী তখন বললো, আপনার কথা সত্য, এ যদি মদ না-ও ছাড়ে তবু আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

হযরত তখন আমাদের কালেমা পড়ালেন। আমার নাম রাখলেন আলাউদ্দিন। আর স্ত্রীর নাম রাখলেন ফাতেমা। আমার ছেলের নাম রাখলেন, মুহাম্মদ আলীম, মুহাম্মদ সালীম, মুহাম্মদ কালিম মুহাম্মদ নাঈম এবং মুহাম্মদ নাসীম। মেয়েদের নাম রাখলেন শামীমা, সারা এবং জাকিয়া। আমার স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন একে জামাতে পাঠিয়ে দাও। অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলে

তখন আর মদ ছাড়াবার জন্য ঔষধ খাওয়ানো লাগবে না। সে জানতে চাইল কত খরচ হবে? হযরত বললেন, বেশি না এক হাজার রুপিই যথেষ্ট। আমার স্ত্রী আটশ রুপি হযরতের সামনে পেশ করলো এবং বললো একে আজই পাঠিয়ে দিন। আমি আরও দুইশ রুপির ব্যবস্থা করে দিব।

প্রশ্ন : জামাতে কোথায় সময় কাটালেন?

উত্তর : আমি প্রথমে হযরতের সাথে ফুলাতে গেলাম। তারপর মিরাঠে গিয়ে সার্টিফিকেট তৈরি করলাম। তাপর নিজামুদ্দীন থেকে বাহরাইচে চিল্লা কাটালাম। বিহারের এক মাওলানা সাহেব আমাদের আমীর ছিলেন, তিনি আমার পিছনে অনেক মেহনত করেছেন এবং চিল্লার মধ্যে পুরো নামায শিখিয়েছেন। খানাপিনার আদবও ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছেন। এই চিল্লার মধ্যেই আমি ছয় নম্বর পুরোপুরি শিখেছি।

প্রশ্ন: তারপর গ্রামে গিয়ে কী করলেন? আপনার খান্দানের লোকেরা বিরোধিতা করেনি?

আলাউদ্দীন : প্রথম দিকে তারা খুশিই ছিল। কারণ, আমার অবস্থা তখন আজ এখানে পড়ে থাকি তো কাল ওখানে। তারা ভেবেছে যাক, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পুরো খান্দানের লোকেরা আমাকে পেরেশান করে তোলে। হাফেয সাহেবকেও কষ্ট দিতে থাকে। তখন হযরতের পরামর্শে আমরা গ্রাম ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। মাদ্রাসায় গিয়ে চৌকিদারের চাকরি নেই। বাচ্চাদের ঐ মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিই। আমার স্ত্রী হাফেয সাহেবের স্ত্রীর কাছে থেকেই নামায শিখে নিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার বাচ্চাদের লেখাপড়ার কী অবস্থা?

উত্তর : আমার বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ হাফেয হয়ে গেছে। এক ছেলে মাদ্রাসায় পড়ছে। তিনজন এখনও স্কুলে আছে। মেয়েরা তিনজনই মাদ্রাসায় মাওলানা পড়ছে। দ্বিতীয় ছেলে সালিম শয়তানের প্ররোচনায় পালিয়ে গিয়েছিল। এ হলো আমার স্ত্রীর সবচেয়ে, প্রিয় সন্তান। সে তার জন্য প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে তাবিজ এনে দিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। লোকেরা আমার স্ত্রীকে বলেছে, ওকে তোমার খন্দানের লোকেরা মেরে ফেলেছে। এ কথা শুনে তার অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে পড়েছিল।

আমি তখন খুবই পেরেশান হয়ে হযরতের কাছে চলে যাই। হযরত বললেন, তাবিজ তো খুবই পুরানো ব্যাপার স্যাপার। তাছাড়া এগুলো হলো

দুর্বল ও অসুস্থ মুসলমানদের জন্য। তুমি নতুন এবং তাজা ঈমানদার। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু করতে পারেন। বললেন, জামাতে তোমাকে সালাতুল হাজতের কথা শেখানো হয়নি? সাহাবায়ে কেরাম তাদের যেকোন প্রয়োজনে সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করতেন। তারপর আমি ফুলাতের জামে মসজিদে গিয়ে এশার পর দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়লাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে খুব কান্নাকাটি করে দুআ করলাম, হে আল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের প্রতিপালক তো তুমিই। আমার মতো পাপীদের প্রভুও তুমিই। তুমিই একমাত্র দাতা। দান করও তুমি এবং ছিনিয়েও নাও তুমি। তুমি দয়া করে আমাদের সন্তানকে সুস্থ ফিরিয়ে দাও।

আমি বারবার বলছিলাম। হে আল্লাহ! আমি তো আমার ছেলেকে তোমার কাছ থেকে ডেকে আনবোই। কখনও আমি কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় পড়ে যাচ্ছিলাম। আমার প্রতি আমার মালিকের করুণা হলো। তিনি তো সকলের ডাকই শোনেন। সকাল আটটার সময় হযরত আমাকে বললেন, আলাউদ্দিন! তোমাকে মুবারকবাদ! তোমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। সালিম বাড়ি ফিরেছে। আমি আনন্দে আমার পকেটের সবগুলো পয়সা দান করে একজন অন্ধ ফকিরের হাতে তুলে দিই। তারপর ঋণ করে আমি বাড়ি ফিরে যাই। ঘরে এসে দেখি, আলহামদুলিল্লাহ! আমার ছেলে উপস্থিত। তারপর পড়াশোনায় তার মন বসলো। এ বছর সে তারাবীহ পড়িয়েছে। পুরো কুরআন শরীফে মাত্র সাতটি ভুল গেছে।

ভাই আহমদ! এটা আল্লাহ তায়ালার করুণা। কোথায় আমার মতো কাফের ব্যক্তি আর কোথায় আমার ছেলে কুরআনের হাফেয। দ্বিতীয় মেয়ে সারাকেও এ বছর হেফয করতে দিয়েছি। সে-ও কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন : এখন আপনি কোথায় থাকেন? নন্দীগ্রামের কথা বলেছিলেন– সেখানে কী উদ্দেশ্যে থাকছেন?

উত্তর : হযরত আমাকে কোলকাতার একজন ঠিকাদারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আগে তো আমি মজুরি করতাম। পরে কোলকাতার ঐ ভদ্রলোক আমাকে স্টোরকিপার বানিয়ে দেন। নওমুসলিম হওয়ার কারণে আমার প্রতি তার বিশেষ খেয়াল ছিল। নন্দীগ্রামে সে একটি ফ্যাক্টরির ঠিকা নিয়েছিল। আমাকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছা, হঠাৎ সেখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হলো। দাঙ্গার খবর রেডিও-টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে

প্রচারিত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে অসংখ্যা লোক মারা গেছে। আমরাও তখন খুব পেরেশান ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ এক বছরে হযরতের সাথে ফোনে পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। অথচ আমি অন্তর থেকে তার মুরীদ। সেখানকার অবস্থা যখন ভয়াবহ আমার স্ত্রী তখন ফোন করে হযরতের কাছে দুআ চেয়েছে। আমি যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছি।

এক সপ্তাহ পর হযরতকে পেলাম। হযরত আমাকে বললেন, সাহাবায়ে কেরামের মতো দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে দুআ করার কথা ভুলে গেলে কেন? আমি বললাম, হযরত! আমার দুআয় কাজ হবে না। আপনি দুআ করুন। হযরত বললেন, আমি তো করবো, দাতা তো একমাত্র আল্লাহ। তিনি কি তোমার দুআ শুনবেন না। বললাম, আচ্ছা আমি আজই দুআ করছি। তারপর সেদিনই এশার নামায পড়ে মসজিদে খুব দুআ করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার দুআ শুনেছেন।

হঠাৎ দাঙ্গার আগুন এমনভাবে নিভে গেল যেন কেউ পানি ঢেলে দিয়েছে। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আজ রাতেই আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করবো। ইনশাআল্লাহ! কাল হতে দেখবে অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। আমি সাহাবায়ে কেরামের মতোই আল্লাহ তায়ালাকে আমার প্রার্থনা মানিয়ে নেব। প্রার্থনাকারীই তো পরিবর্তিত হয়েছে, প্রার্থনা যিনি শোনেন তিনি তো এক অদ্বিতীয়। পরের দিন দেখা গেল সব সঙ্গী আমাকে সম্মান করতে লাগলো। আমি তাদের বললাম, আমি তো হযরত কালিম সিদ্দীকির নির্দেশে দুআ করেছি। প্রকৃত অর্থে দুআ তো করেছেন হযরত। আমাকে তো অন্তরে একিন সৃষ্টি করার জন্য হযরত দুআ করতে বলেছেন। আমি হযরতকে ফোন করে জানাই দাঙ্গা থেমে গেছে। এদিকে আমার সঙ্গীরা আমার ভক্ত হয়ে গেছে। হযরত তখন আমাকে বললেন, এদের মধ্যে যদি অমুসলিম থাকে তাহলে তুমি এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারো। তারা তোমার কথা মন দিয়ে শুনবে। এদের জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে ঈমানদার বানানোর চেষ্টা কর। আমি তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! চারজন মজদুর ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের সাথে একজন রাজ ও একজন পেলেম্বরও ইসলাম কবুল করে।

প্রশ্ন : আপনি কি নন্দীগ্রামে স্থায়ীভাবে থাক শুরু করেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমি একটি পণ্ডট কিনেছি। কিছু পয়সাও জমিয়েছি। আল্লাহ তাআলা যদি কবুল করেন আর সেখানকার দানাপানি যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে আল্লাহই হয়তো ঘরের ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রশ্ন : সেখানে জামাতের কাজও তো করছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! তিন দিন তো প্রতি মাসেই লাগাচ্ছি। অবশ্য প্রতি বছর চিল্লায় যেতে পারছি না। প্রতিদিন তালিম এবং মসজিদের গাশত শুরু করেছি। মানুষও কিছু কিছু যোগ দিচ্ছে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু বলুন।

উত্তর : আহমদ ভাই! সারা পৃথিবী এখন হেদায়েতের পিপাসায় কাতর। আমার মতো পাপীকেই দেখুন, শরাবের মতো নাপাক বস্তু আমার হেদায়েতের উপলক্ষ হয়েছে। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। আমাদের কর্তব্য এই উম্মত হওয়ার হক আদায় করা। পৃথিবীর সকল মানুষই তো এই নবীর উম্মত। অথচ আমরা তাদের পর মনে করে তাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছাইনি। এটা বড় জুলুম। মসুলমানদের জালেম হওয়া উচিত নয়। তাদেরকে তাদের আমানত পৌঁছে দেয়া এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক– অনেক শুকরিয়া আলাউদ্দীন ভাই! আসসালালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

উত্তর : ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **জানুয়ারী- ২০০৮**

মুহাম্মদ আকবর (জতিন্দ্র কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আমার আবার পয়গাম কী! আমি তো ছোট ভাই। আমার তো এখনও পর্যন্ত নিজের ঈমানের ব্যাপারেই সন্দেহ কাটেনি। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই বলবো, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ এলাকার অমুসলমানদের কথা ভাবতে হবে। অন্যথায় হাশরের মাঠে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ধরবেন। এ কথা ভাবার সুযোগ নেই, এখানে কে ইসলাম গ্রহণ করবে? চারদিকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। আমার খান্দানের জন্য দুআ করবেন। বিশেষ করে আমার জন্য, আমার ঈমান যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঈমানের উপর অটল রাখেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ আকবর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

প্রশ্ন : আকবর ভাই! আমি হযরতের ছেলে, আমার নাম আহমদ। আমাদের এখান থেকে প্রতি মাসে আরমুগান নামে একটি উর্দূ পত্রিকা বের হয়। তাতে নওমুসলিমদের ঘটনা ছাপা হয়। এসব ঘটনা পড়ে আমাদের মুসলমান ভাইদের মধ্যে যেমন চিন্তার সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনিভাবে যারা অমুসলমান তাদের মধ্যেও ইসলামের দিকে আসার একটা পথ তৈরি হয়। আমাকে আব্বু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন একটা ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য। আপনার পক্ষে কি কথা বলা সম্ভব?

উত্তর : ভাই আহমদ! আপনি সম্ভবত মাওলানা সাহেব। আমাকে মাফ করবেন। প্রথম কথা হলো, মাত্র কয়েকদিন আগে আমি মুসলমান হয়েছি। আমি যে একজন মুসলমান এ বিষয়ে আমার নিজের সন্দেহই এখনও কাটেনি। দ্বিতীয় কথা হলো, আমি আমাকে পরিপূর্ণভাবে হযরতের হাতে সঁপে দিয়েছি। দশদিন ফুলাতে থাকার পর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে গতকাল হযরতে সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। হযরত আমাকে বলেছিলেন, প্রথমেই জামাতে যেতে হবে। এর আগে কিচ্ছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ নেই। আমি এখন হযরতের নির্দেশেই চলবো। প্রথমে জামাতে যাবো। আশা করি এর মাধ্যমে আমার ভেতর হয়তো সামান্য ইসলাম আসতে পারে। হয়তো ঈমানও কিছুটা তাজা হবে। জামাত থেকে আসার পর আমাকে প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন: না, না আকবর ভাই! আমি তো আপনাকে চিনিও না। আব্বুই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার সাথে মিথ্যা বলছি না।

উত্তর : না আহমদ ভাই! আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত যদি আমাকে আদেশ করেন তাহলেই কেবল আমি আপনার সাথে কথা বলতে রাজি আছি। অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আব্বুর সাথে আপনাকে ফোনে আলাপ করিয়ে দিই?

উত্তর : জী, ফোনে অনুমতি এনে দিন, তারপর কথা বলবো। (অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ফোনে হযরতকে পাওয়া গেল না।)

প্রশ্ন : তাহলে কী মাওলানা ওয়াসির সাথে কথা বলিয়ে দেব? তার কথা বিশ্বাস করবেন তো?

উত্তর : হ্যাঁ! তিনিই আমাকে হযরতের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অন্তত তার সাথে হলেও কথা বলিয়ে দিন। (ফোনে মাওলানা সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি মুহাম্মদ আকবরকে বললেন, হযরতের সাথে কথা হয়েছে। হযরতই মাওলানা আহমদকে পাঠিয়েছেন। আপনি তাকে ইন্টারভিউ দিন। দায়-দায়িত্ব আমার।)

উত্তর : হ্যাঁ, এবার বলুন!

প্রশ্ন: প্রথমেই আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন।

উত্তর : আমার পারিবারিক নাম ছিল যতীন্দ্রকুমার। আমি লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী হারদুই জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি। আজ থেকে ২২ বছর আগে। আমার বাবা কৃষক ছিলেন। প্রাথমিক লেখাপড়া গ্রামের স্কুলে হয়েছে। ইন্টার কমপ্লিট করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার ভাইবোনসহ আমাদের বিশাল পরিবার।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : আমাদের গ্রামে এবং পুরো এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক তবে নামে মুসলমান। বেদআতীর সংখ্যাই বেশি। তবে কোনো কোনো মসজিদে তাবলীগের কাজ হয়। সেখানকার মসজিদে যখন নামায হতো তখন আমি মসজিদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় কুরআন পাঠ শুনতাম। সকালে যখন আমি ঘরে যেতাম তখন ইমাম সাহেব নামায পড়াতেন। ইমাম সাহেবের আওয়াজ ছিল খুবই চমৎকার, তার তেলাওয়াত আমার অন্তরকে স্পর্শ করতো। বহুবার তার তেলাওয়াত শুনে আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। মনে হতো কে যেন আমার অন্তর থেকে বলছে এই কালাম সত্য। মানুষের অন্তরে কত সুন্দর প্রভাব ফেলে। আরো ভাবতাম যারা এর

মর্ম বুঝে তারা না জানি এর দ্বারা আরও কত গভীরভাবে প্রভাবিত। আমাদের মসজিদে জামাতের লোকেরা গাশত করতো। একদিন গাশত অবস্থায় হাফেয সাহেবের সাথে আমার দেখা হলো। আমি বললাম হুযুর! জামাতের কাজ তো খুবই পুরনো। এটা নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে চলে আসছে। আচ্ছা, তিনি কি মানুষ বুঝে দাওয়াত দিতেন? যারা কেবল মুসলমান তাদেরই কেবল দাওয়াত দেবে অন্য ধর্মের হলে তাদের দাওয়াত দেয়া যাবে না– এটা তিনি বলেছেন? আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের কাছে শুনেছি– তিনি যখন দাওয়াতের কাজ করতেন তখন কোনো মুসলমানই ছিল না। তাহলে তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী, খ্রষ্টানদেরও ধর্মের দাওয়াত দিতেন। আপনারা কেন হিন্দুদের মসজিদে ডাকেন না? ইসলাম সম্পর্কে তাদের বুঝান না কেন?

আমি প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত শুনি এবং এর ভালোবাসায় পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছি। না জেনে বুঝে আমি এর দ্বারা এত প্রভাবিত হই এত আনন্দ বোধ করি তাহলে এর মানে বুঝলে না জানি কত স্বাদ পাব! হাফেয সাহেব বললেন, আসলে আমরা মুসলমানরাই এখন বিকৃতির শিকার। আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে পড়েছে। আমরা তাই প্রথমে মুসলমানদের অবস্থার সংস্কার চাচ্ছি। আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে আপনাদের দাওয়াত দেয়ার অনুমতি নেই। তবে ভারতের বাইরে যারা তাবলীগের কাজ করছে তারা অমুসলিমদেরও দাওয়াত দিচ্ছে। আমি তাকে বললাম, তাবলীগের কাজ তো চলছে আমাদের দেশ নিযামুদ্দীন মারকাযে থেকে, অথচ আমাদের দেশের অমুসলিমরা এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর অন্য দেশের লোকেরা উপকৃত হচ্ছে। আপনারা যখন মারা যাবেন তখন কি প্রশ্ন করা হবে, বড়দের কথা কেন মান নি? প্রশ্ন তো হবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে কেন দাওয়াত দাওনি।

প্রশ্ন : আপনি এটা কী করে জানলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের কাজ করেছেন এবং তাঁর সময়ে কোনো মুসলমান ছিল না? আর নিযামুদ্দীন মারকায থেকেই যে এর নবসূচনা এটাই বা বললো কে?

উত্তর : আমাদের ঘরের পাশেই মসজিদ। সেখানে তাবলীগের কাজকর্ম হতো। আমাদের প্রতিবেশিদের অনেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সাদ্দাম নামে আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল। আমি তাকে সবসময় ইসলাম এবং তাবলীগ

জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। সে উত্তর দিতে না পারলে আমাকে হাফেয সাহেবের কাছে নিয়ে যেত।

প্রশ্ন : হাফেয সাহেব কি আপনার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারতেন?

উত্তর : না, তিনি আমার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারতেন না বরং তার উত্তর শুনে আমার মনের ভেতর প্রশ্নগুলো আরো বেড়ে যেত। আমার বন্ধু সাদ্দাম একবার দেখলাম গাশত করছে। আমি তাকে ধরে তাদের আমীর সাহেবের কাছে গেলাম। তারপর বললাম, আপনারা শুধু চেহারা দেখেই মুসলমানদের দাওয়াত দেন কেন? আমীর সাহেব বললেন, আমাদের মুসলমানদের অবস্থাই তো এখন ভয়াবহ। আমরা প্রথমে তাদের অবস্থা সংশোধনের চেষ্টা করছি।

আমি বললাম মৃত্যুর পর যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে তখন আমরা আল্লাহকে বলবো- মালিক! আপনি হয়তো আমাদের আপনার প্রিয় নবীর জামানায় প্রেরণ করতেন অন্যথায় আমাদের এই সঙ্গীদের পাকড়াও করুন। এই সাদ্দাম এবং জামাতের লোকেরা আমাদের সাথেই বসবাস করে। আমাদের এলাকায় তাবলীগের কাজ করে। আপনি যখন আমাদের দ্বীনের কথা বলা ও শোনার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করেননি তখন আমরা দ্বীন পাবো কোথায়? আমার বিশ্বাস, আপনারা হয় আমাদের ইসলামের কথা বলুন। নয়তো আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দরবারে আপনারাই পাকড়াও হবেন।

আমীর সাহেব মাওলানা ছিলেন। তিনি বললেন, এই কাজের জন্য আমাদের একটি জামাত রয়েছে। আপনি সুযোগ করে একবার ফুলাত চলে যান। এই জেলারই একজন সন্তান মাওলানা ওয়াসী সাহেব ওখানে থাকেন। ওখানকার মাদ্রাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করুন। তিনি আপনাকে মাওলানা কালিম সাহেবের সাথে সাক্ষতের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি তার কাছ থেকে ঠিকানা নিলাম। পরের দিন পিতা মাতার কাছে জামাতে যাবার অনুমতি নিয়ে ফুলাত চলে এলাম।

প্রশ্ন: আপনার মাতা-পিতা কি জানতেন আপনি মুসলমান হওয়ার জন্য যাচ্ছেন?

উত্তর : না, আসলে তারা জামাত কী তাও জানতেন না। তবে এতটুকু বুঝতেন এটা একটা ভালো কাজ। এরা মুসলমানদের নামাযের দাওয়াত দেয়।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

উত্তর : আমি ফুলাত চলে গেলাম, মাওলানা ওয়াসি সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে 'আপকি আমানত' বইটি দিলেন। আমি একে একে চারবার পড়লাম বইটি। ঘটনাক্রমে সেদিন হযরত মাওলানা কালিম সাহেব সন্ধ্যায় তাশরিফ আনলেন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। তারপর কারী সাহেবকে ডেকে বললেন, একে নামায শিখিয়ে দাও। আমি কারী সাহেবের কাছে নামায ইত্যাদি শিখতে লাগলাম। আলহামদুলিল্লাহ! পনের দিনে নামায শিখলাম এবং কায়দা পড়ে ফেললাম। হযরত সবসময় সফরে থাকেন। যার কারণে তার সাথে মনে চাইলেও সাক্ষাত করা সম্ভব হয় না।

আমার ধারণা ফুলাত যারা থাকেন তারা সকলেই তাঁর সাক্ষাতের জন্য আকুল থাকেন। খানকায় যারা আছে সকলের অবস্থা আমি এমনই দেখেছি। কতদূর এলাকা থেকে সফর করে আসে। অনেক অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়ে মার খেয়ে আসে। কিন্তু হযরতের সান্নিধ্যে এলে মনে হয় যেন প্রচন্ড তাপ থেকে ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কয়েক মাস পরও যদি একবার দেখা হয়, অন্তরের সমস্ত কষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যায়। এখানকার প্রত্যেকেই মনে করে হযরত আমাকে সবচে' বেশি ভালোবাসেন। দুই সপ্তাহ পর হযরত ফুলাত এসেছেন। একজন একজন করে ডেকে পাঠিয়েছেন। সকলের কথা শুনছেন, কোলাকুলি করছেন, আমিও সাক্ষাত করেছি। আমার জামাতে যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়েছে।

আজ সকালে আইনী কাগজপত্র তৈরি করছি। উকিল আমাকে নাম জিজ্ঞেস করলে বললাম, হযরত তো বলেছেন নাম পরিবর্তন করা জরুরী নয়। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের নাম বদলাতেন না। তবে তুমি যদি চাও তোমার নাম পছন্দমতো রেখে দিতে পারো। আমি উকিল সাহেবকে বললাম আযানে উচ্চারিত– আল্লাহু আকবার শব্দটি আমার খুব ভালো লাগে। মুহাম্মদ আকবর কি কারও নাম হয়? উকিল সাহেব বললেন– হ্যাঁ, মুসলমানগণ তো মুহাম্মদ আকবর নাম রাখে। তাছাড়া বাদশাহ আকবরের নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন। আমি বললাম, তাহলে এটাই থাক। আযান থেকেই আমার নাম হয়ে যাক। মুয়াজ্জিন যখন নামাযের জন্য মানুষকে ডাকে তখন সে দাওয়াতে আমার নামটাও উচ্চারিত হবে। আপনি আমার নাম মুহাম্মদ আকবর লিখে দিন।

প্রশ্ন: এখানে আসার পর বাড়িতে আর ফোন করছেন?

উত্তর : আসলে হযরত আমাকে ফোন করে মাকে সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ভাবলাম এখনও আমার ঈমান দুর্বল। আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি। ভয় করছি এখন কথা বলতে গেলে তিনি কান্নাকাটি শুরু করেন তাহলে আমার অন্তর গলে যাবে। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। আর সেখানে গেলে আমার ঈমান বিপদে পড়ে যাবে। এজন্য বারবার বিপদে পড়া সত্ত্বেও আমি মাকে ফোন করিনি। প্রথমে জামাতে যাবো। সেখান থেকে ফিরে এসে বাড়িতে যাবো। তারপর পরিবারের সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিব।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হচ্ছে তারা আপনার বিরোধিতা করবে এবং আপনাকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে?

উত্তর : তেমন আশংকা করছি না। কেননা, আমার পরিবারের লোকেরা খুবই অমায়িক। ইসলামের সাথে তাদের একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া প্রথমেই আমি তাদের হযরতের কিতাব 'আপকি আমানত' পড়তে দিব। আমি বাড়ি ফেরার পর এই কিতাব এক হাজার কপি ছাপাবো। এই কিতাব মানুষের চিন্তা এবং অন্তরকে এমন নিঁখাদ ভালোবাসার সাথে স্পর্শ করে যদি সত্যমনে কোনো মানুষ এটা পড়ে তাহলে ইসলামের দাওয়াত উপেক্ষা করতে পারবেনা বরং ইসলামের ছায়ায় চলে আসবে। যদি বিরোধিতা হয় হবে। কারী সাহেব আমাকে সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী পড়ে শুনিয়েছেন। আমি নিজে হিন্দিতে ফাযায়েলে আমাল পড়েছি। সাহাবাযে কেরাম যখন কুরবানী দিয়েছেন তখন আমরাও দেব। এ পথে যদি জীবন চলে যায় কোনো পরোয়া নেই। মূল্যহীন পথে জীবন দেয়ার চাইতে এমন মূল্যবান পথে জীবন দেয়া শ্রেয়। বেহেশতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে জীবন দেয়ায় ব্যর্থতার কিছু নেই। আমি আমার অন্তরকে বারবার পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার অন্তর আমাকে একথাই বলেছে– আকবর! আল্লাহর ভালোবাসায় দাওয়াতের পথে আল্লাহর বান্দাদের দোযখ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে জীবন দান করা এমনি মরে যাওয়ার চে' অনেক উত্তম এবং সুখকর।

প্রশ্ন: মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই আবেগ দান করুন।

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আসল কথা হলো, আমরাই ভয় করছি।

নইলে পৃথিবী এখন তৃষ্ণার্ত। আমাদের এলাকায় হযরত মাওলানাকে জানেন এমন দুই তিনজন লোকে আছেন। অথচ তাদের হাতে গত বছর আমাদের এলাকায় অন্তত পঁচিশজন মুসলমান হয়েছে। আরও শত-শত অপেক্ষায় আছে। এরা মন থেকে প্রস্তুত। কিন্তু যারা কালেমা পড়াবে তাদের ভেতরে ভয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ফুলাত যাওয়ার কথা বলেন। এদিকে আমাদের এলাকার মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই বেদআতী এবং কবরপূজারী। এরা নামাযও পড়ে না।

প্রশ্ন : বেদআত একটি খারাপ কাজ এটা আপনাকে বললো কে?

উত্তর : এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক থেকেও বোঝা যায়। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করা যাবে না। এই তো ইসলাম। সুতরাং কবরকে পূজা করার কথা কিভাবে ভাবা যায়? আমি তো বেদআতী মুসলমানদের বলতাম, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে আর কতটুকু পার্থক্য? তোমাদের তুলনায় আমরা অনেকটা ভালো। আমরা যাদের পূজা করি তারা অন্তত আমাদের সামনে থাকে এবং আমাদের দেখতে পায়। আর তোমরা যে এই কবরের পূজা করছো। তোমাদের হয়তো জানাই নেই এটা কার কবর। মানুষের কবর না ঘোড়ার কবর?

লক্ষ্ণৌতে ঘোড়াশাহ নামে এক পীর ছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তার নামে ওরশ হতো। পরে জানা গেল, এটা কোনো এক নবাবের ঘোড়ার কবর। সুতরাং তোমাদের চেয়ে আমরা ভালো। অথচ মূর্তিপূজা যে ঠিক নয় এটা আমরাও বুঝি। নিজের হাতেই তৈরি একটা বস্তুকে পূজা করার কী মানে আছে? মূর্তি যদি আমাদের পূজা করতো তাও একটা যুক্তি ছিল। সৃষ্টিকর্তার পূজা করা অযৌক্তিক কিছু নয়। ইসলাম গ্রহণের আগেও আমি আমার হিন্দু ভাইদের বলতাম– যে ভগবান লজ্জাস্থানের পূজা করতে বলে সে আবার ভগবান হলো কী করে? আসলে মানুষের বিবেক মাঝেমাঝে লোপ পেয়ে যায় নতুবা কেউ চাইলে নিজের বিবেক দ্বারাও এসব বুঝতে পারে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার কেমন অনুভূতি হচ্ছে? তাছাড়া ইসলামের কোনো বিষয়টি আপনার ভালো লেগেছে?

উত্তর : খুব ভালো লাগছে। ইসলামে এমন কোনো বিষয় আছে কি যা ভালো লাগবার মতো নয়? ইসলামের প্রতিটি বিষয় এমন কি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতই এমন– যদি কোনো ব্যক্তি

একটু ভাবে তাহলে মুসলমান হয়ে যেতে পারে। সবচে' বড় কথা হলো ইসলাম পুরো জীবনের একটি পরিপূর্ণ নমুনা। এমন নয় ধর্ম থাকবে মন্দিরে আর ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, পরিবার সমাজ সবকিছু চলবে মনমত। বরং ইসলাম মানব জাতিকে পরিপূর্ণ জীবনের পথ বলে দিয়েছে। আর সে পথ এতোটাই আকর্ষণীয় যে, কোনো মানুষ যদি গভীরভাবে এসব নিয়ে ভাবে তাহলে এর জন্য সে পাগল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার সামনে হেদায়াতের পথ খুলে দিয়েছেন। এবার বলুন, জামাত থেকে ফিরে কী কর্মসূচি?

উত্তর : জামাত থেকে ফিরে প্রথমে বাড়ি যাবো। পরিবারের লোকজনের সাথে দাওয়াতের কাজ করবো। আমার ইচ্ছা মুসলমানদের মাঝেও কাজ করবো। বিশেষ করে বেদআতী মুসলমানদের ভেতর কাজ করার ইচ্ছা আছে। আমাদের এলাকায় প্রচুর সরল ও ভালো মানুষ আছে। দু-চারজন যদি নিজেদের এ পথে বিলিয়ে দিতে পারে তাহলে পুরো এলাকা দোযখ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিছুদিন আগে আমাদের এলাকায় এক হিন্দু লালাজি মুসলমান হয়েছেন। এই লালাজিই রাম মন্দির নির্মাণ এবং বাবরি মসজিদ শহীদ করার জন্য পঁচিশ লাখ রুপি নিজের পকেট থেকে খরচ করেছেন। তার প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া হয়েছে। হয়তো মালিককে খুশি করার জন্যই তিনি রামমন্দির নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতি মালিকের মমতা হয়েছে। তার একজন যুবক পুত্র এক্সিডেন্টে মারা গেছে। তার দোকানে আগুন লেগেছে। নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন : আপনি এটাকেই আল্লাহ তায়ালার মমতা বলছেন?

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আমি এগুলোকেই আল্লাহ তাআলার মমতা বলছি। কারণ, এসব দুর্ঘটনায় পড়ার পর তার মনে হয়েছে, আমি কোনো ভুল করেছি। অবশেষে তার চিন্তায় এসেছে, আমি মালিকের ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি। তারপর সে ইসলাম সম্পর্কে পড়তে শুরু করেছে। এক পর্যায়ে এসে যখন মুসলমান হতে চাইলো তখন মানুষ ভয়ে তার সাথে দেখা করতো না। তাকে কেউ কালেমা পড়াতেও প্রস্তুত হচ্ছিল না। অবশেষে মাওলানা কালিম সিদ্দীকি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেন। সেই ব্যক্তি গিয়ে তাকে কালেমা পড়ান। লালাজি এখন একটি মসজিদ বানাচ্ছেন। সাথে একটি মাদরাসা। দেখুন, এক পুত্র কিছু সম্পদ এবং স্বীয় স্বাস্থ্যের পতন তার

হেদায়েতের উপলক্ষ হয়েছে। এটা আল্লাহর করুণা নয় তো কী?

প্রশ্ন : আপনি সত্যই বলেছেন।

উত্তর : আমাকে কয়েকজন মুসলমান ভাই বলেছেন– ঘরবাড়ি ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ? আমি বলেছি ধোঁকার ঘর ছেড়ে চিরস্থায়ী ঘর বেহেশতের মহল খরিদ করার জন্য যাচ্ছি। আমি যদি বাড়িঘর না ছাড়তাম তাহলে হয়তো আমার ঈমান নসীব হতো না। সুতরাং এই যে আমার ঘরবাড়ি ত্যাগ করা এটা কি আল্লাহ তায়ালার করুণা ও তার মমতা নয়?

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে। জাযাকাল্লাহু! মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পয়গাম?

উত্তর : আমার আবার পয়গাম কী? আমি তো ছোট ভাই। আমার তো এখনও পর্যন্ত নিজের ঈমানের ব্যাপারেই সন্দেহ কাটেনি। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই বলবো, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ এলাকার অমুসলমানদের কথা ভাবতে হবে। অন্যথায় হাশরের মাঠে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ধরবেন। এ কথা ভাবার সুযোগ নেই, এখানে কে ইসলাম গ্রহণ করবে? চারদিকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। আমার খান্দানের জন্য দুআ করবেন। বিশেষ করে আমার জন্য, আমার ঈমান যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঈমানের উপর অটল রাখেন।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া আকবর ভাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : আপনাকেও, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, *মে– ২০০৯*

শেঠ মুহাম্মদ উমর (রামজী লাল গুপ্তা)-এর সাক্ষাৎকার

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর আমি নিজে অযোধ্যায় গিয়েছি। পুরো একটি টিমের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর ঘরে ফিরে এসে আমি অনেক বড় একটা ভোজের আয়োজন করি। আমার ছেলে যোগেশ তখন রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি খুব ধুমধাম করে বিজয় উৎসব পালন করি। রামমন্দির নির্মাণের জন্য মুক্ত হস্তে খরচ করি। কিন্তু সত্য বলতে কী, আমার ভেতর কেমন যেন একটা ভয় কাজ করতে থাকে। আমার যেন বারবার মনে হতো- কোনো আসমানী গজব আমাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা। আমার দোকান এবং গুদাম মোটামুটি দূরত্বেই অবস্থিত। কিন্তু দেখা গেল, সকালে বিদ্যুতের শার্টসার্কিটে দুই জায়গায় আগুন লেগে গেল। এতে আমার অন্তত দশ লাখ রুপির সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর আমার মনটা আরও ভেঙ্গে গেল। ৬ হিসেম্বরের বিপদ হয়তো আমার পরিবার কোনো ভাবে কাটিয়ে উঠতো। কিন্তু ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর আমার ছেলে যোগেশ কোনো একটি কাজে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিল। রাস্তায় ট্রাকের সাথে তার গাড়ি এক্সিডেন্ট করে। সেখানেই ড্রাইভারসহ সেও মারা যায়। তার নয় বছরের একটি ছেলে ও ছয় বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। এ ঘটনা মেনে নেয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

শেঠ মুহাম্মদ উমর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : শেঠ সাহেব! দুই তিন মাস যাবৎ আব্বু আপনার কথা খুব বলছিলেন। বারবার আলোচনা করছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যে কাউকেই বা যে কোনো বস্তুকেই কাজে লাগাতে সক্ষম।

উত্তর : মাওলানা আহমদ! হযরত সত্য কথাই বলেছেন। আমার জীবনটাই তো আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। আমার মতো খোদা ও খোদার দুশমন আর এদিকে আমার প্রতি মালিকের করুণা ও অনুগ্রহ। আহা! পূর্বেই যদি আমি হযরতের কিংবা হযরতের কোনো লোকের সাক্ষাত পেতাম তাহলে আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ঈমান ছাড়া মরতে হতো না। (এ কথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর কাঁদতে-কাঁদতেই বলেন) সে আমাকে কতো রকম করে বোঝাতো। মুসলমানদের

সাথে তার সম্পর্ক কত সুন্দর ছিল। আর আজ সে আমাকে এই বার্ধক্যে ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করে এক অসহ্য কষ্টের মধ্যে রেখে চলে গেল।

প্রশ্ন : শেঠ সাহেব! প্রথমেই আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চাইবো।

উত্তর : আমি লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী একটি গ্রামে ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার প্রথম জন্ম হয়েছে এখন থেকে ৬৯ বছর আগে ১৯৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বর। আমাদের বংশের নাম গুপ্তা। আমার পিতাজি কেরানায় পাইকারি ব্যবসা করতেন। আমার ষষ্ঠ পুরুষ থেকে প্রত্যেকের ঘরে একটি করে সন্তান হতো। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ব্যবসায় লেগে পড়েছি। আমার পারিবারিক নাম ছিল রামজি লাল গুপ্তা।

প্রশ্ন : ৬ ডিসেম্বর প্রথমবার জন্ম হওয়ার অর্থ?

উত্তর : আসলে এই বছর ২২ জানুয়ারী আমি দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করেছি। যদি আমার পূর্বেকার জীবন শুমার না করা হয় তাহলেই ভালো। সেটা তো আমার অন্ধকার জীবন।

প্রশ্ন : জী, আপনার খান্দানী পরিচয় সম্পর্কে বলছিলেন...

উত্তর : আমার পারিবারিক পরিবেশ ছিল খুবই ধার্মিক। আমার পিতাজী ছিলেন জেলা বিজেপির প্রধান। যা পূর্বে জনসংঘ নামে পরিচিত ছিল। যার কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা ছিল আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদে তালা ঝুলানো থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদের শাহাদাতের ঘৃণ্যতম ঘটনা পর্যন্ত আমি পরিপূর্ণ উন্মাদনার সাথে শরীক ছিলাম। আমার বিয়ে হয়েছিল খুবই ভদ্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষ এক পরিবারে। আমার স্ত্রীর স্বভাবও ছিল সেকুলার। মুসলমানদের সাথে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ট। তাদের বাড়িতে যখন আমরা বিয়ে করতে গেলাম তখন দেখলাম খানা-পিনাসহ বিয়ের যাবতীয় ইন্তেজাম করছেন আমার শ্বশুরের এক বন্ধু খান সাহেব। দাড়িওয়ালা অনেক অতিথি সেখানে উপস্থিত। তার বরং মূল ব্যবস্থাপনায় অংশীদার। এটা আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগে। আমি তো এক পর্যায়ে খানা খেতে অস্বীকার করে পরিষ্কার বলে দিই, মুসলমানদের হাত লেগেছে, আমি এ খাবার খাবো না। আমার পিতাজীর এক বন্ধু ছিলেন পন্ডিতজী। তিনি তখন আমাকে বুঝান যে, হিন্দুধর্মের কোথায় এ কথা লেখা আছে, মুসলমানদের হাত লাগা খাবার খাওয়া যাবে না? আমি অত্যন্ত ঘৃণার সাথে খাবার গ্রহণ করি।

আমার বিয়ে হয়েছিল ১৯৫২ সালে । নয় বছর পর্যন্ত আমাদের কোনো সন্তান হয়নি। নয় বছর পর ১৯৬১ সালে মালিক আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। আমি তার নাম রাখি যোগেশ। তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি ভালো স্কুলে। আমার ইচ্ছা ছিল আমি তাকে পার্টি এবং আমার জাতির জন্য উৎসর্গ করবো। তাকে সামাজিক বিষয়ে পি.এইচ.ডি করিয়েছিলাম। প্রথম থেকেই সে ছিল ভালো ছাত্র। তবে তার স্বভাব ছিল মায়ের মতোই। হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের প্রতি তার আগ্রহ বেশি ছিল। দলীয় মনোভাব এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে মোটেও পছন্দ করতো না। আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তার পরও এসব বিষয় নিয়ে আমার সাথে তর্ক করতো। রামমন্দির আন্দোলন এবং এই উদ্দেশ্যে আমার অর্থ খরচ এসব বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে সে দুইবার এক সপ্তাহের জন্য ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার মা ফোনে কান্নাকাটি করে ফিরিয়ে এনেছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলবেন?

উত্তর : আমি সবসময়ই মুসলমানদের আমাদের এই দেশের শত্রু ভাবতাম। তাছাড়া রাম জন্মভূমিতে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানানোর কারণে আমার মাথা সর্বদা চড়ে থাকতো। আমি যে কোনো মুল্যে রামমন্দির বানাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম। এজন্য আমি আমার শরীর, মন, জ্ঞান, সবকিছু বিসর্জন দিয়ে রেখেছিলাম। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত রামমন্দির আন্দোলন এবং বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার নানা উপলক্ষে অন্তত ২৫ লাখ রুপি নিজের পকেট থেকে খরচ করেছি। আমার স্ত্রী এবং পুত্র এতে চরম অসন্তুষ্ট হয়েছে। যোগেশ বলতো, এ দেশে তিন শ্রেণীর মানুষ বাইর থেকে এসে রাজত্ব করেছে। এক আর্য গোষ্ঠি। এরা এদেশে এসে জুলুম করছে। এখানকার শূদ্রদের দাসে পরিণত করেছে। নিজেদের আখের গুছিয়েছে। দেশের জন্য কিছুই করেনি। বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের অবিচার করেছে। অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর তীরে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি শ্রেণী ইংরেজ। এরা এদেশে এসে এখানকার অধীবাসীদের গোলাম বানিয়েছে। এখানকার সম্পদ লুট করে ইংল্যান্ড নিয়ে গেছে। ভারতবাসীর উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছে। অসংখ্য মানুষকে খুন করেছে। অসংখ্য মানুষকে ফাঁসি দিয়েছে। তৃতীয় একটি শ্রেণী হলো মুসলমান। এরা এদেশে এসে এদেশকে নিজেদের দেশ মনে করে এখানে লালকেল্লা বানিয়েছে। তাজমহলের মতো গর্বের ভবন নির্মাণ করেছে। এখানকার মানুষকে কাপড় পরা শিখেয়েছে। কথা বলা শিখিয়েছে। চলার জন্য রাস্তা নির্মাণ করেছে। সরাইখানা বানিয়েছে। ডাকপ্রথা চালু করেছে। নহর খনন করেছে।

রাষ্ট্রের ছোট-ছোট বিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক বিশাল ভারত নির্মাণ করেছে। এক হাজার বছর সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরুদের শাসন করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে।

আমার পুত্র আমাকে ইতিহাসের বরাত দিয়ে মুসলমান শাসকদের ইনসাফের ঘটনাবলী শোনাতো। কিন্তু কী বলবো, আমার রক্তে মিশে গিয়েছিল ইসলামের প্রতি শত্রুতা। ফলে আমার মেযাজে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ১৯৯০ সালের ৩০ ডিসেম্বরের আন্দোলনেও আমি ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর আমি নিজে অযোধ্যায় গিয়েছি। পুরো একটি টিমের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর ঘরে ফিরে এসে আমি অনেক বড় একটা ভোজের আয়োজন করি। আমার ছেলে যোগেশ তখন রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি খুব ধুমধাম করে বিজয় উৎসব পালন করি। রামমন্দির নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে খরচ করি। কিন্তু সত্য বলতে কী, আমার ভেতর কেমন যেন একটা ভয় কাজ করতে থাকে। আমার যেন বারবার মনে হতো- কোনো আসমানী গজব আমাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা। আমার দোকান এবং গুদাম মোটামুটি দূরত্বেই অবস্থিত। কিন্তু দেখা গেল, সকালে বিদ্যুতের শার্টসার্কিটে দুই জায়গায় আগুন লেগে গেল। এতে আমার অন্তত দশ লাখ রুপির সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর আমার মনটা আরও ভেঙ্গে গেল। ৬ হিসেম্বরের বিপদ হয়তো আমার পরিবার কোনো ভাবে কাটিয়ে উঠতো। কিন্তু ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর আমার ছেলে যোগেশ কোনো একটি কাজে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিল। রাস্তায় ট্রাকের সাথে তার গাড়ি এক্সিডেন্ট করে। সেখানেই ড্রাইভারসহ সেও মারা যায়। তার নয় বছরের একটি ছেলে ও ছয় বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। এ ঘটনা মেনে নেয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে থাকি। আমার স্ত্রী আমাকে অনেক মাওলানার কাছে নিয়ে যায়। হারদুইয়ের বড় হযরতের কাছে নিয়ে যায়। এরপর আমার মানসিক অবস্থা ঠিক হলেও মনের মধ্যে এটা রয়ে যায় যে আমি ভুল পথে আছি। ইসলাম সম্পর্কে আমার জানা উচিত। তারপর আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আপনি কী পড়েছেন?

উত্তর : সর্বপ্রথম আমি হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে একটি ছোট বই পড়েছি। তারপর মাওলানা মনযুর নোমানীর 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' পড়েছি। তারপর মাওলানা আলী মিয়া নদবীর 'ইসলাম এক পরিচয়' পড়েছি। তারপর ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর একটি ছেলে আমাকে মাওলানা কালিম সিদ্দীকির 'আপকি আমানত' বইটি এনে দেয়। পরের দিন মানে ৬ ডিসেম্বর আমি মনে মনে ভয় করছিলাম আগামীকাল কী ঘটতে যাচ্ছে। এই বই আমার মনের ভেতর একথা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলো যে কেবল মুসলমান হওয়ার মধ্যেই আমি আমার জীবনকে আশংকার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমি পাঁচ-ছয় ব্যক্তির কাছে গেলাম। আবদার করলাম, আমাকে মুসলমান করে দাও। কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছিলো। কেউ আমাকে মুসলমান করতে প্রস্তুত হলো না।

প্রশ্ন : আপনি তাহলে ২০০৬ সালের ৬ ডিসেম্বর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? একটু আগে তো বলছিলেন এখন থেকে কয়েক মাস আগে ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী আপনি মুসলমান হয়েছেন।

উত্তর : আসলে ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর আমি মুসলমান হয়ে যাওয়ার পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম। । কিন্তু ২০০৯ -এর ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত কেউ আমাকে মুসলমান করতে প্রস্তুত হয়নি। আমাদের অঞ্চলের এক ছেলে ফুলাত গিয়ে মুসলমান হয়েছিল। সে মূলত হযরতকে জানিয়েছে। সে হয়তো বলেছে, এক লালাজি বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার জন্য অনেক অর্থ খরচ করেছে। এখন সে মুসলমান হতে চায়। একথা শোনার পর হযরত আমার কাছে এক মাস্টার সাহেবকে পাঠান। এই মাস্টার সাহেব বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় সর্বপ্রথম কোদাল চালিয়েছিল। সে যাওয়ার সময় ভালো করে ঠিকানাও জেনে যায়নি। ফলে তিনদিন পর্যন্ত তাকে ঠিকানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তিন দিন পর ২২ জানুয়ারী সে আমাকে পায়। সেই আমাকে কালেমা পড়ায়। হযরতের পক্ষ থেকে আমাকে সালাম বলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুযুরকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করে। হযরত মহারাষ্ট্র সফরে ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর হযরতকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, সেই লালাজী আলহামদুলিল্লাহ! কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। এখন আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আপনি তাকে দ্বিতীয় বার কালেমা পড়িয়ে দিন। হযরত আমাকে দ্বিতীয় বার কালেমা পড়ালেন এবং হিন্দিতে অঙ্গীকার করালেন। আমি যখন হযরতের কাছে বললাম, আমি জালেম!

আমার মালিকের ঘর ভাঙতে এবং সেখানে শিরকের ঘর বানাতে পকেট থেকে পঁচিশ লাখ রুপি খরচ করেছি এখন ইচ্ছা করেছি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পঁচিশ লাখ রুপি খরচ করে একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা বানাবো। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন। যে দয়াময় মালিক আমাকে তাঁর ঘর ভাঙ্গা এবং শহীদ করার উসিলায় হেদায়েত দান করলেন সেই মালিক যেন আমার নামটা মসজিদ ধ্বংসকারীদের তালিকা থেকে উঠিয়ে তাঁর ঘর নির্মাণকারীর তালিকায় দিয়ে দেন। আমি বলি, আমার একটি ইসলামী নাম রেখে দিন। হযরত ফোনেই আমাকে মোবারকবাদ দেন, দুআ করেন। আমার নাম রেখে দেন মুহাম্মদ উমর। আমার মালিকের কী অপরিসীম করুণা আমার প্রতি। মাওলানা সাহেব! যদি আমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণা এবং আমার সমুদয় সম্পদ আমার মালিকের জন্য উৎসর্গ করে দিই তবুও আমার মালিকের শোকরিয়া আদায় করতে পারবো না। এত বড় জুলুম এবং বড় পাপকে তিনি আমার হেদায়াতের উসিলা বানিয়েছেন।

প্রশ্ন : এখন ইসলামকে জানার জন্য আর কী পড়ছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! ঘরে একজন শিক্ষক রেখেছি। তিনি একজন খুব ভালো মাওলানা। তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়াচ্ছেন এবং বুঝাচ্ছেনও।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী এবং নাতি-নাতনীর কী হলো?

উত্তর : আমার মালিকের অনুগ্রহে আমার স্ত্রী, যোগেশের স্ত্রী এবং আমার নাতি-নাতনী সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। এখন আমরা সকলেই এক সাথে কুরআন পড়ছি।

প্রশ্ন : দিল্লীতে কোনো কাজে এসেছিলেন?

উত্তর : না, মাওলানা সাহেব ডেকেছিলেন। এক ব্যক্তি আমাকে আনার জন্য গিয়েছিল। হযরতের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। দেখা করার ইচ্ছা ছিল।

প্রশ্ন : আব্বুর সাথে কী কথা হয়েছে?

উত্তর : হযরত আমাকে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন– আপনার মতো কত ভাই না বুঝে বাবরি মসজিদ শহীদ করার মতো ঘটনায় শরীক হয়েছে। আপনাকে তাদের জন্য কাজ করতে হবে। তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে। আমি মনে মনে একটা তালিকাও তৈরি করেছি। আমার স্বাস্থ্য এখন আর আগের মতো নেই যে, নিজে ছুটাছুটি

করতে পারবো। তবে এতটুকু বুঝি, যতদিন বেঁচে আছি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কালেমা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজেই লেগে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য কোনো পয়গাম আছে কি?

উত্তর : আমার যোগেশের বেদনা সর্বদা আমাকে ব্যথিত করে রাখে। মরতে তো হবে সকলকেই। মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। তাছাড়া বাহানাও পূর্ব থেকেই ঠিক করা রয়েছে। কিন্তু ঈমান ছাড়া আমার এমন প্রিয় সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলো- আমার মতো জালেম ইসলাম দুশমন বরং খোদার দুশমন পিতার ঘরে জন্ম নিয়েও যে সর্বদা মুসলমানদের পক্ষে কথা বলতো, সে ইসলাম ছাড়া মারা গেল, যখন এ কথা ভাবি তখন মনে হয় মুসলমানগণ তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করেনি। এই যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। জানি না, এমন আরো কতো যুবক এবং বৃদ্ধ মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : শেঠজী আপনাকে অনেক অনেক শোকরিয়া। তবে যোগেশ সম্পর্কে বলবো- আব্বু এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে বলেন, যারা স্বভাবগতভাবেই ইসলামের চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা এসে তাদের কালেমা পড়িয়ে দেন। এমন অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালার রহমের কাছে আশা রাখুন। যোগেশ যেন মুসলমান হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে থাকে।

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা আপনার কথা সত্য করুন। আমার ফুলের মতো এই সন্তানকে যেন আমি বেহেশতে গিয়ে দেখতে পাই।

প্রশ্ন : আমীন! অবশ্যই বেহেশতে গিয়ে আপনার ছেলের সাথে মিলিত হবেন ইনশাআল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুতল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, *জুন- ২০০৯*

নওমুসলিম ডাক্তার উর্মির সাক্ষাৎকার

আরমুগানের মাধ্যমে আমি আমার বোনদের কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করতে চাই। তা হলো একজন মুসলমানের দায়িত্ব ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মানুষের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোও তার দায়িত্ব। আর এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও সমানভাবে আদিষ্ট। বরং ইসলামী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ভাগ্যবানদের নূরানী কাফেলায় পুরুষদের চেয়ে নারীরা এগিয়ে। গারে হেরায় ওহী অবতরণের সূচনালগ্নে ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন এবং নিকটতম মানুষের উপস্থিতিতেও হযরত নবী عليه السلام -এর দাওয়াতের সর্বপ্রথম শ্রোতা ছিলেন তারই জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা রাযি. এ ঘটনা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, নারীদেরও আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এমনকি পুরুষদের চেয়েও বেশী। দাওয়াতের ময়দানে অমুসলিম সম্প্রদায় বিশেষত পশ্চিমা সমাজের অবস্থা দর্শনে তারা এ ধ্রুবসত্য গভীরভাবে অনুধাবনেও সক্ষম হবেন যে, বস্তুবাদিতা ও নগ্নতার বিষে আক্রান্ত যে পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোক ঝলকানীতে আজ আমরা প্রভাবিত হচ্ছি এবং তাকে উন্নতির সোপান মনে করছি পশ্চিমা সমাজ তাদের নোংরা সংস্কৃতির দরুণ আজ কতটা অধঃপতিত। অস্থিরতা ও অশান্তির মরণ যন্ত্রণায় ফাঁসির মঞ্চে দন্ডায়মান এ মানুষগুলো আজ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য কতটা তৃষ্ণার্ত। এবং তারা এটাও অনুধাবন করতে পারবেন যে, ইসলামের মহান দৌলত দান করে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

আসমা যাতুল ফাউযায়ন : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি

ডাক্তার সাহেবা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনি বড় সুসময়ে এসে পড়েছেন। আব্বাজানের কাছে আপনার আলোচনা শুনছিলাম। আব্বু বলছিলেন আরমুগানের জন্য আপনার একটি ইন্টারভিউ নিতে। আপনি হয়তো অবগত আছেন, আমাদের ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দূ সাময়িকী বের হয়। যেখানে ইসলাম গ্রহণকারী ভাগ্যবান নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়ে থাকে।

উত্তর : হ্যাঁ, কিছু সংখ্যা আমিও দেখেছি। তবে প্রিয় বেটি! আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি আমাকে নওমুসলিম সম্বোধন করছ, অথচ আমি ১০ বছর পূর্বে

কালিমা পাঠ করে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছি, আর প্রকৃত অর্থে এবং মানসিকভাবে তো জন্ম থেকেই আমি মুসলমান।

প্রশ্ন : জি, হ্যাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন। কেননা প্রত্যেক শিশুই ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মলাভ করে..।

উত্তর : সাধারণভাবে প্রত্যেক শিশুই ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মলাভ করে...। এটা তো আমাদের নবী সা.-এর পবিত্র এরশাদ। আর তাঁর এরশাদে কি কারো সন্দেহ থাকতে পারে? আমাদের পরিবার বিশেষত পিতাজী তো শুরু থেকেই ইসলামী মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার পূর্ব হতেই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত ছিলেন।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার পরিচয় জানতে চাইব।

উত্তর : আমার নাম উর্মী। পিতা ডাক্তার অনীল মোদী। সোশালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান। পরলোকগত পিলু মোদীর আপন ভাতিজা তিনি। পিতাজী উঁচুমানের একজন ফিজিশিয়ান ছিলেন। আমেরিকা থেকে MD করেছিলেন। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতজনদের অনুরোধে তিনি মিরাঠ এসে আবাস গড়েন এবং ব্যাংকষ্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লিনিক শুরু করেন। আমার ছোট দুটি ভাই আছে। একজনের নাম তারেক আরেকজন শারেক।

দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা আমি বিজাপুরেই করেছি। এরপর মিরাঠে এসে মিরাঠ কলেজে BSCapital তে ভর্তি হই। BSCap. শেষ করে PMT করেছি। এরপর মাও. আজাদ মেডিকেল কলেজে MBBS -এর ৩ বছরের কোর্স সমাপ্ত করে লন্ডন নিবাসী সহোদরার অনুরোধে লন্ডনে চলে আসি। সেখানেই MBBS এবং পরবর্তিতে MS করার সুযোগ হয়। দিল্লীর এক অভিজাত সাইয়্যেদ বংশের ডাক্তার সাইয়্যেদ আমেরের সাথে যিনি একজন উঁচু মানের নিউরোলোজিস্ট আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর লক্ষ্মৌ-এর সঞ্জয়গান্ধী PGI তে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দু'জনেরই চাকরি হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী উভয়েই আমরা 'প্রফেসর' পদে উন্নীত হই। আমার যে সহোদরা লন্ডন নিবাসী তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তার বারংবারের অনুরোধ ছিল আমরা যেন লন্ডনে সেটেল হই। ফলে তার পীড়াপীড়িতে ৩ বছর পূর্বে ২০০১ সালে আমরা স্বামী-স্ত্রী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে পাড়ি জমাই। ছোট ভাই শারেকের সাথে আমার ননদের বিয়ে উপলক্ষে বর্তমানে হিন্দুস্তানে অবস্থান করছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বলুন!

উত্তর : মূলত আমার পিতা পূর্ব থেকেই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। বিরিয়ানী, কোরমা ও কাবারের প্রেমিক ছিলেন তিনি। তিনি শুধু উর্দূই জানতেন না ফার্সির ব্যাপারেও তার যথেষ্ট দখল ছিল। বংশ পরম্পরায় তিনি হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি আমার নাম উর্মি আর ভাইদের নাম শারেক ও তারেক রেখে ছিলেন। নিজের নাম লিখতেন ডাক্তার অনীল ওয়ারিস মোদী। প্রথমত আমাদের নিবাস ছিল বিজাপুরে। বিজাপুরসহ দক্ষিণ হিন্দুস্তানের এলাকাগুলোর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এ কারণেই যখন আমরা মিরাঠে এলাম তখন এখানকার নোংরা পরিবেশে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বিশেষত মিরাঠ কলেজে অধ্যয়নরত গ্রাম্য জাট এবং চৌধুরী বংশের ছেলেগুলো ছিল অত্যন্ত গোঁয়ার এবং নির্লজ্জ প্রকৃতির।

অসভ্যতায় তারা এতটাই উচ্ছন্নে গিয়েছিল যে আমাকে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে হলো। মনে মনে অন্য কলেজ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তিনি আমাকে এই নোংরা পরিবেশেই হেদায়াত দিতে চাচ্ছিলেন। ঘটনা এই যে, এই অসভ্য ছেলেগুলোর মাঝে কিছু সভ্য ও সম্ভ্রান্ত ছেলেও ছিল। যাদের অন্যতম ছিলেন আপনার পিতা (মাও. কালীম সাহেব) যার ভদ্রতা এবং প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বে আমাদের সকল সাথী এমনকি শিক্ষকরা পর্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। সবাই তাকে শ্রদ্ধাভরে কালীম ভাই বলে ডাকত। এমন দৃশ্য তো অনেকবারই দেখেছি, ছেলেরা সিনেমার গল্প করছে, ইতিমধ্যে কালীম ভাই এসে উপস্থিত হয়েছেন তো সাথে সাথে তারা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। ক্লাসে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল চমৎকার। কাব্য-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল। এমনকি চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমাদের কলেজে একবার প্রদেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কালীম ভাই এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

যাই হোক কলেজের এই নোংরা পরিবেশ দর্শনে তিনি নিজেও অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। বাসায় আমি পিতাজীর কাছে কালীম ভাইয়ের শারাফাতের তারীফ করতাম। পিতাজী তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বলতেন। কালীম ভাই প্রতিদিন নিজ গ্রাম ফুলাত থেকে ট্রেনযোগে খাতুলি হয়ে মিরাঠ কলেজে আসা যাওয়া করতেন। কখনো কখনো বেগম পুল থেকে পায়ে হেঁটে আমাদের বাসার সামনে দিয়েই কলেজে যেতেন। একদিন সকালবেলা তিনি

আমদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে পিতাজীর সাথে সাক্ষাৎ করালাম। পিতাজী যেমন কালীম ভাইয়ের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন, কালীম ভাইও পিতাজীকে দেখে প্রভাবিত হলেন।

আমাদের ক্লাসের দুষ্টু ছেলেগুলোর অধিকাংশই মিরাঠ কলেজের হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করত। ইতোমধ্যে রাখিবন্ধন উৎসব এসে গেল। একদিন সকাল সাড়ে আটটায় কালীম ভাই আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে আব্বাকে বললেন, বোন উর্মি ক্লাসের নোংরা পরিবেশে আমরা হাঁপিয়ে উঠছি। চল কিছু রাখি সংগ্রহ করে হোস্টেলে যাই। আমি ২৫টি রাখি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে হোস্টেলে যাই। একজন জাট এবং চৌধুরী ছাত্রকে ভাইয়া ভাইয়া বলে রাখি বেঁধে দেই। তারা অত্যন্ত শরমিন্দা হয় এবং আমাদের ক্লাসের পরিবেশ বদলে যায়। প্রজ্ঞাপূর্ণ এই কৌশল দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম। আব্বু আম্মুকেও ঘটনাটি জানালাম। ফলে কালীম ভাইয়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ আরো বৃদ্ধি পেল।

আমি উর্দূ ভাষা শিখতে আগ্রহী ছিলাম। পিতাজীও চাচ্ছিলেন আমি যেন উর্দু শিখে নিই। উর্দু ভাষার প্রতি আব্বাজানের ধারণা ছিল বেশ উঁচু। কখনো তো অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন যে, উর্দু হলো উত্তম আদর্শ অনুপম শিষ্টাচারের সম্ভার। আমি কালীম ভাইকে অনুরোধ করলাম আমাকে উর্দু পড়াতে। কিন্তু তিনি ব্যস্ততার দরুন অপারগতা প্রকাশ করলেন। তবে তিনি আমার উর্দু পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। উর্দু ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী মাও. মাসরুর সাহেব ছিলেন আমার শিক্ষক। তিনি উর্দুতে MA করেছিলেন। লাইব্রেরীরুমে প্রতিদিন আধা ঘণ্টা আমি তার কাছে উর্দু পড়তে লাগলাম। স্বল্প সময়েই আমি উর্দুভাষা আত্মস্থ করে ফেললাম। এরপর কালীম ভাই আমাকে 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' এবং 'মরনে কে বাদ কিয়া হোগা' কিতাব দুটি পড়তে দিলেন। কিতাব দুটি আমার অন্তরজগতকে দারুণভাবে নাড়া দিল। মরণে কে বাদ কিয়া হোগা- তো আমার চোখের ঘুমই কেড়ে নিল। মৃত্যুপরবর্তী শাস্তির ব্যপারে আমি দারুন শংকিত হয়ে পড়লাম।

কালীম ভাইকে আমি আমার অবস্থা জানালাম। তিনি আমাকে মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শান্তি লাভের জন্য ঈমান এনে মুসলমান হতে বললেন। আমি পিতাজীর সাথে পরামর্শ করলাম। পিতাজী আমাকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন এবং এ-ও বললেন যে, তুমি এখন বড় হয়েছো। নিজের ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তোমার রয়েছে। ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী আমি

কলেজের লাইব্রেরী কক্ষে কালীম ভাইয়ের নিকট ইসলাম গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ! পিতাজী আমার এ সিদ্ধান্তে মোটেও আপত্তি করেন নি।

১৯৭৯ সালে আমি আমার সহোদরার অনুরোধে লন্ডনে চলে যাই এবং সেখানে MS করে ১৯৮৪ সালে মিরাঠে ফিরে আসি। পিতাজী কালীম ভাইকে আমার বিবাহের পাত্র নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আমার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধই নির্বাচন করেছেন। দিল্লীর এক অভিজাত সাইয়্যেদ বংশে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী ডাক্তার আমের ডি এম। একজন উঁচুমানের নিউরোলোজিস্ট। তিনি একজন দ্বীনদার সাচ্চা ইনসান। যেখানেই যান মানুষের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি তাকে আপন করে নেয়। সবখানেই লোকরা তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিতে বিমুগ্ধ হয়। নিজ পেশায় তিনি একজন সফল মানুষ।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার অনুভূতি কেমন?

উত্তর : মূলত যেমনটি আমি শুরুতে বলেছি যে, আমি এবং আমার পরিবার বিশেষত পিতাজী তো স্বভাবগতভাবে মুসলমানই ছিলেন। আর এখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বিশেষত আমার অনুভূতি প্রত্যুষে হারিয়ে যাওয়া সেই বালকের মত সন্ধ্যাবেলায় যে ফিরে আসে আপন ঘরে। আর তার ক্ষত হৃদয়ে বয়ে যায় শান্তির সুবাতাস।

প্রশ্ন : লন্ডনের পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় একজন মুসলমান হিসাবে আপনি কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! লন্ডনে আসার পর আমরা শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে আরো অধিক সতর্ক হয়েছি। আমার স্বামী এখানে এসেই দাড়ি রেখেছেন। স্বয়ং আমার অনুভূতি হলো যে, পর্দাহীনতা বিশেষত স্বল্পবসনা কিংবা অনাবৃত থাকার ব্যাপারটি আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমরা উভয়েই আলহামদুলিল্লাহ নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ি। এছাড়া ডাক্তারী পেশায় রোগীর সুস্থতা আল্লাহর ক্ষমতাধীন হওয়ার বিষয়টি আমরা এখন দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি। আমাদের এখানে অনেক মুসলমান রোগীও আসে। OT রুমে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে প্রথমে আমি তাকে কালেমা পড়াই এরপর সান্ত্বনাবাণী শুনাই এবং এটাও বুঝাই যে, অসুস্থতার দরুণ মৃত্যু এসে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করুন। অমুসলিম রোগীদের জন্য আমাদের এখানে একটি রুহানী চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। আমাদের উভয়ের টেবিলেই প্রচুর পরিমাণে ইসলামী literature (প্রবন্ধ-নিবন্ধ) থাকে। রোগীরা নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে থাকেন। পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে

আমার। লজ্জাহীনতা এবং বস্তুবাদের বিষে আক্রান্ত পশ্চিমাবিশ্ব আজ চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত এবং সীমাহীন অস্থিরতায় নিমজ্জিত। সেখানে অধিকাংশ মানুষ এখন জীবনের স্বাদ ও শান্তি হারিয়ে আত্মহননের মঞ্চে দন্ডায়মান। আমি মনে করি তাদের এই হাতাশা ও অস্থিরতার চিকিৎসা কেবল ইসলামের পবিত্র শিক্ষার মাঝেই নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন : অমুসলিম রোগীদের ইসলামী literature প্রদানে কোনো দাওয়াতী ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই দাওয়াতী কর্মের ফলস্বরূপ গত ৩ বছরে ২৭৩ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমার শ্বশুর হযরত মাও. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর হাতে বাইয়াত ছিলেন। তিনি দিল্লী থেকে আমেরিকা চলে এসেছিলেন। আমার স্বামীও হযরতের এক খলীফা মাও. ওলী আদম সাহেবের সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক রাখতেন। আমরা আমাদের লন্ডনে অবস্থানের উদ্দেশ্য ইসলামের দাওয়াত মনে করি। সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হই একথা ভেবে যে, আমার লন্ডন নিবাসী সহোদরা যিনি আমাকে কাছে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা পিতা মাতার চাইতেও বেশী উদগ্রীব ছিলেন– তিনি আমাদের লন্ডনে আগমনের মাস দুয়েক পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বড় ঈর্ষণীয় ঈমানী হালতে কালেমা পাঠরত অবস্থায় জায়নামাযের উপর তার ইন্তেকাল হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পরেও কি আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! কালীম ভাই আমাকে এ বিষয়ে বেশ জোর দিয়েছেন যেন আমি একটি তালিকা তৈরী করে প্রতিদিন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা অব্যাহত রাখি। আমারও ইচ্ছা যে গড়ে প্রতিদিন ৫০ পৃষ্ঠা পড়ব। তবে একথা ঠিক যে ৫০ পৃষ্ঠার নেসাব এখনও পর্যন্ত পুরা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু আমি যদি বলি যে, বিগত ৩ বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৫ পৃষ্ঠার কম পড়িনি তবে ইনশাআল্লাহ– এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য হবে। এ যাবত আমি শতাধিক সিরাতের কিতাব পাঠ করেছি। হযরত মাও. আশরাফ আলী থানভী এবং হযরত মাও. সাইয়্যেদ আবুর হাসান নদভী রহ.-এর প্রায় সকল কিতাবই আমি পড়ে ফেলেছি। মওদুদী সাহেবের লেখনীও আমার পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। এছাড়া লন্ডনে প্রায়শই নতুন নতুন ইসলামী কিতাব বাজারে আসে এগুলোও আমাদের খোরাক জোগায়। এমনকি

খৃস্টানদের ছাপানো কিতাবগুলোও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! তাহলে তো আপনি ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছেন।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমার দৈনন্দিনের পাঠের গড় পরিমাণ ২৫ পৃষ্ঠার কম হবে না। এ হিসাবে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার পৃষ্ঠা হয়ে যায়। প্রথমদিকে মুতালাআর ব্যাপারে আমি ততটা আগ্রহী ছিলাম না। কালীম ভাই আমাকে জোর দিলেন যে মন না চাইলেও আপনাকে নেসাব পুরা করতেই হবে। কালীম ভাইয়ের এ নির্দেশকে একজন কল্যাণকামীর আদেশ মনে করেই প্রথমে কয়েক মাস আমি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুতালাআ করতাম এখন আমার অবস্থা হলো– খানা না খেলেও এতটা ক্ষুধার্ত হই না মুতলাআ না করলে যতটা তৃষ্ণার্ত হই। কখনো তো এমনও হয় যে, নতুন কিতাব না পেলে পুরাতন কিতাবই দ্বিতীয়বার পড়ি। এভাবেই আমার কাছে তৈরি হয়েছে কিতাবের একটি বিশাল সম্ভার আর তার কিছু অংশ স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানাদি কজন? তারা কোথায় পড়াশোনা করছে?

উত্তর : আল্লাহর রহমতে আমার সন্তান তিনজন। বড়জনের নাম হাসান আমের। ছোটজনের নাম হুসাইন আমের আর মেয়েটির নাম ফাতেমা যাহরা। ছেলেরা মাদরাসায় পড়াশোনা করছে। বড় ছেলে হাসানের বয়স ১০ পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই সে হিফজ সম্পন্ন করেছে। এ বছর সে আলিম প্রথম বর্ষে পড়ছে। ছোট ছেলে হুসাইনের বয়স নয় বছর। তার ষোল পারা হিফজ হয়েছে। আর মেয়ে ফাতেমা একটি ইসলামী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। ওর বাবা ঘরেই ওকে কোরআন শরীফ পড়িয়েছেন। আমরা দুজন প্রোগ্রাম করেছি যে আমাদের সন্তানদের আমরা রোজগারের ফিকির থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত করে দিব। যাতে করে তারা তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে দাওয়াতের জন্য ওয়াকফ করতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি আপনার পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ফিকির করেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! যে বছর আমি MSC সমাপ্ত করে হিন্দুস্তানে ফিরে আসি সে বছরই কালীম ভাইকে পিতাজীর উপর মেহনত করতে অনুরোধ করি। কালীম ভাই পিতাজীকে বেশ কিছু কিতাব দিলেন। এরমধ্যে সাইয়্যেদ আলী মিয়া নদভীর রহ. নবীয়ে রহমত তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত

করল। পিতাজী যদিও আগে থেকেই ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তথাপি জীবনের দীর্ঘসময় একটি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার দরুন এবং খান্দানের লোকদের কারণে বিশেষত আপন চাচা জনাব পিলু মোদী এবং তার বিশিষ্ট বন্ধু আর কে কিড়াভয়ের উপস্থিতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণে ইতস্তত করছিলেন। ডাক্তার আমেরের সাথে আমার বিবাহ অনুষ্ঠান তিনি সম্পূর্ণ ইসলামী পন্থায় অর্থাৎ মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারেই ধুমধামের সাথে করেছিলেন। তবে বলা বাহুল্য যে এ জাতীয় অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণ করার নিমিত্তে ঢালাওভাবে 'খরচের' অনুমতি ইসলাম দেয় না। তা সত্ত্বেও এটাই এখন মুসলমানদের সামাজিকতা?

PGI তে চাকুরীকালীন পিতাজী একবার দু'দিনের জন্য গোমতী নগরে আমাদের বাসায় এলেন। আমরা হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য পিতাজীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। পিতাজী শুরুতে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন যে, প্রথা পালনে কী হয়! আমি তো মন ও মানসের দিক থেকে তোমাদের আগে মুসলমান হয়েছি। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। আমার স্বামী বললেন, নিঃসন্দেহে ইসলামের মূল আবেদন তো মন ও মানসের আত্মসমর্পণ এবং এটাকেই আমরা ইসলামের রুহ মনে করি। তথাপি রুহের জন্য যেহেতু শরীর জরুরী এবং শরীর ছাড়া রুহের সত্তাগত স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। এজন্য মন ও মানসের সাথে সাথে আপনি বাহ্যিকভাবেও কালেমা পড়ে নিন। পিতাজী তৈরী হয়ে গেলেন এবং কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

আম্মাজান পিতাজীর সাথেই ছিলেন। পিতাজী মুসলমান হওয়ার পর আম্মাজানকে তৈরী করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল। তিনিও কালেমা পড়ে নিলেন। মিরাঠে আসার দুমাস পর তার মারাত্মক হার্ট এটাক হলো। তার হার্টের দুটি শিরাই বণ্চক হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাকে লক্ষ্মৌ নিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়াত মওতের মালিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। লক্ষ্মৌতেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হলো। আলহামদুলিল্লাহ! জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তার ঈমানের খুশবুতে সুবাসিত ছিল। ইসলাম গ্রহণের দরুণ তার সময় কাটত আল্লাহর তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায়।

প্রশ্ন : আপনার ভাইদের কী অবস্থা?

উত্তর : ছোটভাই তারেক CA করেছে। বর্তমানে সে মুম্বাই এর একটি বড়

কারখানার ম্যানেজার। মুম্বাই এর এক তাবলীগ ঘরানায় তার বিয়ে হয়েছে। আর শারেক MBA শেষ করেছে। বর্তমানে লক্ষ্ণৌর একটি হোটেলের ম্যানেজার। এ মাসের ২৯ তারিখে আমার ননদ রাশেদার সাথে তার বিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ!

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেদায়েত দ্বারা সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন। আর এখন আপনি নিজেও দাওয়াতের কাজ করছেন। দাওয়াতী জীবনে আপনার এই অভিব্যক্তি জানতে চাই যে, অমুসলিমদের হেদায়েতের জন্য কোনো পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী?

উত্তর : এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। অস্থিরতা ও মরণযন্ত্রণায় কাতর মানবতাকে জ্ঞান ও যুক্তির নিরিখে উত্তীর্ণ ধর্মবিশ্বাসেরই পরিচয় কেবল পূর্ণরূপে করতে সক্ষম। এতদসত্বেও আমি আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং আমার মাধ্যমে যারা ইসলামের ছায়াতলে এসেছেন, তাদের অবস্থার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করত এ কথাই বলব যে, আপনি আপনার মৌখিক দাওয়াত দ্বারা হয়তো লোকদের থেকে ইসলাম গ্রহণের মৌখিক স্বীকৃতি নিতে পারেন, কিন্তু কোনো মানুষকে এতটুকু প্রভাবিত করার জন্য যে, সে তার জীবনের গতিপথ পাল্টে নতুন একটি ধর্মবিশ্বাস গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যাবে। মৌখিক দাওয়াতের পাশাপাশি আপনার আমলী দাওয়াতও বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে। আমি মনে করি, আমাদের পরিবারের ইসলাম গ্রহণের পিছনে বরং আমাদের দুজনকে দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত করার পিছনে আপনার আব্বাজানের স্বভাবজাত ভদ্রতা এবং দাওয়াতী কর্মকান্ড সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার পাশাপাশি নবীদের প্রেরণ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে মানুষের জন্য কিতাবের সাথে ব্যক্তিও প্রয়োজন। অর্থাৎ, কথার সাথে আমলও চাই। আর তখনই কেবল পরিবর্তনের আশা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : শুকরিয়া উর্মি ফুফু! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আরমুগানের পাঠকদের জন্য আপনার কোনো পয়গাম আছে কি? বিশেষত এর পাঠিকাদের জন্য কোনো বিশেষ পয়গাম?

উত্তর : আরমুগানের মাধ্যমে আমি আমার বোনদের কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করতে চাই। তা হলো একজন মুসলমানের দায়িত্ব ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মানুষের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোও তার দায়িত্ব। আর এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও সমানভাবে আদিষ্ট।

বরং ইসলামী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ভাগ্যবানদের নূরানী কাফেলায় পুরুষদের চেয়ে নারী এগিয়ে। গারে হেরায় ওহী অবতরণের সূচনালগ্নে ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন এবং নিকটতম মানুষের উপস্থিতিতেও হযরত নবী عليه السلام -এর দাওয়াতের সর্বপ্রথম শ্রোতা ছিলেন তারই জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা রাযি. এ ঘটনা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, নারীদেরও আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এমনকি পুরুষদের চেয়েও বেশী। দাওয়াতের ময়দানে অমুসলিম সম্প্রদায় বিশেষত পশ্চিমা সমাজের অবস্থা দর্শনে তারা এ ধ্রুবসত্য গভীরভাবে অনুধাবনেও সক্ষম হবেন যে, বস্তুবাদিতা ও নগ্নতার বিষে আক্রান্ত যে পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোক ঝলকানীতে আজ আমরা প্রভাবিত হচ্ছি এবং তাকে উন্নতির সোপান মনে করছি। পশ্চিমা সমাজ তাদের নোংরা সংস্কৃতির দরুণ আজ কতটা অধঃপতিত। অস্থিরতা ও অশান্তির মরণ যন্ত্রণায় ফাঁসির মঞ্চে দন্ডায়মান এ মানুষগুলো আজ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য কতটা তৃষ্ণার্ত। এবং তারা এটাও অনুধাবন করতে পারবেন যে, ইসলামের মহান দৌলত দান করে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

প্রশ্ন : মন চাচ্ছে বিশদভাবে আপনার দাওয়াতী জীবনের কারগুজারী শুনি। কিন্তু আপনাকে শীঘ্রই যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোনো সাক্ষাতে আবার কথা হবে। অনেক অনেক শুকরিয়া!

উত্তর : অবশ্যই! বাস্তবেই দাওয়াতী জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের অর্জিত হয়েছে এবং অনেক ঘটনাও আমাদের জীবনে ঘটেছে। ইনশাআল্লাহ আবার সাক্ষাৎ হবে।

فى اما ن الله استودع الله دينكم واما نتكم و خواتيم اعما لكم

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা যাতুল ফাউযায়ন

মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর– ২০০৪

সফিয়্যা (সরোজ শালনী)-এর সাক্ষাৎকার

‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নত বিশ্বের কেবল ইসলামের প্রয়োজন এবং ইসলাম ছাড়া এই দুনিয়া একদম কাঙাল। বোন আসমা! আমি এটা কোন কাব্য করছিনা। বরং এই উন্নত বিশ্বকে খুব কাছে থেকে দেখেই এই কথা বলছি। এই কাঙাল দুনিয়াকে কেবল ইসলাম গড়তে পারে। অন্যথায় এই দুনিয়াটা দেউলে হয়ে গেছে। এর দেউলেপনা ও অন্ধকারের চিকিৎসা কেবল মুসলমানদের কাছে আছে। তারপরও এই কাঙাল পৃথিবী থেকে আমরা ভীত কেন? আমার আফসোস হয় এবং বিস্ময় জাগে যখন আমি অনুভব করি যে, এই দেউলিয়া ও অন্ধকার পৃথিবীতে নিজেদের কাছে দেউলেপনার চিকিৎসা এবং সবচে’ বড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত কেন? আমাদের তো এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বরং গর্ব করা দরকার এবং এই দেউলে পৃথিবীর জন্য করুণা অনুভব করা দরকার।” –ডা.সফিয়্যা

আসমা : আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সফিয়্যা :ওয়া আলায় কুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্ন : ডাক্তার সাহেবা! আজমীর থেকে আব্বার ফোন এসেছিল। তিনি বলেছেন যে, আপনার ফোন এসেছিল। আমি যেন আপনাকে ডেকে পাঠাই এবং আপনার সঙ্গে কথা বলি। আপনি জেনে থাকবেন যে, আমাদের এখানে ফুলাত থেকে আমাদের রক্ত সম্পর্কীয় ভাই-বোনদের বিশেষত দেশবাসী ভাইদের পর্যন্ত দাওয়াতে হক (সত্যের আহ্বান) পৌঁছুনো এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার চিন্তা-ভাবনা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টিকরা এবং মসলমানদের সজাগ ও সচেতন করার জন্য একটি উর্দূ পত্রিকা বের হয়। এতে ইসলামের দস্‌ড়্রখানের ওপর আগমনকারী সৌভাগ্যবান ভাইদের আত্মকাহিনী প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আব্বুর একান্ত ইচ্ছা ছিল ২০০৫ নং সংখ্যায় আপনার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোক।

উত্তর : আসলে আমি পনের দিন যাবত মাওলানা সাহেবকে ফোন করার চেষ্ট করছিলাম। আমার কাছে তাঁর ইউ.পির ও দিল্লীর ফোন নম্বর ছিল। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। গতকাল আকস্মিকভাবেই ফোন পেয়ে যাই। তিনি আমাকে দিল্লীর বাসার নম্বর দেন এবং খুব তাকীদ করেন যেন আপনাকে ফোন করে চলে যাই। এজন্য যে, ম্যাগাজিন প্রেসে পাঠাতে হবে আর এটি ছিল প্রেসে

পাঠাবার একদম শেষ তারিখ। মাওলানা সাহেব আমাকে আরও বলেছেন– এই সব সাক্ষাৎকার দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টিতে বড় রকমের ভুমিকা পালন করছে। আমার তখন ধারণা হল এতে আমারও কিছুটা অংশ থাকুক। এখন আপনি আমার থেকে যা চান জানতে পারেন।

প্রশ্ন : শুকরিয়া। প্রথমে আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর : আমার পুরনোর নাম সরোজ শালনী। ১৯৭৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর লাখনৌর কাছে মোহন লালগঞ্জে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা ড.কে.এ.শর্মা ছিলেন একজন অধ্যাপক এবং কার্ডিওলাজিতে তিনি ডি.এম (ডক্টর অব মেডিসিন) করেছেলেন। এরপর তিনি বেশ কিছু কাল পান্থহসপিটালে থাকেন। দশ বছর যাবত লক্ষ্নৌ বাসার কাছাকাছি চেষ্টা-তদবীর করে বদলী হন। আমার মা একজন গৃহিনী। আমার পিতা মেযাজে একজন হিন্দুস্‌ড়্নী। তিনি কেবল প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেন। এজন্য তিনি আপন পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বহু ডাক্তার ছেড়ে আমার মা’কেই পসন্দ করেন ও বিয়ে করেন। আমার দুই ভাই । একজন বানারস ইউনিভার্সিটিতে রীডার এবং অপরজন বি,এইচ,এল-ল ইঞ্জিনিয়ার। দু‘জনেই আমার বড়। আমি ইন্টার সয়েন্স বায়োলজিতে প্রথম বিভাগে পাশ করি। এরপর পি,এম,টি, প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হই। লক্ষ্নৌ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস করি এবং মওলানা আযাদ মেডিক্যাল থেকে এস,ডি,করি। অতঃপর পিতার ইচ্ছানুক্রমে কার্ডিউলজি (হৃদরোগ) কে বিষয় হিসাবে নির্বাচন করি। এখন আমি AIMS থেকে DM করছি এবং বর্তমানে AIMS -একার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট চাকুরীও করছি। আমি এখন থেকে এক বছর চার মাস চার দিন দু‘ঘন্টা আগে ২০০৪ সালে ২০মে রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এগারটার সময় গ্রীন পার্ক মসজিদে গিয়ে আপনার আব্বার হাতে ইসলাম কবুল করি।

প্রশ্ন: আপনার ইসলাম কবুলের ঘটনা এবং কেন ও কিভাবে ইসলাম কবুল করলেন। একটু বিস্‌ড়্রিতভাবে আপনি আমাদেরকে বলুন!

উত্তর : ২০০৩ সালের জুনে j.c.c.u শিশুদের ওয়ার্ডে আমি ডিউটিরত ছিলাম। আমি দেখলাম একজন মওলানা সাহেব হরিয়ানার একটি শিশুকে দেখতে এসেছেন। শিশুর পাশে একজন এটেন্ডন্ট। বাচ্চার মা হরিয়ানার শিশুটির পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁর বাচ্চাকে ফুঁক দিতে বলল। মাওলানা সাহেব বাচ্চাটিকে কিছু পড়ে ফুঁক দিলেন। এরপর পাশেই অপর এক বাচ্চার

মাও দাঁড়িয়ে তার চাচ্চাটিকে ফুঁক দিতে বলল। মাওলানা সাহেব তার বাচ্চাকেও ফুঁক দিলেন। এভাবে তিনি ছয়টি বাচ্চাকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁক দিলেন। ডিপার্টমেন্টের হেড ডাক্টর ত্যাগীর এসময় ছিল রাউন্ড দেবার সময়। আমি সামনে থেকে দেখতে ওয়ার্ডে আসলাম এবং মাওলানা সাহেবকে বললাম– আপনার রোগী কে? আপনি কখনো এ রোগীর কাছে আবার কখনো ও রোগীর কাছে যাচ্ছেন এবং ঝাড়-ফুঁক করছেন। এটা j.c.c.u এখানে রোগীর ইনফেকশন হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান।

মাওলানা সাহেব বললেন। এসব রোগীই আমার। এজন্য আমাদের যাঁরা বড় তাঁরা বলেছেন যে, সকল মানুষ একই মা-বাপের সন্তান। এজন্য এখানে ভর্তি সকল রোগীর সঙ্গেই আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। যেই মালিক আপনাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে এই 'আমার-তোমার' একেবারেই পছন্দ নয়। আর যা পড়ে আমি ফুঁক দিচ্ছি তা সেই মালিকের কালাম (বাণী) যিনি তাঁর কালামে একথা বলেছেন আর আপন সংবাদ বাহক হযরত ইবরাহীম এর মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন। আর হযরত ইবরাহীম তো তিনি যাঁর নামের ওপর ভারতের লোকেরা নিজেদের ব্রহমন (ব্রাহ্মণ)বলে। তিনি স্বীয় মালিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমার মালিক তো তিনি, আমি পীড়িত হলে যিনি আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

আপনি প্রতিদিন দেখে থাকবেন, দেখছেন, আপনি আপনার চিন্তা-ভাবনা থেকে রোগীর জন্য ভাল ভাল ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন। রোগী সেসব ওষুধ খেয়ে সুস্থ হচ্ছে, এর পর মারা যাচ্ছে। আবার কখনো কোন রোগীর ভুল চিকিৎসার পর রোগী ভাল হয়ে যাচ্ছে।

এধরনের কথা আমি এই প্রথম বার শুনলাম। গত সপ্তাহয় আমাদের ওয়ার্ডে ছ'জন বাচ্চা মারা যায়। এদের মধ্যে চারটি বাচ্চা ছিল খুব সুন্দর। দু'সপ্তাহ ওয়ার্ডে থাকার কারণে তাদের প্রতি আমার একটি মায়াও বসে গিয়েছিল। তাদের মৃত্যুতে আমি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। মাওলানা সাহেবের মুহাব্বত ভরা কথা শুনে আমার মনে হল তাঁর আরও কথা আমার শোনা দরকার। আমি মাওলানা সাহেবকে আমার কেবিনে আসতে বলি। তিনি আমার ডকে সাড়া দেন। মাওলানা সহেব আমাকে বলেন, আপনি আমার ছোট বোন কিংবা আমার সন্তানের মত। আপনি আমাকে ভালবেসে এখানে ডেকে এনেছেন। আপনার কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনার ওয়ার্ডে আগত রোগীদের আপনি নিজের বাচ্চা কিংবা ভাই বা বোন মনে

করবেন এবং তাদের ব্যথা ও কষ্টকে সেইভাবে নেবেন। মালিক আপনাকে কত সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন যে, পেরেশান-হাল লোকদের দুঃখ ও ব্যথায় আপনাকে শরীক করেছেন। আপনি খুব পরিমাপ করে থাকবেন যে, যেই মার বাচ্চা হয়েছে আর সে এতটা অসুস্থ যে, তাকে j.c.c.u তে ভর্তি হতে হয়েছে। আর সাধারণত সরকারী হাসপাতাল গুলোতে তারই ভর্তি হয় যাদের কোথাও আশ্রয় নেই। তাদের সঙ্গে এতটুকু সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ যদি আপনি করেন তাহলে তাদের প্রতিটি পশম বরং তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার জন্য দুআ বের হবে।

পরিশেষে তিনি খুব দরদের সাথে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, ডক্টর শালনী! আপনি আমার রক্ত সম্পর্কীয় বোন! এজন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না, বরং আপনাকে ওসিয়্যত করছি। আর ওসিয়্যত তো তাকে বলা হয় যা কোন মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তানদের লক্ষ করে অন্তিম কথা হিসেবে বলে। আর তা এই যে, আপনি আপনার ওয়ার্ডে আগত প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা সবচে' বড় পূজা মনে করে করবেন। আপনি শত বছরের তপস্যা ও কঠিন পূজার মাধ্যমে মালিকের কাছ সেই আসন পাবেন না যা কোন দুঃসহ ব্যথা-বেদনাকাতর ও বিপদগ্রস্ড় মাতা-পিতাকে সান্ত্বড়না দানের মাধ্যমে পাবেন।

আমি মাওলানা সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম এবং ওয়াদা করলাম যে, আমি চেষ্টা করব। মাওলানা সাহব চলে গেলেন। ডাক্টর সাহেবের-রাওন্ডের পর আমি পানিপথ হরিয়ানার ঐ বাচ্চার বাপ থেকে জানতে চাইলাম মাওলানা সাহেব কে? তিনি বললেন, ইনি আমাদের হযরতজী। তিনি খুব ভাল মানুষ। তাঁর হাতে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হয়েছে।

এরপর অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর কথার আছর আমার মনের ওপর ছিল। বিশেষ করে সেই কথাটি যে, এসব রোগীই আমার। যেই মালিক আমাদের পয়দা করেছেন। তার কাছে এটা আমার আর ওটা তোমার পসন্দনীয় নয়। আমিও অনুভব করি যে, মাওলানা সাহেবের ঝাড়-ফুঁকের পর রোগীদের অবস্থার ভেতর আশ্চর্য রকমের পার্থক্য এসেছে এবং সব রোগীই সুস্থ হয়ে ওয়ার্ডে থেকে চলে গেছে। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর ক্রমান্নয়ে এ স্মৃতি ঝাঁপসা হতে থাকল। অবশেষে একেবারে ম্ণ্ঢান হয়ে গেল।

মাওলানা আযাদ মেডিক্যাল কলেজে আমার এক রুম পার্ঠনার ছিল। ডা.রীনা সেহগাল। সে গাইনীতে এম,এস করছিল। পরে সে সফদর জঙ্গ হাসপাতালে

গাইনী বিভাগে চাকুরী পায়। আমাদের ভেতর ভাল বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সে আমাকে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। খাওয়ার পর কথা হচ্ছিল , কাজ করার জন্য তার এখানে মুসলমান কর্মচারীরা আসত। খাবার রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ তারাই করত। আমি তাকে বললাম, তুমি রান্নার জন্য মুসলমান বাবুর্চি রেখেছ কেন? কোন হিন্দু পাওনি তুমি? সে বলল, এই যে মেয়েটি তুমি দেখছ বড় ভাল মেয়ে। খুবই সৎ ও ঈমানদার । কয়েক বার আমার টাকার পার্স (মানিব্যাগ) পড়ে গেছে, যে অবস্থায় পেয়েছে সেই অবস্থায় আমার হাতে তুলে দিয়েছে। অতঃপর কথায় কথায় মুসলমানদের কথা উঠল। ডা. রীনা বলল, আমাদের দেশে বরং বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়াতে কথা উঠছে মানুষ মুসলমান হচ্ছে। কত বড় বড় বিরাট ব্যক্তিত্ব মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন। মাইকেল জ্যাকসন সম্পর্কে তুমি হয়তো জেনে থাকবে যে, সেও মুসলমান হয়ে গেছে। দূরে কি স্বয়ং আমাদের হাসপাতালেই কার্ডিওলজি বিভাগের এক যুবক ডা. বলবীর সেও বছর দুয়েক আগে মুসলমান হয়ে গেছে। সে তো এও চায় যে, গোটা হাসপাতালের সকলেই মুসলমান হয়ে যাক।

আমি একজন রোগীর চেক আপের জন্য তাকে ডেকে পাঠাই। এসেই সে আমাকে বলল, যদি মৃত্যুর পর নরকের হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে মুসলমান হয়ে যাও।

একথা শুনে আমার ওয়ার্ডে আগত মাওলানা সাহেবের কথা মনে পড়ল। এবং তাঁর সকল কথা জীবন্ত হয়ে উঠল। আমি ডা. রীনাকে বললাম ডা. বলবীরের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। সে আমাকে পরের দিন ফোন করতে বলল। ফোন করতেই বলল, রবিবার দিন ডা. বলবীরকে আমি আমার কামরায় ডেকে পঠিয়েছি। আপনি বেলা দশটায় আমার কামরায় চলে আসুন। রবিবার দিন আমি ডা. সেহগালের কামরায় যাই। ডা. বলবীরও আসে । শ্যামলা রঙের খুবই উজ্জল যুবক যেন কোন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম তিনি কত দিন আগে ইসলাম কবুল করেছেন। ইসলাম, হ্যাঁ কেবল ইসলামই সত্য ও সর্বপ্রথম এবং অন্তিম (সর্বশেষ) ধর্ম। আর ইসলাম ছাড়া মৃত্যুপরবর্তী জীবনে না মোক্ষ লাভ ঘটবে, না মুক্তিই মিলবে। পরিণতিতে চিরদিনের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর ইসলাম কবুল করা আপনার জন্য এতটাই প্রয়োজন, এতটাই জরুরী যতটা জরুরী আমার জন্য। আমি চানতে চাইলাম, আপনি কি আপনার নামও পরিবর্তন করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমার ইসলামী নাম

ওয়ালিউল্লাহ যার অর্থ আল্লাহর অর্থাৎ, ঈশ্বররের বন্ধু। আমি তাকে বললাম এক-দেড় বছর আগে আমার ওয়ার্ডে একজন মাওলানা সাহেব এসেছিলেন। তিনি আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন যা আজ পর্যন্ত আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি ওয়ার্ডের সব রোগীকেই ঝাড়-ফুঁক করছিলেন। তাঁর রোগী কোনটি জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, সব রোগীই আমার। আমরা সকলেই একই পিতা-মাতার সন্তান, রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। 'এটা তোমার আর ওটা আমার' এসব পয়দা করনেওয়ালা মালিকের আদৌ পছন্দ নয়। ডা. বলবীর বলতে লাগলেন, মাওলানা সাহেব খুবই সত্যকথা বলেছেন। এ তো ইসলামের এবং আমাদের সকলের রসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে একথাই বলেছিলেন। আমি বললাম, সেই ভাষনণ কি ছাপা পাওয়া যায় । তিনি বললেন, আমাদের নবীর প্রতিটি কথা সম্পূর্ণরুপে নিরাপদ ও সুরক্ষিতরূপেই পাওয়া যায়। আমি কারুর থেকে নিয়ে ডা. রীনার হাতে আপনাকে পাঠিয়ে দিব।

দু-চারদিন পর ডা. রীনা সেহগাল ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত আমাদের নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হজ্জ ভাষণটি এনে আমাকে দিল। সেটি পড়ে আমি তো বিস্মিত হয়ে যাই। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পকে বারবার আলোচনা ও সতর্কীকরণ আমার হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে। মাওলানা সহেবের কথা আমর মনে পড়ল। ধারণা করলাম কতইনা ভাল হত আমি যদি মাওলানা সাহেবের ঠিকানা জেনে নিতাম । হাসপাতালে আমি পুরনো রোগীদের ফাইল খুঁজলাম যাতে করে পানি পথের রোগীর ঠিকানা পাই। তাহলে আমি নিজেই রোগীর বাড়ি গিয়ে মাওলানা সাহেবের ঠিকানা জেনে নেব। কিন্তু আমি পেলাম না। ইসলাম সম্পর্কে পড়া ও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমার ভেতর আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমি ডা. বলবীরের ফোন নিলাম এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিধারণ করলাম । সফদর জঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে তার ওয়ার্ডে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম । অতঃপর তাকে ইসলামের ওপর লিখিত বইপুস্ড়ক ও সাহিত্য দেবার জন্য বলি। দ্বিতীয় দিন তিনি আমার হাসপালে আসেন এবং আমাকে ছোট একটি পুস্ড়ক 'আপকী আমানত আপকী সেবা মে' হিন্দীতে লিখিত দেন ও বলেন ইসলামের অবশ্যকতা এবং এ সম্পর্কে জানার জন্য এই ছোট্ট পুস্ড়িকাটি একশটি বইরেয়র একটি। ব্যস! পুস্ড়িকাটি খুব মন দিয়ে পড়বেন। একজন সত্যিকারের সংবেদনশীল বন্ধুর কথাগুলো কেবল আমাকেই বলছেন। আপনি

পড়লে আপনার নিজেরও এমনটাই লাগবে। আমি এই পুস্তিকার লেখকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পুস্তিকার দু'টি শব্দ এর প্রমাণ। আপনি পুস্তিকাটি পড়লে পুস্তিকা এবং পুস্তিকার লেখক সম্পর্কে জেনে যাবেন। ডা. বলবীর আমাকে বলেছেন যে, তিনি দিল্লী পার্শ্ববর্তী ইউ.পির একটি শহরের রাজুত খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুস্তিকাটি দিয়ে এবং কিছুক্ষণ চা পান ইত্যাদি সেরে তিনি চলে যান। আমি ওয়ার্ডে বসে ব্যস! এক নিঃশ্বাসেই বইটি পড়ে ফেলি। বইটি পড়ার পর মাওলানা সাহেবের কথা খুব মনে পড়ল। বইটি আমার মনে স্থান করে নেয়। বইটি পড়ে আমি ডা. বলবীরকে ফোন করি এবং তাকে বলি যে, লেখকের আর কোন বই আছে কিনা। থাকলে দিতে বলি। এ-ও বলি যদি লেখকের সঙ্গে আপনি সাক্ষাত করিয়ে দেন তাহলে আমর ওপর আপনার এক মহা অনুগ্রহ হবে।

চার দিন পর ছিল ১৮ই মে। ডা. বলবীরের ফেন এল। তিনি বললেন, আপনি যদি ছুটি নিতে পারেন তাহলে 'আপকি আপমানত' এর লেখক মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে গ্রীন পার্ক মসজিদে দেখা হতে পারে। আমি তখনই রেডি হয়ে গেলাম। অটো কার যোগে গ্রীন পার্ক মসজিদে পোঁছি। মাওলানা সাহেব এগারোটার পরিবর্তে সাড়ে দশাটায় সেখানে পোঁছে যান। তাঁর সফর ছিল সামনে । মাওলানা সাহেবকে দেখে এতো খুশী লাগল যে, আমি তা ভুলতে পারবনা। আমি দেখালাম 'আপকী আমানত' এর লেখক মাওলানা কালীমই সেই মাওলানা সাহেব যিনি দেড় বছর আগে হরিয়ানার বাচ্চাকে দেখার জন্য আমার ওয়ার্ডে এসেছিলেন। যাকে আমি এতদিন খুঁজছিলাম । ভক্তি ও ভালবাসার আতিশয্যে আমি তার পায়ের ওপর গিয়ে পড়ি। মাওলানা সাহেব খুব কঠিনভাবে আমাকে নিষেধ করেন এবং আমাকে বলেন। এখন আর দেরী কেন? আপকী আমানত' পড়ার পর আর কোন সন্দেহ আছে? আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম। কিন্তু আমি আর আমাকে ধরে রাখলামনা । আমি মওলানা সহেবকে বললাম যে, আমি মুসলমান হতেই এসেছিলাম। মাওলানা সাহেব খুব খুশী হলেন এবং সাথে সাথেই আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমার ইসলামী নাম রাখলেন সরোজ শালনীর পরিবর্তে সফিয়্যা শালনী (এস,সালনী) । মাওলানা সাহেব আমাকে কিছু কিতাবের নাম লিখেদেন এবং নামায মুখস্ড় করা ও পড়ার তাকীদ করেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনি এর ঘোষণা দিয়েছেন কিনা?

উত্তর : মাওলানা সাহেব এর ঘোষণা দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু তারপরেও আমি আমার বিশেষ লোকদের কাছে তা বলেছি। কখনো কখনো আমর আবেগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, ইসলাম যখন সত্য তখন একে লুকানো এবং লুকোচুরি করে বেঁচে থাকা কেমন কিন্তু সাথে সাথেই আমর মনে পড়ে, যখন এমন একজন মানুষ যার দরুন আমার ধারণার বিপরীত অন্ধকার আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা কীট ইসলামের আলো পেল, তাঁকে রাহবার (পথ-প্রদর্শক) মানল, এ খন তাঁর কথা মানাই ভাল।

প্রশ্ন : আপনার বান্ধাবী ডা. রীনা হেগালকে আপনি বলেছেন?

উত্তর : আমি কেবল তাকে বলেই দিই নাই বরং আমি এবং ডা.ওয়ালিউল্লাহ (বলবীর) দু'জনে তার সঙ্গে লেগে আছি। আলহামদুলিল্লাহ।! সে কলেমা পড়েছে। সে বিবাহিতা এবং তার স্বামী ডা.বি.কে. সেহগালের নিজের ক্লিনিক আছে। খুবই কট্টর গোড়া হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওদিকে কয়েক বছর যাবত তিনি রাধাস্বামী সত্য সংঘের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। এ জন্য সে তার কারণে চেপে আছে।

প্রশ্ন : ডা.ওয়ালিউল্লাহর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

উত্তর : আসলে ডা.ওয়ালিউল্লাহ নিজেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। তিনি এমন এক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যার ফলে ক্রমান্বয়ে তিনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন এতে করে সেখানে পেসমেকার লাগাতে হচ্ছে। তার নিজের চিকিৎসার সূত্রে আমার সঙ্গে বেশি যোগাযোগ। আমি তার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব ভূমিকা পালন করি। সরকারী চাকুরে এক যুবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মুসলমান হবার পর বিয়ে হবে। এরপর খান্দানী রেওয়াজ মাফিক শাদী অনুষ্ঠিত হবে। তাকে কালেমা পড়িয়ে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু পরে মহিলাটি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ রাখতে পারে নি। এক্ষেত্রে তার চাকুরীও এতে বাঁধা ও প্রতিবন্ধক হয়। ইসলামের প্রতি তার স্ত্রীর অনাগ্রহ ও অনাকর্ষণ তার মনকে কুরে কুরে খেতে থাকে। ফলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা কার্যকর না হওয়ায় মাওলানা সাহেব তাকে হার্বাল মেডিসিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। আল্লাহর মেহেরবানী দু'মাসেই তিনি প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাওলানা সাহেব তাকে আরব দেশগুলোতে যাবার পরামর্শ দেন এবং পরে তার স্ত্রীকেও সেখানে নিতে বলেন। সেখনে সে পরিবেশ পাবে। আল্লাহর শোকর সৌদীতে তার চাকুরী মিলে যায়। গত মাসে তিনি তার স্ত্রীকেও ডেকে নিয়েছেন। তার যাওয়ায় তার

সমস্যার তো সমধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একাকী হয়ে গেছি। ডা. রীনা যার নাম আপনার আব্বার পরামর্শে রাখা হয়েছিল ফাতিমা। তার স্বামীর ওপর ডাক্তার ওয়ালিয়্যুল্লাহ দাওয়াতী কাজ করছিল, সেই দাওয়াতী কাজটি কমে গেছে। আমি খোলাখুলিভাবে তার সাথে কথা বলতে পরিনা ।

প্রশ্ন : আপনার পিতামাতাও কি আপনার মুসলমান হবার ব্যাপারটি জেনে গেছেন।

উত্তর : হ্যাঁ, আমি আমার পিতাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি। তিনি খুশী মনে তা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এখন ক্রমান্বয়ে তার অসন্তোষ কমে আসছে।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ে হয়েছে কি?

উত্তর : ছ'-সাত বছর থেকে আমার পিতা আমার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। অনেক ভাল সম্পর্ক তাঁর ছাত্রদের ভেতর থেকেই এসেছিল। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। এজন্য আমি নিজেকে এর জন্য প্রস্তুত করতে পারছিলাম না। আমি ডি.এম.করার বাহানায় নিষেধ করে দিই। আমি কয়েক বার মাওলানা সাহেবের কাছে আমার ইসলামের ঘোষণা দেবার অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি চুপচাপ থেকে নীরবে পরিবারের সদস্যদের ওপর কাজ করতে বলেন। আমি যখন আমার নামায-রোযার কষ্টের কথা বললাম তখন তিনি কোন আরব রাষ্ট্রে চাকুরীর বাহানায় যাবার জন্য বললেন। এজন্য তিনি ডা. ওয়ালিউল্লাহর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। আলহামদুলিল্লাহ জেদ্দায় কিং আব্দুল আযীয় হাসপাতালে আমি নিযুক্তি পাই। এবং দুবছরের ছুটিও পাই। আমার বতমান কর্মস্থল থেকে তিন মাস থেকে প্রস্তুতিমূলক ছুটি কাটাচ্ছি।

বোন আসমা! আপনি বিয়ের এমন এক প্রশ্নব করেছেন যে, এই প্রশ্ন স্বয়ং আপনার জন্যই কৌতুকের হবে। আপনার জানা আছে যে, পিজিআই চুন্দিগড়ের একজন সার্যন ডা. আসআদ ফরিদীর সাথে আপনার বিয়ের প্রস্ড়াব এসেছিল এবং তিনি ও খুব চেষ্টিত ছিলেন যাতে করে আপনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন তার হাসপালের ইতিহাসে শেরওয়ানী পরিহিত ও শ্মশ্রুমন্ডিত একমাত্র ডাক্তার । কিন্তু আপনার সম্বন্ধ ভাগ্যে লিখিত ছিল আলীগড়ে বিধায় সেখানেই হয়। মাওলানা সাহেব একবার আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন। আমি যদি রাজী থাকি তাহলে তিনি এই সম্বন্ধের ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। আমি বলি, এরচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় আর হতে পারেনা। কিন্তু একদিন আপনি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের অনুমতি দিচ্ছেন না, অপর দিকে এই ফয়সালা কিভাবে হতে পারে। তিনি

আমাকে বললেন, আপনি আগে তো রাজী হন তাহলে আমি সমস্যার সমাধান করছি। আমি আমার সম্মানিত জানিয়ে দিই। ডা. আস'আদের পোষ্টিংও জেদ্দার কিং আব্দুল আযীয হাসপাতালে হয়ে যায়। তিনিও দরখাস্ড় করে রেখেছিলেন। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর জেদ্দায় চলে যান। আমার ভিসাও প্রসেসিং হচ্ছে। আমার ইচ্ছা ভিসা সত্বর এস গেলে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে এ বছরেই হজ্জ তৌফীক দান করেন।

আসমা : একজন শ্মশ্রুমন্ডিত ও শেরোওয়ানী পরিহিত মুসলমানকে বিয়ে করতে নিজেকে পরিবেশগতভাবে আশ্চর্য লাগেনি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ মোটেই না । আল্লাহর শোকর ইসলামের সব বিষয়ই আমার ভেতর থেকে পছন্দ। সত্য বলতে কি ইসলাম আমার ভেতরকার স্বভাজাত ধর্ম । যখন আমি শুনলাম যে. আমর স্বামী ডা. আস'আদ পি.জি.আই-এর ইতিহাসে শেরোওয়ানী পরিহিত শ্মশ্রুধারী একমাত্র ডাক্তার তখন আমার মন চাইল আমি ইসলামের ঘোষেণা দিয়ে বোরকা পরব এবং অলইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনসস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সাযেন্সে একমাত্র বোরকাধারী ডাক্তার হবো। কিন্তু মাওলানা সাহেব আমার এই আবেগকে উৎসাহিত করত আরও দু'-চার বছর সৌদী আরব থেকে আসার জন্য বললেন। আমার ধারণা এবং আমার এই ধারণায় আমি আরও মজা পাই যে, গোটা হাসপাতালে একমাত্র বোরকাধারিনী নওমুসলিম ডাক্তার, গোটা হাসপাতালের লোকদের ইসলাম সম্পর্কে অবগতি লাভের মাধ্যম হবে। এটি একটি উত্তম পদক্ষেপ।

প্রশ্ন : আপনার পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে ফেললেন। এতে আপনার পিতামাতা কষ্ট পান নি?

উত্তর : আমার বিয়ে তো হঠাৎ করে হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব আমার পিতামাতাকে ছেলে দেখান এবং বলেন যে, একটি পয়সা কিংবা একটি আংটি যৌতুক ছাড়াই এ বিয়ে হয়ে গেছে। আর সামাজিক বিতর্ক এড়াবার জন্য আমরা করব কি, প্রথমে ডা. আস'আদ যাবেন। পরে যাবেন ডা. শালনী । কেউ জানবে না। পরে মনে করবে সৌদী আরবে গিয়ে এই বিয়ে হয়ে থাকবে। এতে করে আত্মীয় স্বজন ও আপন জনদের বেশি খারাপ লাগবে না। তারা রাজী হয়ে যান। বিশেষ করে তারা ডা. আস'আদকে দেখে খুব খুশী হন। বারবার আমার পিতা আমাকে বলেন। শালনী! তোর সৌভাগ্য এমন চাঁদের মত তুই স্বামী পেলি। আসলেই তিনি আমার চেয়ে অনেক সুন্দর। তিনি ডা. আস'আদকে বিদায় জানাতে দিল্লী এয়ার পোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন এবং তাকে খুব আদরও করেন।

প্রশ্ন : আসলেই আপনি খুব ভাগ্যবতী । আল্লাহ গায়েব থেকে আপনার জন্য এমন সুন্দর এন্তেজাম করেছেন।

উত্তর : নিঃসন্দেহে আল্লাহর বহুত মেহেরবানী। আমি যখনই মনে করি আল্লাাহর দরবারে সিজদায় বহুক্ষণ পড়ে থাকি । আসলে আমি এবর যোগ্য ছিলাম কোথায়! কুফর ও শিরকের অন্ধকারে আমার ইসলাম জুটল। এই ময়লা আবর্জনার ওপর আমার মালিকের এ অনুগ্রহ।

প্রশ্ন : আপনি নিজের ঘরের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন নি?

উত্তর : আল্লাহর শোকর। আমি ক্রমান্বয়ে কাজ করছি এবং এখন ইসলামের সঙ্গে তাদের দূরত্ব খুবই কমে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আরমুগানের মাধ্যমে আপনি কি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোন উপদেশ দিতে চাইবেন?

উত্তর : আমার মনে জাগে , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নত বিশ্বের কেবল ইসলামের প্রয়োজন এবং ইসলাম ছাড়া এই দুনিয়া একদম কাঙাল। বোন আসমা! আমি এটা কোন কাব্য করছিনা। বরং এই উন্নত বিশ্বকে খুব কাছে থেকে দেখেই এই কথা বলছি। এই কাঙাল দুনিয়াক কেবল ইসলাম গড়তে পারে। অন্যথায় এই দুনিয়াটা দেউলে হয়ে গেছে। এর দেউলেপনা ও অন্ধকারের চিকিৎসা কেবল মুসলমানদের কাছে আছে। তারপরও এই কাঙাল পৃথিবী থেকে আমরা ভীত কেন? আমার আফসোস হয় এবং বিস্ময় জাগে যখন আমি অনুভব করি যে, এই দেউলিয়া ও অন্ধকার পৃথিবীতে নিজেদের কাছে দেউলেপনার চিকিৎসা এবং সবচে' বড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত কেন? আমাদের তো এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বরং গর্ব করা দরকার এবং এই দেউলে পৃথিবীর জন্য করুনা অনুভব করা দরকার আমাদের এই অর্থে নিজেরদের দাতা এবং দুনিয়াটাকে নগন্য ও তুচ্ছ মনে করা উচিত। ব্যস!

প্রশ্ন : বহুত বহুত শুকরিয়া ডা. সফিয়্যা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখুন।

উত্তর : আপনাকেও ধন্যবাদ বোন আসমা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাউযাইন
মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

মুহাম্মাদ লিয়াকত (চৌবল সিং)-এর সাক্ষাৎকার

আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য সকলের কাছে দুআ চাই। আল্লাহ তায়ালা যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যখন হেদায়েতের ফয়সালা হয় তখন এই পৃথিবীতে কোনো না কোনো উপলক্ষ এমনিতেই বেরিয়ে আসে। তবে তার জন্যে সাধনা করা চাই।

আহমদ আওয়াহ : আসাসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ লিয়াকত : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : লিয়াকত সাহেব! ভালোই হলো আপনি এসেছেন। আসলে আরমুগানের পক্ষ থেকে আপনার সাথে কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল।

উত্তর : ফুলাত তো বরাবরই আসা হয়। কিন্তু আপনার আব্বার সাথে দেখা করা ভারি কঠিন হয়ে পড়েছে। যখনই আসি শুনি, তিনি সফরে আছেন। একদিন ইফতেখার ভাইকে ফোনে জিজ্ঞেস করলাম– মাওলানা সাহেবকে কোথায় পাবো? তিনি এখন কোথায় থাকেন? ভাই ইফতখার বললেন– ৬৩০১-এ থাকেন। অর্থাৎ, গাড়িতেই থাকেন। যাই হোক, ভাই আহমদ! এবার বলো আমাকে কী বলতে হবে?

প্রশ্ন : অনুগ্রহ পূর্বক প্রথমেই আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলুন।

উত্তর : ভাই আহমদ! আমি অতটা শিক্ষিত মানুষ নই। তাছাড়া দেশি ভাষায় ভালো করে কথাও বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আসলে আমি আপনার কাছে আপনার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় জানতে চাচ্ছি। প্রথমেই আপনার পরিবার ও বংশ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমার নাম মুহাম্মদ লিয়াকত। কয়েক বছর আগেও আমার না ছিল চৌবল সিং। মুজাফফরনগর জেলার তফসিল জাঁউস-এর একটি গ্রামের অধিবাসী। বংশগতভাবে আম গোজার বংশের মানুষ। আমরা গৃহস্থ লোক। আল্লাহর মেহেরবানী আমরা পাঁচ ভাই। চার ভাই পুরো পরিবারসহ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমার বড় ভাই গ্রামের বড় চৌধুরী। কংগ্রেসের আঞ্চলিক লিডার। তিনি এখনও হিন্দু। আমি দ্বিতীয় আমার ছোট ভাই যার প্রথম নাম ছিল রাম সিং এখন তার নাম মুহাম্মদ রিয়াসত। তার ছোট যার পূর্ব নাম ছিল প্রকাশ চাঁদ। তার নাম এখন ফিরাসত। আর একেবারে ছোট ভাই যার নাম ছিল রাজেন্দ্র সিং তার বর্তমান

নাম বাশারত। আমি দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের জনক। আমার ভাই রিয়াসতের দুই ছেলে এক মেয়ে। ফিরাসতের তিন ছেলে আর বাশারতের দুই ছেলে এবং চার মেয়ে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী এ পর্যন্ত আমাদের পরিবারের চব্বিশজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের সন্তানরা সবাই পড়াশোনা করছে। আমাদের চার ভাইয়ের পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ে এখন কুরআন হিফজ করছে।

প্রশ্ন : কিভাবে মুসলমান হলেন? একটু বিস্তারিত বলুন।

উত্তর : ভাই, এটা আসলে আমার মালিকের মেহেরবানী। তাই আমি মুসলমান হয়েছি।

প্রশ্ন : শিবাজির মূর্তি কিভাবে মুসলমান হতে বললো? এমন কথাতো শুনিনি।

উত্তর : এখন থেকে প্রায় নয় বছর আগের ঘটনা। সে বছর আমাদের আম খুব ভালো হয়েছিল। ফসল যেমন ভালো হয়েছিল, দামও ছিল ভালো। আমরা আমাদের পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে নতুন বাড়ি বানালাম। নতুন বাড়িতে ছোট একটি কক্ষ পূঁজার জন্য নির্মাণ করলাম। টাইলস দিয়ে চমৎকার করে সাজালাম। বলতে গেলে ঘরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির তৈরি করলাম। এই মন্দিরে স্থাপন করার উদ্দেশ্য শিবাজির মূর্তি কিনতে গেলাম মুজাফফরনগর এবং পাঁচ হাজার রুপিতে একটি মূল্যবান মূর্তি কিনলাম। দোকানী মূর্তিটিকে ভালো কাগজ দিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট করে দিলো। মুজাফফর নগর থেকে বাড়ি ফিরছি। শিবচকের আগে একটি মসজিদ আছে। আমি যখন মসজিদের সামনে দিয়ে আসছি, হঠাৎ করে আমার মনে হলো, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমার মনে হেদায়াতের বাতাস বইতে শুরু করলো। ভাবতে লাগলাম, যদি এই মূর্তিটি আমার হাত থেকে পড়ে যায়। তাহলে নিশ্চিত ভেঙ্গে যাবে। আচ্ছা যে নিজেই হাত থেকে পড়ে গেলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, সেই ভগবান আমাকে কী উপকার করতে পারে? আমি একথা যখন ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে কিভাবে যেন আমার হাত থেকে মূর্তিটি ছুটে পড়ে গেলো। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মূর্তিটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। আমার মনে, আমার চিন্তায় হঠাৎ ঝড় বইতে লাগলো। আমি আমাকেই শুধাতে লাগলাম এরচেয়ে তো বরং মুসলমানদের ধর্মই ভালো। তাদের খোদা পড়েও না, ভাঙ্গেও না, চূর্ণও হয় না। অথচ সব জায়গায়ই আছে। একজনের পূজা

করো। তারপর আরামে বসে থাকো।

আসলে আমি কেন যেন অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। আমার সামনেই মসজিদ, রাস্তা থেকে মসজিদটি বেশ উঁচু। সিঁড়ি বেয়ে আমি মসজিদে উঠে গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি কান্ধালার হযরতদের মুরীদ। কালো কাপড় পরিহিত। তাকে গিয়ে বললাম, মিয়াজী! আমাকে মুসলমান বানিয়ে দাও। সে বিব্রতবোধ করলো। আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম, সন্দেহ করো না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বুঝেশুনেই মুসলমান হওয়ার জন্য এসেছি। মুসলমানদের ধর্মই সাচ্চা ধর্ম। তাদের খোদা ভাঙ্গেও না, ফাটেও না। সদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সদা সকলকে দেখেন। আমাকে মুসলমান করে নাও। আমার আবেগে সেও প্রভাবিত হলো। আমাকে কালেমা পড়ালো। নাম রাখলো মুহাম্মদ লিয়াকত। কালেমা পড়ার পর এবং ইসলাম ধর্মে প্রবেশের পর আমি পরম শান্তি অনুভব করি। আমি আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরে আসি। ফিরে আসার সাথে সাথে সকলেই আমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, মূর্তি কোথায়? মূর্তি আনোনি কেন? বললাম, সবই বলবো।

সেই রাতেই সর্বপ্রথম আমি আমার স্ত্রীকে পুরো কাহিনী বলি। আমার ঘটনা শুনে আমার স্ত্রী খুবই আনন্দিত হলো। বললো, দীর্ঘদিন ধরে আমি নিজেই তো মুসলমান হবো ভাবছি। মুসলমান মেয়েদের নামায পড়তে দেখি, তখন খুব ভালো লাগে। শায়েস্তা নামের একটি মেয়ে আমাকে তাবলীগের কিতাব পড়ে শোনাতো। সে বছর আমি তিন শুক্রবার রোযাও রেখেছি। যা হোক তার কথায় আমি বেশ স্বস্তিবোধ করলাম। পরের শুক্রবারে তাকে নিয়ে গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। ইমাম সাহেব আমার স্ত্রীকে এবং আমার সন্তানদের কালেমা পড়িয়ে দিলেন। আমার স্ত্রীর নাম রাখলেন ফাতেমা। আমার সন্তানদের নাম রাখলেন আয়েশা, জায়নাব, মুহম্মদ, হামেদ এবং মাহমুদ আহমদ।

প্রশ্ন : তারপর আপনার অন্য ভাইয়েরা কিভাবে মুসলমান হলেন?

উত্তর : আমার তিন ভাই এবং তাদের পরিবার তোমার আব্বার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যখন আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানেরা মুসলমান হলো তখন আমি আমার সবচে' ছোট ভাই রাজেন্দ্রকে ডেকে পরম ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি বলি। সে তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে। তার স্ত্রী মুসলমান হওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায়। এদিকে

আমাদের গ্রামের আগের ইমাম সাহেব চলে গেছেন। সেখানে একজন নুতন ইমাম এসেছেন। তাকে আবদার করার পর তিনি কালেমা পড়াতে অপারগতা প্রকাশ করেন। আসলে বেচারা ভয় পেয়েছিল। তখন আমি আমার গ্রামের অন্য মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা করি। তারা আমাকে ফুলাত যাওয়ার পরামর্শ দেয়। দুপুরে ফুলাতে এসে যখন পৌঁছাই তখন মাওলানা কালিম সাহেব সফরের উদ্দেশ্যে গাড়িতে ওঠে বসেছেন। আমি গাড়িতে গিয়েই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। আমার ভাই এবং ভাবীকে পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি গাড়ি থেকে নেমে আসেন। কালেমা পড়ান, আইনি কাগজপত্র কিভাবে তৈরী করতে হবে এ বিষয়ে পরামর্শ দেন। নিজে উপস্থিত থেকে আমাদের খানাপিনা করান। চা পান করান। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হন। আমাদের পড়ার জন্যে কিছু হিন্দি বইপত্র দেন। অন্য ভাইদের কিভাবে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে বলেন।

আমরা ওয়াদা করি, তাদের অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত দেবো। ঘরে ফিরে আমি বইগুলো পড়তে শুরু করি। তারপর পরিবারের সকলকে পড়ে শোনাই। বিশেষ করে 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি মাওলানা সাহেব অন্তর দিয়ে লিখেছেন। পুস্তিকার প্রতিটি কথাই যেন হৃদয়ে করাঘাত করতে থাকে। এটা পড়ার পর আমি ইসলামের মূল্য বুঝতে পারি। তারপর দুই বছর চেষ্টা চালিয়ে যাই। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে আমার দুই ভাই এবং তাদের সন্তানদেরও ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে দেন। আমি তাদের ফুলাত নিয়ে আসি। তারা এখানে এসেই কালেমা পাঠ করে।

প্রশ্ন : পরিবারের লোকেরা আপনার কথা রেখেছে? বিশেষ করে মেয়েদের মানানো তো খুবই কঠিন।

উত্তর : মূলত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েতের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। দেখ, শিবাজির মূর্তিই তো আমাকে বলে দিল– আমি পূজার উপযুক্ত নই। ইসলামই সত্য ধর্ম। মূর্তিটি যখন ভেঙ্গে গেলো। তখন তো আমি খৃস্টান হয়ে যেতে পারতাম। বস্তুত মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে তখন আমার অন্তরে অন্য কোনো চিন্তাই উদিত হয়নি। আসলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তখন আমার হেদায়েতের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। এটা তাঁর করুণা। প্রকাশের স্ত্রী মায়া তো শুরুতে প্রচন্ড বিরোধিতা করেছে। আমাদের একথা বলেও শাসিয়েছে যে, আমি পুরো এলাকা জ্বালিয়ে দেবো। আমরা তার পা

পর্যন্ত ধরেছি। রাতের পর রাত দুআ করেছি। আল্লাহ তায়ালাই তার অন্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি যখন জানাজানি হলো তখন হিন্দুরা বিরোধিতা করেনি? বিশেষ করে খান্দানের লোকেরা আপনার প্রতি কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করেনি?

উত্তর : আসলে আমি এটাই চাচ্ছিলাম। আমার ছোট ভাই রাজেন্দ্র যখন মুসলমান হলো, তখন বিষয়টি আমার বড় ভাই নেতাজি জানতে পারলেন। জানার পর তিনি অনেকটা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। লাঠি হাতে আমাদের দুই ভাইকে খুব পিটালেন। আমরা মার খাচ্ছিলাম আর তাকে বিনয়ের সাথে খোশামুদ করছিলাম যে, আগে ইসলাম সম্পর্কে জানুন, তারপর আমাদের মারুন। কিন্তু আমাদের কোনো কথাই তিনি শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের চাপে ফেলার জন্যে এলাকার থানাকে দুই হাজার রুপি দেন। টের পেয়ে আমি পালিয়ে ফুলাত চলে আসি। আমার ছোট ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তাকে খুব মারধর করে। কিন্তু আমার ছোট ভাই মুহাম্মদ বাশারাত কোনোভাবেই ইসলাম ছাড়তে রাজি নয়। পুলিশ তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে অবশেষে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখে। দুই জায়গায় পায়ের হাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। দুই দিন পর কোনোভাবে অনুসন্ধান করে রাতের অন্ধকারে তাকে আমি বের করে আনি। মুজাফফরনগরে ডাক্তার খান সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। প্লাস্টার করাই। মাওলানা কালিম সাহেবের স্লিপের কারণে ডাক্তার খান সাহেব আমাদের কাছ থেকে পয়সা পর্যন্ত নেননি। বরং আমাদের খানাপিনারও ব্যবস্থা করেছেন। তারপর আমরা আইনি কাগজপত্র তৈরি করি। পরামর্শ করে এসপি এবং কালেক্টর বরাবর আবেদন করি। তখন মুজাফফারনগরে জয়েন সাহেব নামে একজন এসপি ছিলেন। বড় ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি মুজাফফারনগর থেকে আমাদের থানায় একজন দারোগা পাঠিয়ে জানিয়ে দেন– আমাদের বড় ভাই কিংবা আমাদের এলাকার কেউ যেন আমাদের সাথে কোনো ধরনের খারাপ আচরণ না করে। তার সতর্ক বাণীর উসিলায় আমরা বিপদ থেকে বেঁচে যাই।

প্রশ্ন : এখন আপনার বড় ভাইয়ের কী অবস্থা বলুন?

উত্তর : আমার বড় ভাই মূলত নিঃসন্তান। তিনি আমার ছোট ভাই রাম সিং এখন মুহাম্মদ রিয়াসত এর ছোট ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। এই

ঘটনার পর আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেই, আমরা আমাদের ছেলেকে তার কাছ থেকে নিয়ে আসবো। আমরা তাকে নিয়ে আসি এবং পরিষ্কার নিষেধ করে দিই তুমি নেতাজির ঘরে যেতে পারবে না। বড় ভাই তখন খুবই আদর করতেন। আদর করে তাকে সব সময় গুড্ডু ডাকতেন। তার নাম ছিল রামপাল। এখন মুহাম্মদ বেলাল। আমরা তাকে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এনে মাদরাসায় ভর্তি করে দিই। একদিন বড় ভাই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেট ব্যথা। ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। ব্যাথা কমলো না। আমি মুজাফফরনগরে তাবলীগে গিয়েছিলাম। সংবাদ পেয়ে গুড্ডু তাকে দেখতে যায়। বড় ভাই তখন ব্যাথায় যন্ত্রণায় কাঁদতেন। গুড্ডুকে দেখে জড়িয়ে ধরেন এবং খুব কাঁদেন। গুড্ডু তখন তাকে বলে, ডেডি! তুমি লিয়াকত চাচাকে ডেকে দুআ করাও। গুড্ডু আগে থেকেই তাকে ডেডি ডাকতো। তার কথায় বড় ভাই খুবই নারাজ হন।

এক সপ্তাহ পর্যন্ত মুজাফফরনগর এবং বিভিন্ন ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু ব্যাথা যেই সেই। ঔষুধ খেলে সামান্য সময় ভালো থাকে। তারপর আবার ব্যাথা। বড় ভাই যন্ত্রণায় কঁকাতে থাকেন। গুড্ডু বার বার তাকে একই কথা বলতে থাকে লিয়াকত চাচাকে দিয়ে দুআ করাও। একদিন এমনও বলে ডেডি তুমি রিয়াসত চাচার কাছে মাফ চাও। দশ দিন তাবলীগে কাটিয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসি। এসে জানতে পারি, ভাই সাহেব দুই বার আমার ঘরে এসেছিলেন। ভাবতে থাকি, এখনই তাকে দেখতে যাওয়া উচিত। এটা আমার ধর্মীয় কর্তব্য। এরই মাঝে তিনি আমার ঘরে চলে আসেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমরা সকলেই তখন কাঁদতে শুরু করি। আমি সুযোগ বুঝে বলে ফেলি ভাইয়া! এই সামান্য যন্ত্রণা সইতে পারছেন না– অনন্তকাল নরকের যন্ত্রণা কিভাবে সইবেন? আপনি মুসলমান হয়ে যান। তিনি বললেন– ঠিক আছে, আগে ভালো হই; তারপর চিন্তা করবো। তুমি তোমার খোদার কাছে প্রার্থনা করো আমাকে যেন ভালো করে দেন। ভাই সাহেব চলে গেলেন। আমি দুই রাকাত নামায পড়লাম। অন্তর থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করলাম। করুণাময় আল্লাহ আমার নাম মনে রাখলেন। সন্ধ্যার মধ্যে আমার ভাই সাহেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখনও পর্যন্ত সুস্থ আছেন।

প্রশ্ন: তারপর আর তাকে দাওয়াত দেননি?

উত্তর : হ্যাঁ, দাওয়াত দিয়েছি। ওয়াদার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। এ পর্যন্ত বলেছি, যে আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করেছেন তিনি চাইলে আবার অসুস্থও করে দিতে পারেন। কিন্তু সত্যকথা হলো, এখনও পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তার হেদায়েতের ফয়সালা হয়নি। হেদায়েত তো উপর থেকে আসে। তারপরও ভাই সাহেব এখন আমাদের সাথে ভালো আচরণ করেন। মনে হয়, আমাদের অসন্তুষ্ট করতেও ভয় পান। আরেকটি বড় কথা হলো, আমাদের সকল জায়গা জমি এ পর্যন্ত এক সাথেই ছিল। আর সবই ছিল তার কব্জায়। গত বছর আমাদের চার ভাইয়ের জমিজমা আলাদা করে দিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনি আপনার পরিবারের লোকদের দীনি শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। আমাদের চার ভাইয়ের পরিবারেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আছে। আমাদের পাঁচ ছেলে এবং তিন কন্যা এখন কুরআন শরীফ হেফয করছে। আমাদের স্বপ্ন, তাদের সকলকেই আলেম এবং দা'য়ী বানাবো। বেলাল খুবই মেধাবী। আত্মীয়-স্বজনকে নির্বিঘ্নে মুসলমান হওয়ার কথা বলে। ঘরে নিয়মিত তালিম হচ্ছে। আমরা চার ভাই পালাক্রমে একের পর এক জামাতে যাই।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার কেমন লেগেছে? যখন অতীত দিনের কথা মনে হয়, তখনই বা কেমন লাগে?

উত্তর : আমাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আসলে আল্লাহ তায়ালার একান্ত অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কৃপা না হলে স্বয়ং শিবাজির মূর্তি আমাকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিত না। যখন ভাবি, কতটা সহজে আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার এ বিশাল খান্দানকে হেদায়েত দান করেছেন তখন কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ঝুঁকে পড়ে। আমি তো মাঝে মধ্যে চলতি পথে সেজদায় পড়ে যাই। আল্লাহ না করুন- যদি তিনি আমাকে হেদায়েত না দিতেন, আমাদের প্রতি যদি তাঁর করুণা না হতো, আমরা যদি কাফের এবং হিন্দু অবস্থায় মারা যেতাম তাহলে তো আমাদের করার কিছু ছিল না। আমাদের প্রতি আমাদের করুণাময়ের এ এক অসামান্য অনুগ্রহ। (চোখের পানি ছেড়ে) কোথায় আমাদের মতো অপবিত্র মানুষ, আর কোথায় ঈমানের মতো মহান ধন! আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন: আপনার এবং আপনার পরিবার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের জীবনের প্রতিটি পল আল্লাহ তায়ালার রহমতের নিদর্শন। প্রতিদিনই আল্লাহর রহমতের কোনো না কোনো কারিশমা দেখতে পাই। আসলে কেবলমাত্র আমাদের জীবন কেনো পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনে তার প্রতিটি পলে আল্লাহ তায়ালার কোনো না কোনো রহমত ও অনুগ্রহ বিকশিত হয়। তবে সবার দেখার মতো চোখ থাকে না। মানুষ যদি এক আল্লাহর জন্যে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারে, কেউ যদি এক আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, জীবনের সকল প্রয়োজন সকল সংকটে কেবল তাঁর কাছেই হাত পাতে, হিম্মত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের পথে চলতে চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল প্রার্থনাই পূরণ করা হয়।

প্রশ্ন : আপনি বরাবরই আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করে থাকেন। আপনার অধিকাংশ দুআই কবুল হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে কোনো ঘটনা আমাদের শোনান।

উত্তর : প্রতিটি মানুষেরই উচিত আল্লাহর তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। কিছু চাওয়ার থাকলে কেবল তাঁরই কাছে চাওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা তো সকলের দুআই কবুল করেন। এ পর্যন্ত আমার কোনো দুআই তিনি ফিরিয়ে দেননি। আমার মনে হয়, আমার প্রতিটি দিনই আল্লাহর তায়ালার কোনো না কোনো রহমত নিয়ে হাজির হয়। আমি প্রতিদিন সকাল থেকে অপেক্ষায় থাকি– দেখি আজ কোন্ রহমতের মুখোমুখি হই।

দুই দিন হলো জামাত থেকে চিল্লা শেষ করে ফিরেছি। জামাতে যাওয়ার আগে আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। তাকে অপারেশন করাতে হয়েছে। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার রুপি খরচ হয়েছে। সাথে আরও কিছু সমস্যা ছিল। এলাকায় তখন জোড় চলছিল। তাবলীগি সাথীরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়– এবার আপনার জামাতে যাওয়ার পালা। সুযোগ নেই বলে আমি আমার অপারগতার কথা বলি। জাসউ-এর এক বন্ধু জোর করে আমার নাম লিখিয়ে দেয়। বলে, খরচের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। খরচের দায়িত্ব আমার। হয়তো নওমুসলিম মনে করেই আমাকে একথা বলেছে। নওমুসলিম মনে করে যখনই কেউ আমার সাথে সহযোগিতার আচরণ করে, তখন কেন যেনো আমি খুব আহত হই। আমরা তো অন্যের সামনে ভিখারির মতো হাত পাতার জন্য মুসলমান হইনি। তাছাড়া এটা ইসলামের শিক্ষাও নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আজ পর্যন্ত এই ধরনের কোনো সাহায্য আমি নিজেও কবুল করিনি। আমার ভাই বেরাদরকেও কবুল করতে দিইনি। সংকটে পড়েছি ধৈর্য ধরেছি। শুরুর দিকে

অর্থসংকট গেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অবিচল থাকার শক্তি দিয়েছেন। আমার ভাইদের সাহস দান করেছেন। যখন নাম লিখিয়েই দিল তখন ভাবলাম, আচ্ছা দেখি। খরচের ব্যবস্থা হলে চলে যাবো। ব্যবস্থা না হলে নিষেধ করে দেবো। কারও কাছ থেকে ধার করবো না। জামাত বের হওয়ার দিন পর্যন্ত আমার কাছে তেমন কোনো টাকা পয়সা নেই। পকেটে মাত্র দুইশ রুপি। সঙ্গীদের পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ি। তাদের দাবির মুখে নাও করতে পারছি না। মনে মনে ভাবলাম আমি তো কারও কাছে চাইনি। তারা নিজ থেকেই দিতে চাচ্ছে। সুতরাং সমস্যা কী! জামাতে চলে গেলাম। পুরো চিল্লায় পনেরশ রুপি খরচ হওয়ার কথা। মারকায থেকে জামাত গুজরাটের পালিনপুর হালকায় গেল।

সাথীরা খরচের টাকা জমা করছিল। আমার পক্ষ থেকে কেউ কেউ টাকা দিতে চাইলো। কিন্তু কেন যেন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মন রাজি হলো না। আমি না করে দিলাম। বললাম, ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট খরচ আমিই দেবো। জামাত পালনপুরে পৌঁছালো। প্রতিদিন খরচের পয়সা দিতে হবে। আমি দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়লাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করলাম। রাতের বেলা স্বপ্নে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– ভয় করো না। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে লজ্জিত করবেন না। পরের দিন জোহর নামাযের পর আমি তো বিস্ময়ে অবাক। দেখি, আমাদের বড় ভাই অমুসলিম নেতাজি পালনপুর মারকাযের এক সঙ্গীকে নিয়ে আমাকে খুঁজছেন। খুঁজতে খুঁজতে আমার সামনে এসে উপস্থিত। আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে বললেন– দুই দিন আগে দেখলাম- তুমি খুব কান্নাকাটি করছো। ভাবলাম, তোমার কাছে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। আমি তোমার ঘরে গেলাম। জানতে পারলাম তুমি জামাতে গেছো।

মুন্সী রিয়াজকে নিয়ে দিল্লি নেজামুদ্দীন মারকাযে গেলাম। খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারলাম, তুমি পালনপুর আছো। আহমদাবাদ মেইলে পালনপুর চলে এলাম। এ কথা বলে তিনি আমার হাতে দুই হাজার রুপি তুলে দিলেন। বললেন, আমার কাছে তোমার দশ হাজার রুপি পাওনা ছিল। এই নাও দুই হাজার। বাড়িতে এসে বাকি আট হাজার নিয়ে নিও। একদিন তিনি আমাদের সাথে থাকলেন। পরের দিন বাড়ি চলে গেলেন। আমি বার বার আল্লাহ

তায়ালার কৃতজ্ঞতায় শুকরিয়ার নামায পড়তে লাগলাম। আসলে মুসলমান হওয়ার আগে আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে দশ হাজার রুপি পাওনা ছিলাম। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন এই রুপি তিনি আমাকে দিবেন না। অথচ আজ নিজেই তিনি কত পথ খুঁজে আমার সামনে সেই পাওনা রুপি নিয়ে উপস্থিত। জীবনব্যাপী এমন কত ঘটনা ছড়িয়ে আছে!

প্রশ্ন: লিয়াকত ভাই সত্যিই আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুণা অসামান্য। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার সাথে আপনার সম্পর্কও গভীর। আমাদের জন্যেও দুআ করুন।

উত্তর : মৌলবী আহমদ ভাই! আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তো সকলের প্রতিই হচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। আমাদের প্রতি আল্লাহর তায়ালার বিশেষ করুণা হলো তিনি তাঁর করুণা উপলব্ধি করার শক্তি আমাদের দান করেছেন। তোমার জন্য দুআ করবো না কেন? আমি তো তোমাদের পুরো বংশের জন্যেই দুআ করি। মাওলানা কালিম সাহেব আমাদের রাহবার। আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ কম নয়। আল্লাহ তায়ালা উভয় জাহানে তোমাদের ভালো রাখুন। শান্তিতে রাখুন।

প্রশ্ন: মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর : কথা তো একটিই। আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য সকলের কাছে দুআ চাই। আল্লাহ তায়ালা যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যখন হেদায়েতের ফয়সালা হয় তখন এই পৃথিবীতে কোনো না কোনো উপলক্ষ এমনিতেই বেরিয়ে আসে। তবে তার জন্যে সাধনা করা চাই।

প্রশ্ন : ধন্যবাদ আপনাকে ।

উত্তর : আপনাকেও অনেক কনেক ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **মার্চ–** ২০০৪

মুহতারামা খাইরুন নিসা (শালিনী দেবী)-এর সাক্ষাৎকার

দুটি কথাই বলতে চাই। আমরা যে সকল মুসলমান ভাইবোন পৈত্রিকসূত্রে ইসলাম লাভ করেছি– তাদের মধ্যে এই পেয়ারা দ্বীনের মূল্য নেই। আফসোস হয় দ্বীনকে তারা বোঝা মনে করে। বিশেষত নামায পর্দা ইত্যাদিকে। আপনারা এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। আপন রব ও রাসূলের প্রতি ইয়াকীন রাখুন। ঈমান গ্রহণ করে এর প্রতিফল প্রত্যক্ষ করুন। এরা যখন ঈমানের গুরুত্বই অনুধাবন করে না তখন স্বভাবতই কেউ ঈমান নিয়ে মরুক আর ঈমানবিহিন দোযখে চলে যাক এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের গোটা মানবজাতিকে দোযখ থেকে বাঁচানোর ফিকির করা দরকার।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম।

খাইরুন নিসা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আপনার নাম?

উত্তর : খাইরুন নিসা।

প্রশ্ন : আপনি কোথাকার অধিবাসী। কিছুটা পরিচয় দিন।

উত্তর : আমি থানা ভবনের নিকটস্থ এক গ্রামে থাকি। আমার পুরনো নাম শালিনী দেবী। পিতার নাম চৌধুরী বলী সিং। পানিপথ জেলার হরিয়ানার এক গ্রামে করপলিসিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। প্রথম স্বীর সঙ্গে আমি ১৪ বছর সংসার করেছি। আট বছর পূর্বে আমার আল্লাহ আমাকে ইসলাম দানে ধন্য করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমার পাঁচটি সন্তান। এরা সবাই মুসলমান হয়ে আমার সঙ্গে আছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : ছোটবেলা থেকেই নিজ হাতে গড়া মূর্তির পূজাপাট আমার ভালো লাগতো না। তরুলতা, ফুল-ফসল আর চাঁদ-তারা দেখে ভাবতাম, এমন সুন্দর মনোরম সৃষ্টির স্রষ্টা না জানি কত সুন্দর মনোহর। আমর শ্বশুর বাড়ির গ্রামে ইউপির অনেক মুসলমান কাপড় ইত্যাদির ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগমন করতো। তারা আমাকে এক মালিকের পূঁজা এবং আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলতো। তারা চলে

যাওয়ার পর আমার ছোট ছোট সন্তানেরা আমাকে বলতো মা! আমরা সবাই মুসলমান হয়ে গেলে কতই না ভালো হতো। কিছুদিন পর আমি মুসলমান হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। গঙ্গুহ এলাকার দুজন মুসলমানের সঙ্গে ওখানে গিয়ে সন্তানসমেত মুসলমান হয়ে যাই।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার শ্বশুরালয়ে ও বাপের বাড়ির লোকজনের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়নি?

উত্তর : ইসলামের নাম শুনেই তারা কিয়ামত কান্ড ঘটিয়ে ফেলে। আমার ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সীমাহীন নির্যাতন করে। আমাদের সবাইকে প্রাণে মারার জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টাই তারা করে। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর মালিক আমাদের হেফাজত করতে থাকেন। আল্লাহর তাআলার ওপর আমার ভরসা ছিল। প্রতি পদে আমি জায়নামাযে গিয়ে তার কাছে ফরিয়াদ জানাতাম। আল্লাহ তাআলাও আমাকে পদে পদে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : ওদের বিরোধিতা আর আল্লাহ তাআলার সাহায্যের কিছু কথা শোনান?

উত্তর : কোন মুখে আমি আমার মালিকের শোকর আদায় করবো? আমার পরিবার এবং আমার শ্বশুরালয় (যারা বড় মাপের জমিদার ও প্রভাবশালী ছিল) আমাকে খতম করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমে দু-চার দিন তারা বোঝাতে থাকে। যখন তাদেরকে ফয়সালা শুনিয়ে দেই যে, আমি মরে যেতে পারি কিন্তু ইসলাম ছাড়তে পারবো না– তারা আমার ওপর রুঢ় আচরণ শুরু করে। আমার পা বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। কিন্তু তাদের লাঠি না জানি কোথায় গিয়ে পড়তো। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বলা যায় বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরে এলে দেখি পাশে পুলিশ দাঁড়ানো। আশে পাশে অন্য কেউ নেই। পরে জেনেছি সেই মারধোরের সময় আমার চাচা আর জ্যাঠা নিজেদের লাঠির আঘাতেই হাত ভেঙ্গে পঙ্গু হয়েছে।

তারা আমার সন্তানদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমার বড় ছেলে উসমানকে তারা বাড়ি নিয়ে গিয়ে নির্দয়ের মতো পেটায়। দু'দিন পর পালিয়ে গিয়ে সে প্রাণ বাঁচায়। থানাভবনে আমাদের এক মুসলমান বান্ধবীর বাড়ি থেকে তাকে আবারও পাঁকড়াও করা হয়। তাকে মারার জন্য আমার পরিবার গুন্ডাদের নিয়ে আসে। তেরো বছরের বাচ্চাকে আট দশজন ছুরি চাকু নিয়ে মারতে থাকে। ছেলেটি ওদের ছুরি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, জান

বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালায়। কিভাবে যেন তাদের একজনের পেটে ছুরি ঢুকে যায় এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ইতোমধ্যে একটি বাস এসে পড়ে। বাস থামিয়ে যাত্রীরা নেমে পড়লে খুনীরা দ্রুত সটকে পড়ে। দুটি মানুষ সেখানে পড়ে ছিল। একজনের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত, আর আপরজন মৃত। পুলিশ এসে আহত ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলখানায় তাকে অমানুষিকভাবে পেটানো হয়। সে পরিষ্কার বলে দেয়, ছুরি ছিনিয়ে নেয়ার সময় আমার হাত থেকে তার পেটে ঢুকে গেছে। তাকে আগ্রা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাতের বেলা আমি জায়নামাযে পড়ে থাকতাম। আমি নিজের নিরাপত্তার খাতিরে তালেব নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করি। মহিলারা আমাকে ভয় দেখাতো। মুসলমান মহিলারাও আমাকে শুনিয়ে দিতো, বিবাহ করেছো না! তোমার ছেলে আর এখন তোমার সঙ্গে থাকবে না। তোমার ছেলেদের আর কেউ জামিন করে আনবে না।

আমার ছেলে উসমান আগ্রা জেলে নামায পড়তো, দুআ করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখে, আসমান থেকে একটি পর্দা নামল। লোকেরা বলছিল, বিবি ফাতেমা আসমান থেকে উসমানের জামিন করাতে আসছেন। এক সপ্তাহ পর আগ্রার এক বিত্তবান মহিলা উসমানকে জামিন করিয়ে দেয়। জামিন পাওয়ার পর দ্বীন শেখার জন্য আমি তাকে জামাআতে পাঠিয়ে দেই। আমি বাকী বাচ্চা চারটির ভবিষ্যত-চিন্তা করে খুব কাঁদতাম।

বড় মেয়েটি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো। তাকে নামায পড়তে দেখে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে জ্বালাতে চেয়েছিল কিন্তু আমার আল্লাহ রক্ষা করেছেন। চারবার দেয়াশলাই জ্বালানো হয়েছিল কিন্তু তার একটি পশমও পুড়েনি। আমার দেবররা পরামর্শ করে ক্ষীরের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমার বড় দুই মেয়েকে খাইয়েছিল কিন্তু তাদের কিছুই হয়নি। আমার জ্যাঠাইমা মনে করেছিলেন বিষ মিশানোই হয়নি। তিনি ক্ষীর খেয়ে সাথে সাথেই মারা যান।

উসমান জামাআত থেকে ফিরে আসে। সে আর আমি পানিপথের এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাদের দেখে ঘিরে ধরে। তারা গুলি চালায়! গুলিগুলো শাঁ শাঁ করে এদিক সেদিক চলে যায়। তারা তেইশটি গুলি করে। তেইশ নম্বর গুলিটি তাদের একজনের শরীরে লেগে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

আমি আমার আল্লাহর কাছে আমার সন্তানদের ফিরে পেতে দু'আ করতাম। একদিন মাওলানা গাওস আলী শাহ মসজিদে আসলেন। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের ঘটনা শোনালেন, আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের ঘর থেকে তাঁকে কীভাবে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম– আয় আল্লাহ! যখন তুমি মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তাহলে আমার সন্তানদের কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ না। আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, আস্থা পোষণ করেছি। আর কার কাছে আমি ফরিয়াদ নিয়ে যাবো। তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি ফরিয়াদ জানাবো না। সারা রাত সিজদায় পড়ে রইলাম। চোখ লেগে এসেছিল। শুনি কে যেন বলছে আল্লাহর বান্দী খুশি হয়ে যাও। তোমার সন্তান তোমার সঙ্গেই থাকবে।

সকালে ছেলে উসমান পানিপথ থেকে কর্নাল যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে যায়। সে দেখে, তার তিন বোন ছোট ভাইটিকে নিয়ে বাস থেকে নামছে। চার ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে সে খুশী খুশী বাড়ি আসে। পরের রাতেও আমি রাতভর সিজদায় পড়ে থাকি। মালিক আমার! তুমি কত ভালো! কত প্রিয়! দুঃখিনী বান্দীর আবদার শোনামাত্রই তার আদরের সন্তানদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে পাঁচ-ছয়বারই এমন হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাকে আর আমার বাচ্চাদের খোঁজ করতো এমনকি আমরা তাদের দেখতাম কিন্তু মনে হতো তারা যেন অন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিটি বাঁকেই আমার মাওলা আমাকে ভরসা দিয়েছেন। এমন মালিকের আমি কেমন মুখে গুণ গাইবো।

প্রশ্ন : আপনি বাচ্চাদের তরবিয়তের কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর : বড় ছেলে উসমান কুরআন পড়ে নিয়েছে। প্রতি বছর জামাতে যায়। বর্তমানে কাজ করছে। আমি দম করে কাজে পাঠিয়ে দেই এবং মালিকের হেফাজতের ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকি।

বড় দুই মেয়ের বিবাহ আল্লাহ তাআলা করিয়ে দিয়েছেন। জামাই দুটি খুবই দীনদার ও সৎ। আমার মেয়ে খুব পাক্কা মুসলমান। তাদের বিয়ের সময় আমার ছেলে আগ্রা জেলে ছিল। আল্লাহ তাআলা জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। সে তার বোনদের হাসিমুখে তুলে দিতে পেরেছে। ছোট মেয়ে আর ছোট ছেলেটি মাদরাসায় পড়ছে।

প্রশ্ন : আপনি তো মাশাআল্লাহ পর্দায় থাকেন। নামাযের খুব পাবন্দী করেন। এতে আপনার কেমন লাগে?

উত্তর : ঈমান গ্রহণের পর আমি পদে পদে আমার আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি। নামাযে আমি খুবই স্বাদ অনুভব করি। ছয় বছর ধরে আমার তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত আউয়াবিন বাদ পড়েনি। আমার এখানে কী কৃতিত্ব, আমার মালিকই আমাকে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। কোনো প্রয়োজন হলেই আমি জায়নামাযে চলে যেতাম। মালিকের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে নিশ্চিত হয়ে যেতাম যে, এখন আমার প্রয়োজন সমাধা হবেই হবে।

পর্দাকে আমি আমার মালিকের নির্দেশ মনে করি। পর্দাবস্থায় আমার মনে হয় কোনো দূর্গে অবস্থান করছি। আর আমার মালিক আমাকে এই দূর্গে দেখে খুশী হচ্ছেন। আমার তো আশ্চর্য লাগে যে, কৃতিত্ব, গোটা পানিপথে স্বল্পসংখ্যক মহিলাই বোরখা পরে। অনেকটা না পরারই মতো। জানিনা আমরা কেমন মুসলমান। না আল্লাহর ওপর ভরসা আছে, আর না আস্থা। আমার বিশ্বাস, মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান-একীন দৃঢ় করে নেয় তাহলে চাঁদ-তারাও তাদের অনুগত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আপনার মেয়েরাও পর্দা করে?

উত্তর : আল্লাহর শোকর! আমার মেয়েরাও খাঁটি পর্দা করে। তাদের দেখে তাদের শ্বশুরালয়ের লোকজন খাঁটি পর্দা শুরু করেছে। ধন্যবাদ সেই রাহীম কারীমের যিনি আমাদের শয়তান থেকে হিফাযতের জন্য পর্দার উপঢৌকন প্রদান করেছেন। অথচ এটাকেই কিনা আমরা বন্দিদশা মনে করছি। আমার তো বেপর্দা হিন্দু মহিলাদের দেখেও আফসোস হয়। সত্য বলছি, আমি শুনেছি, মহিলারা নিজের ওপর পতিত দৃষ্টিকে অনুভব করতে পারে। আমার তো মুসলমান হওয়ার এবং পর্দা করার পূর্বে আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রত্যেক পুরুষদের দৃষ্টিকেই কাপড় ভেদ করে ইজ্জত লুণ্ঠনকারী মনে হতো। আমার প্রচন্ড রাগ হতো, সাথে লজ্জাও। আমার আল্লাহ আমাকে এমন দ্বীন দিয়েছেন যা আমাকে এই আযাব থেকে রক্ষা করেছে।

প্রশ্ন : মুসলমান ভাই-বোনদের উদ্দেশ্য কিছু বলবেন?

উত্তর : দুটি কথাই বলতে চাই। আমরা যে সকল মুসলমান ভাইবোন পৈত্রিকসূত্রে ইসলাম লাভ করেছি– তাদের মধ্যে এই পেয়ারা দ্বীনের মূল্য নেই। আফসোস হয় দ্বীনকে তারা বোঝা মনে করে। বিশেষত নামায পর্দা

ইত্যাদিকে। আপনারা এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। আপন রব ও রাসূলের প্রতি ইয়াকীন রাখুন। ঈমান গ্রহণ করে এর প্রতিফল প্রত্যক্ষ করুন। এরা যখন ঈমানের গুরুত্বই অনুধাবন করে না তখন স্বভাবতই কেউ ঈমান নিয়ে মরুক আর ঈমানবিহিন দোযখে চলে যাক এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের গোটা মানবজাতিকে দোযখ থেকে বাঁচানোর ফিকির করা দরকার।

প্রশ্ন : আপনার পরবর্তী প্রোগ্রাম কী?

উত্তর : কুরআন শরীফহিফয করার ইচ্ছা আছে, ফুলাত গিয়ে কুরআন মাজীদ হিফয করতে হবে এটা আমার পাক্কা এরাদা। দুই ছেলেকেই দ্বীনের সৈনিক ও দাওয়াতের কর্মী বানাবো। বড়টি তো কাজে লেগে গেছে। ছোটটি যেন খাজা আজমীরি রহ.-এর মতো লক্ষ লক্ষ লোককে মুসলমান বানাতে পারে দৈনিক তাহাজ্জুদে সেই দুআ করি। আল্লাহকে বলি, তুমি তো মূর্তিপূজকের ঘরে ইবরাহীম আ.-কে পয়দা করেছো। তাহলে তোমার জন্য এটা কিসের মুশকিল? ছোট ছেলেটিকে হাফেজ আলেম দ্বীনের দা'য়ী বানাতে হবে। আমার আল্লাহ অবশ্যই আমার আরজু পুরা করবেন। আজ পর্যন্ত তিনি আমার কোনো আবেদন নামঞ্জুর করেননি।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া! আপনি আমাদের জন্যও দুআ করবেন।

উত্তর : আমার কী যোগ্যতা আছে? আপনিই আমার জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের নবী আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা ওয়ারিশ বানিয়ে দিন। আমীন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **জুন**– ২০০৩

মুহাম্মদ মুহসিন (রমেশ সেন)-এর সাক্ষাৎকার

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে যেমন ঠান্ডা পানি অতীব প্রার্থনীয় একটি বিষয়। প্রতিটি মানুষের জন্য ইসলামও ঠিক তেমন। একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ। তৃষ্ণায় তাঁর ঠোঁট-জিহ্বা-কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। আপনি যদি তাঁর মুখের কাছে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি তুলে ধরেন তাহলে সে ঠেলে দিবে না, বরং টেনে নেবে। ঠিক তেমনিভাবে এখন প্রয়োজন হলো ইসলামকে তৃষ্ণার্তদের মুখের কাছে তুলে ধরা। পুরো পৃথিবী কুফুর-শিরকের জালে আটকে পড়ে আছে। পুরো পৃথিবী এখন শিরক ও কুফরের পাথরের নীচে চাপা পড়ে। আজ তাদের জন্য চাই মুক্তি। ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা হচ্ছে। আমাদের উচিত, এই প্রোপাগান্ডাকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সামনে ইসলামকে তুলে ধরা। আরমুগানের পাঠকদের কাছে এটাই আমার অনুরোধ।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ মুহসিন : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : মুহসিন সাহেব! আপনি একেবারে সময়মতো এসেছেন।

উত্তর : জি আহমদ সাহেব! এক মাস ধরে ফোনে হযরত মাওলানার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। কোনোভাবেই পাচ্ছিলাম না আল্লাহর উপর ভরসা করে রওনা হয়ে গেলাম। ভাবলাম গিয়ে পড়ে থাকবো। যখন দেখা হওয়ার হবে। কিন্ত আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী, ট্রেন থেকে নেমে খলিলুল্লাহ মসজিদে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম হযরত যদি দিল্লি থাকেন তাহলে অবশ্যই মসজিদে দেখা হবে। আলহামদুলিল্লাহ! সাক্ষাৎ হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি তো আপনার স্বার্থের কথা বলছেন। আর আমি বলছি আমার স্বার্থের কথা। আজ মাসের ২২ তারিখ আরমুগানের আগামী সংখ্যার জন্যে এখনও পর্যন্ত কোনো ইন্টারভিউ সংগ্রহ করতে পারিনি। দুই দিনের মধ্যে পত্রিকা প্রেসে যাবে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে চিন্তা করছিলাম। ফোনে কাকে ধরবো হঠাৎ করে আব্বু বললেন, আমাদের খুবই প্রিয় বন্ধু মুহসিন ভাই আসছেন তুমি তার সাথে দেখা করো। এ সংখ্যায় তার ইন্টারভিউ নাও।

উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ। হযরত আমাকেও বলে গেছেন। যাওয়ার সময় বলছিলেন সামান্য আপেক্ষা করুন। আহমদ আরমুগানের পক্ষ থেকে আপনার সাথে কিছু কথা বলবে।

প্রশ্ন: তো শুরুতেই আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাইবো।

উত্তর : আমি মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার অধিবাসী। জন্মগ্রহণ করেছি ১৯৬২ সালের ১৯ এপ্রিল একটি ব্যবসায়ী পরিবারে। আমার বাবা খৈল-ভূষির বেপারী ছিলেন। তিনি জীবনে নানার ধরণের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। তার ব্যবসা কয়েকবার মাটির সাথে মিশে গেছে। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই সাহসী এবং বীর চরিত্রের মানুষ। আমার ছোট দুই ভাই এবং একজন বোন আছে। আমি সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট করার পর বি-ফার্মা করি। তারপর আমার বাবা আমাকে একটি মেডিকেল সেন্টার করে দেন। তারপর ঝাঁসিতে একটি শিক্ষিত পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী এমএসসি করার পর বিএও করে একটি কলেজে লেকচারার হয়ে গিয়েছিল।

বিয়ের পর চাকরির কারণে নানা সমস্যা চলছিল। আল্লাহ তায়ালা সংকট অনেকটাই দূর করে দিয়েছেন। গোয়ালিয়রে তার বদলি হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমরা দুই পুত্র এবং এক কন্যার জননী।

প্রশ্ন: কিভাবে মুসলমান হলেন জানতে পারি?

উত্তর : আমার পাশেই একজন স্পেয়ার পার্টসের দোকানদার ছিলেন। তার নাম সাঈদ আহমদ। লোক যেমন চমৎকার তেমনি ধার্মিক মুসলমান। আমাদের মার্কেটে সাঈদ ভাই-ই ছিলেন একমাত্র মুসলমান দোকানদার। কেন যেন আমার সবচে' বেশি ঘনিষ্ঠতা এবং সখ্যতা ছিল তার সাথে। তার শ্বশুরবাড়ির কেউ কখনও গোয়ালিয়র এলে আমার জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু নিয়ে আসতো। একবার তার শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের উৎসব হবে। তার শ্যালক আমাকে খুব জোর করে দাওয়াত করে। দিনটা ছিল আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সাঈদ ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে প্রোগ্রাম করলাম। সৌভাগ্যই বলতে হবে। আমরা যখন ভূপাল যাবো ঠিক তখনই সেখানে আপনার আব্বু মাওলানা কালিম সাহেবের একটি প্রোগ্রাম হওয়ার কথা। সাঈদ ভাই মাওলানাকে আগে থেকেই জানতেন। সেখানকার এক হাজী সাহেব যার হাতে এ পর্যন্ত শত শত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে মূলত তার মাধ্যমেই সাঈদ ভাইয়ের আপনার বাবার সাথে পরিচয়। আপনার বাবার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাঈদ ভাই ব্যাকুল ছিলেন। মাঝে মধ্যেই আমার কাছে তার কথা বলতেন। বার বার বলতেন চলুন একবার ফুলাত যাই। ভূপাল যাওয়ার পর সাঈদ ভাই বিয়ের উৎসব রেখে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ছোটাছুটি শুরু করলেন।

তার অন্তরে এখলাস ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! সকালে এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মাওলানা সাহেবকে নাশতার দাওয়াত করেছিলেন। তার সাথে

আসারও অনেক মাওলানা সাহেব ছিলেন। আমি এবং সাঈদ ভাই সেখানে পৌঁছলাম। সুযোগ বুঝে সাঈদ ভাই মাওলানাকে বললেন– এ হচ্ছে রমেশ সেন সাহেব। আমার খুবই চমৎকার প্রতিবেশী। শুধু প্রতিবেশী নন, আমার বড় ভাই। আমরা ফুলাত গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবো ভাবছিলাম। আমাদের সৌভাগ্য, গোয়ালিয়র থেকে আজই একটি বিয়ে উপলক্ষে ভূপালে এসেছি। এখানে এসে জানতে পারলাম, আপনার প্রোগ্রাম রয়েছে। তারপর বিয়ে শাদীর কথা ভুলে গেছি। গতকাল সকাল থেকে ছোটাছুটি শুরু করেছি। আজ আল্লাহ তায়ালা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করেছেন। আপনি তার সাথে একটু কথা বলুন।

মাওলানা সাহেব সাঈদ ভাইয়ের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। বললেন– ফুলাত তো অবশ্যই আপনাদের আসতে হবে। আর রমেশ সাহেব কেবল আপনার ভাই হবেন কেন, তিনি আমাদেরও ভাই। আমাদের রক্তের ভাই। আমাকে বললেন– কী বলেন রমেশ সাহেব! আমরা কি এক মাতা-পিতার সন্তান নই? আমি বললাম– জি হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই।

মাওলানা সাহেব বললেন– এক মাতা-পিতার সন্তানকেই তো রক্তের সম্পর্কের ভাই বলা হয়। তারপর মাওলানা সাহেব বাড়ির মালিক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে আলাদা কোনো একটি ঘরে একটু জায়গা করে দিতে বললেন। উপস্থিত সকলেই তখন সমস্বরে বলে উঠলো আপনি এখানেই কথা বলুন। আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি। তারা সকলেই চলে গেলো।

মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, রমেশ সেন সাহেব! আপনি আমাদের রক্তের ভাই। আপনি আমাকে একজন ভালো মানুষ মনে করে ভালোবেসেই আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। এখন আমার কর্তব্য হলো আপনার জন্য সবচে' বড় প্রয়োজন এবং সবচে' কল্যাণকর যে কথাটি সেটা আপানাকে অবশ্যই বলবো। তাছাড়া আপনার জন্য সবচে' বড় ভয়ের বিষয়টি সম্পর্কেও আপনাকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। দেখুন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দেশে বসবাস করে অথচ সে দেশের শাসক মানে না, সেখানকার সংবিধান মানে না, সেখানকার আইন মানে না, তখন তাকে বিদ্রোহী এবং গাদ্দার বলা হয়। এ কারণেই কোনো দেশের কোনো পদে যখন কেউ আসীন হতে চায়, তখন তাকে সে দেশের শাহী ফরমান এবং সংবিধানের প্রতি বরং সংবিধানের প্রতিটি ধারার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং তা মেনে চলার শপথ নিতে হয়। আমাদের সামনে বিশাল পৃথিবী, এই বিশাল সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক ও বাদশাহ হলেন এক অদ্বিতীয় আল্লাহ। তাঁর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ এবং অন্তিম পয়গম্বরের মাধ্যমে এই সংবিধান পাঠিয়েছেন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে সবচে' বড় কর্তব্য হলো মহান সেই একক ও অদ্বিতীয় সত্তা প্রেরিত সর্বশেষ সংবিধানকে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণ করা। যদি কেউ এই শপথ না নেয়, তাহলে সে বিদ্রোহী এবং গাদ্দার। মালিকের জমিনে থাকার, জমিনে চলাচল করার, তাঁর সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু ভোগ করার অধিকার এই বিদ্রোহীর নেই। এমনকি তার বাতাসে শ্বাস গ্রহণের অধিকারও নেই। যে বিদ্রোহী ও গাদ্দার এই শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তার এই বিদ্রোহের কারণে তাকে মৃত্যুর পর অনন্তকাল নরকে থাকতে হবে। সুতরাং রমেশ ভাই! এই যে শপথ একেই বলা হয় কালেমায়ে শাহাদাত। আমি আপনাকে এখন কালেমায়ে শাহাদাত পড়াতে চাই। মালিককে হাজির নাজির মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধ থেকে তওবা করে তাঁর পাঠানো সর্বশেষ সংবিধান মেনে চলার অঙ্গীকার হিসেবে খাঁটি মনে দুই লাইনের এ কালেমাটি পড়ে নিন।

তারপর তিনি আমাকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করান। আমি কালেমা পাঠ করলাম। কালেমা পাঠ করার পর বললেন– যে ব্যক্তি খাঁটি মনে এই কালেমা পাঠ করে তাকেই মুসলমান বলা হয়। আল্লাহর শোকর! আপনি এখন মুসলমান। এখন আপনাকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম শিখতে হবে, নামায শিখতে হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে। আপনি যখন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন তখন জানতে পারবেন সাইদ সাহেব আপনার প্রতি কী অনুগ্রহ করেছেন। তিনি ভাই হিসেবে তার যথার্থ হক আদায় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মূল্য তো এই পৃথিবীতে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর যথার্থ উপলব্ধি হবে মৃত্যুর পর।

নাস্তার ব্যস্ততা ছিল। সকলকে ডাকা হলো। নাস্তার ফাঁকেই মাওলানা সাহেব কিছু বইপত্রের নাম লিখে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে 'আপকি আমানত' পুস্তিকাটি দিলেন। নিয়মিত পাঠ করার জন্য 'ইয়া হাদী ইয়া রহীম' এবং আরও কিছু শব্দ লিখে দিলেন। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, যে দুই লাইন আমাকে পাঠ করালেন সেটাও কি কোথাও পাওয়া যাবে? তারপর আমি বললাম, কালেমা পাঠ করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যেন আমি কোনো শৃঙ্খলে বাঁধা ছিলাম। আমি বাঁধনমুক্ত হয়েছি, আমার মাথার উপর হাজার মণের একটা বোঝা ছিল। বোঝাটি সরে গেছে। নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছিল। আমি নিজেকে তখন পরিপূর্ণ স্বাধীন অনুভব করছিলাম।

প্রশ্ন: আব্বুই কি আপনার নাম মুহাম্মদ মুহসিন রেখেছেন?

উত্তর : না, মাওলানা সাহেব আমাকে নাম বদলাতে বলেননি। তবে আইনি কাগজপত্র কিভাবে তৈরি করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক দিন পর মুহসিনে ইনসানিয়ত বইটি পড়ে আমি খুবই আলোড়িত হয়েছিলাম। তারপর আমি নিজেই আমার নাম মুহসিন রাখবো বলে আগ্রহ প্রকাশ করি। তখন সাঈদ ভাই আমার নাম রেখে দেন মুহাম্মদ মুহসিন।

প্রশ্ন: তারপর বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকদের এই কাহিনী বলেছেন?

উত্তর : ভূপাল থেকে আমরা গোয়ালিয়র গেলাম। আমি ভেবেছিলাম, গাদ্দারী এবং বিদ্রোহের অভিশাপ থেকে বেরিয়ে এসে মালিককে মেনে চলার শপথ নেয়া প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। গোয়ালিয়র ফেরামাত্র আমি আমার স্ত্রীকে বিষয়টি জানাই। তাকেও কালেমা পড়তে বলি। আমি চিন্তা করিনি, আমার এই কথায় সে এতটা চটে যাবে। সে সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবারকে ডেকে আনে। সে এতটাই ক্ষুব্ধ হবে আমি তা কখনও কল্পনা করিনি। বাধ্য হয়ে আমি পুরো পরিবারের সামনে ক্ষমা চাই। কথা দেই, তোমাদের সাথে হিন্দুধর্ম নিয়েই থাকবো। কিন্তু তারপর যখনই আমি একাকী হতাম, আমার অন্তর আমাকে চেপে ধরতো। আমার মন আমাকে চাবকাতে থাকতো। বলতো সারা জাহানের মালিকের বিদ্রোহী হয়ে কাফের এবং মুশরিক হয়ে মালিকের পৃথিবীতে নির্ভয়ে বসবাস করছো। আর তুমি কত ভীতু! এরচেয়ে বরং মরে যাওয়া ভালো। মনে হতো, কেউ যেন ভেতর থেকে আমাকে প্রশ্ন করছে একমাত্র আল্লাহই কি এই সমগ্র জাহানের মালিক নন? কুরআন কি আল্লাহর সত্য বাণী নয়; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মতো সত্য ও আদর্শ মানুষ কি এই পৃথিবীতে আরেকজন সৃষ্টি হয়েছে? বেহেশত দোযখ কি সত্য নয়? আচ্ছা দেবদেবী কি কোনো পূজার উপযুক্ত? মূর্তিশালার সবগুলো দেবতা মিলে কি একটি মাছি বানাতে পারবে? কুফর ও শিরকের পরিণতি কি চিরস্থায়ী জাহান্নাম নয়? প্রশ্নগুলো সবসময় আমাকে তাড়া করে ফিরতো, আমার ভেতরে অগ্নিলাভার সৃষ্টি হতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো, পৃথিবীর সকল পূজারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

প্রশ্ন: এই সময়টাতে ইসলাম সম্পর্কে আপনার পড়াশোনা চালু ছিল?

উত্তর : প্রতিদিন আমি ইসলামকে জানার জন্যে একটি করে বই পড়তাম। যতই পড়তাম ততই আমার তৃষ্ণা বেড়ে যেতো। মূলত এই পড়াশোনাই আমার ভেতরে প্রশ্নগুলো জন্ম দিয়েছিলো।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : যা হওয়ার কথা তাই হলো। আমার ভেতরটাই আমাকে বিদ্রোহী করে তুললো। আমি সকল ভগবান এবং সকল পূজারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে বসলাম। অঙ্গীকার করলাম এক খোদা এবং তাঁর আনুগত্যেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবো। আমি আমার স্ত্রী এবং পরিবারকে জানিয়ে দিলাম, আমি মুসলমান। মুসলমান হিসেবেই বেঁচে থাকবো। মুসলমান হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবো। আমি তোমাদের চাপে আত্মীয়তার টানে ইসলামের ক্ষুদ্র কোনো বিধানকেও ছাড়তে পারবো না।

প্রশ্ন: আপনার এ কথায় তারা ক্ষেপে যায়নি?

উত্তর : ক্ষেপবে না কেনো? খুব ক্ষেপেছে। প্রতিদিনই খান্দানের লোকজন জমা হতো। আমাকে ডাকা হতো। বুঝানোর চেষ্টা হতো। বিরক্ত হতো, ক্ষুব্ধ হতো। প্রথম দিকে ডাকার সাথে সাথেই আমি চলে যেতাম। অবশেষে জানিয়ে দিলাম, আমি আর পঞ্চায়েতের ডাকে কোথাও যাবো না। পরিবারের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে নানা স্কীম তৈরি করলো। আমি আদালত থেকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহ করলাম। আমার বিরুদ্ধে অনেক মামলা হলো, ছয়বার আমাকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা হলো। কয়েকজন গুন্ডা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা হলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ফোনে হযরত মাওলানার সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, এই পরিস্থিতিতে আপনাকে গোয়ালিয়র ছেড়ে দেয়াই ভালো। দীনের জন্য দেশ ত্যাগ করাও একটি মহৎ আমল। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এর প্রতিদান দিবেন। কয়েক দিনের জন্য আমি দিল্লি চলে এলাম। এখানে এসে সাময়িক বিরোধিতার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। কিন্তু এখানে অন্য ধরনের কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলাম। গোয়ালিয়র থেকে যে পরিমাণ অর্থকড়ি সাথে এনেছিলাম তা ফুরিয়ে গেলো। এখানে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারলাম না। একটি কোম্পানীতে এমআর এর চাকরি পেলাম। কিছুটা স্বস্তি পেলম। তারপর হযরতের এক বন্ধু আমাকে রাজস্থান নিয়ে গেলেন। এখন রাজস্থানেই আছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

প্রশ্ন : এই যে একের পর এক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেন এতে কি ভেঙ্গে পড়েন নি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তিনিই ধরে রেখেছেন। তবে পরিবার এবং অমুসলিমদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছি, তাতে সাহস বেড়েছে। কখনোই ভেঙ্গে পড়িনি। অবশ্য

খান্দানী মুসলমানদের পক্ষ থেকে চারপাঁচ বার এমন এমন কষ্টের শিকার হয়েছি– শয়তান একেবারে ধর্ম ত্যাগের দিকেই ঠেলে দিয়েছিল। তারপরও আল্লাহর শোকরিয়া! হযরত মাওলানার মতো আল্লাহর রহমতের জীবন্ত নমুনা কুফরের হাত থেকে বেঁচে থাকার উপর ফেরেশতা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সত্যকথা হলো, আমি তো ঈমান এবং ইসলামের উপযুক্ত ছিলাম না। আল্লাহ তায়ালা দয়া করেছেন। সাঈদ ভাইকে হেদায়েতের ফেরেশতা বানিয়ে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনিই দয়া করে মূলত আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। জীবনে এত বেশি ও কঠিন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছি যদি আমি আমার শক্তি দিয়ে এর মোকাবেলা করতে চেষ্টা করতাম, তাহলে অবশ্যই আমাকে ইসলাম ছেড়ে চলে যেতে হতো। সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার রহমত ছিল। বছরের পর বছর তিনিই দীনের উপর অবিচল রেখেছেন।

প্রশ্ন : এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো ঘটনা শোনাবেন?

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! ঈমানের মতো মূল্যবান ধন আল্লাহ তায়ালা যেভাবে দয়া করে আমাকে দান করেছেন, এর বিপরীতে এসব কষ্ট কিছুই না। মাওলানা সাহেব আমাকে যখন কালেমা পড়িয়েছিলেন তখন কিন্তু আমি ধর্ম পরিবর্তনের নিয়তে কালেমা পড়িনি। কালেমা পড়ার পর আমি যখন অনুভব করলাম, আমি যেন এক কঠোর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি এখন আমি এ পথে যেসব মুসিবতের মুখোমুখি হয়েছি তা যদি বলে বেড়াই আমার কাছে মনে হয় কি এটা যেন আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। তাই এসব ঘটনা বলতে লজ্জা হয়। তাছাড়া এসব বিপদ আমার ঈমানকে শক্তিশালী করেছে এবং উজ্জ্বল করেছে।

প্রশ্ন: তারপরও এক আধটা বলুন।

উত্তর : এ বিষয়ে আমাকে মাফ করবেন। এসব ঘটনা ছিল আমার জন্য নিয়ামত। আলমহামদুলিল্লাহ! এখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে শান্তি ও নিরাপত্তার নেয়ামতের মধ্যে রেখেছেন। । আমার স্ত্রী এখন আয়েশা হয়ে আমার সাথে জীবন-যাপন করছে। আমার দুই ছেলে এখন মুহাম্মদ হাসান এবং মুহাম্মদ হোসাইন। আমার কন্যা এখন ফাতেমা। আল্লাহ তায়ালা আমার পুরো পরিবারকে হেদায়েত দিয়েছেন। এ পথে আমি যে কষ্ট পেয়েছি তা কি এই নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছ নয়! তারপরও যেসব কষ্টে আমি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছি তা এখন কষ্ট হিসেবে আলোচনা করা চরম ক্ষুদ্রতা এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নয়?

প্রশ্ন : শুনেছি, এ বছর ওমরায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদেরসহ ওমরা করেছি।

সেখানে গিয়েই মূলত পরিবারের সবাই যেন মুসলমান হয় এর পূর্ণ যন্ত্রণা মনের সধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ওমরা পালন করার পর নিজেদের মধ্যে দীনের প্রতি আগ্রহও বেড়েছে।

প্রশ্ন : আপনার খান্দানের সাথে যোগাযোগ আছে?

উত্তর : ওমরার পর যোগযোগ শুরু করেছি। মনে হচ্ছে হারামাইন শরীফাইনে যে দুআ করেছি তা কবুল হতে শুরু করেছে। আমার এক চাচাতো ভাই আমার সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জুলাইয়ের দিকে আসতে বলেছি। সে একজন সরকারি বড় কর্মকর্তা। সে যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে আমাদের পুরো পরিবারকেই ভাবতে হবে। আমি আমার এই ভাইকে আপকি আমানত এবং ইসলাম এর পরিচয় বই দুটি দিয়েছি। সে পড়েছে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছু বলুন!

উত্তর : ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে যেমন ঠান্ডা পানি অতীব প্রার্থনীয় একটি বিষয়। প্রতিটি মানুষের জন্য ইসলামও ঠিক তেমন। একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ। তৃষ্ণায় তাঁর ঠোঁট-জিহ্বা-কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। আপনি যদি তাঁর মুখের কাছে এক গণ্ডাস ঠান্ডা পানি তুলে ধরেন তাহলে সে ঠেলে দিবে না। বরং টেনে নেবে। ঠিক তেমনিভাবে এখন প্রয়োজন হলো ইসলামকে তৃষ্ণার্তদের মুখের কাছে তুলে ধরা। পুরো পৃথিবী কুফুর-শিরকের জালে আটকে পড়ে আছে। পুরো পৃথিবী এখন শিরক ও কুফরের পাথরের নীচে চাপা পড়ে। আজ তাদের জন্য চাই মুক্তি। ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা হচ্ছে। আমাদের উচিত, এই প্রোপাগান্ডাকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সামনে ইসলামকে তুলে ধরা। আরমুগানের পাঠকদের কাছে এটাই আমার অনুরোধ।

প্রশ্ন: মুহসিন ভাই! আপনাকে অনেক শোকরিয়া ভেবেছিলাম আজ আপনার কাছ থেকে যে সব কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার বিবরণ শুনবো। সে যাক, পরে কখনও শুনবো ইনশাআল্লাহ!

উত্তর : আহমদ ভাই আমাকে মাফ করুন। এখন আমি যে অবস্থায় আছি, সত্যি বলতে কী, আমি যদি সে সব প্রতিকূলতার কথা বলি যে প্রতিকূলতা আজ আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে– তাহলে সেটা হবে অকৃতজ্ঞতা। দুআ করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে ইসলামের মতো মহান

নেয়ামতের মর্যাদা বোঝার তাওফিক দান করেন। আমাদের যেন দীনের উপর অটল ও অবিচল রাখেন।

প্রশ্ন : দীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো চেষ্টা করেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম দিন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানার একটা আগ্রহ আমার মধ্যে উপলব্ধি করে আসছি। এরই মধ্যে কুরআন শরীফ পড়া শিখেছি। উর্দু মোটামুটি ভালোই শিখেছি। কিছুটা লিখতে পারি। আমার পরিবারের সকলেই এখন কুরআন শরীফ পড়ছে। আমরা অঙ্গীকার করেছি, প্রথম ধাপেই আমাদের এতটুকু কুরআন শরীফ পড়া শিখতে হবে যেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে প্রতিদিন এক মানযিল করে পড়তে পারি। তাবলীগে গিয়ে শুনেছিলাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল– তিনি সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। সেই থেকেই আমি আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা এক সাথে শপথ নিয়েছি আমরাও একই পদ্ধতিতে প্রতি পাঁচ কি সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ অবশ্যই খতম করবো। আশা করছি চলতি বছরের শেষ নাগাদ অথবা জানুয়ারি পর্যন্ত অবশ্যই আমরা প্রতিদিন এক মনযিল করে তেলাওয়াত করার উপযুক্ত হয়ে যাবো। এখনও প্রতিদিন ফরজ নামাযের পর আমরা পাঁচজন যত্নসহ কুরআন তেলাওয়াত করি। তারপর কুরআন শরীফের কিছু তরজমাও মুখস্থ করি।

প্রশ্ন: মাশাআল্লাহ! খুবই চমৎকার। আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন। আব্বুর কাছে শুনেছি, আপনি একজন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত। আল্লাহ তায়ালা আপনার সব দুআই কুবল করেন। এ সম্পর্কে কোনো ঘটনা বলবেন কি?

উত্তর: ভাই আহমদ সাহেব! আল্লাহ তায়ালা তো প্রতিটি মুসলমান বরং প্রতিটি মানুষের সাথেই এ ওয়াদা করেছেন– সুতরাং প্রতিটি মানুষই তো মুস্তাজাবুদ দাওয়াত। প্রয়োজন শুধু আল্লাহ তায়ালাকে সব কিছুর নিয়ন্ত্রক ও একমাত্র মালিক মনে করে তাঁর কাছে হাত পাতা। এটা ভিন্ন কথা যে, কারও ক্ষেত্রে হয়তো এসব কথা মানুষের মধ্যে প্রচার পায়, আবার কারও ক্ষেত্রে পায় না। আমার ধারণা দুনিয়াতে এমন মানুষ নেই যার দুআ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন নি। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে পূর্ণ একীন ও বিশ্বাসের সাথে দুআ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা কবুল করবেন। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে পূর্ব থেকে নয়, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠনোর আবদারও করে দয়াময় মালিক তার কথাও রাখবেন। প্রয়োজন হলো পূর্ণ আস্থার সাথে তাঁর কাছে হাত পাতা। হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার দেয়া

নিয়মের বাইরে কোনো কিছু চাওয়া সঙ্গত নয়। এটা ভিন্ন কথা। তবে আমার বিশ্বাস বান্দা যদি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার কথা ফেলবেন না। এই যে আমার স্ত্রী মুসলমান হলো, আমার সন্তানরা আমার কোলে ফিরে এলো– যে নারী আমাকে কয়েকবার বিষ পান করাতে চেয়েছে সে পাক্কা মুসলমান হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসাটা কি পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য ওঠার চাইতে কম?

অসহায় বান্দা যখন পরম বিনয়ের সাথে মহান মালিকের কাছে ভিখারির মতো শূন্য হাত তুলে বসে, মালিক তখন সেই হাত অবশ্যই পূর্ণ করে দেন।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, বিষয় তো তাই। আসলে চাওয়ার লোক নেই। আপনি বলেছেন, খান্দানী মুসলমানদের দ্বারা।

উত্তরঃ ভাই আহমদ সাহেব! সে একই কথা হলো। এসব কথা আলোচনা করা মালিকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা মনে হয়। মানুষ খুবই দুর্বল। মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে গেছে। আমাকে মাফ করবেন। আমি তো আমার মালিকের অপার অনুগ্রহের মধ্যে ডুবে আছি। ঈমান যখন নসীব হয়েছে, তখন আর কিসের কষ্ট কিসের প্রতিকূলতা? আমি আমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। দুআ করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে অকৃতজ্ঞতা থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **জুলাই- ২০০৯**

মাওলানা উসমান কাসেমী (সুনীল কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আরমুগানের পাঠকদেরকে আমি বলবো আরমুগান হলো একটি আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মুসলমানকে দীনি দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। এই উম্মতের প্রতিটি মুসলমান যেন বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণ করে, আমাদের মতো কুফর এবং শিরকে নিমজ্জিতদের উদ্ধারের চেষ্টা করে। কেবল মাত্র সমর্থন ও বাহবা দিয়ে সকলেই আরমুগানের এই মিশনের সম্মান রক্ষা করবেন এবং যতটুকু সম্ভব প্রত্যেকেই দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করবেন। আমার আরেকটি অনুরোধ হলো, আমার পরিবার এবং খান্দানের জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের হেদায়েত নসীব করেন আর আমাকে তাঁর নবীর কিছু দরদ হলেও দুরুদ নসীব করেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উসমান কাসেমী : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানার সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তরঃ অবশ্যই বলুন! আমার জন্য এটা সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাইবো।

উত্তর : আমার নাম মুহাম্মদ উসমান। হরিয়ানা জেলার কাছে পালওয়ালা নামক গ্রামের এক অমুসলিম রাজপুত পরিবারে আমার জন্ম। আমার পূর্বের নাম ছিল সুনীল কুমার। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলামের ঋণদান করেছেন। এখন আমার বয়স প্রায় পঁচিশ বছর। হারসুলি মাদরাসায় ১৯৯২ সালেই পড়াশোনা শুরু করি। প্রথমে নাজেরা তারপর কুরআন কারীম হেফয করি। হেফয এবং দাওরায়ে হাদীস দারুল উলুম দেওবন্দেই কমপিণ্টট করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্নঃ কিভাবে মুসলমান হলেন বলবেন কি?

উত্তরঃ আমার জীবন আল্লাহর রহমত ও করুণার এক চমৎকার নিদর্শন। আমার মতো এক অপবিত্রকে হেদায়েত দিবেন বলে আল্লাহ তায়ালা যে বিস্ময়কর ঘটনা ও অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তা এখনও ভেবে মুগ্ধ হই। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে আমাকে অষ্টম শ্রেণীর পর লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। লেখাপড়া ছেড়ে জীবিকার সন্ধান করতে থাকি। আমাদের ক্লাসেই মেওয়াতের একজন ছেলে পড়তো। নাম আব্দুল হামিদ।

তার সাথে ছিল আমার গভীর বন্ধুত্ব। তার বাড়ি ছিল হাথিয়ানের কাছে। পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে আবদুল হামিদকেও পড়াশোনা ছাড়তে হয়। আবদুল হামিদ পালওয়ালে কার মেকিংয়ের কাজ শিখতে শুরু করে। কিছদিন পর আমিও তার সাথে গিয়ে ওয়ার্কশপে ভর্তি হই। আবদুল হামিদের বাবা ছিলেন একজন মসজিদের ইমাম। জমিয়তে শাহ ওয়ালীউল্লাহ- এর পক্ষ থেকে হাথিয়ানের কাছেই একটি মসজিদে তিনি ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখানকার পশ্চাৎপদ মুসলমানগণ ১৯৪৭ এবং কেউ কেউ তারও আগে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলেই হযরত থানভী রহ. তাঁর কিছু ভক্তকে দীনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। যারা সেখানে দাওয়াতের কাজ করেছেন।

হযরত থানভী রহ. তাদের অনেক দুআ দিয়েছিলেন এবং অনেক সুসংবাদও শুনিয়েছিলেন। গ্রামটিতে কোনো মসজিদ ছিল না। ছিল একটি মাজার। এই মাজারটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা সেখানকার সকলেই জানতো। কেউ কখনও মাজারে কোথাও কোনো ধরনের ময়লা এমন কি ছেঁড়া পাতাও পড়ে থাকতে দেখেনি। সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে থাকতো মাজারটি। অথচ মাজারটির উপরে ছিল কবুতরের নিবাস। কবুতরগুলোও মাজারে কিংবা তার আশপাশে বিষ্ঠা ছাড়তো না। এই মাজারের এক পাশেই আবদুল হামিদের বাবা মিয়াজী সাহেব থাকতেন। এলাকার লোকজন তাকে খানাপিনা পর্যন্ত দিতো না। তিনি সেখানে আযান দিতেন, নামায পড়তেন। মাঝে মধ্যে এলাকার কিছু শিশু এখানে চলে আসতা। তিনি তাদের কালেমা পড়াতেন। সেখানকার ধর্মত্যাগী মুসলমানগণ মহিষের গাড়িতে করে বোঝা বহনের কাজ করতো। কাছেই ছিলো মাটির একটি বড় ঢিপি। মানুষ এখান থেকে মাটি কেটে অন্যত্রে নিয়ে যেতো। একদিন সেখানে যারা মাটি কাটার কাজ করতো তার মাটি কাটতে কাটতে হঠাৎ লক্ষ করলো শূন্য-গর্ভের মতো একটি জায়গা। সাদা ধবেধবে কাপড় দেখা যাচ্ছে। তারা আরেকটু যখন মাটি সরালো, তখন দেখতে পেলো– একটি লাশ। ভয় পেয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মিয়াজীকে ডেকে আনলো। তারা ভেবেছিল, কোনো জিন-ভূত হবে। মিয়াজী এসে দেখলেন সাদা দাড়ি মন্ডিত একজন বুযুর্গ মানুষের লাশ। দেখে মনে হচ্ছে যেন আজই মারা গেছেন। তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, এটা কোনো ঈমানদার আল্লাহওয়ালা মানুষের লাশ। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা এমনই হয়। মৃত্যুর পর তাদেরকে নববধূর মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। মাটিও তাদের হেফাজত করে।

ঘটনাটি এলাকার লোকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। এলাকার লোকজন খুব প্রভাবিত হয়। এই ঘটনার পর ধর্মত্যাগী হয়ে যাওয়া অনেকেই তাওবা করে পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। তারা তাদের সন্তানদের মিয়াজীর কাছে পড়তে পাঠাতে শুরু করে। মাজারের কাছে মসজিদ বানাবার জন্য জায়গা দান করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে সেখানে মসজিদ গড়ে ওঠে। একদিন আবদুল হামিদ তার বাবার সাথে দেখা করার জন্য সেখানে যায়। বন্ধু বলে আমিও সাথে যাই। যাওয়ার পর আবদুল হামিদের বাবা আমাদের জন্যে খানাপিনার ব্যবস্থা করেন। খাওয়ার জন্যে সেখানে একটি মাত্র পেণ্ডট ছিল। খাওয়া শুরু করার আগে মিয়াজী বললেন– একটু অপেক্ষা কর। আমি গ্রাম থেকে আরেকটা পেণ্ডট আনার ব্যবস্থা করছি। আমরা উভয়ে বললাম, আলাদা পেণ্ডটের দরকার নেই। আমরা দু'বন্ধু এক পেণ্ডটেই খাই। একথা বলে আমরা খেতে শুরু করি।

মিয়াজী সাহেব তখন আবদুল হামিদকে বললেন– বেটা! তোমাদের পরস্পরে যখন এতই বন্ধুত্ব তখন তুমি তোমার বন্ধুকে মুসলমান করে নিচ্ছো না কেন? এটা কেমন কথা, এক বন্ধু মুসলমান আরেক বন্ধু হিন্দু! খানাপিনার পর আবদুল হামিদ এবং তার বাবা আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কথায় কথায় কয়েকবার তো কেঁদে পর্যন্ত ফেললেন। আমি বললাম– আপনি আমাকে ইসলামের কোনো মন্ত্র শিখিয়ে দিন। আমি মন্ত্রটি রীতিমতো পড়বো। যদি কোনো কারিশমা দেখি, তাহলে মুসলমান হবো। তাবলীগ জামাতের লোকেরা মিয়াজীকে একটি দুআ শিখিয়েছিল, তিনি আমাকে সেই দুআটি শিখিয়ে দিলেন। দুআটি হলো– ''আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার''হ আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। তারপর বললেন তুমি সব সময় এটা পাঠ করবে। আমি বললাম– এই মন্ত্রের অর্থও বলে দিন। তিনি বললেন– এর অর্থ তো আমার জানা নেই। হাথিয়ানে মুফতি রশীদ সাহেব আছেন, তাঁর কাছে জেনে আসবো।

পরদিন তিনি হাথিয়ান গেলেন। সন্ধ্যায় আমিও হাথিয়ান গেলাম। গিয়ে মিয়াজীকে মন্ত্রটির অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন- এর অর্থ হলো, হে আমার মালিক! আমাকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি বললাম, নরকের আগুন থেকে রক্ষা করার কী অর্থ? তিনি বললেন, ঈমান ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলতে হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে মারা যাবে, সে বেহেশতে যাবে। বললাম– সত্যিই বিষয়টা এমন? তিনি বললেন– একশ ভাগ সত্য।

কথাটি শোনার পর আমার খুব দুঃখ হয়। আমি আবদুল হামিদকে বললাম– তুমি আমার কেমন বন্ধু আমি যদি এই অবস্থায় মারা যেতাম তাহলে তো নরকে যেতাম। তুমি তো কখনও আমাকে একথা বলনি? মিয়াজী বললেন, বেটা! তুমি সত্যিই বলেছো! আবদুল হামিদের কর্তব্য ছিল, তোমাকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া। সে যাই হোক, এখন তুমি কালেমা পড়ে নাও। আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। পরের দিন তিনি আমাকে হাথিয়ান মাদরাসায় নিয়ে গেলেন। মুফতি সাহেব আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমার নাম রাখলেন মুহাম্মদ উসমান। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন: মুসলমান হওয়ার পর সাবইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, না বিষয়টি পরিবারের কাছে গোপন করেছিলেন?

উত্তর: আসলে শোনার ঘটনা তার পরেরটিই। তৃতীয় দিন মুফতী সাহেব আমাকে আইনি কাগজপত্র করার জন্য এক ব্যক্তির সাথে হরিয়ানার ফরিদাবাদ পাঠিয়ে দেন। ফরিদাবাদ জেলা জজের সামনে আমি হলফনামা পেশ করি। জেলা জজ ছিলেন কট্টর হিন্দু। তিনি আমাকে নাবালক বলে স্থানীয় থানা ইনচার্জকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন। হাথিয়ান থানা ইনচার্জ ছিলেন তখন উমেশ শর্মা। তিনি কোনো জরুরি তদন্তকাজে তখন বাইরে যাচ্ছিলেন। ইনসপেক্টর বলবীর সিংকে আমার কেসটি দিয়ে যান। বলবীর সিং ছিল কট্টর আর জালেম চরিত্রের মানুষ। তিনি আমাকে প্রথমে কতক্ষণ ধমকালেন। হাতে মারলেন। যখন আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম– ঈমান ছাড়বো না– তখন বেধড়ক পিটুনি। মারের চোটে বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমি তখন অবিরাম জঁপে যাচ্ছিলাম– আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার। তার মারের কারণে মাঝে মধ্যে আমার জঁপের আওয়াজ বড় হয়ে উঠতো। বলবীর আমাকে পেটাচ্ছিল আর গালাগাল করছিল। একবার সে আমাকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো কী পড়ছিস? আমি দাওয়াতের নিয়তে তাকে মন্ত্রটি বললাম এবং তার অর্থও বললাম। তার রাগ চরমে পৌঁছে গেল। বলবীর দুজন সিপাহীকে বললো– কামারের দোকানে গিয়ে লোহার রড গরম করে নিয়ে এসো। তারপর গরম লোহা দিয়ে একে ছ্যাঁকা দাও। দেখবো, কে তাকে আগুন থেকে রক্ষা করে! যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নিজ ধর্মে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে। ছাড়বে না।

সিপাহী দুজন কামারের দোকানে গেলো। চারটি লোহার রড় গরম করে নিয়ে এলো। রডগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গিয়েছিল। আমাকে নিয়ে

তারা থানার ভেতরে ঢুকলো। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি অবিরাম আমার মন্ত্র পড়ে যাচ্ছি। তারা আমার শরীর থেকে শার্ট খুলে ফেললো। তারপর আমার শরীরে জ্বলন্ত রডের ছ্যাঁকা দিতে লাগলো।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আমার শরীরে লোহার রড কোনো চিহ্নও ফেলতে পারলো না। সিপাহীরা তো তাজ্জব! বিষয়টি তার ইন্সপেক্টর বলবীরকে জানালো। ততক্ষণে রডের লাল আভা চলে গেছে। বলবীর যখন দেখলো আমার শরীরে কোথাও পোড়ার চিহ্ন নেই তখন সে সিপাহীদের গালি দিতে দিতে বললো তোমরা রড গরমই করনি। তারপর সে দেখার জন্য যখন রড ধরতে যায় তখন মারাত্মকভাবে তার হাত পুড়ে যায়। যন্ত্রণায় সে কঁকিয়ে ওঠে। 'মা'রে, বাবারে' বলে চেঁচাতে থাকে। দুজন সিপাহীকে বলে একে সামনের দিকে দৌড়াতে বল। তারপর পিছন থেকে গুলি করে শেষ করে দাও। এ মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আর আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। এই বলে ইন্সপেক্টর চলে যায়।

সিপাহীরা আমাকে দৌঁড় দেয়ার জন্য চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলে দেই– আমি চোর নই যে, দৌড়ে পালাবো। গুলি যদি করতে হয় তাহলে আমার বুকে করো। যখন সিপাহীদের সাথে আমার তর্ক হচ্ছে ঠিক তখন থানা ইনচার্জ জনাব উমেশ শর্মা এসে উপস্থিত। তিনি পুরো কাহিনী শুনলেন। পুলিশদের ধমকালেন। বললেন, এর বিশ্বাস এত্ত পাকা, তোমরা যদি গুলি করো তার গায়ে গুলি লাগবে না। শর্মাজি আমাকে খানা খাইয়ে চার্জশিট তৈরি করে রাহতক জেলে চালান করে দিলেন। বললেন– বেটা! তোমার জন্য এটাই ভালো হবে। তোমাকে যদি ছেড়ে দেই তাহলে মানুষ তোমাকে মেরে ফেলবে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আমি জানে বেঁচে যাই। আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করুণার প্রতি আমার বিশ্বাস আগের চাইতে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন: শুনেছি, আপনার সাথে একজন কোতয়াল মুসলমান হয়েছিল। ঘটনাটি বলবেন?

উত্তর: সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। সেই কোতয়ালই উমেশ শর্মাজি। আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, আগুন আমার শরীরকে না পোড়ানো এসব শুনলেন। তদন্ত করলেন। আসলেই গরম রড আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি বললাম, আপনি আমার একজন কল্যাণকামী। আপনাকে যদি সত্য না বলি, তাহলে কাকে বলবো, আমার কথা তার বিশ্বাস হলো। তিনি প্রভাবিতও হলেন। আমার জামিনের ব্যবস্থা করলেন। ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করে

জেল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর বললেন– যে মাওলানা তোমাকে মুসলমান বানিয়েছে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আমি তাকে হাথিয়ান এ মুফতী রশীদ আহমদ সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। ইসলাম সম্পর্কে তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর মুফতি সাহেবের হাতেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুফতি সাহেব তাকে ইসলাম প্রকাশ না করার জন্য পরামর্শ দিলেন। তার কিছু দিন পর বাবরি মসজিদ শাহাদাতের ঘটনা ঘটলো। মেওয়াত অঞ্চলে নানা রকমের দাঙ্গা হলো। হাথিয়ানের মুসলমানগণ বরাবরই দাঙ্গার শিকার হতো। দেখা গেছে, কোতয়াল শর্মাজির উসিলায় এবার এ এলাকায় মুসলমানদের উপর কোনোরূপ জুলুম হয়নি। তিনি তখন মুসলমানদের খুব সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : আজকাল কী করছেন?

উত্তর : আমি আজকাল জমিয়তে শাহ ওয়ালীউল্লাহর তত্ত্বাবধানে আলোয়ার জেলায় দাওয়াতি কাজ করছি। সেখানকার একটি প্রতিষ্ঠান আমার তত্ত্বাবধানে চলছে। হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের মাধ্যমে আমি হারসুলি মাদরাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। তার তত্ত্বধানেই আমি চলছি।

প্রশ্ন: আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর: আরমুগানের পাঠকদেরকে আমি বলবো আরমুগান হলো একটি আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মুসলমানকে দীনি দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। এই উম্মতের প্রতিটি মুসলমান যেনো বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণ করে, আমাদের মতো কুফর এবং শিরকে নিমজ্জিতদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কেবল মাত্র সমর্থন ও বাহবা দিয়ে সকলেই আরমুগানের এই মিশনের সম্মান রক্ষা করবেন এবং যতটুকু সম্ভব প্রত্যেকেই দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করবেন। আমার আরেকটি অনুরোধ হলো, আমার পরিবার এবং খান্দানের জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে হেদায়েত নসীব করেন আর আমাকে তাঁর নবীর কিছু দরদ হলেও দুরুদ নসীব করেন।

প্রশ্ন: অনেক অনেক শোকরিয়া। ফী আমানিল্লাহ!

উসমান কাসেমী! আপনাকেও অনেক অনেক শোকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **জুলাই**- ২০০৩

জনাব বেলাল আহমদ (হীরালাল)- এর সাক্ষাৎকার

সকলের কাছে দুআ চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ইলম দান করেন। আমাকে যেন কুরআনের আদলে মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠার তাওফিক দান করেন। আমার পরিবারকে যেন হেদায়েত দান করেন। আর একটি কথা হলো, পৃথিবীর সকল মানুষ আমাদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়। তাদের সকলের ঈমানের কথা ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের হেদায়েত দান করেন তাহলেই আমাদের ভ্রাতৃত্বের হক আদায় হবে।

বেলাল আহমদ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : বেলাল ভাই! আরমুগানের পক্ষ থেকে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তর : আহমদ ভাই! অবশ্যই বলুন। এটা আমার জন্য অনেক বড় খুশির কথা।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : আমার জন্ম আজমগড় জেলার বোমেগাঁও গ্রামে। আমার পুরনো নাম হীরালাল। আমার বাবা বাবু নন্দন বিহার দেওয়াজা একজন ধার্মিক হিন্দু। আমরা সাত ভাই। আমার পরিবার এবং গ্রামের অনেক মানুষ দিল্লিতে বিল্ডিং পেইন্টিং- এর কাজ করে। অবশ্য বাবা দিল্লিতেই পান- বিড়ি- সিগারেটের দোকান করেন।

প্রশ্ন : কিভাবে মুসলমান হলেন জানতে পারি?

উত্তর : আগের কথা। আমার বয়স তখন বারো বছর। আমি আমার বাবার সাথে দিল্লি তাইমুর নগরে তার দোকানে বসতাম। আমাদের দোকানের উপর তলায় আব্বাজী আবু ফাইয়াজ কড়াই প্রভৃতির একটি কারখানা চালাতেন। আমার বাবা সেই কারখানাতে রাতের বেলা থাকার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। আমরা রাতে কারখানার কারিগরদের সঙ্গে ঘুমাতাম। প্রতি রাতেই আব্বাজী কারখানার সব কারিগরকে এক সাথে করে ফাজায়েলে আমল পাঠ করে শোনাতেন। আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করতাম। কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগতো। রাতের বেলা আগেভাগে গিয়ে তালিমের অপেক্ষা করতাম। কোনো দিন যদি আব্বাজী তালিম করতে না চাইতেন, আমি তাকে গিয়ে সামান্য সময়ের জন্য হলেও তালিম করতে অনুরোধ করতাম। কারখানার

কারিগরগণ যখন নামায পড়তে যেতেন, আমিও তাদের সাথে যেতাম। মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে নামাযের দৃশ্য দেখতাম। নামায পড়ার এই দৃশ্য আমার কাছে খুব ভাল লাগতো।

এক রাতের ঘটনা। আমি আব্বাজী আবু ফাইয়াজকে বললাম– আব্বাজী আমি কি মুসলমান হতে পারি? তিনি আমাকে মমতার সাথে বললেন– অবশ্যই হতে পারবে বেটা! তুমি যদি মুসলমান না হও তাহলে তোমাকে নরকে যেতে হবে। অনন্তকাল আগুনে জ্বলতে হবে। আমি বললাম, তাহলে আমাকে মুসলমান করুন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমার গায়ের রং কাল বলে আমার নাম রাখলেন, বেলাল আহমদ। বললেন– বেলাল হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মুয়াজ্জিন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট সয়েছিলেন। তারপর আমি বাটলা হাউজ মসজিদে নামায পড়তে যেতে শুরু করি। আব্বাজী আমাকে নামায পড়তে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন– তোমাকে নামায পড়তে দেখলে তোমার পরিবারের লোকেরা মারপিট করবে। আমি বললাম– একবার আপনি নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম– আব্বাজী! আপনি এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়েন না, ব্যাপারটা কী? তখন আপনি বলেছিলেন– যদি কোনো ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়, তাহলে সে আর মুসলমান থাকে না। তাহলে আমি কি দুই নম্বর মুসলমান হবো? যদি দুই নম্বর মুসলমানই হই, তাহলে আর মুসলমান হয়ে লাভ কী! আপনি আমাকে এক নম্বর মুসলমান করুন। আব্বাজী তখন জবাব দিলেন- কথা তুমি ঠিকই বলেছো। নামায ছাড়া কোনো মুসলমানি নেই। কিন্তু তুমি এখন ছোট। তোমার পরিবারের লোকদের ভয় আছে। এজন্যই তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। আমি বললাম– আব্বাজী! মা- বাবাকে বেশি ভয় করবো, না আল্লাহকে? আমার কথা শুনে তিনি বললেন– বেটা! ঠিক আছে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে যেও।

তারপর রমযান মাস এলো। সময় হলেই মসজিদে নামায পড়তে চলে যেতাম। কখনও হয়তো আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে মসজিদে যেতে দেখেও ফেলেছে। আমি রোজাও রাখতে শুরু করি। দিনের বেলা যখন পরিবারের লোকেরা আমাকে খেতে বলতো, আমি কৌশলে এড়িয়ে যেতাম। এতে করে তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এক শুক্রবারের ঘটনা। আমি যাকেরবাগ মসজিদ থেকে জুমার নামায পড়ে ঘরে ফিরছি। আমার মাথায় তখনও টুপি। আমার বাবা

আমাকে দেখে ফেললেন। দেখামাত্রই ধরে ফেললেন। বললেন– মসজিদে গিয়েছিলে কেন, বলো! আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। বলে ফেললাম, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। নামায পড়তে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে খুব বকাঝকা করলেন। ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই আমার ভাই এবং খান্দানের লোকেরা ছিল। তারা দুপুরের খাবার খেতে এসেছে। সকলেই আমাকে আলাদা- আলাদা ডেকে ঝুঝাতে লাগলো। কিন্তু আমার একথা, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমার পক্ষে পুনরায় হিন্দু হওয়া সম্ভব নয়। আমার বড় ভাই আমাকে মারতে শুরু করলো। অনবরত কিল ঘুষি চালাতে লাগলো। কিন্তু আমার সাফ কথা– মারো আর যাই কর, একথা মাথা থেকে ফেলে দাও- আমি আবার হিন্দু হয়ে যাব। তোমরা যদি জীবনে সফল হতে চাও যে, মৃত্যুর পর যদি নরকের আগুন থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও এবং কালিমা পড়ে নাও।

আমাকে আমার ভাই মারছে আর আমি তাকে কালিমার দাওয়াত দিচ্ছি– এতে অন্যরাও ক্ষেপে যায়। তারা তখন আমাকে লাঠি ইত্যাদি যার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে মারতে শুরু করে। লাঠির আঘাতে আমার মাথা কেটে রক্ত বের হয়ে আসে। আর আমার ভেতরে তখন ঈমান তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলি- জীবনের শেষ কথা শুনে নাও! যা খুশি আমাকে করো, তারপর আমি আমার পায়ের আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বলি এখান থেকে আমাকে কাটতে শুরু কর। কাটতে কাটতে আমাকে টুকরো টুকরো করে দাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কণ্ঠ স্থির থাকবে আমার শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে থাকবো। এখন তোমাদের খুশি, যা ইচ্ছা করতে পার।

আমার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখে তারা আমাকে ছেড়ে দিল। রাতের বেলা সুযোগ বুঝে আমি পালিয়ে গেলাম। দুই দিন পর্যন্ত তারা আমাকে নানা জায়গায় খোঁজাখুজি করলো। তৃতীয় দিন আব্বাজী আবু ফাইয়াজকে গিয়ে চাপ দিল– আপনি আমাদের ছেলেকে যাদু করেছেন। ছেলে আপনার কাছে আছে। আগামীকালের মধ্যে যদি আমরা আমাদের ছেলেকে না পাই, তাহলে পুলিশের কাছে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো। আব্বাজী তাদেরকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন– এই কি উপকারের পুরস্কার! বিনা ভাড়ায় আমি তোমাদের ছেলেকে থাকতে দিয়েছি। আজ এভাবে তার প্রতিদান দিচ্ছ! কিন্তু তারা তার কথা শুনতে নারাজ।

আব্বাজী চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমি দিল্লিতেই ছিলাম। আমিও জানতে পেরেছি, আমার পরিবারের লোকেরা আব্বাজীকে পেরেশান করছে। পরে আমি নিজেই কারখানায় ছুটে আসি। আব্বাজীকে বলি আপনি আমার হাত ধরে আমাকে আমার পিতাজীর হাতে তুলে দিন। তাকে পরিষ্কার বলে দিন– এই নিন আপনার ছেলে! ভবিষ্যতে কিছু হলে আমাদের আর কোনো দায় থাকবে না। আব্বাজী আমাকে বলল, তারা তো আমাকে মেরে ফেলবে! আমি বললাম, আমাকে কিছুই করবে না, তিনি আমাকে আমার পিতার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন– আল্লাহর অনুগ্রহ, আপনার ছেলে নিজেই চলে এসেছে। তার বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না। এখন তাকে বুঝে নিন। ভবিষ্যতে তার কিছু হলে এর কোনো দায় আমরা নেবো না।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর: তারপর আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আজমগড়ে আমাদের গ্রামে নিয়ে গেল। নানা রকমের তান্ত্রিক কবিরাজ দিয়ে আমাকে চিকিৎসা করালো। তাদের ধারণা ছিল, আমাকে যাদু করা হয়েছে। বাড়িতে যাওয়ার পর লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে থাকি। কিছুদিন পর্যন্ত আমাকে তারা আটকে রাখে। আমাদের গ্রামের একজন মুসলমানের সাথে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে বুঝালেন, তোমাকে যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, তাহলে তোমার চাল- চলন বদলাতে হবে। আমি তখন পরিবারের কাছে নরম হয়ে পড়ি। আমার কোমল আচার-আচারণ দেখে এবং সহজ সরল চাল-চলন দেখে তারা ভাবতে শুরু করে– যাদু নামানো হয়েছে। জিনের আছর ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমার মা যাচ্ছিলেন তার বাবার বাড়ি। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। ধারণা, পরিবেশ পরিবর্তন হলে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। আমার নানা বাড়ির পাশেই একজন বুদ্ধিমান মুসলমান আছেন। আমার মা আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন– তাকে একটু বুঝিয়ে দিন। এ তো আমাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলছে। তিনি আমার মাকে সান্তনা দিলেন। বললেন– একে ধরে রেখে লাভ নেই; বরং খুশি মনে ছেড়ে দিন। এ কোনভাবেই আপনার কাছে থাকবে না। এ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি আমার নানার বাড়ি থেকে সোজা আব্বাজীর কাছে চলে যাই। তিনি আমাকে মুজাফ্ফর নগর তার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে একটি মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। আমি কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ি। কিছু উর্দু এবং কয়েক পারা হেফয করি। তারপর মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের পরামর্শে আমাকে নাদওয়াতুল

উলামার এক বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমার পড়াশোনা ভালোই চলছে।

প্রশ্ন: মুসলমান হওয়ার পর নতুন পরিবেশে আপনার কেমন লাগছে?

উত্তর: আমার আব্বাজী আমাকে আমার পিতাজীর চাইতে হাজারগুণে বেশি ভালোবাসেন। মানুষ মনে করে আমি তাঁর আপন ছেলে। আম্মুজীও আমাকে অন্য ভাইদের চাইতে বেশি ভালোবাসেন। অন্য ভাইবোনদের তুলনায় আমার কথাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। একদিন আমাকে দেখে তার এক আত্মীয় আমার ভাইদের বলছিল– এখন তো আমার বাবার সম্পদেও এ অংশ পাবে। সাথে সাথেই আমার ভাইয়েরা বলে উঠলো– এ বরং আমাদের আগে আমাদের বাবার সম্পদের অংশ পাবে। আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আমাদের এই ভাইটি দান করেছিলেন। আমরা কোথায় আর কোথায় মদীনার এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন! আমরা প্রয়োজনে আমাদের এই ভায়ের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি। আর সেটাকে আমরা সৌভাগ্য মনে করি।

প্রশ্ন: আপনার ভাই এবং মা বাবার সাথে কোনো যোগাযোগ আছে?

উত্তর: একবার দিল্লিতে আমি বাসে করে যাচ্ছি। নেজামুদ্দীনের কাছাকাছি যাওয়ার পর লক্ষ করলাম, আমার ভাই সাইকেলে করে যাচ্ছে। আমি তাকে চিৎকার করে ডাকি। সে আমাকে দেখতে পায়। সাইকেল জোরে চালাতে থাকে। কিন্তু বাসের সাথে তো সাইকেলে কুলিয়ে উঠার কথা নয়। আমি পরের স্টপেজে নেমে পড়ি। আমার ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির। আমাকে দেখে লাফিয়ে পড়ে। আমাকে বলে পিতাজী মরণাপন্ন। তোর কথা খুব বলছেন। আমি বললাম–ঠিক আছে, আগামীকাল আসবো। আমি আব্বাজীর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে দাওয়াতের নিয়তে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি গেলাম। তিনি তখন একেবারে স্বাভাবিক। দীর্ঘক্ষণ আমাকে বুঝাতে থাকলেন। বললেন– তুমি আমার সবচে' আদরের ছেলে। তুমি যদি আমাদে ধোঁকা দাও, তাহলে আমার কী হবে। তিনি এও বললেন– আমি এক পন্ডিতজির সাথে পরামর্শ করেছিলাম। তিনি আমাকে তোমাকে মেরে ফেলবার কথা বলেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন, একে যদি না মারো তাহলে তোমার পুরো খান্দানকে ধর্মভ্রষ্ট করে ছাড়বে। পন্ডিতজীর পরামর্শের পর আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এত আদরের ছেলে! এমন মমতার সাথে বড় করেছি, এখন মেরে ফেলবো! আমি বললাম– পিতাজী! যখন আমাকে ধরে এনেছিলেন তখনও আমি বলেছিলাম এবং এখনো বলছি–

যদি আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তাহলেও যতক্ষণ আমার মধ্যে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে যাবো।

আমি আপনার কাছে এজন্য এসেছি– আপনি আমার পিতা। অসম্ভব মমতা করে আমাকে বড় করেছেন। আমার মা আমাকে দুধপান করিয়েছেন। আপনারা যদি হিন্দু অবস্থায় মারা যান, তাহলে অনন্তকাল নরকে জ্বলতে হবে। আমার অনুরোধ, আপনারা সকলে মুসলমান হয়ে যান। আমার সাথে চলুন। তিনি আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। তাকে দেখে খুবই হতাশ মনে হলো।

প্রশ্ন: তারপর তার সাথে আর কোনো যোগযোগ করেছেন?

উত্তর: আমার এক চাচা সউদী আরবে থাকেন, তিনি ইসলামের খুবই কাছে চলে এসেছেন। একবার জানতে পারলাম দেশে এসেছেন। এটাকে সুযোগ মনে করে আমি দিল্লিতে গেলাম। পিতাজীর সাথে দেখা করলাম। পিতাজী বললেন, তোমার চাচা বলেছেন, সত্যধর্ম এবং একমাত্র যৌক্তিক ধর্ম হলো ইসলাম। আমরা কেবল এই কারণে হিন্দু যে, আমাদের জন্ম হয়েছে হিন্দু সমাজে। তোমার চাচা বলেছিলেন, হয় তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও আর না হয় ছেলেকে তার আপন অবস্থায় থাকতে দাও। তাকে নতুন করে হিন্দু বানানোর চেষ্টা করা বড় অন্যায়। আমি বললাম, পিতাজী! তারপর আপনি কী চিন্তা ভাবনা করেছেন? তিনি বললেন, সত্য বলতে গেলে তো এটাই বলতে হয়, ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম। কিন্তু আমরা সমাজ ছেড়ে কিভাবে মুসলমান হবো! মানুষ কি বলবে!

আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাকে বুঝাতে থাকি। কিন্তু তার কাছে সমাজের ভয় দোযখের ভয়ের চাইতেও বড় ছিল। আমার অন্তরে খুব ব্যাথা পাই। ঘরে ফিরে দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করি। মাওলানা কালিম সাহেবের একটি আলোচনা মনে পড়তে থাকে। তিনি বলেছিলেন, আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন, যারা ভুলক্রমে কিংবা ইসলামকে অসত্য ধর্ম মনে করার কারণে ইসলামের শত্রুতা করেছেন, যখন তাদের যথাযথভাবে দাওয়াত দেয়া হয়েছে– তারাও ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। চাই তিনি হযরত উমর রা. হোন, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ হোন, ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল হোন, হযরত ওয়াহশি হোন কিংবা জালেম বলে খ্যাত হিন্দাই হোন। কিন্তু যারা ইসলামকে সত্যধর্ম জেনেও বিদ্বেষবশত কিংবা সামাজিকতার ভয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে থেকেছে চাই তিনি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসীম মমতাপ্রবণ চাচা আবু তালেবই হোন না কেন তাদের ভাগ্যে ইসলামের দৌলত জুটেনি।

আমার মনে হয়, আমার পিতাজীর বিষয়টিও অনুরূপ। তিনি ইসলামকে সত্যধর্ম বলেছেন, কিন্তু সামাজিকতার ভয়ে কবুল করতে পারছেন না। আল্লাহ না করুন, তিনি ইসলাম থেকে বঞ্চিত অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। আহমদ ভাই! আমার বাবার জন্য অবশ্যই দুআ করবেন। হযরতকে দুআ করতে বলবেন। রমযানের দুআতেও আমার বাবা এবং পরিবারের কথা মনে রাখবেন। তাঁরা যদি এভাবেই মারা যায়, তাহলে অনন্তকাল নরকে জ্বলবে। আমার মা-বাবা আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমার আল্লাহ যেন তাদের হেদায়েত দান করেন।

প্রশ্ন: না, না বেলাল ভাই! এভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আপনাকে খুশি করবেন। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তাদের হেদায়েত দান করবেন। আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন।

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা যেন আপনার কথাকে সত্য করেন।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর : সকলের কাছে দুআ চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ইলম দান করেন। আমাকে যেন কুরআনের আদলে মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠার তাওফিক দান করেন। আমার পরিবারকে যেন হেদায়েত দান করেন। আর একটি কথা হলো, পৃথিবীর সকল মানুষ আমাদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়। তাদের সকলের ঈমানের কথা ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের হেদায়েত দান করেন তাহলেই আমাদের ভ্রাতৃত্বের হক আদায় হবে।

প্রশ্ন: বেলাল ভাই, আপনাকে অনেক শোকরিয়া।

উত্তর: আপনাকেও শোকরিয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **ডিসেম্বর-** ২০০৩

মাস্টার মুহাম্মদ আসলাম (প্রমোদ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আমার ভাইদেরকে শুধু এতোটুকু অনুরোধ করতে চাই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলকে এই ওসীয়ত করে গেছেন فليبلغ الشا هد الغائب দ্বীনের এ কথাগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিবে। খতমে নবুওয়তের পর দাওয়াতের এ জিম্মাদারী ইসলামের এক মহান দায়িত্ব হিসেবে আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, এ কাজের প্রতি আমাদের উদাসীনতা ও মানুষের কাছে না পৌঁছানোর কারণে আমাদের হযরতের ভাষায় প্রতি মিনিটে ৩১৩ জন ভাই কুফর ও শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে চীরস্থায়ী জাহান্নামের উপযুক্ত হচ্ছে। এরা সকলেই আমাদের ভাই। তারা যদি অজ্ঞতার কারণে আমাদের সাথে দুশমনি করে এতেই তাদের পাওনা শেষ হয়ে যায় না। আমাদের উন্নতি ও মুক্তির একমাত্র উপায় হল দাওয়াতের মেহনত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবী এবং তাঁর দরদভরা এই ওসীয়ত ও শেষ আকুতিটুকুর প্রতি যেন আমরা খেয়াল রাখি। এ ব্যপারে অবহেলা করা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

মুহাম্মদ আসলাম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আপনার পরিচয়?

উত্তর : আমার নাম মুহাম্মদ আসলাম। দেওবন্দের নিকটবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসী। আমার পূর্বনাম প্রমোদ কুমার। প্রসিদ্ধ জাট সম্প্রদায়ের লোক আমি। আজ হতে প্রায় সাড়ে সাত বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি।

প্রশ্ন : আপনার খান্দান সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার তিন ভাই এক বোন। পিতামাতা এখনো জীবিত আছেন। আমার যখন ছয় বছর বয়স তখন তিনি সন্নাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার পাড়ে তিনি একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম চালাতেন। আমার পিতা হিন্দুধর্মের একজন বড় পন্ডিত ছিলেন তাছাড়া বংশের মধ্যে চাচা, জ্যাঠা ও বড় ভাইরাও ভাল জ্ঞান রাখেন। এককথায় আমাদের বংশটা নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

প্রশ্ন : আপনি বললেন, আপনার পিতা বড় পন্ডিত ছিলেন, তিনি কি এখনও আছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এখন তো তিনি ইসলাম কবুল করেছেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শুনাবেন কি?

উত্তর : ইসলাম মূলত স্বভাবগত একটি ধর্ম। যেমনটি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেমনিভাবে মানুষের পেটে ক্ষুধা-পিপাসা লাগে এবং খানা-পিনা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরাত্মা দ্বীন ইসলাম ও তাওহীদে খালেসের সন্ধানে অস্থির থাকে। ছোটবেলা থেকেই এই চিন্তা করতাম, কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। এ লক্ষ্যে অনেক ধর্মগুরুর সাথে কথা বলেছি কিন্তু এতমেনান হচ্ছিল না। ইতোমধে একজন হাফেজ সাহেবের সাথে যোগাযোগ হল, তাঁর সাথেও এ বিষয়ে কথা বললাম। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তার এ পরামর্শ খুব ভাল লাগলো।

ইসলামে পবিত্রতার বিধান আমার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দ লেগেছিল। আমার মনে হতো যে পেশাব- পায়খানার মত এমন গান্ধা বস্তু মানুষ যার পাশে দাঁড়াতেও ঘৃণা বোধ করে- যখন তা মানুষের কাপড়ে বা শরীরে লেগে যায় তখন তা থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় কী? আর মালিক তো পবিত্র। নাপাকের সাথে তিনি কিভাবে মিলবেন? পাক-পবিত্রতার প্রতি আমার এই আগ্রহ ও অনুরাগের মাধ্যমেই আমার আল্লাহ আমাকে কুফর ও শিরকের নাপাকি থেকে পবিত্র করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করে আমি চিরধন্য হয়েছি। হাফেজ সাহেব আমাকে ফুলাতে হযরতের নিকট নিয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহর রাস্তায় চার মাস সময় লাগালাম। তারপর অনেক মেহনত করে দ্বীন শিখলাম। মাওলানা সাহেব আমাকে যমুনা নগর এলাকায় পাঠালেন। সেখানে আমি মাদরাসায় কোরআন শরীফ, তাজবীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য জরুরী বিষয়াদী শিক্ষা করি এবং বাচ্চাদের শিখাই। তারপর দুবছর যাবত ফুলাতেই রয়েছি।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছিল?

উত্তর : একজন মানুষ যখন নিজের সবকিছু ছেড়ে নতুন কোনো পরিবেশে যায় তখন কিছু পেরেশানী তো হবেই। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। আমার জন্য সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় ছিল মুসলমান ভাইদের নানাবিধ প্রশ্ন এবং মানুষের সাক্ষাৎ দেয়া। কিন্তু এতদসত্বেও আমি যে মূল্যবান ঈমানের সওদা করেছি তার তুলনায় এসব কোনো বিষয়ই ছিল না।

প্রশ্ন : শুনেছি আপনি একবার রাগ করে কোথাও চলে গিয়েছিলেন, তা কী কারণে পুনরায় ফিরে এলেন?

উত্তর : নিজের অজ্ঞতা এবং কিছু লোকের উপর্যুপরি প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে গুড়গাঁও একটি খৃস্টান মিশনারীর কার্যালয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমার ভুল এই ছিল, আমি মনে করেছিলাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এখন আমার সকল প্রয়োজন পুরা করা মুসলমানদের দায়িত্বে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ইসলাম গ্রহণ করাকে মুসলমানদের উপর অনুগ্রহ মনে করেছিলাম। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে আমার আক্বীদা ঠিক ছিল। যদিও বাহ্যত খৃষ্টান মিশনারীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। সেখানকার অবস্থা দেখেও আমার কাছে ইসলামের কদর বেড়ে গেল। বিশেষ করে আমার প্রতি মাওলানা সাহেবের আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ আমাকে চম্বুকের ন্যায় আকর্ষণ করছিল। সর্বদাই সেখানে অস্থিরতা অনুভব করতাম। অনিচ্ছাকৃতভাবেই ফুলাত আসতে হল। খাতুলী এসে হযরতকে ফোন করলাম। তিনি ফুলাত ডেকে পাঠালেন। আমি পোশাক পাল্টিয়ে ফেলেছিলাম। আমার খুবই শরম লাগছিল। কিন্তু হযরত জামে মসজিদে ডেকে আমার সাথে কোলাকুলি করে খুব কাঁদলেন। আমাকে খুব বুঝালেন। দোযখের আগুনের ভয় অন্তরে বসিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, তোমার সবচেয়ে বড় ভুল হল ঈমান আনাকে তুমি মুসলমানের উপর অনুগ্রহ মনে করছো। হযরত বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ডুবন্ত বা অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তারপর সে উদ্ধারকারীকে বলে যেহেতু উদ্ধার করেছ অতএব, অন্ন-বস্ত্রসহ আমার যাবতীয় প্রয়োজন তোমাকেই পূরণ করতে হবে। তাহলে এটা তার কত বড় বোকামী হবে?

আলহামদুলিল্লাহ! আমার ভুল ভেঙ্গে গেল এবং সাথে সাথে সালাতুত তওবা পড়ে খালেছ দিলে তাওবা করে নিলাম।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করে আপনার কাছে কেমন লাগছে?

উত্তর : আমি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর শোকার আদায় করছি। যখনই আমার ঈমানের কথা মনে পড়ে তখনই আল্লাহর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে মনে চায়। আমার আরো মনে হতো যে, যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়েত না দিতেন। এবং হযরতের মুহাব্বতের কারণে যদি খৃস্টান মিশনারী থেকে বের করে না আনতেন আর এ অবস্থাতেই আমার মৃত্যু এসে যেতো তাহলে আমার কী করুণ পরিণতিই না হতো, আমি যথারীতি শিউরে উঠি– যেমন এখন উঠছি।

الحمد لله الذى هدا انا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا ان هدان الله

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন যে আপনার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের হযরত আমাদের পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলে, আমি তাকে পিতার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং তার আশ্রমের কথা তাকে জানালাম। তখন তিনি আমাকে তাঁর হেদায়েতের দুআ করতে বললেন। হযরতের অভিমত এই ছিল যে, নওমুসলিমদের দাওয়াতের কাজে না লাগালে পেরেশানীর কারণে এক সময় তাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। মাওলানা সাহেব আমাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন এবং সাথে মাওলানা ইমরান মুজাহেরীকে পাঠালেন। আমরা আশ্রমে পৌঁছলাম। আমার আব্বা চিনতে পারলেন কিন্তু পরিবেশের কারণে প্রকাশ করলেন না। আমরা তার গুরুর রেফারেন্স দিলাম ফলে তিনি এই বাহানায় অনেক আদর যত্ন করলেন। ফেরার সময় দুজনকে কিছু রুপি দিলেন। পরবর্তীতে আসার আবেদনও করলেন। আমরা ফুলাত ফিরে আসলে হযরত কারগুজারী শুনলেন এবং আফসোস করে বললেন, তোমরা দাওয়াত কেন দিলেনা? পুনরায় তাদের কাছে গিয়ে ফুলাত আসার দাওয়াত দিয়ে এসো।

আমরা আবার তার ওখানে গেলাম। দাওয়াত দেওয়ার তো হিম্মত হল না। শুধু মাত্র ফুলাত আসার ওয়াদা নিলাম এবং হযরতের কিতাব আপনার আমানত নামক বইটি হাদিয়া দিয়ে ফিরে এলাম। তারা এক সপ্তাহ পর আসবেন বলে কথা দিলেন। এক সপ্তাহ পরে তাকে আনতে গেলাম। পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রথমে চাচাকে মাদরাসায় নিয়ে গেলাম। দুই দিন পর ফুলাত পৌছুলাম। তিনি হযরতের আপনার আমানত নামক বইটি পড়ে খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। রাত ১টায় হযরত সফর থেকে ফিরে এলেন। সকাল ৮টার সময় হযতের সাথে সাক্ষাত হল।

হযরত আমার আব্বাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। এরপর নির্জনে বসে কথা বললেন, কিছুক্ষণ পর সুসংবাদ পেলাম, আমার পিতা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছেন। লোকেরা বিস্তারিত জানতে চাইলে হযরত বললেন, আমি প্রথমে দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করি। এরপর তাকে বললাম, আপনি মাস্টার আসলামের পিতা হওয়ার কারণে আমারও পিতার মতই। আমি যদি জানতে পারি, আপনি আনমনে কোনো এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল।

আপনি তাতে যে কোনো সময় পতিত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হতে পারেন। তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? তিনি বললেন- আপনি দুশ্চিন্তায় থাকবেন। তখন আমি বললাম, আমার যখন এ ব্যাপারে একীন রয়েছে যে ঈমান ছাড়া পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় আর হঠাৎ কখন মৃত্যু চলে আসে বলা যায় না- তখন আমার কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই তখন আপনার অনেক কষ্ট হবে। আমি বললাম এবার চাইলে আপনি ঈমান গ্রহণ করে আমাকে প্রশান্তি দিন অথবা এভাবেই অস্থিরতার মাঝে রেখে দিন। তিনি বললেন, এটা হতে পারে না, আমি তো আপনার আমানত বইটি পড়ে ঈমান আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। বারবারই আমার মনে একথা আসছিল যে, আপনার কিতাব পড়েই যখন এত আনন্দ পেলাম তাহলে সাক্ষাতে না জানি কতো স্বাদ রয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, নিশ্চয় তিনি এমন এক মহাত্মা যাঁকে ঈশ্বর বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

এখন দুটি পথ সামনে। হয়তো আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিবেন। তারপর আমিও মসজিদে বসে আল্লাহ আল্লাহ করবো। অথবা আমার সাথে অনেক লোক রয়েছে যারা এই উদ্দেশ্যে আমার অনুসরণ করছে যে তাদের আমি শান্তির পথ দেখাবো তাদেরও হক রয়েছে। অতএব, আমি মুসলমান হয়ে যাবো তবে এখনই তা প্রকাশ করবো না। ওখানে গিয়ে আমার অনুসারীদের বলবো যে, গঙ্গার তীরে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকছে না এখন আমরা পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর আলো বাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আশ্রম বানাবো। এই বলে তাদেরও সাথে করে নিয়ে আসবো আর আপনি তাদের সত্যের পথ দেখাবেন। এখন আপনি যা বলবেন তাই হবে। আমি তাকে বললাম, শেষ প্রস্তাবটি সবচেয়ে উত্তম আপনি প্রথমে কালিমা পড়ে নিন। তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর তার নতুন নাম রাখা হল আব্দুল্লাহ।

প্রশ্ন : এরপর কী হল?

উত্তর : তিনি হযরতের খুব অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাঁকে বারবার জড়িয়ে ধরতেন। তিনি হযরতকে বললেন, আমি কোরআন শরীফ পড়া শিখতে চাই। আমাকে হিন্দী ভাষার কুরআনের কপি দিন। আমি ইতিপূর্বেও কোরআন পড়েছিলাম কিন্তু তখন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পড়েছি। এখন এজন্য পড়তে চাই যে আমার মালিক আমার কাছে কী চান। এরপর তিনি আশ্রমে চলে যান এবং অনুসারীদের নিয়ে সেখানে যমুনা নগর মাদরাসায় কিছুদিন

অবস্থান করেন। তার দুই শিষ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। একজনের কথা তো কী বলবো! সে সাদুয়ায় এক হিন্দু নাপিতের কাছে মাথার জটা চুল কাটানোর জন্য গিয়েছিল। নাপিত তাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার চুলে কী উকুন হয়েছে? সে উত্তর দিল, না। নাপিত জিজ্ঞাসা করলো তাহলে চুল কাটাচ্ছো কেন? সে নিঃসংকোচে বলে দিল আমি মুসলমান হয়েছি। তাই শিরক ও কুফরের সকল নোংরামীকে ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছি।

আফসোস! আমার পিতার জন্য এখনো কোনো ব্যবস্থা হলনা। তবে الحمد لله তিনি যথেষ্ট মজবুত। কুরআন পড়ছেন এবং জিকির করছেন।

প্রশ্ন : جزاكم الله আপনি আপনার খান্দানের জন্য কাজ করেছেন। তার কোনো ভাল ফলাফল দেখা যাচ্ছে?

উত্তর : আমার হযরত এ বিষয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রথমদিকে আমাকে ঘরের লোকেরা ঘৃণা করতো। কিন্তু আমি তাদের হেদায়েতের জন্য দিল থেকে দুআ করলাম এবং সহমর্মিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে দাওয়াতের নিয়ত করলাম তখন অবস্থা পাল্টে গেল। আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করলেন। দায়ীর সাথে আল্লাহর মদদ থাকে এবং আল্লাহ রাস্তা খুলে দেন। এখন সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথেই যোগাযোগ, দেখা সাক্ষাৎ হয়। তারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেন, মনযোগসহ কথা শোনেন বরং এখানকার বিশ্বাস নিয়েই মিলিত হন। দুনিয়াবী কোনো সমস্যায় পড়লে দুআ কামনা করেন। আমি হযরতের 'আপনার আপমী' নামক বইটি তাদের দিয়েছি। কিছু লোক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন। ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের অনেকেই বড় শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ।

প্রশ্ন : আপনি ফুলাতে দিনরাত মসজিদ আর দাওয়াত নিয়েই পড়ে থাকেন। আপনার মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি হল কিভাবে?

উত্তর : আমার প্রতি হযরতের সুদৃষ্টি। তিনি আমাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যই হল দাওয়াত ও দ্বীনের মেহনত। আয়-উপার্জন ও অন্যান্য কাজগুলো জীবনের প্রয়োজনাদীর অন্তর্ভুক্ত। আমার মনে চায় বুজুর্গদের আবাসভূমি ফুলাত একটি ইসলামী আবাসে পরিণত হোক। যেন মানুষ এখানে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন : মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি অধম আর কী বলবো, আমার ভাইদের শুধু এতোটুকু অনুরোধ করতে চাই যে, প্রিয়নবী (সাঃ) বিদায় হজের ভাষণে সকলকে এই

ওসীয়ত করে গেছেন فليبلغ الشا هد الغائب দ্বীনের এ কথাগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিবে। খতমে নবুওয়তের পর দাওয়াতের এ জিম্মাদারী ইসলামের এক মহান দায়িত্ব হিসেবে আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, এ কাজের প্রতি আমাদের উদাসীনতা ও মানুষের কাছে না পৌঁছানোর কারণে আমাদের হযরতের ভাষায় প্রতি মিনিটে ৩১৩ জন ভাই কুফর ও শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে চীরস্থায়ী জাহান্নামের উপযুক্ত হচ্ছে। এরা সকলেই আমাদের ভাই। তারা যদি অজ্ঞতার কারণে আমাদের সাথে দুশমনি করে এতেই তাদের পাওনা শেষ হয়ে যায় না। আমাদের উন্নতি ও মুক্তির একমাত্র উপায় হল দাওয়াতের মেহনত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবী এবং তাঁর দরদভরা এই ওসীয়ত ও শেষ আকুতিটুকুর প্রতি যেন আমরা খেয়াল রাখি। এ ব্যপারে অবহেলা করা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়।

দ্বিতীয় আবেদন হল এই যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার বসবাসের জন্য একটি সমাজের প্রয়োজন। একজন নওমুসলিম ইসলাম কবুল করার পর তাকে হিজরত করে নিজের ঘর-বাড়ী সবকিছুই বিসর্জন দিতে হয়।

এই মুহূর্তে তার একটু আশ্রয় ও সহমর্মিতার বড় প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক নওমুসলিমের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু চাঁদা তুলে সদকা খয়রাত দিয়ে তাদেরকে ভিখারী বানানো বা তাদের দিল বিগড়ানো উচিৎ নয় বরং যদি একজন মুসলমান ভাই মদিনার ভ্রাতৃত্তের নমুনা হয়ে একজন মুহাজির ভাইয়ের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেয়; তাকে ঋণ দিয়ে বা পরিবারের সদস্য হিসেবে শরীক করে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন তাহলে পারিবারিক দাওয়াত দেয়া সহজ হয়ে যায়। এতে তাদের শান্ত্বনাও লাভ হবে। এজন্য কিছু দিন আমদের হযরতের কাছে গিয়ে মায়া-মুহাব্বত শিক্ষা করা উচিৎ।

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

- ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারী- ২০০৩

আব্দুর রহমান সাহেব (রঘুবীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার

একথা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি, যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়েত না দিতেন তাহলে কুফরের উপর আমার মৃত্যু হত। মাঝে মাঝে পেরেশান হয়ে যাই এই ভেবে যে, না জানি আমার কোনো বদ আমলের কারণে আমার কাছ থেকে ইসলামের নেআমত ছিনিয়ে নেয়া হয়? কারণ ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ হল প্রকৃত সফলতা। এগুলো ভেবে প্রায়ই আমি সেজদাবনত হয়ে যাই এবং দুআ করি, হে আল্লাহ! আপনি তো সকল দাতার দাতা। আপনার নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কোনো কিছু দিয়ে ফেরত নিল তার উদাহরণ হল বমি করে আবার তা চেটে খাওয়া। আপনি তো সজ্জন ও ভদ্রতম। আপনি আমাকে আমার চাওয়া ছাড়াই হেদায়েত দান করেছেন। অতএব, আর খাতেমাও যেন ঈমানের সাথেই হয়। আমার বিশ্বাস الله আমার খাতেমা ঈমানের সাথেই করবেন। انشاء الله আপনিও দুআ করবেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

আব্দুর রহমান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : ভাই আব্দুর রহমান! ভাল আছেন তো? আরমুগানের জন্য আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমি ভাল আছি। আহমদ ভাই! অবশ্যই বলুন। এটাতো আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রশ্ন : প্রথমেই আপানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : আমার নাম রঘু সিং ছিল। আমি খাতুলী গ্রামের এক কুমার সম্প্রদায়ের লোক। আদর করে সবাই আমাকে রঘু বলে ডাকতো। ১৯৭১ খৃঃ আল্লাহ আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। তখন আমার বয়স আনুমানিক ২১ বছর। আমার পিতা দীপচন্দ্রজীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমরা তিন ভাই এবং দুই বোন জীবিত রয়েছি। আমার বিবাহের বছর মা মারা যান। তখন আমি জেনারেল মার্চেন্টের দোকান করতাম। মাঝে সেলুনের দোকানও করেছিলাম। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নমানের হওয়াতে তা ছেড়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শুনান।

উত্তর : ঘটনা হল, ১৯ বছর বয়সে আমার বিবাহ হয়। আমার বিবি খুবই সুন্দরী ছিল। তার পিতৃপুরুষও আমাদের খান্দানের চেয়ে সম্মানিত ছিল। তার

পিতা একজন ভাল কৃষক ছিলেন। কিছু কারবারও করতেন। আমরা গরীব হওয়ায় তা করতে পারতাম না। আমি দশম ক্লাসে ফেল করেছিলাম। সে আমার চেয়ে বেশী পড়াশোনা জানতো। সে ইন্টারমিডিয়েট পাশ ছিল। তাকে আমার খুব পছন্দ হল এবং মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। একবার তার পিত্রালয়ের লোকেরা তাকে নিতে আসলো এবং সে চলে গেল। কিছুদিন পর তাকে আনতে গেলাম। কিন্তু সে আসতে চাইল না। আমি খুব কষ্ট পেলাম। এরপর আমার পিতা তাকে আনতে গেলেন। কিন্তু তারা আনতে দিলো না। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সুপারিশ করেও কোনো কাজ হল না। সকল প্রকার বাহ্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মোল্লা মুনশীদের- মাধ্যমে তাবিজ-কবজ ও ঝাড়-ফুঁক করাতে লাগলাম। কিন্তু এতে কোনো কাজ হল না।

ওকে আমার খুব মনে পড়তো। কোনো কাজেই মন বসতো না। ওর চিন্তায় একেবারে আধা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার পিতাকে কেউ বললো, শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত আকরর খান ওয়ালী মসজিদে মুসলমানদের বড় এজতেমা হয়। সেখানে অনেক মাওলানা সাহেব আসেন। তুমি ওকে ওখানে নিয়ে যাও। আমার পিতা শনিবার সকালে ওখানে পৌঁছলেন। লোকেরা বললো, মসজিদের বাহিরে বস। প্রোগ্রাম শেষ হলে কোনো মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো। মসজিদের বাইরে একজন মৌলভী সাহেব তেহারী বিক্রি করতো। আমার পিতা তার কাছে গেলেন। নিজের দুঃখের কথা বললেন। তিনি বললেন, আমরা খাতুলীওয়ালারা সকল কাজে ফুলাতের লোকদের স্বরণাপন্ন হই। ঐ যে দাঁড়িয়ে এক যুবক বয়ান করছে তার বাড়ী ফুলাত। দেখতে যদিও মৌলভী মনে হচ্ছে না কিন্তু সে ফুলাতের লোক। এখানে ফুলাতের অনেক লোক এসেছে। তিনি যখন বের হবেন তখন তার পিছু নিবে। তিনি কাজ করতে চাইবেন না কিন্তু যদি করে দেন তাহলে মনে কর তোমার কাজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : সেই নওজোওয়ান কে ছিল?

উত্তর : বলছি, মূলত তিনি ছিলেন আপনার আব্বু। তখন তিনি মিশন স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে পড়তেন। স্কুলের ড্রেসেই এজতেমায় শরীক হতেন। সে জামাআতের সাথে সর্বদা জুড়ে থাকতেন। ভাল বয়ান করতে পারতেন কিন্তু মানুষ তখন তাকে মৌলভী সাহেব বলার কল্পনাও করতে পারতো না। সাপ্তাহিক ইজতেমায় জুড়নেওয়ালী বা সকালের ছয় নাম্বারের কথা অধিকাংশ সময় তিনিই করতেন। এশরাক থেকে ফারেগ হয়ে তিনি বের হলেন। ব্যাগ সাথেই ছিল। স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন। আমার পিতা পিছে দৌঁড়ালেন এবং

মৌলভী সাহেব, মৌলভী সাহেব বলে ডাকতে শুরু করলেন। তিনি মৌলভী হলে বা নিজেকে মৌলভী মনে করলে ডাক শুনতেন। আমার আব্বা দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন- কী ব্যাপার এতো ডাকছি তারপরও শুনছেন না যে? আপনার আব্বা বললেন, আপনিতো মৌলভী সাহেব বলে ডাকছিলেন। আমি তো মৌলভী সাহেব নই। আমার পিতা বললেন, তেহারী বিক্রেতা মৌলভী তো ঠিকই বলেছেন, ফুলাতের লোকরা নিজেদের খুব গোপন রাখে।

আব্বা তাকে বললেন, আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। তিনি জানতে চাইলেন কাজটি কী? আব্বা বললেন, ছেলের বউ বাপের বাড়ি থেকে আসছে না। চিন্তায় চিন্তায় ছেলেটা মরে যাচ্ছে, কোনো কাজকাম করে না। এমন কোনো তাবিজ দিন যাতে তার বউ তার কাছে ফিরে আসে। তিনি বললেন, ভাই মোল্লাজী আপনার সাথে মজাক করেছেন। আমার পরদাদাও তো কোনোদিন তাবিজ বানায়নি। আমার আব্বাকে মোল্লাজী বলেছিলেন, তিনি অস্বীকার করবেন। কোনভাবেই তুমি মানবে না। আপনার পিতার অস্বীকার করা দেখে তার একীন হলে গেল যে, তিনি গুমনাম টাইপের লোক। সবার কাজ করে দেননা। এজন্য তিনি বারবার অনুরোধ করে বললেন, আপনি আমাকে টলাতে পারবেন না। আমার সবকিছু ভাল করেই জানা আছে। যতক্ষণ আপনি আমাকে কাজ করে না দিবেন ততক্ষণ আপনার পিছু ছাড়বো না।

মৌলভী সাহেব বলেন যে, অনেক বুঝানো সমঝানোর পরও যখন সে নাছোড়বান্দা তখন জান বাঁচানোর জন্য বললেন, আগামী শনিবার আসবেন। তার খেয়াল ছিল কোনো কবিরাজের কাছ থেকে তাবিজ নিয়ে তাকে দিয়ে দিবেন। ঐ সময় ফুলাতে হযরত শায়েখ যাকারিয়া রহ.-এর একজন মুরীদ হাফেজ আব্দুল লতীফ সাহেব মাদরসায় পড়াতেন। তিনি একাজ জানতেন। তার নিকট হতে তাবীজ নিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছিল। আমার আব্বা শনিবারের ওয়াদার উপর তাকে ছেড়ে দিলেন। সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে সকালের দুই নাম্বারের বয়ান তারই ছিল। মাওলানা সাহেব বলেন যে, কেবল সূর্য উঠছে কথা বলতে বলতে জুতা পাহারাদারের দিকে তাকাতেই আমার পিতার দিকে নজর পড়ে যায়। তিনি আমাকে নিয়ে সকাল সকালই পৌঁছে গিয়েছেন। কুমোরদের সকাল খুব তাড়াতাড়ি হয়। মানে তারা খুব সকালেই ঘুম থেকে ওঠে। গত সপ্তাহের কথা মনে পড়লো। তাবিজের কথা তো ভুলে গেছি। কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে কথা শেষ

করলাম। এরপর তিনি প্রথম এশরাকের নিয়ত বাঁধলেন– তখন হযরত শাহ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর একজন কর্মচারীকে কিছু পয়সা দিয়ে জায়নামাযে দাঁড় করিয়ে দেয়ার ঘটনা স্মরণ হয়ে গেল।

হে আল্লাহ! আমি তো জায়নামায পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম, দিল পরিবর্তন করা তোমার কাজ। এই ঘটনা থেকে উপায় গ্রহণ করে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়ে আমার আব্বাকে বললেন, আপনার ছেলেকে গোসল করতে বলুন। এরপর তিনি নামায শেষ করে আমাকে নিয়ে মসজিদের বাহিরে একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনবার কালেমায়ে তাইয়েবা পড়ালেন এবং হিন্দি ভাষায় এর অর্থ বলে দিলেন এবং আমাকে বললেন, ব্যাস! এক মালিক সবকিছু করতে পারেন। যদি তুমি একথা দিলে বসিয়ে নিতে পারো তবে মালিক তোমার কাউকে ডাকা ছাড়াই তোমার কাছে পৌঁছে দিবেন এবং আমাকে একটি কাগজে হিন্দি ভাষায় কালিমায়ে তাইয়েবা লিখে দিয়ে বললেন, সর্বদা একনিষ্ঠভাবে জঁপ করবে। বাহিরে এসে বাবাকে বললেন তাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছি। যদি সে এটা জঁপে তবে মালিক অবশ্যই শুনবেন। মাওলানা সাহেব বলেন, এরপর মসজিদে গিয়ে আবার দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে খুব দুআ করলেন, ইলাহী! আমি তো মুখে বলে দিয়েছি দিলের বিষয়তো আপনার হাতে।

আমরা দুইজন নিশ্চিন্তে ঘর ফিরলাম। চতুর্থদিন আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। খুশি মনেই তাকে রেখে চলে গেলেন। আমি খুব করে কলেমা জঁপতে থাকলাম। কখনো জোরে মজা করে পড়তাম কখনো আনন্দে আভিভূত হয়ে যেতাম। পরবর্তী শনিবার আব্বা দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হলেন। এই শনিবার আপনার পিতা আসলেন না। তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। তৃতীয় শনিবার আবার এলেন। ইজতেমা শেষ করে আপনার আব্বা যখন মসজিদ থেকে বের হলেন তখন আমার আব্বা তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং দুকেজি মিষ্টি পেশ করলেন। তিনি এই বলে ফেরৎ দিলেন যে এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। মালিক আপনার সহায় হয়েছেন। আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলে যে সারাক্ষণ আপনার দেয়া মন্ত্র পাঠ করে এতে কোনো ক্ষতি হবে না তো? তিনি বললেন! কোনো ক্ষতি হবেনা বরং ফায়দা হবে।

আমি সর্বদা সেই কালিমা জঁপতে থাকলাম। একদিন আনন্দচিত্তে খুব জোরে জোরে এই কালিমা পড়ছিলাম। ফুলাতে একজন মোল্লাজী ছিল যে

ছুতারের কাজ করতো। তার নাম ছিল গোলাম হোসাইন। তিনি আমাদের মহল্লায় দরজা জানালা বানাতেন। আমার এই কালিমা জঁপ করার শব্দ শুনে ফেললেন। তিনি আমাকে ভাল করেই চিনতেন। শোনামাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন। কিরে রঘু! কী পড়ছিস? আমি বললাম মন্ত্র পড়ছি। ফুলাতের মৌলভী সাহেব বাতলে দিয়েছিলেন। এর দ্বারাই তো আমার বউ ফিরে এসেছে। তিনি বললেন এটা তো ইসলামের কালিমা। এই কালিমা পড়েই তো মানুষ মুসলমান হয়। আমি বললাম, তাহলে কি আমি মুসলমান হয়ে গেছি? তিনি বললেন যদি সাচ্চা দিলে পড়ে থাকো তাহলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমিতো সাচ্চা দিলে এবং বিশ্বাসের সাথে পড়ি। তুমিও হয়তো এভাবে পড় না। তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি মুসলমান হয়ে গেছে। আমি বললাম, এখন তাহলে কী করণীয়? তিনি বললেন, এখন তোমার মুসলমানী নাম রাখতে হবে এবং নামায শিখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া উচিৎ। আমি বললাম, কী নাম রাখবো? তিনি বললেন আঃ রহমান রাখো। জিজ্ঞাসা করলাম, নামায কে শিখাবে? তিনি বললেন, আমি শিখাবো। আমি বললাম, ঠিক আছে।

তিনি প্রতি রাতে আমাকে সময় দিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি নামায শিখাতেন। ১৫-২০ দিনের মধ্যেই আমি সুন্দর করে নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে হিন্দী ভাষায় দুএকটি কিতাব এনে দিলেন যেমন বেহেস্তের চাবি। দোযখে শাস্তি ইত্যাদি আমি চুপে চুপে নামায পড়তে থাকি। আর বইগুলো বিবিকে দেখাই এবং তাকে আমার মুসলমান হওয়ার ঘটনা শুনাই তাকে কসম দিয়ে বলি প্রকৃত হিন্দু বিবি স্বামীর সাথে তার চিতায় পুড়ে তোমারও উচিৎ আমার ধর্মগ্রহণ করা। সে প্রস্তুত হয়ে গেল। মোল্লাজী গোলাম হোসেন তাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন। নাম রাখলেন ফাতিমা। এখন থেকে আমরা একে অপরের পাহারাদারী করে সতর্কতার সাথে নামায পড়তে লাগলাম। একদিন আমার আব্বা আমাকে নামায পড়তে দেখে খুব বকলেন। আমিও স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি আমার ভাইদেরকে সাথে নিয়ে আমাকে খুব মারলেন। ফলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম।

প্রশ্ন : এরপর কী হল?

উত্তর : আমি ৩০ দিন বাহিরে থাকলাম। আমি দিল্লী চলে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল এখানেই কোনো কাজে লেগে যাবো। আমার আব্বা পাঁচ-ছজন জন লোক

নিয়ে ফুলাত গেলেন। আপনার পিতার কাছে আমার সন্ধান জানতে চাইলেন। তিনি অজ্ঞতা জানালেন, কিন্তু তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি বলছিলেন, আপনি ওকে যাদু করেছেন। তাকে মুসলমান বানিয়েছেন। সে আপনার কাছেই আছে। যদি পরশুর মধ্যে সে ফিরে না আসে তাহলে আমরা থানায় রিপোর্ট করবো। আপনার আব্বা খুব চিন্তিত হলেন। তিনি বুঝালেন, আজ পর্যন্ত তার সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি আপনার উপকার করেছি তার বিনিময়ে আপনি এই দিলেন? আমি একথাও জানি না যে, সে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমার আব্বা কিছুক্ষণ অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করে ফিরে এলেন।

প্রশ্ন : তারপর?

উত্তর : জানিনা কেন যেন আমার দিল-মন পেরশান হতে লাগলো। ফুলাত যাওয়ার খুবই আগ্রহ জাগলো। আপনার আব্বার সাথে দেখা করতে মনে চাইলো। পেরেশানীতে রাতে ঘুমাতেও পরছিলাম না। বাধ্য হয়ে স্টেশনে গেলাম। রাতেই খাতুলীগামী একটি ট্রেনে খাতুলী পৌঁছলাম। সকাল সকালই পায়ে হেঁটে ফুলাত পৌঁছে গেলাম। মাওলানা সাহেব আমাকে দেখে খুবই খুশী হলেন। আমি ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, আমি তো খুব পেরেশান ছিলাম। আমাদের পরিবারের লোকেরা পুলিশকে খুবই ভয় পায়। খুব দুআ করছিলাম। আল্লাহর শোকর, তুমি চলে এসেছো। আমি তাকে বললাম, আপনি আমকে নিয়ে খাতুলী চলুন। আমার হাত ধরে আমার বাবার হাতে পৌঁছে দিয়ে বলুন, এই নিন আপনার ছেলে। এখন তাকে ছেড়ে দিবেন বা বন্দি করে রাখবেন এটা আপরার ব্যাপার এবং তার কাছেই জেনেন নিন, আমার সাথে তার কোনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা? তিনি বললেন, তোমার বাবা তোমাকে মারবেন। আমি বললাম, আমি নিজেকে সামলে নেবো। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আব্বার হাতে তুলে দিয়ে ঐ কথাগুলোই বললেন।

এরপর কিছু দিন আমি পরিস্থিতি ঠান্ডা করার জন্য ঘরেই অবস্থান করতে লাগলাম। আমাদের মহল্লার পাশেই কিছু মুসলমান বেকারীর কাজ করতো। যারা ছিল পুনার অধিবাসী। আমি হেকমতের সাথে আব্বাকে একথার উপর রাজী করলাম যে, আমিও তাদের সাথে সেখানে যাবো এবং কিছু কাজ-কারবার করবো। আমি পুনা চলে গেলাম এরপর বিবিকেও নিয়ে এলাম। সেখানে গিয়ে এলাকার কথা খুব মনে পড়তো। কিছু-আয় উপার্জন করে

খাতুলীর একটি মুসলিম পল্লীতে বাড়ি বানালাম। জামাআতে সময় লাগাতে থাকলাম। আলহামদুলিল্লাহ! দ্বীনের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের এক জামাআতের সাথে মুজাফফর নগর আমাদের একটি রোখ পড়লে পিড়াপীড়ি করে আমাকে জামাআতের আমীর বাননো হল। আমরা ফুলাত পৌঁছলাম। আমি আরবী লাহজায় আযান শিখেছিলাম। জোহরের আযান দিলাম। এরপর মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার ঘরে গেলাম তখন আপনার পিতা মাওলানা হয়ে গেছেন। আমি তার কাছে গেলাম কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। যখন বললাম আমি খাতুলির আপনার সেই রঘু তখন তিনি আমাকে নতুন আকৃতিতে দেখে খুব খুশি হলেন। এরপর যখন জানতে পারলেন, জোহরের আযান আমি দিয়েছি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব খুশি হলেন। যে সময়টুকু এ এলাকায় লাগিয়েছি তাতে খুব ফায়দা হয়েছে।

প্রশ্ন : এরপর কী হল?

উত্তর : এরপর মাওলানা সাহেবের পরামর্শে খাতুলীতে অবস্থান শুরু করলাম সেখানে থেকেই বাড়িতে টাকা পাঠাতাম। প্রায় ১০ বছর ধরে খাতুলীতে বসবাস করছি। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা জানতো যে, আমি পুনাতে আছি। প্রথমে নাপিতের দোকান দিয়েছিলাম কিন্তু মুসলমানদের দাড়ি মন্ডানো দেখে আমার আশ্চর্য লাগতো। নবীর সুন্নতের উপর অস্ত্র চালানো আমার জন্য মুশকিল ছিল। পরে আমি জেনারেল মার্চেন্ট এর দোকান খুললাম। আলহামদুলিল্লাহ! এখন খুব ভাল চলছে।

প্রশ্ন : শুনলাম আপনি একটি মক্তবও নাকি খুলেছেন?

উত্তর : আমার শ্বশুরালয়ের বেশ কিছু সদস্য মুসলমান হয়েছে।

আমার দুই শালাকে আল্লাহ তায়ালা আমার প্রচেষ্টায় হেদায়েত দান করেছেন। সেখানে তালীমের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। মাওলানা সাহেবের সাথে মাশওয়ারা করলাম। তিনি বললেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কিছু করা উচিৎ। আলহামদুলিল্লাহ! সেখানে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা পূর্বে মসজিদে চলতো। এখন গ্রামের লোকেরা জমিন দিয়েছে। চারটি কামরা তৈরী হয়েছে। ৫জন উস্তাদ কাজ করছেন। আল্লাহর শোকর ভাল কাজ চলছে।

প্রশ্ন : আপনার কতজন সন্তান এবং তারা কী করে?

উত্তর : আমার পাঁচ সন্তান। তিনজন পুত্র সন্তান। উসমান, আলী ও হাসান। আর দুইজন কন্যাসন্তান। আয়েশা ও যয়নব। আলহামদুলিল্লাহ সকলেই দ্বীনী তালীম হাসিল করছে। বড় ছেলে হাফেজ হয়ে গেছে এখন

গুজরাটের এক মাদরাসায় পড়াশোনা করেছে। মুহাম্মদ আলীর ১৬ পারা হিফয হয়েছে আর মুহাম্মদ হাসানের তিন পারা হেফজ হয়েছে। সে সবচেয়ে বেশী ধীশক্তি সম্পন্ন। আয়েশা ও যায়নব উভয়েরই কোরআন শিখা হয়ে গেছে। এখন হেফজ শুরু করেছে। আমি শবে কদরে এবং জামাআতে গিয়েও দুআ করেছি যে, হে আল্লাহ! আমার সবগুলো সন্তানকে হাফেজ আলেম এবং দ্বীনের দায়ী বানিয়ে দিন। ছাহাবায়ে কেরামের মত পাক্কা মুসলমান বানিয়ে দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেই সত্তা আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের পথে এনেছেন তিনি অবশ্যই আমার ফরিয়াদ শুনবেন।

প্রশ্ন : ইসলাম পূর্ব জীবনের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?

উত্তর : একথা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি, যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়েত না দিতেন তাহলে কুফরের উপর আমার মৃত্যু হত। মাঝে মাঝে পেরেশান হয়ে যাই এই ভেবে যে, না জানি আমার কোনো বদ আমলের কারণে আমার কাছ থেকে ইসলামের নেআমত ছিনিয়ে নেয়া হয়? কারণ, ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ হল প্রকৃত সফলতা। এগুলো ভেবে প্রায়ই আমি সেজদাবনত হয়ে যাই এবং দুআ করি, হে আল্লাহ! আপনি তো সকল দাতার দাতা। আপনার নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কোনো কিছু দিয়ে ফেরত নিল তার উদাহরণ হল বমি করে আবার তা চেটে খাওয়া। আপনি তো সজ্জন ও ভদ্রতম। আপনি আমাকে আমার চাওয়া ছাড়াই হেদায়েত দান করেছেন। অতএব, আর খাতেমাও যেন ঈমানের সাথেই হয়। আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমার খাতেমা ঈমানের সাথেই করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনিও দুআ করবেন।

প্রশ্ন : অবশ্যই আপনার জন্য দুআ করবো আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া আসসালামু আলাই কুম

উত্তরঃ ওয়া আলাইকুম আসসালাম

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও.আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, আগষ্ট- ২০০৪

এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সাদেক (সত্যেন্দ্র মল্লিক) সাহেবের সাক্ষাৎকার

না জানি আমার মত এমন কত লোক রয়েছে যারা ভিতরে ভিতরে মুসলমান। আর সত্য নবীর বাণী– প্রত্যেক শিশু ইসলামী ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক মুসলমানের একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, যত মানুষ অন্য ধর্মের উপর রয়েছে সে তার ঘর ও ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। এখন পথভোলা ব্যক্তিকে তার ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে তার সাথে কতইনা কল্যাণকর বিষয়। আপনার প্রচেষ্টায় মুসলমান হল আপনি তার আসল বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। মাওলানা সাহেব বলেন যে, আমি দাওয়াত দিতেই পারি না। যেহেতু আপনি এসে পড়েছেন আর (জানাশোনা) কোনো আলেমও (মানুষও) এখানে নেই অথচ কিছু কথা তো বলতেই হয়। তাই কিছু বললাম, আর এতেই আপনি মুসলমান হয়ে গেলেন। আসলে আপনি মুসলমান হননি বরং মুসলমান তো ছিলেনই। এখন শুধু প্রকাশ করলেন। যদি মুসলমানরা আপনার মতো যারা ভিতরে মুসলমান এমন লোকদেরকে সন্ধান করে, যারা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের স্বীকৃতি নিয়ে নেয়া হয় তাহলে হিন্দুস্তানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। আমি অত্যন্ত দায়িত্ববোধের সাথেই বলছি হিন্দুদের মধ্যে এমন ভিতরগত মুসলমানদের সংখ্যা বংশগত মুসলমানদের চেয়েও বেশী। সুতরাং মুসলমানরা তাদের সন্ধান করে যদি বের করতে পারে তাহলে দেশের চিত্রই পাল্টে যাবে।

আহমদ মাওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

মুহাম্মদ সদেকঃ -ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্ন : উকীল সাহেব! আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। এবার রমযানে আব্বু প্রায়ই আপনার কথা আলোচনা করতেন। কয়েকবার বয়ানের মধ্যেও বলেছেন। আমার ইচ্ছা, এবার আরমুগানে আপনার একটি সাক্ষাৎকার ছাপাবো।

উত্তর : আপনিই কি মাওলানা সাহেবের ছেলে মৌলভী আহমদ মাওয়াহ নদভী সাহেব?

প্রশ্ন : জী হ্যাঁ, আমার নামই আহমদ আওয়াহ। মাফ করবেন শব্দটা মূলত আওয়াহ আব্বাহ নয়।

উত্তর : 'আওয়াহ' শব্দের অর্থ কী?

প্রশ্ন : আওয়াহ শব্দের অর্থ হল, মাখলুকের উপর অত্যন্ত স্নেহশীল ও মমতাময়ী ব্যক্তি। কুরআনে হযরত ইবরাহীম আ.-এর শানে এ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ان ابراهيم لحليم اواه অর্থাৎ, বস্তুত ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, (আল্লাহর স্মরণে) অত্যধিক আহ-উহকারী (এবং সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল।

তার নামেই আমার নাম রেখেছিলেন আমার আব্বুর পীর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.।

উকিল সাহেব! আমাদের এখান থেকে (ফুলাত) উর্দু ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার নাম আরমুগান। এতে ইসলাম গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আব্বু আপনার ইন্টারভিউ নেয়ার আদেশ করেছেন।

প্রশ্ন : আরমুঁঘানের অর্থ কী?

উত্তর : শব্দটি মূলত 'আরমুগান' আরমুঘান নয়। আসলে আমি উর্দু ভাষা জানিনা আর আমরা গ্রাম্য ভাষায় কথা বলি।

প্রশ্ন : না উকিল সাহেব! কোনো সমস্যা নেই। আপনি তো উর্দু জানেন না। অনেক শিক্ষিত লোক এমনকি মৌলভীদেরও দেখেছি তারা উর্দু পারে না। আরমুগানের অর্থ হল, গিফট, হাদিয়া, তোহফা বা উপহার। আল্লাহর শোকর যে, এই পত্রিকাটি মানবতার জন্য উপহার হিসেবেই প্রমাণিত হচ্ছে। আব্বা হয় তো আপনাকে বলে থাকবেন।

উত্তর : হ্যাঁ, মাওলানা সাহেব ফোন করেছিলেন। বললেন যে, অল্প সময়ের জন্য তাশরীফ আনুন। আহমদ আওয়াহ আপনার একটি ইন্টারভিউ নিতে চাচ্ছে। আমারও খুব দেখা করতে মনে চাচ্ছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম তিনি সফরে গেছেন। আজই কি এসে পড়বেন?

প্রশ্ন : সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পড়বেন- রাত হতে পারে।

উত্তর : তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আসতে দেরী হলে সকালেই দেখা করবো।

প্রশ্ন : আপনার বংশ পরিচয় দিন।

উত্তর : আমি ১৫ই আগস্ট ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে দোরালার নিকটবর্তী নাখলা নামক গ্রামে এক জাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা সরকারী স্কুলে হেড মাস্টার এবং স্বাধীনতার অগ্রসেনানী ছিলেন। তার নাম ছিল মাষ্টার হাজারী লাল। ভাল উর্দু জানতেন। তিনি আগের যুগে উর্দু ভাষার উপর B.A করেছিলেন। একজন মাওলানা সাহেবের কাছে কোরআন শরীফ পড়া শিখেছিলেন। তিনি বলতেন তাঁর পিতা তাকে লেখাপড়ার জন্য দেওবন্দ পাঠিয়েছিলেন। আমাদের পরদাদা মাস্টার প্রেম চন্দ্র তো আধা মুসলমান ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালে দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের সাথে ইংরেজ বিরোধী জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাতবরণ করেন। ইংরেজরা তাকে গুলি করে শহীদ করেছিল। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. তাকে মৌলভী প্রেম চাঁদ বলে ডাকতেন। তার ছেলে বাবু শ্যাম লালও ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে শহীদ হন। আমার পিতা তার একমাত্র সন্তান ছিলেন। গান্ধিজী তাকে নিজের ছেলে বানিয়ে নিলেন। গান্ধিজীর সাথে তিনি বিদেশ সফরও করেছেন। ইংল্যান্ড আফ্রিকাতে গিয়েছেন।

অনেকদিন পর্যন্ত আমার পিতার কোনো সন্তান হচ্ছিল না। পরে এক ফকীর আমাকে আর্শীবাদ করে। মায়ের পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার উপর গান্ধিজীর অনেক প্রভাব ছিল। তিনি গান্ধিজীকে আধা মুসলমান মনে করতেন। বরং কখনো কখনো বলতেন যে গান্ধিজী ভিতরে ভিতরে মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, গান্ধিজী সকালে উঠে গোসল করতেন। প্রথমে কোরআন পড়তেন। তার পবিত্র কুরআনটি তিনি মিরাঠের একজন হাকীম সাহেবের মাধ্যমে রায়পুরের হযরতজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার বিশেষ বিশেষ স্থানে কিছু বিষয় লিখে রেখেছিলেন। আব্বা বলতেন রেশমী রুমাল অন্দোলনের পুরোধা দেওবন্দের মাওলানা মাহমুদ সাহেব গান্ধিজীকে গান্ধিজী বানিয়েছেন।

আমার শৈশব কালে আব্বার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমার আপন চাচা আমাকে লালন পালন করেছেন। একারণে আমি উর্দু শিখতে পারি নাই। মা বলেন যে মৃত্যুর সময় আব্বা এই বলে ওসীয়ত করেছিলেন যে আমাকে যেন দেওবন্দ মাদরাসায় পড়ানো হয়। কিন্তু বংশের লোকেরা আব্বার মৃত্যুর পর তার এ অসীয়ত মানতে রাজী হলনা। দোরালা থেকে হাইস্কুল ও ইন্টার পাশ

করার পর মীরাঠ কলেজ থেকে B.A এবং পরে L.L.B করি এবং মিরাঠ কোর্টেই ওকালতী শুরু করি। প্রায় ১০ বছর প্রাকটিস করি। কিন্তু একাজ করতে দিল সায় দিতো না। মিথ্যা সাক্ষ্য, ধোঁকা এমন কি সত্য মামলার জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতো। দীর্ঘদিন যাবত অন্তরাত্মার সাথে মোকাবেলা করে আসছিলাম এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ওকালতী করতে থাকলাম। কিন্তু একথা সর্বদাই দিলের মধ্যে থাকতো যে মানুষের রুজী রোজগার হালাল রাখা উচিৎ। ধোঁকাবাজী ও মিথ্যার মাধ্যমে উপার্জিত রুজী-দ্বারা জীবন দুর্বিষহ হবে এবং আত্মা কুলষিত হয়ে পড়বে। এ জন্য ১৯৯৫ খৃঃ ওকালতীর পেশা ছেড়ে দেই এবং চাষাবাদ শুরু করি। সাথে ছোটখাটো ব্যবসায়ও জড়িত হই। আল্লাহর ফযল ও করমে খুব সহজেই জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের কিছু স্মৃতিচারণ করুন।

উত্তর : মৌলভী আহমদ সাহেব আসলে আমি প্রকৃতিগতভাবেই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

প্রশ্ন : এটাতো একেবারে বাস্তব সত্য কথা। শুধু আপনি কেন- প্রত্যেক নবজাতক স্বভাবগতভাবেই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস :

كل مولود يولد على الفطرة فا بواه يهود انه او ينصرانه او يمسجسا نه

অর্থ : প্রত্যেক শিশু ইসলামী ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অতপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান বা মূর্তিপূজক বানায়।

উত্তর : আমার অবস্থা হল এই যে আমার বাবা যদি আর কিছু দিন বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আমি দেওবন্দের উস্তাদ হতে পারতাম। হয়তো আপনারই উস্তাদ হতাম, কারণ আপনি দেওবন্দ থেকেই ফারেগ হয়েছেন।

প্রশ্ন : না বরং আমি দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের অপর একটি বড় মাদরাসায় নদওয়াতুল উলামা যেটা লক্ষ্মৌতে অবস্থিত সেখানে পড়ালেখা করেছি।

উত্তর : নদওয়া! মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর মাদরাসা! সেখানে আমি গিয়েছি। আলী মিয়া নদবী রহ. তো আমাদের দেশের গর্ব। আরবের উলামায়ে কেরাম তাকে সকলের বড় মুরুব্বী এবং বড় মাপের আলেম মনে করতেন। আমাদের মাওলানা কালীম ছিদ্দীকী সাহেব তারই খাছ মুরীদ।

প্রশ্ন : জী, জী, এটাই নদওয়া।

উত্তর : আপনি সত্য বলেছেন, প্রতিটি শিশুই প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। একারণেই আমাদের দেশে ছোট শিশু মারা গেলে দাফন করা হয়!

আল্লাহর কী শান! কিভাবে তিনি বান্দাকে আগুন থেকে বাঁচান। কিন্তু মাওলানা আহমদ সাহেব! আমি তো ইসলামী ন্যাচারের উপরই বড় হয়েছি। হিন্দুধর্মের সাথে আমার মুনাসাবাত ছিল না। আমার পরিবার যদিও আর্য সমাজী, আর আর্যসামাজে মূর্তিপূজা ইসলামের চেয়েও বেশী ঘৃণা করা হয়। কিন্তু আর্য সমাজেও গোমরাহী আর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আমার চোখে কিছুই পড়েনা? ওকালতীর সময় ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওকালতী ছাড়ার পর এখন যেহেতু কোনো কাজ নেই তাই আর্য ও অন্যান্য ধর্ম নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি। আমি বুঝলাম, স্বামী দয়ানন্দ স্বরসতী যা কিছু সংস্কার করেছে তা ইসলামেরই অবদানে। আর বিবেকানন্দজী তো কিছু দিন মুসলমানও ছিলেন। আমি খুবই উৎকণ্ঠিত হই। যদি মাওলানা কালীম ছিদ্দীকী সাহেব বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাহলে ইসলামই তার সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে দিতো! আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ভিন্ন পরিবেশে থাকার কারণে ইসলামের শিক্ষা কমই পেয়েছি। তারপরও কোনো মসজিদে নামায হলে আর আমি সেদিক দিয়ে অতিক্রম করলে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বড় আফসোসের সাথে তাকিয়ে থাকতাম। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে বলতাম, মালিক! আপনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। অসংখ্য বার এমনটি হয়েছে। আমি দুই বার ঈদের নামায দেখার জন্য দিল্লীর জামে মসজিদ পর্যন্ত গিয়েছি। একবার রাতেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। মসজিদে অবস্থানরত জনসমুদ্র দেখে আমি আর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। খুব কান্না পেল। সেদিন আল্লাহর কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করে আবারও অভিযোগ করলাম।

প্রশ্ন : 'মাশাআল্লাহ' আল্লাহ আপনার আবদার রক্ষা করেছেন। আল্লাহ আপনার ফরিয়াদ কবুল করেছেন। আপনার তামান্না পূরো হয়েছে। তা কিভাবে মুসলমান হলেন! সে ঘটনাটি বলুন!

উত্তর : হ্যাঁ বলছি। এ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে মোবাইলে একটি ফোন এল। আমি রিসিভ কররাম। কথা শুনে বুঝতে পারলাম আপনার আব্বু। তিনি

বললেন আসসালামু আলইকুম আমি বললাম ওয়ালাইকুম সালাম। তিনি বললেন, মাওলানা রাশেদ সাহেব বলছিলেন? আমি বললাম আপনি রং নাম্বারে ডায়াল করেছেন। এটা রাশেদের ফোন নয়। তিনি বললেন, মাফ করবেন। এই বলেই ফোন কেটে দিলেন। আসলে মাওলানা সাহেবের একজন সাথী ছিলেন মাওলানা রাশেদ-যিনি রাটুয়াতে একটি মাদরাসা চালান-তার নাম্বার মাওলানা সাহেব ভুল সেভ করেছিলেন। এরপর সঠিকটাও সেভ করেছেন কিন্তু ভুল নাম্বারটি (যেটা আমার নাম্বার) ডিলেট করতে ভুলে গেলেন।

প্রথম সিরিয়ালে আমার নাম্বারটি ছিলো। দেড় মাস পর হঠাৎ ফোন এলো আসসালামু আলইকুম উত্তর না দিয়ে বললাম– ভাই নাম্বারটা ভালভাবে দেখে নিন। বারবার বিরক্ত কেন করছেন? মাওলানা সাহেব পুনরায় ক্ষমা চাইলেন। আগস্টে আবার ফোন এলো। রিসিভ করতে পুনরায় অপর প্রান্ত থেকে আসসালামু আলইকুম ভেসে এলো। আমি এবার একটু কঠোর ভাষায় বললাম, ভাই! আপনি কেন নাম্বারটা ঠিক করেছেন না? আর কেনইবা বারবার বিরক্ত করছেন? মাওলানা সাহেব পুনরায় ক্ষমা চেয়ে ফোন কেটে দিলেন। আমার ভাগ্য ভাল ছিল আর আল্লাহর করম ছিল। এবার মাওলানা সাহেব নাম্বার ডিলেট করলেন কিন্তু আমার উপর মালিকের রহম হল, মাওলানা রাশেদ সাহেবের নাম্বার ভুলে ডিলেট হয়ে গেল আর আমার নাম্বার তখনো থেকে গেল।

এ বছর রমযানে ১৪ই সেপ্টেম্বর মাওলানা সাহেবের ফোন এলো– আসসালামু আলইকুম আমি কঠোর ভাষায় বললাম, ভাইজান এটা রং নাম্বার। কতদিন ধরে আপনাকে বলছি। আপনি কি আমার জান নেবেন? মাওলানা সাহেব হেসে বললেন ভাই সাহেব আপনি কিভাবে বললেন যে এটা রং নাম্বার? এটা আমার ভায়ের নাম্বার, আমি বললাম, ভাই! এটা আমার নাম্বার আপনার ভায়ের নয়। মাওলানা সাহেব বললেন, এটা কি আপানার নাম্বার নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ এটা আমার নাম্বার।

মাওলানা সাহেব বললেন, আপনার নাম কী? আমি বললাম, সত্তেন্দ্র মল্লিক। মাওলানা সাহেব বললেন, হ্যাঁ ভাই সত্যেন্দ্র মল্লিক আপনার সাথেই তো কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি তো আমার ভাই আমাকে আপনি চিনেন না। আমি বললাম, না আমি আপনাকে চিনি না। মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি আমি সকলেই কি এক মাতা-পিতার সন্তান নই? আমি বললাম, হ্যাঁ।

মাওলানা সাহেব বললেন এক পিতা-মাতার সন্তান তো পরস্পর ভাই। আপনি আপনার আপন ভাইকেও চিনেন না। আপনার বয়স কত? বললাম ৫৬ বছর। মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি তো আমার বড় ভাই এবং আমরা রক্ত সম্পর্কীয় দুই ভাই। ছোট ভায়ের তো খোঁজ খবর নেন না। ছোট ভাই সালাম দেয় আর আপনি প্রতিবারই বকাবকি করেন? অথচ বড় ভায়ের উপর আমার হক ছিল যে আপনি প্রতিদিন আমার খোঁজ খবর নিবেন। বাড়িতে এসে হালচাল জিজ্ঞাসা করবেন। চলাফেরার প্রতি খেয়াল রাখবেন। পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবর নিবেন। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় থাকেন? আমি বললাম দোরালার পাশে নাখলা নামক স্থানে থাকি। মাওলানা সাহেব বললেন, এতো কাছে থাকেন, প্রকৃত ভাই তো দূর-দূরান্ত থেকেও আসে। অনেক ভাই পাকিস্তানে থাকে। পাকিস্তানে ভিসা পাওয়া কত কঠিন কিন্তু মানুষ দূরবর্তী আত্মীয়ের খোঁজও নিতে আসে। আপনি আমার এত কাছের প্রতিবেশী এবং রক্ত সম্পর্কীয় ভাই কিন্তু আজ পর্যন্ত একবারও খোঁজ-খবর নিলেন না। উল্টো আমি সালাম করলে আপনি কর্কশ ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন।

মাওলানা সাহেবের এমন হৃদয়গ্রাহী কিছু কথা শুনে সত্যিই আমার মন গলে গেল। ভীষণ শরম পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনি কোথায় থাকেন? তিনি উত্তর দিলেন খাতুলীর নিকবর্তী ফুলাতে থাকি আমি। বললাম ওখানে তো একবার মহিষ কিনতে গিয়েছিলাম। ভাই সাহেব! আমি আজই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার উচিৎ ছিল ভাইয়ের কাছে যাওয়া। মাওলানা সাহেব বললেন, আজ তো সফরে যাচ্ছি, কালও ফিরতে রাত হবে, আপনি পরশুদিন আসেন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ! ১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হল। আমি মাওলানা সাহেবের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, গ্রামে ঢুকতেই একটি মাদরাসা দেখতে পাবেন। ওখানে কালীম নাম বললেই লোকেরা দেখিয়ে দিবে।

১৬ই- সেপ্টেম্বর বাসযোগে খাতুলী পৌঁছলাম। খাতুলী থেকে ছোট মোটরযানে চড়ে বসলাম। গাড়ীওয়ালাকে বললাম, ভাই ফুলাতের মাদরাসায় মাওলানা কালীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। গাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করল হযরতের সাথে দেখা করতে চান? আমি বললাম কালীম, সে বলল, হ্যাঁ

উনিই হযরত! মনে হয় মুসলমান হতে এসেছেন? আমি হেসে বললাম, তিনি যদি বানান তাহলে হয়ে যবো। গাড়ী থেকে নেমেই মাওলানা সাহেবের বাড়ী পৌছলাম। মাওলান সাহেবের সামনে চেয়ারে কিছু লোক বসা ছিল। দাঁড়িয়েই সাক্ষাৎ করলাম এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি এডভোকেট সত্যেন্দ্র মল্লিক। সাথে সাথে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব মুহাব্বতের সাথে স্বাগত জানালেন। বারবার বলতে লাগলেন বড় ভাই খোঁজ নিতে নিজেই এসে পড়লেন, রমযান মাস হওয়া সত্ত্বেও চা নাশতার ব্যবস্থা করলেন। চা পান করতে এসে কথা শুরু হল। ইসলামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকলেন। চা শেষ না হতেই আমি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। আমার নাম রাখা হল সাদেক। এবার খাতুলী পর্যন্ত নিজের গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিলেন। সাথে আপনার আমানত।

'মরণের পরে কী হবে' বই দুটি দিয়ে দিলেন। আমি কয়েকবার বই দুটি পড়লাম এবং আমার বিবির কাছে মুসলমান হওয়ার বিষয়টি বললাম। সে প্রথমে খুব কান্নকাটি করলো। আমি তাকে বললাম আমার কাছে দুটি কিতাব আছে আগে কিতাবগুলো তিনবার করে পড়। এরপর যদি তুমি বল তাহলে আমি আবারও হিন্দু হয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। আমার বিবি আপনার আমানত' বইটি একবার, পড়ে মরণের পরে কী হবে পড়তে শুরু করেছে মাত্র। এর মাঝে একদিন আমার কাছে এসে বললো আমাকেও মুসলমান বানিয়ে দিন। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। আমাদের দুই সন্তানও মুসলমান হয়ে গেল। তাদের তিনজনকেই আমি ফুলাতে এনে কালিমা পড়িয়েছি। বিবির নাম রেখেছি ফাতেমা, মেয়ের নাম আমিনা আর ছেলের নাম মুহাম্মদ আহমদ রাখা হয়েছে। এ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার পরিবারের সকলেই মুসলমান।

প্রশ্ন : আপনার বংশের লোকেরাও কি মুসলমান হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেছিল?

উত্তর : বংশের লোকেরা আমার ঘোর শত্রুতে পরিণত হল। শুরু থেকেই তারা এমনটি করে আসছিল। এক পর্যায়ে তারা গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন করলো। কিন্তু আমি নিজেও তো একজন উকিল। এজন্য আমি I.G.S.S.P. বরাবর একটি দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলাম। প্রথমে অনেক হট্টগোল হলেও এখন পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূল। আমি দিল্লীতে একটি বাড়ি বানিয়েছিলাম। দুই বাচ্চা দিল্লীতেই পড়াশুনা করে। মাওলানা সাহেবের পরামর্শেই বংশের লোকদের থেকে একটু দূরে দিল্লীতেই বসবাসের পণ্ঢান করি।

প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে আপনার কেমন লাগছে?

উত্তর : মুসলমান হয়ে মনে হচ্ছে যেন আমি বাড়িঘর হারিয়ে আবারও তা ফিরে পেয়েছি। এক কথায় আমি আমার অনেকদিনের হারানো সম্পদ পুনরায় ফিরে পেয়েছি। আমি যতই ইসলাম নিয়ে গবেষণা করি ততই আমার বাবা-মা, দাদা-পরদাদার স্মরণ আমাকে পীড়া দেয়।

প্রশ্ন : আপনি এমনটি ভাবছেন কেন? এমন তো হতে পারে যে, কেউ তাদের কালিমা পড়িয়েছে? বা মৃত্যুর সময় ফেরেস্তারা তাদের কালিমা পড়িয়ে দিয়েছেন।

উত্তর : মৌলভী আহমদ সাহেব! আমি অবুঝ শিশু নই। আমি শৈশবে আমার পিতাজীকে চিতায় জ্বালিয়েছি। এবং নির্মমভাবে পুড়ে ছাই হতে দেখেছি। যেই পিতা তার সন্তানকে দেওবন্দ মাদরাসায় পড়ানোর ওসীয়ত করে যায় তার হিন্দু হয়ে চিতায় পোড়াটা মৌলভী ও মুসলমানদের জুলুম ছাড়া আর কী হতে পারে?

প্রশ্ন : আপনি যেভাবে তাদের অবস্থায় বর্ণনা দিলেন তাতে আমি আশাবাদী অবশ্যই আল্লাহ তাদের ঈমানের দৌলত দান করে থাকবেন। আর দুনিয়ার আগুনের সাথে আখেরাতের আগুনের কোনো সম্পর্ক নেই।

উত্তর : ঈদের রাতে এসব কথা মনে করে আমার একটুও ঘুম হয়নি। আমি খুব পেরেশান হচ্ছিলাম। মনে চাচ্ছিল সকল মুসলমানকে গালিগালাজ করি। রাতে পুনরায় উযু করলাম। আহত হৃদয়ে নামাযের নিয়ত করলাম। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলাম। সকালের দিকে চোখ লেগে এলে স্বপ্নে বাবা ও দাদাকে দেখলাম তারা বলছেন বেটা সাদেক। আল্লাহ সকল মানুষের প্রভু শুধু মুসলমানদের নয়। আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমরাও মুসলমান। এতে কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আপনিতো ফুলাত যাতায়াত করেন কিন্তু দ্বীন শেখার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : নভেম্বর মাসে জামাআতে যাবো। দুই-তিন দিন ফোনে কথা না হলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। আমি মাওলানা সাহেবকে বলেছি আল্লাহ অতি মেহেরবান। আপনি ডিলেট করা সত্ত্বেও তিনি নিজের লিস্ট থেকে আমাকে ডিলেট করেননি। আমার মন চাচ্ছে আমার সকল পরিচিতদের নাম্বার আপনার মোবাইলে সেভ করে দেই। যাতে সকলেই হেদায়েত লাভ করতে পারে। মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

আমার মোবাইলে অনেক ডাক্তার ও অমুসলিমদের নাম্বার সেভ করা আছে। আমার চিন্তা হচ্ছে যে এঁরা কেয়ামতের দিন আমার গলা চেপে ধরে বলবে - এর কাছে আমাদের ফোন নাম্বারও ছিল তারপরও কোনো ফিকির করেনি। যে সকল লোকদের নাম্বার আমরা মোবাইলে সেভ করি তাদের সাথে আমাদের লেনদেন বা বন্ধুত্ব হওয়া তো অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহর নবীর ফরমান, আল্লাহর জান্নাত ঐ সমস্ত লোকদের উপর হারাম পরা মানুষের সাথে লেনদেন করে কিন্তু তাদের কাছে দ্বীন পৌছায় না। একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, মোবাইল ফোন ঐ সমস্ত লোকদের সাথে সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিবে। তাই আমার চিন্তা হল, কমপক্ষে তাদের কাছে দাওয়াত তো পৌছাতে হবে। মাওলানা সাহেব বলেন, এরপর থেকে আমি সকলের সাথে যোগাযোগ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! একজন ডাক্তার ও দিল্লীর একজন উকিল সাহেব কালিমা পড়েছেন। এই দুই জনসহ বাকীরা যদি হেদায়েত লাভ করে তাহলে তাদের সকলের সওয়াব আপনিও পাবেন।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : না জানি আমার মতো এমন কত লোক রয়েছে যারা ভিতরে ভিতরে মুসলমান। আর সত্য নবীর বাণী– প্রত্যেক শিশু ইসলামী ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক মুসলমানের একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, যত মানুষ অন্য ধর্মের উপর রয়েছে সে তার ঘর ও ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। এখন পথভোলা ব্যক্তিকে তার ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে তার সাথে কতইনা কল্যাণকর বিষয়। আপনার প্রচেষ্টায় মুসলমান হল আপনি তার আসল বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।

মাওলানা সাহেব বলেন যে, আমি দাওয়াত দিতেই পারি না। যেহেতু আপনি এসে পড়েছেন আর (জানাশোনা) কোনো আলেমও (মানুষও) এখানে নেই অথচ কিছু কথা তো বলতেই হয়-তাই কিছু বললাম, আর এতেই আপনি মুসলমান হয়ে গেলেন। আসলে আপনি মুসলমান হননি বরং মুসলমানতো ছিলেনই। এখন শুধু প্রকাশ করলেন। যদি মুসলমানরা আপনার মতো যারা ভিতরে মুসলমান এমন লোকদের সন্ধান করে, যারা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের স্বীকৃতি নিয়ে নেয়া হয় তাহলে হিন্দুস্তানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। আমি অত্যন্ত দায়িত্ববোধের সাথেই

বলছি হিন্দুদের মধ্যে এমন ভিতরগত মুসলমানদের সংখ্যা বংশগত মুসলমানদের চেয়েও বেশী। সুতরাং মুসলমানরা তাদের সন্ধান করে যদি বের করতে পারে তাহলে দেশের চিত্রই পাল্টে যাবে।

আমার মনে হয় যদি মুসলমানরা একশনের পথ পরিহার করে যদি শুধু অমুসলিমদের মধ্য থেকে ভিতরগত মুসলমানদের তালাশ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তাহলে শয়তান ও বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কত ভিতরগত মুসলমান ভিতরে ঈমান লালন করেই মৃত্যুবরণ করছে। আমার বিশ্বাস গান্ধিজী ভিতরগত মুসলমান ছিলেন। জওহর লাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, খাতুলীর পন্ডিত সুন্দর লাল, সকলেই ভিতরগত মুসলমান ছিলেন। মুসলমানরা তাদের হক আদায় করেনি। আজও এমন বহু লোকের কথা শোনা যায়।

বিল ক্লিন্টন, নেলসন ম্যান্ডেলা, প্রিন্স চার্লস ভিতরগত মুসলমান। স্বয়ং হিন্দুস্তানেই কত হিন্দু রয়েছে যার মধ্যে হিন্দুদের একটি খোলস মাত্র ধারণ করে আছে আর ভেতরে ভেতরে পাক্কা মুসলমান।

হায় যদি সকলেই সম্মিলিতভাবে এই ব্যাপারে সচেষ্ট হত যে ভিতরগত সকল অমুসলমান নিজেদের ঈমানকে প্রকাশ করে মুসলমানদের মাঝে শামিল হয়ে যায়ক তাহলে শুধু আমাদের দেশই নয় বরং পুরা বিশ্বের মানচিত্রই পাল্টে যেত।

আপনাকেও অনেক শুকরিয়া ধন্যবাদ। অনেক সময় দিয়েছেন। السلام আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **নভেম্বর-** ২০০৮

জনাবা আয়েশা রাজী সাহেবা (নওমুসলিম)-এর সাক্ষাৎকার

হক্ব এবং সত্যের জন্য মানুষের কুরবানী দিতে হয়। মানুষ আযম করবে এবং হক অনুসন্ধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হবে। তাহলে সত্য তার সামনে প্রকাশিত হবেই। আমি এমন অবস্থায়ই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, হক্বের উপর ভরসা করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমাকে সাহস দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার লক্ষে পৌঁছেছি। আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল এবং অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। কারণ, আসল জিনিস (ঈমানের হালাতে মৃত্যু) তো এখনো বাকী আছে।

আসমা জাতুল ফাওযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আয়েশা রাজী : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আয়েশা রাজী, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, আরমুগানে মানুষের কারগুজারী ছাপা হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার ইন্টারভিউ নেওয়া হয় নাই, আমি কয়েকবার আব্বাকে বলেছিলাম যে, আয়েশা রাজীর ইন্টারভিউ ছাপানো দরকার!

উত্তর : আমার নিজেরও এমন ইচ্ছা ছিল, আমি উমরের পিতাকে কয়েকবার বলেছি যে, হযরতজীকে বল এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে যেন আমার নামও এসে যায়। হতে পারে এটাই আমার নাজাতের ওসীলা হবে। হযরত ফোনে কয়েকবার বলেছিলেনও, কিন্তু সব কিছুর একটা সময় আছে, এজন্য গত মাসে হযরত হুকুম করলেন এখানে এসে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, পরবর্তী মাসে তা ছাপা হবে। আলহামদুলিল্লাহ সেই সময় এসে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার বংশীয় পরিচয় দিন!

উত্তর : আমি পানি পথের হরিয়ানার অধিবাসী। আপনার জানা আছে, হিন্দুস্তানের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিকতা সকল দিক থেকেই দেশের মধ্যে তার উল্লেখযোগ্য অবস্থান রয়েছে। এই পানিপথের যমুনা নদীর তীরবর্তী এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ শর্মা পরিবারে আমার জন্ম।

আমার পরিবার অত্যন্ত ধার্মিক, আমরা চার ভাই, তিন বোন। আমি সবার ছোট। আমাদের গ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি ঘর ছিল। তারা যেমন দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকে কমজোর ছিল, তেমনি ধর্মীয় দিক থেকে কমজোর ছিল।

অনেকের তো সম্ভবত এটাও জানা ছিল না যে, ইসলাম কী জিনিস বরং অনেকে নামের দিক থেকেও মুসলমান ছিল না অর্থাৎ তাদের এবং তাদের সন্তানদের নাম হিন্দুদের মত রাখত। আমি স্কুলে ভর্তি হলাম, আমার সাথে দু-তিন জন মুসলমান মেয়েও পড়ত। তাদের মধ্যে একজনের মা ছিল ইউপির। দ্বীনের ব্যাপারে তার কিছু জানা শোনা ছিলো, অন্যথায় অধিকাংশ মেয়েদের এটাই জানা ছিল না যে, কালিমা কী? প্রাইমারী শেষ করার পর আমার বড় ভাই আমাকে লুধিয়ানা ভর্তি করিয়ে দেন সেখানে প্রথমে হাইস্কুল পাশ করে আলহামদুলিল্লাহ দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি। আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষায় ফেলতে চাচ্ছিলেন, তাই লুধিয়ানা যাওয়াটাই আমার জীবনের মোড় পরিবর্তনের মাধ্যম হয়।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : পূর্বেই বলেছি আমার বড় ভাই রাজেন্দ্র শর্মা লুধিয়ানা থাকতেন। তিনি আমাকে লুধিয়ানা নিয়ে যান। সেখানে একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি হই। আমাকে এক খৃস্টান মেয়ে বাইবেল দেয়। আমি জন্মগতভাবেই ধার্মিক ছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে সত্য নবীর সত্য বাণী, "প্রত্যেক শিশু স্বভাবজাত ভাবে ইসলামের উপর জন্ম লাভ করে কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী খৃস্টান অথবা মূর্তি পূজাক বানায়।" কিছু মানুষের স্বভাব এমন হয় যে, তার উপর পরিবেশের প্রভাব অন্যদের তুলনায় কম পড়ে, সম্ভবত আমার স্বভাব তেমনি ছিল।

নিজ ধর্মের প্রতি আমার কোনো আস্থা ছিল না। আমার নিকট এসব অর্থহীন ফালতুও মনে হত। যেন কোনো নিষ্প্রাণ নাটক আর কি। এজন্য আমার ভেতর সত্যের তৃষ্ণা অনুভব করি।

আমি বাইবেল পড়লাম, কিন্তু বাইবেলের তিনে এক এবং একে তিনের মত দুর্বোধ্য বিষয় আসাকে দ্বন্দ্বে ফেলে দিল। আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত ঈসা আ. তাশরীফ এনেছেন এবং বলছেন, আমার ধর্ম ইসলাম, আর বর্তমান খৃস্টধর্ম আমার আনীত ধর্মের বিকৃত রূপ। চোখ খোলার পর ইসলাম সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হল কিন্তু লুধিয়ানায় ইসলামী কালচার সম্বন্ধে জানা আমার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। একদা স্কুল থেকে ফিরার পথে এক মসজিদে মাহফিল হচ্ছিল। বাহিরে চা, টুপিওয়ালারা দোকান দিয়েছিল। সেখানে হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় ইসলামী বইও ছিল। আমি কয়েকটা বই কিনলাম। তার মধ্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতও ছিল। লেখকের নাম এখন মনে নাই। আমি পড়ার পর মনে হল, এটাই আমার পিপাসিত জিনিস। এরপর ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশী জানার ইচ্ছা হল। আল্লাহ

তাআলা অনুগ্রহ করলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু না কিছু আসতে থাকল। আমি লুধিয়ানাতে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি মুসলমান হব। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এই কাজ দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম সাহেব করেন। ছুটিতে আমি বাড়ি এসেছিলাম। শিরকের পরিবেশে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হত। বার বার বাড়ি ছাড়ার কথা মনে হল।

আমি এক মুসলমান পরিবারের সাথে সম্পর্ক করলাম এবং তাদের দিয়ে ইউপি থেকে বোরকা আনালাম। একদিন সাহরীর সময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পায়ে হেঁটে যমুনা পর্যন্ত পৌছলাম, যমুনা পার হওয়ার জন্য নদীতে নেমে পড়লাম, নদীতে আমার গলা পানি ছিল কয়েকবার মনে হল যে, আমি ডুবে যাব, আমাকে একজন বলেছিল, বেশির চেয়ে বেশি কোমর পানি হবে। কিন্তু সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় পানি বেড়ে গিয়েছিল। আমি কয়েকবার মনে মনে বললাম আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন যদি আমি মারা যাই তবে আমার এ মরণ আপনার মহব্বত, ভালবাসা এবং আপনার তালাশে হবে। বোন আসমা, জানিনা কোথায় আমি সেদিন এত সাহস পেয়েছিলাম। আল্লাহর শোকর যমুনা পার হয়ে গেলাম।

যমুনা পার হয়ে দিল্লীর রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, আমাকে বরোত হয়ে দিল্লী যেতে হবে। এক মুসলমান ভাই আমাকে বলল যে, সেখানে মুসলমান হওয়ার জন্য দুজন জানা শোনা ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যেতে হবে অন্যথায় সেখানে এই কাজ হবে না। আমি বললাম তাহলে আমি কী করব, আমার তো অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। তখন সে বলল, তাহলে তুমি এক কাজ করো দেওবন্দ চলে যাও। আমি বললাম আমি একা দেওবন্দ কিভাবে যাব? তখন আমার উপর তার দয়া হল সে আমাকে বলল দেওবন্দ পর্যন্ত আমি তোমাকে পৌঁছে দিব। তবে আমরা বাসে একটু দুরে দূরে বসব, আমি তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে প্রথমে কিরানা তারপর শামেলী সেখান থেকে নানুতা হয়ে দেওবন্দ নিয়ে যান, দুইটার দিকে আমরা দেওবন্দ পৌঁছি। তারা মাদরাসায় মুসলমান বানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন এক মাওলানা বলল, একে সদর গেটের মাওলানা আসলাম এর নিকট নিয়ে যাও, সেখানে এই কাজ হয়ে যাবে। তিনি মাওলানা আসলাম সাহেবের নিকট নিয়ে যান, মাওলানা আসলাম সাহেব আমাদের খানা খাওয়ান -এবং সান্ত্বনা দেন এবং হযরত (মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম) -এর সাথে ফুলাতে যোগাযোগ করেন। হযরত বললেন, এখনই কালিমা পড়িয়ে দিন আর দু'-একদিন পর ফুলাত পাঠিয়ে দিবেন। তিনি

আমাকে কালেমা পড়ান আমার নাম রাখেন আয়েশা। দুই-তিন দিন পর ফুলাত পাঠিয়ে দেন।

ফুলাতে কয়েকদিন ছিলাম সেখানে নামায-কালাম শিখতে থাকলাম। তারপর পড়াশোনা এবং দ্বীন শিখার জন্য মালিয়ার কোটলা শাকেরা রাজীর কাছে পাঠান। সেখানে আমি কুরআন শরীফ এবং দ্বীনি বিষয়গুলি শিখি। শাকেরা রাজী অত্যন্ত ভালো মেয়ে, আমাকে অনেক মুহাব্বতের সাথে রাখেন। কুরআন শরীফ শেষ করার পর ফুলাত ফিরে আসলাম তখন হযরত দিল্লীর এক যুবক হাবীবুর রহমানের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দেন।

প্রশ্ন : আপনার কাছে এই নতুন পরিবেশ আশ্চর্যজনক মনে হয়নি? বাবা-মা ছাড়া বিবাহ কেমন লেগেছে?

উত্তর : হযরত মাওলানা আসলাম সাহেব এবং তাদের পরিবারের লোকেরা আমার সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছে। ঈমান আনার মত সৌভাগ্য লাভ করতে পারা এবং আখেরাতের সফলতার অনুভূতি অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি কখনো দিলে কিছু আসত তাহলে সাথে সাথে নিজেকে বুঝাতাম।

প্রশ্ন : আপনার শ্বশুর কিভাবে বিবাহ দিয়েছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্বামী হযরতের হাতে বাইয়াত। তাঁর মাতা অত্যন্ত ভালো মানুষ। পরিপূর্ণ সুন্নত মুতাবেক অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে আমাদের বিবাহ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার নিজেকে একাকি মনে হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী কী করেন?

উত্তর : তিনি এক্সপোর্ট-এর কাজ করেন, কিন্তু তাঁর উপর এমন এমন পরিস্থিতি এসেছে যা মনে হয় অনেক কম লোকেরই এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহস দেন, আমার স্বামীর দাওয়াতের আগ্রহ এবং নিত্যদিনের সাফল্য আমাদের আগ্রহ উদ্দীপনা এবং সাহস বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের লোকজন আপনাকে খুঁজেনি?

উত্তর : শুরুতে অনেক খুঁজাখুজি করেছে। থানায় জি.ডি করেছে। গ্রামের কিছু লোককে পেরেশান করেছে। আমি চলে আসার সময় একটি চিরকুট লিখে এসেছিলাম, আমি কোনো ছেলের কারণে যাচ্ছি না, কেউ আমাকে নিয়েও যাচ্ছেনা; বরং আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম তা-আমি পেয়ে গেছি। আমাকে খোঁজা অনর্থক। যদি আল্লাহ চায় তাহলে আমি নিজেই যোগাযোগ করব। কিন্তু তারপরও তারা অনেক খোঁজাখুজি করেছে।

আমার আব্বার ইন্তেকাল আমার সামনেই হয়েছিল। আমি বিভিন্নভাবে বাড়ীর খবর নিচ্ছিলাম। আমি জানতে পারলাম, আমার মা অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মাকে খুব মনে পড়তে লাগল। চিন্তিত ছিলাম যে, শিরকের উপর তার মৃত্যু না হয়ে যায়। আমি আমার স্বামীকে বললাম, কত মানুষকে আপনি কালিমা পড়িয়েছেন অথচ আমার মা কালিমা ছাড়া মারা যাচ্ছেন। এমন দাঈর সাথে আমার বিবাহ হয়ে কী লাভ হল? তিনি আবেগাপণ্ডুত হয়ে পড়লেন আর বললেন, আজকেই যাচ্ছি। আমাদের আম্মাজান (শাশুড়ী আম্মা) বললেন, আমি তোমাদের একা যেতে দিব না, আমিও যাব। আমরা বাড়ী থেকে বাচ্চা-কাচ্চাসহ রওয়ানা দিলাম। আমি আমার শাশুড়ী আম্মা এবং স্বামীকে বললাম, আপনারা কোনো মুসলমানের বাড়িতে অবস্থান করেন।

আমি বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছি। যদি ৩টার মধ্যে ফিরে না আসি তাহালে আপনারা ফিরে যাবেন। বুঝবেন আমাদের চারজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার শাশুড়ী আম্মা জায়নামাযে বসে গেলেন। আমি বোরকা পড়ে বাড়ী পৌঁছলে লোকেরা পেরেশান হয়ে গেল। আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। এদিকে ৪টা বেজে গেল কিন্তু তারা আমাকে অনুমতি দিল না, আমার শাশুড়ী আম্মা থাকতে না পেরে সোজা আমাদের বাড়ীতে চলে আসলেন। আমি আমার স্বামী এবং শাশুড়ী আম্মার অনেক প্রশংসা করলাম। তখন আম্মা তাদের সাথে দেখা করতে চাইলে আমি বললাম, এখন তো আমার তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দু-তিন দিন পর আবার আসব। পরে আমার স্বামীকে নিয়ে গেলাম। আমি এবং আমার স্বামী আম্মাকে বুঝালাম, আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বাড়ীর সবাইকে বের করে দিয়ে একা একা কথা বললেন এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আর আমাকে তার অলংকারের মধ্যে থেকে কয়েক ভরি স্বর্ণ দিলেন। আমার স্বামী, বাচ্চা এবং আমাকে কাপড় চোপড় দিলেন।

প্রশ্ন : এর পর কি আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন?

উত্তর : তাঁর জীবদ্দশায় আরো দুবার গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দুইভাই এবং তাদের স্ত্রী আমাদের যাওয়াতে অসন্তুষ্ট। বিশেষত আম্মা প্রত্যেকবার কিছু না কিছু দিয়ে দিতেন, এই কারণে আমাদের জন্য যাওয়া মুশকিল হয়ে গেল। তার একমাস পর আম্মা ইন্তেকাল করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর কালিমার ওপর ইন্তেকাল হয়েছে।

প্রশ্ন : পরিবারের বাকী সন্তানদের কী খবর?

উত্তর : আমার দুই ভাই এবং দুই বোনের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে, তারা আমাকে ভালবাসে। আমরা সকলের জন্য দুআ করছি আল্লাহ যেন সকলকে হেদায়েত দান করেন। আসলে পরিবারের লোকজন ততটা বিরোধী নয় যতটা আমরা মনে করেছিলাম। এলাকার লোকদের চাপের কারণে তারা একটু ভয় পায়, বড় ভাইয়া আমাকে বলেছে তোর যদি দেখা করতে মনে চায় তাহলে বলবি, আমি দেখা করে আসব। তোরা এখানে আসলে আমাদের সমস্যা হয়।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী হাবীব ভাই অনেক বড় দাঈ। আব্বা তার কথা অনেক বলেন, তিনি কি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনাকেও শরীক করেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাকে অনেক বড় নেয়ামত দান করেছেন। বহুলোক তার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের হযরত বলেন, দাঈর একটা টার্গেট থাকা উচিৎ যে, প্রত্যেক দিন কমপক্ষে একজনকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানাবো। কখনো মাসের পর মাস তাঁর এই সংখ্যা পূর্ণ হতে থাকে। এখনতো একদিনেই কয়েকজন মুসলমান হয়। আবার কখনো কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন খুব পেরেশান হয়ে যান। কখনো কাঁদতে থাকেন আর বলতে থাকেন আমার কোনো গুনার কারণে আল্লাহ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তখন গিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত করা সম্ভব না হলে ফোন করেন। কিন্তু কখনো ফোনে পাওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে একবার এমন হয়েছে, দুই মাস যাবৎ হযরতের সাক্ষাত হয়নি এবং ফোনেও যোগাযোগ হয়নি। এদিকে দাওয়াতের কাজও কিছুটা স্থির হয়ে গেল। ব্যস! ঘরে মাতম শুরু হয়ে গেল। যখনি দেখা হয়, দেখি তিনি কাঁদছেন। আমি অনেক বুঝিয়েছি। হয়তো হযরত সফরে আছেন। যার কারণে আপনি যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, না হযরত নারাজ হয়েছেন। আল্লাহর শোকর এর মধ্যে ফোন পাওয়া গেল। হযরত বললেন, তোমরা আমার রুহানী সন্তান তোমাদের উপর নারাজ হব কেন? মনে হল যেন তার উপর ঈদের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। তখন সকালে একজন তার হাতে মুসলমান হতো, সন্ধ্যায় আরেকজন। তখন আমার কাছে মনে হল যে, তাঁর কথাই সত্য। হযরতের সাথে সাক্ষাতের পর হযরত বললেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দাঈর হেফাজতের জন্য এই পদ্ধতি জারী আছে। দা'য়ী এই যেন একথা মনে না করে যে, আমার কারণেই কাজ হচ্ছে; বরং একথা মনে প্রাণে

বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর দাঈর কান্না আল্লাহ তাআলার কাছে অতিশয় প্রিয়। এজন্য আল্লাহ কখনো রাস্তা খুলে দেন আবার কখনো বন্ধ করে দেন।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানদের লেখাপড়ার কী খবর?

উত্তর : আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আলহামদুলিল্লাহ! চারজনই পড়ছে। ইনশাআল্লাহ! চারজনকেই হাফেজ এবং আলেম বানাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা পূরণ করেন এবং তাদের দ্বীনের দা'য়ী বানান।

প্রশ্ন : আব্বা বলেছিলেন, আপনি বিভিন্ন দুর্যোগের মুখোমুখি হন। তখন আপনার কেমন লাগে?

উত্তর : কামাই রোজগার এবং অসুস্থতা ইত্যাদির সমস্যা আসে। অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী স্মরণ করি আর বলি, আমরা তো ঈমানের জন্য কোনো কুরবানী দিইনি। আর কখনো হিম্মত হারা হয়ে গেলে ভাল কোনো স্বপ্ন দেখি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বার দেখি এবং পুরো মাস জুড়ে তার মজা এবং খুশী থাকে। গত সপ্তাহে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত ভাল অবস্থায় যিয়ারত হয়েছে। উমরের আব্বা বলেন, যিয়ারতের পর অনেক সময় পর্যন্ত তোমার চেহারা উজ্জ্বল থাকে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কিছু বলুন।

উত্তর : হক্ব এবং সত্যের জন্য মানুষের কুরবানী দিতে হয়। মানুষ আযম করবে এবং হক্ অনুসন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। তাহলে সত্য তার সামনে প্রকাশিত হবেই। আমি এমন অবস্থায়ই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, হক্বের উপর ভরসা করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমাকে সাহস দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার লক্ষ্যে পৌছেছি। আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল এবং অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। কারণ আসল জিনিস (ঈমানের হালাতে মৃত্যু) তো এখনো বাকী আছে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শুকরিয়া আয়েশা রাজী। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা যাতুল ফাওযাইন

মাসিক আরমুগান, আগস্ট- ২০০৯

কাজী মুহাম্মদ শুরাইহ সাহেব (সামীর)-এর সাক্ষাৎকার

হযরত অত্যন্ত সত্যকথা বলেছেন যে, এই দেশ সৌহার্দ সম্প্রীতির দেশ। ভালোবাসায় এদেশের মানুষের দুর্বল। পারস্পরিক ভালবাসা ও মুহাব্বতের সামনে এদের হিম্মত স্থির থাকতে পারেনা, সাথে সাথেই তার প্রতি দূর্বল হয়ে যায়, এই সম্প্রদায়ের ভালবাসার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি আমরা এই অবুঝ লোকদেরকে সে সমস্ত প্রচারহীন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে।

তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে করে মুহাব্বতের সাথে যদি দাওয়াত দেই তাহলে এমন হতে পারে না যে, তারা অস্বীকার করে বসবে। এখানে দাওয়াতের কাজ করার জন্য বাহাছ মোবাহাছা ও প্রামাণিক আলোচনা এবং তার যোগ্যতার প্রয়োজন নাই বরং প্রয়োজন শুধু সাহস এবং মুহাব্বতের। আর মুহাব্বত সাহসের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। শর্ত হল মুহাব্বত ভিতর থেকে আসতে হবে এবং দিল পর্যন্ত পৌছাতে হবে। যখন একজন অল্প শিক্ষিত, সরল সোজা গ্রাম্য যুবকের দুই ফোঁটা অশ্রু আমার সারা জীবনের কুফর ও শিরক থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে এবং রহমাতুলল্লি আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত রাতে আল্লাহর সম্মুখে ক্রন্দন আহাযারী আমাদের নসীব হয়ে যায় তাহলে এই দেশ অচিরেই ইসলামের বড় মারকায হয়ে যাবে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কাজী মুহাম্মদ শুরাইহ : ওয়া আলাইকুমুসস সালাম ওয়ারাহামাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : কাজী মুহাম্মদ শুরাইহ সাহেব আব্বা এইমাত্র বললেন যে, তিনি আপনার নাম কাজী মুহাম্মদ শুরাইছ রেখেছেন।

উত্তর : হ্যাঁ, মাওলানা আহমদ সাহেব! এখনো আমি ভালভাবে ঘোষণা করি নাই কিন্তু হযরত জী আমার নাম কাজী মুহাম্মদ শুরাইহ রেখেছেন। নামটা যদিও একটু কঠিন কিন্তু হযরত যখন ইতিহাস বললেন, তখন ভালো লাগল এবং অন্তরে এই কথা আসল যে, আল্লাহ তাআলা যদি নামের বরকতে কাজী শুরাইহ-এর লক্ষ ভাগের এক ভাগ গুণাবলী আমাকে দান করেন তাহলে আমার বেড়া পার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আব্বা বলে থাকেন মুসলমানের, সমস্ত দুনিয়ার সফলতা এবং উন্নতি এর মধ্যে যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বের আখলাকের সাথে নিজেদের

আখলাক মিলিয়ে নিবে। এই মেযাজ থেকে দুনিয়াবাসীর দূরে থাকার কারণে আজকের এই অবনতি। এজন্য আব্বু মাদরাসা এবং অফিসের নাম খাইরুল কুরানের সাথে মিলিয়ে রাখার প্রতি তাকিদ দিয়ে থাকেন। যেমন ধরুন মাদরাসায়ে সিফাতুল ইসলাম, দারুল আরকাম, দারে আবু আয়্যুব ইত্যাদি। কাজী শুরাইহ আমাদের নবীজির চতুর্থ খলীফার যামানায় প্রসিদ্ধ একজন কাজী ছিলেন।

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি সেই ঘটনা শুনিয়েছেন, হযরত আলী রাযি.-এর সাথে এক ইয়াহুদীর লৌহ বর্মের ব্যাপারে মুকাদ্দামার মধ্যে শরঈ সাক্ষী না থাকার কারণে হযরত আলী রাযি.-এর বিরুদ্ধে ফায়সালা করেছিলেন। আর এই ইনসাফ দেখে সেই ইয়াহুদী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : জী, তার এই ঘটনা প্রসিদ্ধ, এটা ছাড়াও তার ইনসাফ এবং ন্যায়পরায়নতার অনেক ঘটনা আছে। কাজী সাহেব, আব্বা হয়তো আপনাকে ইন্টারভিউর কথা বলেছেন?

উত্তর : জী, এখনই বলেছেন। আমি বলছিলাম, বারবার অনুমতি চাওয়ার পরও আপনি আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন এ অবস্থায় ইন্টারভিউ ছাপাটা ঠিক হবে কিনা? হযরতজী বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তো নসীহত এবং দাওয়াতী জযবা পয়দা করা। আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবেন। তাছাড়া এখন রমযান মাস চলছে। এখন এই বরকতময় মাসে আপনার অবস্থা ছাপানোই ভালো।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিচয় দিন।

উত্তর : হরিয়ানার জাট বংশে ২৩ শে মে ১৯৬২ সালে আমার জন্ম, রোহিতক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছি, তারপর বিএসসি করি। আমার আব্বা চন্ডিগড়ে জজ ছিলেন। তিনি আমার লাইন পরিবর্তন করে দিলেন এবং এলএলবি করতে বললেন। আমি এলএলবি করে চন্ডিগড়ে ওকালতী শুরু করি। এরপর PCS প্রথমবার কোয়ালিফাই করি। বর্তমানে জেলা আদালতে CIA ডিজি পদে আছি। ইনশাআল্লাহ খুব শ্রীঘ্রই জজ হওয়ার আশা আছে। আমার এক বোন DSP তাঁর স্বামী ADM, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শোকর যে, আমাদের বংশ খুব শিক্ষিত। সকলে উর্দূতে বেশ দক্ষ। আমার দাদা উর্দূর ভালো কবি ছিলেন।

নিজের পদবী লিখতেন মাখতুম।

হযরত মাখতুম পানিপথির তিনি ছিলেন ভক্ত, অনুরক্ত।

প্রশ্ন : আপনার ইসলামের ঘটনাটি বলুন।

উত্তর : আমি এডিশনাল ডিসট্রিক কোর্টে জজ ছিলাম। আমাদের বংশে মানবতা প্রেমের অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। ঘরে বৃদ্ধ মহিলা এবং বড়রা, মহান ব্যক্তি সূফি সাধকদের এবং ভালমানুষদের গল্প শুনাতেন, আমার পিতা বড় আমানতদার অফিসার ছিলেন। আমি প্রেম চাঁদ এবং পঞ্চ পরমেশ্বরের গল্প পড়েছি।

এই ঘটনার মাধ্যমে আমার মনে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বিচারকের আসনে মানুষ স্রষ্ঠার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বসে। সমস্ত মানুষকে এক নজরে দেখা এবং ইনসাফ করা তার কর্তব্য। আল্লাহ শোকর যে, আমিও বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখতাম এবং আদালতে ইনসাফ করার চেষ্টা করতাম। যখন মানুষ ভাল কাজ করে তখন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষের অন্তরে তার প্রতি সম্মান ভালবাসা দিয়ে দেন। আমি যেখানেই যেতাম, মানুষ আমার ঈমানদারীর কারণে আমাকে অনেক সম্মান করত।

আমি আরো লক্ষ করেছি, অমুসলিম ঘুষখোরও আমাকে সম্মান করত। শুধু তাই নয় বরং আমার অফিসারও আমার ঈমানদারীর কারণে আমাকে ইজ্জত করতেন। পাঁচ বছর আগের কথা। একদিন সকালে মর্নিং ওয়াক করছিলাম। অত্যন্ত বিনয়ী ও দরদী হযরতের এক শাগরেদ আমার কাছে এসে বলল অত্যন্ত খুশির কথা যে, আপনি আমাদের শহরে এসেছেন। সকলে আপনার প্রশংসা করে, আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। আমি কয়েকদিন যাবত আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে দশ মিনিট সময় দিলে খুব খুশি হতাম।

আমি বললাম, এখন আমার সাথে চলেন, কথা হবে সাথে এককাপ চাও পান করবেন। সে তখন বলল, আমাদের হযরত বলেন, কুরআনের ঘোষণা হল যখন কারো সাথে সাক্ষাত করবে তখন তার থেকে অনুমতি নিবে, আমি বললাম আমি সময় দিলাম আমার হাতে এখনই সময় আছে। সে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমার সাথে বাসায় আসল এবং বলল, জজ সাহেব! আমার মনে একথা উদয় হল যে, আপনি একজন ঈমানদার এবং ভালো অফিসার, আপনার একদিন মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ আদালতে অপরাধীদের কাতারে দাঁড়াতে হবে এবং আপনার উপর গাদ্দারদের মুকাদ্দামা দায়ের করা হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার উপর গাদ্দারীর মুকাদ্দামা হবে? বলল, জ্বী, কেননা কোনো দেশের নাগরিক যদি সে দেশের সরকার

এবং সেখানকার সংবিধান (Consititution) না মানে, তাহলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং গাদ্দার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পৃথিবীর সবকিছুর মালিক এক আল্লাহ তাআলা। তার সংবিধান হল আল-কুরআনুল কারীম।

কাজেই যে আল্লাহ এবং কুরআনকে অস্বীকার করবে সেও রাষ্ট্রদ্রোহী এবং গাদ্দার বলে বিবেচিত হবে। আমি বললাম, আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে যে, আমার উপর এই মুকাদ্দামা চলবে? সে অত্যন্ত দরদের সাথে বলল, আমি তো এত বড় শিক্ষিত না যে, আপনাকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিব কিন্তু যখন চোখ খুলবে (যাকে আপনারা মৃত্যু বা চোখ বন্ধ হওয়া বলেন আমরা তাকে চোখ খোলা বলি) তখন আমাদের কথাই সত্য হবে।

কিন্তু তখন আপনার করার কিছুই থাকবে না। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। একথা বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ব্যাথায় দু'ফোটা অশ্রু প্রবাহিত হল যার এক ফোঁটা মাটিতে পড়ল। আরেক ফোঁটা চোঁখর পলাকে আটকে গেল। মাওলানা আহমদ সাহেব মুহাব্বত ও ভালবাসা এবং ব্যাথায় তার অশ্রু প্রবাহিত হওয়াই আমার জন্য ফাঁদ হয়ে গেল। আমার তখন মনে হল, তার এই সহানুভূতিশীল কথা অবশ্যই সত্য। আর এটা মানার মধ্যেই আমার উপকার। তাই আমি তাকে বললাম, তাহলে আমার এখন কী করতে হবে? সে বলল, আজকে এক তারিখ, আমাদের হযরত আজ সোনিপথ আসবেন। তিনি আপনাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কখন যেতে হবে? সে বলল, দশটায় এখান থেকে রওনা দিলে এগারটায় সেখানে পৌঁছে যাবেন। আমরা সময় মত রওয়ানা হয়ে গেলাম। হযরত সাড়ে এগারটায় সেখানে পৌঁছান। গাড়ীর আওয়াজ শুনে আমি ঘর থেকে বের হলাম। মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করলাম। বললাম, আমি মুসলমান হতে চাই। হযরত বললেন, ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাসের নাম, আপনি ইচ্ছা করেছেন ব্যস হয়ে গেছে।

আমরাও যাতে সওয়াবের মধ্যে শরীক হয়ে যাই এজন্য কালিমা পড়ে নিন। এই কালিমা সর্বশেষ বিধান কুরআনকে মানা, নবীকে মানা, নবীর তরীকায় চলার অঙ্গীকার। হযরত আমাকে কালিমা পড়ালেন এবং উর্দুতে তার তরজমাও পড়ালেন। এরপর আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, আপনি কি ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছেন? আমি বললাম, এলএলবিতে মুসলিম প্রিন্সিপাল 'ল' কিছু কিছু পড়েছিলাম। সে সময় যা কিছু পড়েছিলাম ততটুকুই। এছাড়া আর একটি শব্দও পড়া হয়নি।

মুসলমানদের সাথে খুব সম্পর্কও ছিল না। এমনকি যারা নামে মুসলমান তাদের সাথেও সম্পর্ক ছিলনা। হরিয়ানায় তো মুসলমান নাই বললেই চলে। তখন হযরত বললেন, তাহলে এতবড় সিদ্ধান্ত কিভাবে নিলেন? আমি বললাম, আপনার এই মুরীদ আমার কাছে এসে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে বলল, আপনি ঈমানদার অফিসার অথচ আপনার উপর সর্বোচ্চ আদালতে গাদ্দারীর মুকাদ্দমা দায়ের করা হবে। আমি তার কাছে প্রমাণ চাইলে তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে দুফোঁটা অশ্রু প্রবাহিত করে দেন। এক ফোঁটা মাটিতে পড়ে, আরেকটা ফোঁটা চোখেই আটকে যায়। হযরত আজকে আমার বুঝে আসল, অপরাধী হাতকড়া পরে কিভাবে অসহায় হয়ে যায়। তার ভালবাসাভরা দুফোঁটা অশ্রু আমার জন্য ফাঁদ হয়ে গেল। আমার অন্তর বলল, মুহাব্বতভরা মানুষের কথা মানার মধ্যেই উপকার এমন উপকারী মিথ্যুক হতে পারে না। হযরত আমার নাম কাজী শুরাইহ রেখেছেন এবং কাজী শুরাইহ এর পুরো ঘটনা শুনিয়েছেন। আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে বলেছেন। কিতাবের একটি লিস্ট করে এক মাওলানা সাহেব দায়িত্ব দিলেন দিল্লি থেকে তা সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য।

প্রশ্ন : এরপর কি আপনি কিতাবগুলো পড়েছেন?

উত্তর : সর্বপ্রথম আমি 'আপনার আমানত আপনার সেবায়' পড়ি। এই কিতাব আমাকে আমার সিদ্ধান্তের উপর আস্থা সৃষ্টি করে। আমি চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কত বড় চিন্তা ভাবনার কাজ করেছি। আসলে সত্যকথা হল আমার আল্লাহ আমাকে কত চিন্তা-ভাবনা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে ছাড়া নেওয়ার উপর বাধ্য করেছেন। এরপর আমি মরণের পরে কী হবে? পড়ি। এই কিতাব পড়ার পর আখেরাতের কথা বিশেষত হাশরের মাঠে হিসাব নিকাশের কথা আমার মন মস্তিষ্কে এমনভাবে বসে গেল যে, এখন আমি আদালতে বিচারকের আসনে বসি আর আমার মন আমাকে আল্লাহর আদালতে হিসাব দেওয়ার সময় অপরাধীদের কাতারে দন্ডায়মান পায় অনেক সময় এই ভয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এই দুই কিতাবের পর আরো কয়েকশ কিতাব পড়ে ফেলেছি।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারে এখনো জানাননি?

উত্তর : পাঁচ বছর হয়ে যাচ্ছে, আমি খুব পেরেশান। কিন্তু যখনি হযরতকে বলি হযরত তখন বলেন, আরো কয়েকদিন পরে ঘোষণা দিবেন।

আলহামদুলিল্লাহ আমার স্ত্রী, দুই সন্তান মুসলমান। আমরা চারজন ঘরে নামাজের পাবন্দী করি। আজ হযরত বললেন, রমযানের পরে ঘোষণা দিতে। আমার মনে বারবার আত্মমর্যাদাবোধের কারণে এই জযবা এসেছিল, হযরত আবু যর (রাঃ)-কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি আপনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর মনে হয়, একজন পথপ্রদর্শক বানিয়েছি। সুতরাং নিজের মনমতো চলার চেয়ে তাকে মানার মধ্যেই আমার সফলতা। বিভিন্ন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হল, হযরতের আদেশ মানার দ্বারাই আমার উপকার হয়েছে।

প্রশ্ন : নামায কোথায় পড়েন আর জুমার নামায কি আদায় করেন?

উত্তর : ব্যাপকভাবে যদিও ঘোষণা দেই নাই কিন্তু তারপরও অনেক মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জানেন। জুমার সময় যেখানে থাকি তার আশপাশে খুঁজে জামে মসজিদ বের করি। আল হামদুলিল্লাহ জুমার নামাযের খুব পাবন্দি করি। তাছাড়া এ পর্যন্ত সাত বার তিন দিন সময় লাগিয়েছি অবশ্য তা দূরে গিয়ে লাগিয়েছি।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করে আপনার কাছে কেমন লেগেছে?

উত্তর : হরিয়ানায় ১৯৪৭-এর পর ইসলাম এবং মুসলমান ছিল না বললেই চলে। এজন্য রসম ও প্রথার দিক দিয়ে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিলনা।

কিন্ত যেহেতু আকীদা এবং পরিপূর্ণ নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে ইসলাম ন্যাচারাল ধর্ম এজন্য আমার কাছে একেবারে অপরিচিত মনে হয়নি বরং মনে হয়েছে, এটা আমার পূর্বে থেকেই ছিল! হযরত কত সুন্দর কথা বলেন, সোনিপথে তার বয়ান শুনেছিলাম। তিনি বলেন, ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম, পিপাসার্ত ব্যক্তির ঠোঁটে পানি রাখলে যেমন সে তা গ্রহণ করে নিবে এমনিভাবে মানুষের স্বভাব। স্বভাবজাত ধর্ম তালাশ করে। তার কাছে স্বভাবগত ধর্ম নতুন লাগে না। তবে শর্ত হল, এই ধর্ম তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন : আব্বা আপনাকে দাওয়াতের কাজে লাগাননি? পরিবার পরিজন আত্মীয়-স্বজনের নিকট কাজ করতে বলেননি?

উত্তর : হ্যাঁ, বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ! আমি কাজ করছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার এক ফুফু এবং তার স্বামী মুসলমান হয়েছে, আমার চাচার এক ছেলে মুসলমান হয়েছে। আমার ছয় চাকর মুসলমান হয়ে ঘোষণাও দিয়ে দিয়েছে এবং দুজন মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করেছে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! খুব ভাল! আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : হযরত অত্যন্ত সত্যকথা বলেছেন যে, এই দেশ সৌহার্দ সম্প্রীতির দেশ। ভালোবাসায় এদেশের মানুষের দুর্বল। পারস্পরিক ভালবাসা ও মুহাব্বতের সামনে এদের হিম্মত স্থির থাকতে পারেনা, সাথে সাথেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। এই সম্প্রদায়ের ভালবাসার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি আমরা এই অবুঝ লোকদের সে সমস্ত প্রচারহীন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে। তাদের নিজেদের ভাই মনে করে মুহাব্বতের সাথে যদি দাওয়াত দিই তাহলে এমন হতে পারে না যে, তারা অস্বীকার করে বসবে। এখানে দাওয়াতের কাজ করার জন্য বাহাছ মোবাহাছা ও প্রামাণিক আলোচনা এবং তার যোগ্যতার প্রয়োজন নাই বরং প্রয়োজন শুধু সাহস এবং মুহাব্বতের। আর মুহাব্বত সাহসের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। শর্ত হল মুহাব্বত ভিতর থেকে আসতে হবে এবং দিল পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। যখন একজন অল্প শিক্ষিত, সরল সোজা গ্রাম্য যুবকের দুই ফোঁটা অশ্রু আমার সারা জীবনের কুফর ও শিরক থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে এবং রহমাতুলল্লি আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো রাতে আল্লাহর সম্মুখে ক্রন্দন আহাজারী আমাদের নসীব হয়ে যায় তাহলে এই দেশ অচিরেই ইসলামের বড় মারকায হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর : আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এই মুবারক কাজে আমাকে শরীক করার জন্য। ইনশাআল্লাহ ফুলাতে দেখা হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **সেপ্টেম্বর-** ২০০৯

মুহাম্মদ উমর সাহেব (আদেশ)-এর সাক্ষাৎকার

আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ তাআলা যাদের ইসলামের মত মহা দৌলত দান করেছেন তারা যেন এর কদর করে আর হাদীস শরীফের বাণী প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে এর জন্য দুআ ও চেষ্টা করবে, যেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ঘরে ইসলাম পৌছার ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকেও শামিল করেন এবং আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা এই ভাল কাজের জন্য কবুল করেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

মুহাম্মদ উমর : ওয়া আলাইকুমু সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : উমর ভাই! গত বছর আমি আপনার থেকে যে ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম তা আপনার অমতের কারণে প্রকাশ করা হয়নি। এখন সেই ইন্টারভিউটি আমার কাছে ভালভাবে সংগ্রহে নেই। আমার ইচ্ছা, আপনার ইন্টারভিউ ছাপাবো। এখন আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আবার কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : আহমদ ভাই! অবশ্যই বলেন, আমি তো ইন্টারভিউ প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। সে সময় ছাপানোর মত অবস্থা ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ এখন অবস্থা অনুকূল। এখন প্রকাশ করতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর : আমার পূর্ব নাম ছিল আদেশ। সাহারানপুর জেলার সাহজী নামক গ্রামের বাসিন্দা আমি। সাহজী জনতা হাইস্কুল থেকে পাশ করে এখন মাদরাসায়ে কাসেমুল উলুম তেউড়ায় পড়ালেখা করছি।

প্রশ্ন : কিভাবে আপনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন আর কী কারণে ইসলাম গ্রহণ করলেন?

উত্তর : শৈশব থেকেই মুসলমানদের অনেক জিনিস আমার ভালো লাগতো। বিশেষ করে ইসলামের পর্দার বিধান, কারণ। এই বিধান অন্য কোনো ধর্মের নজরে পড়েনি। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হল একটি স্বপ্ন-যার দরুন আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। ছোট কাল থেকেই আমি আমার নাম আদেশ লেখা পছন্দ করতাম। হয়তো এ কারণেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখলাম। নবীজি আমাকে বললেন, কালিমা পড়ে নাও

এবং এখান থেকে চলে যাও। তারপর একটি সুন্দর কুয়া দৃষ্টিগোচর হল। বলা হল, তুমি সেখানে যাও। আশ্চর্য! কুয়ার ভিতর থেকেও সেই আওয়াজ শুনা গেল। এরপর আমি এই কথা আমার মুসলমান বন্ধুদের বললে তারা বলল, তুমি যা ইচ্ছা করো তবে অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাও। এর কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের দৌলত দান করেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘটনা শুনান!

উত্তর : আহমাদ ভাই শৈশব থেকেই আমার মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ছিল। আমি আমার আম্মাকেও বাঁধা দিতাম! বাসায় কেউ আমার সামনে পূজা করতে পারত না। সবাই আমার অগোচরে পূজা করত। একবার আমি বাসার সমস্ত ভগবানের পোস্টার ছিঁড়ে পকেটে রেখে দিলাম আর আমার ভাইকে বললাম, সেগুলো কুয়ায় ফেলে দিতে। আমার আম্মা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সুযোগে আমি ছবিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলাম। আগুন লাগার পর যখন সেগুলো কোনো বাঁধা দিল না। তখন আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এগুলো সব বেকার। আমার মা ঘুম থেকে উঠে যখন জানতে পারলেন, আমরা সব ভগবানগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছি তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞসাবাদ করলেন- আমি কেন এমন করলাম? আমি তখন আম্মাকে বুঝালাম, যে নিজের হেফাজত করতে পারে না সে অন্যের হেফাজত কিভাবে করবে?। এ কথা বলার পর আম্মা আমাকে অনেক মারধর করেন। আর বলতে থাকেন তুই মুসলমান হয়ে গেছিস। আমি বললাম, আমি মুসলমান হইনি।

আমার এখনো বুঝে আসে নাই যে, কোনটা সঠিক! হিন্দুরা বলে মুসলমান ভুল আর মুসলমানরা বলে হিন্দু ধর্ম মিথ্যা। তাই যতক্ষণ আমার কাছে স্পষ্ট না হবে, কোনটা সঠিক ততক্ষণ আমি হিন্দুও না মুসলমান না। এর কিছুদিন পর আমি সেই স্বপ্ন দেখি। আমি পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। এই স্বপ্ন দেখার পর আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। এদিকে আমি পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে সাহারানপুর কাজ শেখার জন্য গেলাম। সেখানে সৈয়দ সাহেবের দোকানে কাজ শিখতাম। তার সাথে– ইসলাম সম্বন্ধেও কিছু কথাবার্তা হতো। যার কারণে সে বুঝতে পারল, আমি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করি এবং ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। একদিন সৈয়দ সাহেব আমার ইসলামে প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথাও শুনেছিল। সে আমার সাথে কথা বলে- আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে, আমি মুসলমান হতে চাই। পরের দিনই সে আমাকে দেওবন্দে মাওলানা আসলাম সাহেবের কাছে নিয়ে যান। মাওলানা আমাকে কালিমা পড়ান আর আমার নাম রাখেন উমর।

প্রশ্ন : এরপর কী হল?

উত্তর : কালিমা পড়ার পর মাওলানা আসলাম সাহেব আমাকে ফুলাত পাঠিয়ে দেন নামায কালাম শিখার জন্য। এখানে অনেক তাড়াতাড়ি নামায এবং অনেক দুআ শিখে ফেলি। এর প্রায় সোয়া একমাস পর বাড়ীতে যাই। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল কোথায় কাজ করি। বললাম দিল্লিতে কাজ শিখেছি। দু-চার দিন পর বাড়ী থেকে যখন চলে আসছিলাম তখন পরিবারের লোকজন দিল্লির কোনো ফোন নাম্বার বা ঠিকানা দিতে বলল, আমি বললাম, আমার ব্যাগ দিল্লিতে রেখে এসেছি, ফোন নাম্বার ঠিকানা সব ব্যাগের মধ্যেই আছে। আমি দিল্লি পৌঁছে ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা দিয়ে দিব।

বাড়ী থেকে আসার সময় আমাকে খরচ করার জন্য ৫০০ রুপি দেয়। কয়েকদিন কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে তারা আমাকে খোঁজা শুরু করে। আমার কোনো হদিস না পেয়ে আমার ইসলামের প্রতি ঝোঁক থাকা এবং আমাদের গ্রামের বাসিন্দা জনাব জহুর সাহেবের কাছে আমার আসা যাওয়ার কারণে তার উপর অপহরণের অপবাদ লাগিয়ে দিল এবং তার প্রতি গ্রামবাসী চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তিনি অপারগ হয়ে বলে দিলেন, তোমাদের সন্তান আট (৮) দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। একথা শুনামাত্রই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল, আমি তার নিকটেই আছি। তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে নিয়ে কাযী রশীদ মাসুদ এমপির কাছে গেলেন। এমপি সাহেব আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, চিন্তা করবেন না সব কিছুঠিক হয়ে যাবে। আমি কাযী সাহেবের নিকট তিন-চার দিন ছিলাম।

এদিকে জহুর সাহেবকে জেলে যেতে হয়। পরবর্তীতে তার জামিন হয়ে গেলেও আবার মামালার শুনানি শুরু হয়। তাকে বাঁচানোর জন্য আমার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এমপি সাহেব পুলিশের লোকদের সাথে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদের আমার সাথে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দিলেন। সমস্ত কাজ আমার ইচ্ছামত করতে বললেন। পুলিশ আমাকে দেওবন্দ নিয়ে যাওয়ার সময় নানুতায় আমার আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাত হয়ে গেল। তারা আমাকে বাঁধা দিয়ে অনেক বুঝালো। কিন্তু আমি তাদের অত্যন্ত শক্ত ভাষায় জবাব দিয়ে দেই। এসও (SO) সাহেব যখন দেখল, আমি তাদের কথা মানছিনা তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মতো কাজ করো ঠিক আছে কিন্তু মা-বাবার কথাও রক্ষা করো। আমি এসও সাহেবের কথায় আমার জন্য কিনে আনা প্যান্টশার্ট নেই এবং কোলড্রিংস পান করি। তবে খানা খাইনি। আত্মীয়-স্বজন বলল, কাপড়টাও পরিবর্তন করে নাও। আমি

বললাম, এখন না সকালে করব। এদিকে তারা সারা গ্রামে একথা ছড়িয়ে দিল, নাউযুবিল্লাহ আমি মুরতাদ হয়ে গেছি এবং দাড়ি কেটে ফেলেছি এ সংবাদের দ্বারা মুসলমানদের উদ্দীপনা কমে গেল এবং এই কথা ভেবে চিন্তিত হল যে, আমি আবার জহুর সাহেবের বিরুদ্ধে বলি কিনা।

আহমদ ভাই! দেওবন্দ পৌঁছার পর অফিসার আমাকে পাঁচ ঘণ্টা হয়রানি করে। এটা বলে সেটা বলে এভাবে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে। অবশেষে আমাকে চার-পাঁচ জন অফিসার মিলে জিজ্ঞাসা করল তুমি এখন কী করতে চাও?

উত্তরে বললাম আমি স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছি কেউ আমার উপর চাপ প্রয়োগ করে নাই এখন আমি ইসলাম সম্বন্ধে পড়ালেখা করতে চাই আপনারা আমাকে কোনো মাদরাসায় পাঠিয়ে দিন। তারা আমার কথা মেনে নিল এবং আমাকে নিয়ে মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। রাস্তায় পুলিশ আমাদের পথরোধ করে। দেখতে দেখতেই সেখানে ৩০০ মানুষ জমা হয়ে গেল, তারা আমাকে গাড়ী থেকে নামাতে চেষ্টা করল। আমি গাড়ীর পাইপ শক্তভাবে ধরে রাখি। তারা আমাকে গাড়ী থেকে টানছিল ঠিক এ অবস্থাই আল্লাহ তাআলা সাহায্য করলেন। আরেকটি পুলিশের গাড়ী এসে সেখানে থামলো।

গাড়ী থামার সাথে সাথে তারা সবাই পলায়ন করল। তারপর এই পুলিশের লোকেরা আমাকে মাদরাসা কাসেমুল উলুম তেউড়ায় দিয়ে আসে। পরের দিন বজরং দলের লোকজন গ্রামের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে জহুর সাহেব এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর চড়াও হয়। জহুর সাহেবের ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে। সামান্য সময়ের মধ্যে সাহজী গ্রাম পুলিশ বাহিনীর লোকেরা ঘিরে ফেলে। তারা অনেক কঠোরতা করে এবং লাঠিচার্জ করে। গ্রামের মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। এরপর সাহজীতে কারফিউ জারী করা হয় এবং কয়েকদিন বলবৎ থাকে। আহমদ ভাই আপনি যখন আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন তখন পরিবেশ অনুকুল ছিল না অনেক কষ্টে কিছুটা ঠান্ডা হয়েছিল তাই উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এখন কোনো সমস্যা নাই।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আর কী কী সমস্যায় পড়েছেন?

উত্তর : বাড়ীতে যে সমস্ত সুবিধা পেতাম তা বাড়ী থেকে আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে। এই জাতীয় আরো কিছু ছোট ছোট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।

প্রশ্ন : উমর ভাই! আপনার কথা বাস্তব। বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এত বড় নেয়ামত লাভ করেছেন যে,

দুনিয়ার সমস্ত সুবিধা একত্রিত করলেও তার সামনে মূল্যহীন হয়ে যাবে। প্রকৃত মুসলমান তো আপনিই আপনার কাছে সত্য আসার পর তা আপনি গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমরা ইসলাম মীরাস সূত্রে পেয়েছি। আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শোকর যে, আমাদের মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। উমর ভাই! আপনার কি জহুর সাহেবের এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত হয়?

উত্তর : না, আহমদ ভাই! এরপর একবারও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে জহুর সাহেবের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে ছেলে বানিয়েছেন, আমাকে দেখার জন্য মাদরাসায় আসেন, সন্তানের মতই ভালোবাসেন তার ছেলেরা আমার সাথে ভাই-বোনোর মতো থাকে। দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। ছুটির সময় সেখানেই যাই।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার কাছে কেমন লেগেছে?

উত্তর : আত্মিক প্রশান্তি বলতে যা বুঝায় তা পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে পেয়েছি।

প্রশ্ন : আলেম হওয়ার পর কী করবেন?

উত্তর : আলেম হয়ে দাওয়াতের কাজ করব। আমি তো এজন্যই আলেম হচ্ছি যে, ইসলামকে সঠিকভাবে জেনে অমুসলিম ভাইদের ইসলামের দিকে আহ্বান করব। আল্লাহ তাআলার বাণী তাদের নিকট পৌছাব আপনার কাছে এবং আরমুগানের সকল পাঠকের নিকট দুআ চাই আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে এই কাজের জন্য কবুল করেন।

প্রশ্ন : আমীন। আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইসলামের মতো মহা দৌলত দান করেছেন তারা যেন এর কদর করে আর হাদীস শরীফের বাণী-প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে এর জন্য দুআ ও চেষ্টা করবে, যেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ঘরে ইসলাম পৌছার ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকেও শামিল করেন এবং আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা এই ভাল কাজের জন্য কবুল করেন।

দ্বিতীয় জরুরী কথা, মানুষের মাঝে যদি ঈমানের দৃঢ়তা থাকে তাহলে যত সমস্যাই আসুক সেই সমস্যা নিজে নিজেই সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের তিনি সাহায্য করেন। দাওয়াতের জন্য মেহনতকারীদের সাথে আল্লাহ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। লোকেরা জহুর সাহেবের

এত বিরোধিতা করল অথচ তার একটা চুলও ছিঁড়তে পারলনা। তার ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করেছে এর কারণে পরবর্তী বছর দ্বিগুণ ফসল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো নামে মুসলমান ছিলাম, তোমাকে ছেলে বানানোর কারণে আল্লাহ এবং আল্লাহর সাহায্যের উপর পরিপূর্ণ ঈমান লাভ হয়েছে এখন আমরা যে কোনো সমস্যায় আল্লাহ তাআলাকেই মুক্তিদাতা মনে করি। আগে এমনটি ছিল না।

প্রশ্ন : শুনলাম আপনি নাকি মুসলমানি (খতনা) করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আহমাদ ভাই! একটা কারণ তো এই যে, আমি ভাবছিলাম আমার থেকে একটা সুন্নত ছুটে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় কারণ হল, যদি কখনো অচেনা এলাকায় মারা যাই তাহলে তো আমাকে হিন্দু মনে করে আগুনে পোড়াবে। এদুটির চেয়ে বড় কারণ হল, প্রস্রাব করার পর পেশাবের ফোটা আটকে আছে মনে হত, আর খালি মনে হত যে, আমি পবিত্র হইনি। আর পবিত্র না হলে তো নামাজ রোজা সব বেকার। এজন্য মাওলানা সাহেবকে অনেক পিড়াপিড়ী করি। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ছুটিতে ফুলাত চলে আসি। মাওলানা সাহেব আমাকে সরধনা পাঠিয়ে খৎনা করিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ কোনো কষ্ট হয়নি এবং খুব শান্তিতে আছি।

প্রশ্ন : শুকরিয়া জাযাকুমুল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, মে -২০০৭

ডাঃ মুহাম্মাদ আসআদ সাহেব (রাজকুমার)-এর সাক্ষাৎকার

এর জন্য অনেক লম্বা সময়ের প্রয়োজন। আমার ধারণা, আমরা মুসলমানদের বাহিরের কোনো শত্রু নাই, ইসলাম থেকে দুরে থাকাই আমাদের বড় শত্রুতা। শুধু তাই নয় বরং আমরা ইসলাম থেকে দূরে থেকে সমস্ত মানব জাতির সাথে শত্রুতা করছি এজন্য যে, ইসলাম এবং ঈমান মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা ইসলাম ধর্ম শুধু মুসলমানদের জন্য মনে করে এবং মুসলমানদের দেখে ইসলামের প্রতি ঘাবড়ে যায়। তারা নিজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং নাজাতের রাস্তা থেকে আমাদের কারণে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থে নয় বরং সমস্ত মানবজাতির প্রতি কল্যাণকামী হয়ে তাদরেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। কমপক্ষে তারা যেন বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের এ বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার।

আহমাদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ডাঃ মুহাম্মাদ আসওয়াদ : ওয়া আলাকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : ডাঃ সাহেব খুব ভাল সময়েই এসেছেন আমি আপনার মতো মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেই খুঁজছিলাম।

উত্তর : কেন ভাই আহমাদ! এমন কী প্রয়োজন দেখা দিল? আপনি তো মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : অনেক দিন যাবত আমাদের এখানে আরমুগানে নওমুসলিমদের ইন্টারভিউ ছাপা হচ্ছে, আব্বার ইচ্ছা ছিল যে, এ মাসে যদি ফূজীর কোনো সাথীর ইন্টারভিউ ছাপা হত তাহলে ভাল হতো। এরই মধ্যে আপনি এসে গেলেন। ভালই হলো।

উত্তর : কিন্তু আপনার আব্বার কাছে নওমুসলিম পরিভাষাটি পছন্দনীয় নয়। আমার মনে হয়, এর দ্বারা সমস্যা হয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা তাকে নিজেদের থেকে আলাদা মনে করে আর ইসলাম গ্রহণকারীও অনেকদিন পর্যন্ত ভুল ধারণার মধ্যে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হলো সে তার সমস্ত প্রয়োজন মুসলমানদের দায়িত্ব মনে করে। এ ধারণাটা তার জন্য অনেক ক্ষতিকর। আমি নিজেকে নওমুসলিম বলি না।

এমনকি নওমুসলিম মনে করি না আর যখন থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– 'সকল শিশু ইসলামী শিষ্টাচারের উপর জন্মলাভ করে, তার পিতা মাতা তাকে খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজক বানায়, শুনেছি তখন থেকে আলহামদুলিল্লাহ! নিজেকে জন্মসূত্রে মুসলমান মনে করি। যাক সে কথা। তা আপনার কী উপকার করতে পারি?

প্রশ্ন : বাস্তবিকপক্ষে আপনার কথাই সত্য। যদিও হিন্দুঘরে জন্মলাভ করার কারণে কিছু দিন বাহ্যিকভাবে ইসলাম থেকে দূরে ছিলেন অন্যথায় আপনি যে জন্মসূত্রে মুসলমান এতে কোনো সন্দেহ নাই। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীও চিরন্তন সত্য। আরমুগানের পাঠকদের জন্য কিছু প্রশ্ন করতে চাই, এতে যারা দাওয়াতের কাজ করছে তাদের জন্য উপকার হত।

উত্তর : অবশ্যই। এটা তো অত্যন্ত খুশির কথা।

প্রশ্ন : আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার নাম আসআদ। বর্তমান বাগপাথ জেলার সরুরপুর নামক স্থানে হিন্দু জাট জমিদার ঘরে আমার জন্ম, আমার আব্বু আমার নাম রাখেন রাজকুমার,। গ্রামেই আমি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করি পরবর্তীতে বড়োত থেকে সাইন্স এবং বায়োলোজীতে ইন্টার পড়ি। ইলাহাবাদ থেকে আয়ুর্বেদীক ডিগ্রী কোর্স বি এ এম এস (BAMS) করি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর : আমার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা আল্লাহ তাআলার গুনবাচক নাম (ھا دی) হাদী (পথপ্রদর্শক) এর কারিশমা। বি, এ, এম, এস এর কোর্স শেষ করে। ৩রা এপ্রিল ১৯৯৩ ইং ফুলাত এসে মাওলানা কালীম সাহেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করি। এরপর জামাআতে সময় লাগাই। এখন আমি মুজাফফরনগর প্রাকটিস করছি। সেই নিজ গ্রামে মেডিকেল প্রাকটিস শুরু করি কিন্তু আল্লাহ তাআলার অন্য কিছু ইচ্ছা ছিল। আমার ক্লিনিক চলল না অথচ আমি তিন বছর যাবৎ পূর্ণ দায়িত্বের সাথে ক্লিনিক করি, তখন আমার এক আত্মীয় আমাকে পরামর্শ দিল কান্ধলার আইলাম গ্রামে ক্লিনিক করতে কারণ সেখানে ডাক্তারের সংখ্যা কিছুটা কম। আব্বা রাজি হওয়াতে সেখানে ক্লিনিক করি। সেখানেও এক বছর নিয়মিত ক্লিনিকে বসি। পরবর্তীতে ক্লিনিক চলল না। এ সময় আইলাম গ্রামে সংসার পাল ওরফে ফূজীর আতংক ছড়িয়ে পড়েছিলো। চারদিকে ফূজীর বাহিনীর আতংক। আইলাম গ্রামে তাদের

ছাউনি ছিল। পি.এ.সি লেগে ছিল কিন্তু দিনের বেলা মনে হত যে ফূজী এসে কাউকে গুলি করে মেরে চলে গেল। দেশের অধিকাংশ সংবদাপত্রে ফূজীর সংবাদ আসত। পুলিশ ফূজীকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার উপর এক লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আমারও তার সাথে দূরবর্তী আত্মীয়তা ছিল। ক্লিনিক থেকে নিরাশ হয়ে হতাশ দিন কাটানো অবস্থায় আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। খুনি, ডাকাত ফূজীর মধ্যে আমি এক মহামানব দেখতে পেলাম। প্রথম সাক্ষাতেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম এবং তার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রশ্ন : আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, আপনি কিভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তার ব্যক্তিত্ব বুঝার জন্য আপনাকে তার ইতিহাস শুনতে হবে। তিনি এক সম্ভ্রান্ত সভ্য যুবক। তার চেহারা এতটাই সুন্দর যে, মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকত। সেনাবাহিনীতে তার চাকরি হয়ে গেল, সে ছিল অত্যন্ত সাহসী। সে যে অফিসারের অধীনে ছিল তার ব্যাপারে শুনেছিল যে, সে ঘুষ খেয়ে শত্রুর গোয়েন্দাদের কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। সে এই খবর যাচাই করল এবং সত্যতা পেল। তখন সে বলল, এমন গাদ্দারের দুনিয়াতে থাকার অধিকার নাই। আমি তাকে হত্যা করব। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী অফিসার গুলি করে মেরে পালিয়ে চলে আসে। কিন্তু সমস্যার কারণে বাড়ী যেতে পারলনা। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরে দিন কাটাত। কেননা পুলিশ তাকে খুঁজে ফিরছিল।

এ সময় সে এক কারী সাহেবের বাসায় রাত কাটাত। সে কারী সাহেবকে তার আশ্রয়দাতা মনে করতো। এদিকে কুদরতীভাবে তার মামলা সেনা আদালতে স্থানান্তরিত হলে সেখান থেকে মামলা খালাস করে দিল। এরই মাঝে বাবরি মসজিদ শাহাদাতের ঘটনায় দেশ গরম ছিল। আইলাম গ্রামে কিছু মুসলমান থাকত। একদিন তারা ফূজীর কাছে এসে বলল, ফূজী ভাই আমাদের মাফ করে দিন। আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফূজী কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, প্রধানজীর পরিবারের লোকজন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর যদি আমাদের মসজিদই না থাকে তাহলে আমাদের এ গ্রামে থেকে কী লাভ? ফূজী উত্তরে বলল, আমি যতক্ষণ জীবিত থাকব তোমাদের মসজিদ কেউ ধ্বংস করতে পারবেনা, তোমরা গ্রামে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করো। তারা গিয়ে প্রধান জীকে বলল, ফূজী বলেছে যতক্ষণ সে জীবিত থাকবে ততক্ষণ কেউ মসজিদ ধ্বংস করতে পারবেনা। প্রধানজীর

সাথে ফূজীর পরিবারের সম্পর্ক ছিল, প্রধানজী বলল এমন লাখো ফূজী থাকলেও আমাদের ৬ সেপ্টেম্বর মসজিদ ধ্বংস করতে বাঁধা দিতে পারবে না। এই সমস্ত লোক কেউ ফুঁষা ছিল তারা এসে ফূজীকে একথা বলে দিল, সে রাইফেল হাতে নিয়ে প্রধানজী তার ছেলে এবং তার এক ভাতিজাকে গুলি করে মেরে ফেলে এবং মসজিদের সামনে লাশ টেনে এনে ফেলে রাখে এবং মুসলমানদের বলে, তোমাদের মসজিদ ধ্বংসকারী শেষ। এখন তোমাদের কোনো ভয় নেই।

প্রধানজীর বংশের জীবিত লোকেরা এক সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে আঁতাত করল, তারা ফূজীর পরিবারের উপর রাত্রিবেলা আক্রমণ করল, মালামাল লুটপাটের সাথে মহিলাদেরও লাঞ্ছিত করল। ফূজী বাড়ীতে ছিল না। সে খবর পেয়ে বাড়িতে এসে তার ভাবী এবং চাচীর লাশ দেখে তার মেযাজ বিগড়ে যায়, সে লাশের কসম খেয়ে বলল, যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন প্রধানজীর পরিবারের একজন করে হত্যা করব। এরপর সে এক সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরী করে এবং প্রত্যেহ এক করে হত্যা করে এভাবে প্রায় ১৬৫ জনকে হত্যা করে। পুরো থানার মধ্যে পুলিশ পেরেশান হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। ফূজী এক আশ্চর্যজনক ডাকাত ছিল। ডাকাতি করত লোকদের থেকে মাসিক চাদা উসুল করত কিন্তু সে টাকা নিজেও ব্যবহার করত না এবং সাথীদেরকেও কিছু খাওয়াতো না বরং এর দ্বারা গরীবদের সাহায্য করতো। বিধবা এবং এতীমদের বিবাহ দিত।

আরও আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে, সম্ভবত এই কারণে আল্লাহ তাআলার রহমতের জোশ আসে। ফূজী কারী সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করছিল। এই সময়ে মাওলানা কালীম সাহেব হরিয়ানা থেকে সফর করে ফিরছিল। তাঁর কারী সাহেবের নিকট কিছু কাজ ছিল। তাই তিনি মসজিদে আসলেন। কারী সাহেব তাকে দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন, ফূজী কালীম সাহেবের আগমন অপছন্দ করছিল। কিন্তু কারী সাহেব তাকে বললেন, আমি তোমার কী হই? উত্তরে সে বলল, আপনি আমার (হিতাকাঙ্ক্ষী)। কারী সাহেব বললেন, এই মাওলানা সাহেব আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করাতে চাচ্ছিলাম। ইতোপূর্বে মাওলানা সাহেবের নিকট বড়োত থেকে বড়হানার এক সফরে ফূজীর পরিচয় দিয়েছিল। মাওলানা বলেন যে, মসজিদ সংরক্ষণের জন্য ডাকাত হওয়া তাকে খুব প্রভাবান্বিত করেছে। তিনি বুধানা পর্যন্ত ফূজীর হেদায়েতের জন্য দুআ করতে থাকেন, হে আল্লাহ আপনার

ঘরের সংরক্ষণের জন্য তাকে যেহেতু ডাকাত বানিয়েছেন। এজন্য তাকে অবশ্যই হেদায়েত দিয়ে দেন, মাওলানা সাহেবও তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তাকে পেয়ে খুব খুশী হলেন।

মাওলানা সাহেব ফূজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুরা শহরে এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ কেন ঘটালে? উত্তরে ফূজী বলল, আমি চিন্তা করে দেখলাম, মৃত্যু আমার নিকটবর্তী তাই একটু নাম করে যাই। মাওলানা সাহেব বললেন, মৃত্যু নিকটবর্তী মনে করে তার জন্য কোনো প্রস্তুতি নিয়েছেন? এখানকার পুলিশ এবং আদালত থেকে তো বাঁচতে পারবেন, সেখানের আদালত থেকে তো বাঁচা সম্ভব না। ফূজী বলল, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে কেউ দেখেছে? মাওলানা সাহেব বললেন, যিনি দেখেছেন তিনি বলেছেন। সে জগতের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাক। ফূজী বলল, জনাবের কথা তো বুঝে আসছে না। কিন্তু আপনি যেহেতু আমার হিতাকাংক্ষী কাজেই বলুন, আপনি কী চান? মাওলানা সাহেব বললেন, কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। ফূজী সাথে সাথে বলল, কালিমা পড়ান।

আপনার আব্বা বলেছেন, আমি মনে করেছিলাম সে আমার সাথে ঠাট্টা করছে। আপনার আব্বা তখন তার দৃঢ় ইচ্ছা সম্পর্কে জানতেন না কিন্তু তারপরও তিনি কালিমা পড়ালেন। সে কালিমা পড়ে বলল, আমিতো মুসলমান হয়ে গেছি এখন তো আর মৃত্যুর পরে শাস্তি হবে না? মাওলানা সাহেব বললেন, ইনশাআল্লাহ হবে না।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সে অস্ত্র হাতে নিয়ে চলে যেতে উদ্দত হল। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? ফূজী বলল, শত্রুপক্ষের এক লোক পুলিশকে ভুল সংবাদ দিয়ে আমাদের এক সাথীর পা ভেঙ্গে দিয়েছে। আজকে হাসিনপুরের এক বাগানে সে কাজ করতে আসবে। মাওলানা সাহেব বললেন, এখন আর এগুলোর সুযোগ নাই। এখন তুমি কাউকে খুন করতে পারবেনা। ফূজী বলল, আপনি তো আগে এগুলো বলেন নাই। মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি কালিমা পড়েছেন যার প্রথম শব্দ লা (لا) যার অর্থ না। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সকল প্রকার অবাধ্যতা যেমন খুন, জুলুম, অত্যাচার, কুফরসহ সকল প্রকার মন্দ কাজ করব না। ফূজী বলল, আমার অস্ত্র তো রক্তপূজা চাচ্ছে। মাওলানা সাহেব বললেন, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আজকে আমাকে হত্যা কর, কালকে কারী সাহেবকে করো,। ফূজী বলল আমি তো পাগল নই। মাওলানা সাহেব বললেন, তুমি

প্রত্যেক দিন একজনকে হত্যা কর তুমি কি জ্ঞানী? ফূজী বলল, আচ্ছা তাহলে কী আমি জ্ঞানী না? মাওলানা সাহেব বললেন, একদম না। ফূজী বলল, যদি তাই হয় তাহলে আজ থেকে ফূজী কাউকে খুনও করবে না এবং ডাকাতিও করবে না।

ফূজী সেখান থেকে চলে গেল, এরপর সে তার সাথীদের একত্রিত করলো। যার মধ্যে ৯জন অমুসলিম এবং ৩১জন মুসলমান ছিল। সকলকে তার মুসলমান হওয়ার সংবাদ দিল এবং স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করল, যারা আমার সাথে জীবন নিয়ে খেলা করে তারা সবাই যেন মুসলমান হয়ে যায়। পরের দিন সে গ্রেফতার হয়। দেশের সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রে তার গ্রেফতারীর সংবাদ লাল কালিতে ছাপা হয়। তিহাড় জেলে তিন মাস ছিল। ইউপি পুলিশ অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল যে, ফূজী বার বার পলায়ন করেছে। এখন যদি আরেকবার পালায় তাহলে আমাদের কোনো দায় নাই।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কথা তো কিছু বললেন না?

উত্তর : তার এক ভাই জেলখানায় তার সাথে দেখার করতে যায়। সে সিগারেটের প্যাকেটে মাওলানা সাহেবের নামে একটি চিঠি লিখে আমার কাছে পৌঁছাতে বলে এবং একথা বলে পাঠায় যে, ডাক্তার রাজকুমারকে গিয়ে বলবে, যদি ফুজীর সাথে মুহাব্বত থাকে তাহলে সে যেন ফুলাত গিয়ে মাওলানা সাহেবের হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় এবং এরপর জামাআতে বেড়িয়ে পড়ে আর আমার ওই চিঠি মাওলানা সাহেবকে দিয়ে দেয় এবং আমার ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সংবাদ দেয়। ফূজী আমাকে অনেক ভালোবাসতো, আমি তার চিঠি নিয়ে ৩ এপ্রিল ১৯৯৩ ইং প্রায় ১২ টার দিকে ফুলাত পৌছি এবং মাওলানা সাহেবের কাছে তার চিঠি দিই। সেই চিঠি আরমুগানে ছাপা হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার একটি কপি আমার পকেটে আছে (এরপর সে চিঠি বের করলে বলল) এই সেই চিঠি। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

প্রিয় মাওলানা সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহামাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি তো সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, আমি তিহাড় জেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছি। জেলখানার সংকীর্ণ জীবনে ঈমান আনার কারণে বাদশাহীর স্বাদ পাচ্ছি। আমার অন্তিম ইচ্ছা হল, আমার সব সাথী যারা সদা সর্বদা জীবন নিয়ে খেলা করত তারা যেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়

হল আপনি একটি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমার ঈমান এখনও বহাল আছে। আপনার অনুগ্রহের বদলা আমার চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলেও আদায় হবে না।

মাআস সালাম

আপনার সেবক

সংসার পাল ফুজী

অতঃপর মাওলানা আমাকে কালিমা পড়ান, খানা খাওয়ান, আমার নাম রাখেন আসআদ। সামান্য সময় কথা বলে উজু করিয়ে মাদরাসায় নিয়ে যান। আমি তাঁর সাথে জোহরের নামাজ পড়ি, মাদরাসার ছেলেরা আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কেননা আমি নামায পড়তে না পারার কারণে নামাযে এদিক সেদিক তাকাই। আমি দশ হাজার রুপি মাওলানা সাহেবকে দিয়ে বললাম যে, আমাকে জামাতে যেতে বলেছে কিন্তু আমি এই পয়সা দিয়ে জামাআতে যেতে চাইনা, আপনি আপনার কাছ থেকে খরচ দিন। মাওলানা সাহেব বললেন এই পয়সা তো আমরাও নিতে পারব না তবে আমি আপনার খরচের ব্যবস্থার করে দেই। এরপর তিনি আমাকে খরচ দেন। চার মাসের জন্য জামাআতে গিয়েছিলাম, জামাতে নিজস্ব জানমাল খরচ করা উচিৎ, এজন্য শুধু এক চিল্লা লাগিয়ে হালাল উপার্জন করার প্রোগ্রাম করি। এরপর পয়সা কামাই করে বাকি দুই চিল্লা লাগানোর ইচ্ছা করি। একচিল্লা দিয়ে ফিরে ফুলাত যাই। মাওলানা সাহেব প্রথমত সময়ের আগে ফিরে আসার কারণে পেরেশান হন পরে কারণ জানতে পেরে খুব খুশী হন।

মুজাফফর নগরে আমি আমার ক্লিনিকে কাজ শুরু করি, যে ক্লিনিক আগে চলত না এমনকি এক বছরে ৩ বার স্থান পরিবর্তন করেছিলাম। এক বছর পর এখন খুব ভালভাবে চলতে থাকে। মাওলানা সাহেব ইস্তেগফার এবং সদকা করতে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করার বরকতে এর মাধ্যমে আমি বাড়ি বানিয়েছি, আর এখন অবস্থাও খুব ভালো।

প্রশ্ন : ফূজী সাহেবের কী হল?

উত্তর : মাওলানা সাহেব বলেছেন, সেই চিঠি পড়ে তিহাড় জেলে গিয়ে ফূজীর সাথে তাঁর সাক্ষাত করার খুব ইচ্ছা জাগে এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে যাওয়ার এক বাহানা পেয়ে যান। কিন্তু যেদিন সেখানে যাওয়ার কথা সেদিন হিন্দুস্তান টাইস পত্রিকা এই সংবাদ ছাপায়, সংসার পাল আত্মহত্যা করেছে। মাওলানা বলেছেন, আমি এই খবর শুনে অত্যন্ত কষ্ট পাই। অতঃপর তিনি তার শাইখের কাছে এই কষ্টদায়ক ঘটনা শুনান। মাওলানা সাহেব

বলেন, মাওলানা আলী মিয়া সাহেবকে শুনানোর সময় হেচকি তুলে কাঁদতে থাকি। মরহুম আলী মিয়া মাওলানা সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, আমি আশাবাদী ফূজী আত্মহত্যা করে নাই। আর যদি আত্মহত্যা করেই থাকে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, সে এর বিধান জানার সুযোগ পায়নি। ইনশাআল্লাহ তার খাতেমা বিল খায়র হবে।

পরবর্তীতে সেখানকার এক মুসলমান অফিসার যিনি সেখানের দায়িত্বশীল তিনি মাওলানা সাহেবকে বলেন, ইতোপূর্বে চারবার ফূজী জেলখানা থেকে পালানোর কারণে জেলকর্তৃপক্ষ তিহাড় জেলে রাখতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। এজন্য তিহাড় জেল থেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তীতে আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে দেয়। সেই অফিসার খুব আফসোস প্রকাশ করেন যে, যদি আমার আগে জানা থাকত তাহলে আমি অবশ্যই কিছু করতাম। আল্লাহর শোকর যে, ফূজীর ইচ্ছা অনেকটাই পুরা হয়েছে। তার ৩১ জন্য অমুসলিম সঙ্গীর ২৩ জন মুসলমান হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জনের অবস্থা তো এমন যে, সাধারণ মানুষ এমনকি আমরাও তাদের থেকে দোআ চাই। তাদের যিন্দেগী এমন যে, তাদের জীবনী লেখা উচিৎ, আল্লাহ তাআলার কী আজীব শান যে, তিনি সন্ত্রাসীদের কত উচ্চ মাকামে পৌঁছে দিলেন।

প্রশ্ন : আপনার বিবাহ হয়েছিল? আপনার পরিবারের কী অবস্থা?

উত্তর : হ্যাঁ, আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রী সদা সর্বদা আমার সাথে ছিল। আমার ইসলাম গ্রহণ করার পর সে একবারও বিরোধিতা করে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করার পর সে বলেছে, মালিক আমাকে আপনার সাথে বেঁধে দিয়েছেন। আমি এক ভারতকন্যা। আপনার সঙ্গে সহমরণেও আমি প্রস্তুত। জামাত থেকে ফিরার পর যখন আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝালাম তখন সে খুব খুশি হল।

আলহামদুলিল্লাহ আমার তিন ছেলে। বড় ছেলের নাম আবু বকর ছোট ছেলের নাম উমর, মেয়ের নাম ফাতেমা। বড় ছেলে হেফজ পড়ছে। ছোট ছেলে ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। ফাতেমাও এখন মাদরসায় যেতে শুরু করেছে আমার ইচ্ছা আছে তাদের এবং আল্লাহ আমাকে যত সন্তান দিবেন সকলকে আলেম, হাফেজ এবং দ্বীনের দা'য়ী বানানোর চেষ্টা করব। পরিবারের লোকেরা প্রথমে বিরোধিতা করেছে এবং কিছুদিন অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু আমি সম্পর্ক ঠিক রেখে ছিলাম এবং পিতা-মাতার খেদমত করছিলাম। প্রত্যেক মাসে তাদের কাছে কিছু না কিছু নিয়ে যেতাম। এখন তারা খুব খুশী এবং

ইসলামেরও নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমার ধারণা যে, আল্লাহ তাআলা খেদমতের বিরাট প্রভাব রেখেছেন। খেদমতের মাধ্যমে পাথরের মত শক্ত দিল মোমের মত গলে যায়। মুসলমান হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার খেদমত করি নাই কিন্তু এখন আমি এবং আমার স্ত্রী বাড়িতে গেলে তাদের খুব খেদমত করি। আলহামদুলিল্লাহ এখন সব ভাইবোনদের মধ্যে আমাদেরকেই তারা সবচেয়ে বেশী মুহাব্বত করে।

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোনো পয়গাম দিতে চান?

উত্তর : এর জন্য অনেক লম্বা সময়ের প্রয়োজন। আমার ধারণা, আমরা মুসলমানদের বাহিরের কোনো শত্রু নাই, ইসলাম থেকে দূরে থাকাই আমাদের বড় শত্রুতা। শুধু তাই নয় বরং আমরা ইসলাম থেকে দূরে থেকে সমস্ত মানবজাতির সাথে শত্রুতা করছি এজন্য যে, ইসলাম এবং ঈমান মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা ইসলাম ধর্ম শুধু মুসলমানদের জন্য মনে করে এবং মুসলমানদের দেখে ইসলামের প্রতি ঘাবড়ে যায়। তারা নিজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং নাজাতের রাস্তা থেকে আমাদের কারণে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থে নয় বরং সমস্ত মানবজাতির প্রতি কল্যাণকামী হয়ে তাদরে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। কমপক্ষে তারা যেন বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের এ বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার।

প্রশ্ন : বাস্তবিকপক্ষে এর জন্য আলাদাভাবে বসা দরকার। ইনশাআল্লাহ সামনের বার এ বিষয়ে আলোচনা করব শুকরিয়া- জাযাকাল্লাহ!

উত্তর : ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই এটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ব্যাপার। যার অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে যারা দাওয়াতের কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরই বেশী, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আহমদ ভাই! আপনি হাদী এবং দয়াময় প্রভুর শুকরিয়া আদায় করুন এবং তার কুদরত দেখুন যে, ডাকাতির অন্ধকার রাস্তা থেকে ইসলামের আলোকিত পথে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি আমার আল্লাহর উপর কুরবান হয়ে যাব, তার প্রতি উৎসর্গিত হব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, অক্টোবর–২০০৪

মুহাম্মদ হাসান (রবীন্দ্র মালিক)-এর সাক্ষাৎকার

দুআ করুন। আল্লাহ তাআলা যেন ঈমানের ওপর জামিয়ে রাখেন। মানুষ আজ ইসলামের ওপর চলার মুকাবিলায় আগুনে দগ্ধ হওয়াকে সহজ মনে করছে। তাদের জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আমি মাত্র আট দিনের মুসলমান। আমি আর কী পয়গাম দেবো। তবে গত এক মাস আমি ইসলাম সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা হল, ঈমান রক্ষা করা এবং বৃদ্ধি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ঈমানকেই অন্যদের নিকট সাফ সাফ পৌঁছে দেয়া।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ হাসান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : ভাই রবীন্দ্র মালিক সাহেব! গত রবিবার আপনি ফুলাত এসেছিলেন। আব্বু তখন আপনার ঘটনা শুনিয়েছিলেন। এই রবিবারে এসেছেন তো আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের এখানে ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দু ম্যাগাজিন বের হয়। মালিক স্বীয় অনুগ্রহে যাদের হেদায়াত দিয়ে কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন– ম্যাগাজিনটিতে তাদের আত্মকথা ছাপা হয়।

উত্তর : জী মাওলানা সাহেব! হযরত এইমাত্র আমাকে বলে গিয়েছেন। আজই আমি মুরাদাবাদ থেকে এসেছি আবার আজকেই ফিরে যেতে হবে। গতমাসে সেখানে বদলী হয়েছিলাম এখন আবার লক্ষ্ণৌ যেতে হচ্ছে। একে তো সরকারী চাকুরী তা-ও আবার পুলিশের। বিছানা সব সময় বাঁধাই থাকে।

প্রশ্ন : এটা তো বেশ ভালো কথা! আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করো যেনো তুমি এক প্রবাসী কিংবা পথিক।"

উত্তর : এটা তো তখন যখন স্বেচ্ছায় নিজেকে মুসাফির বানানো হবে। কিন্তু বিছানা সব সময় বেঁধে রাখলাম আর আশা করলাম হাজার বছর বেঁচে থাকি- এমন মুসাফির হওয়ার কী ফায়দা? হাদীসে বর্ণিত মুসাফির তো মানুষ তখনই হতে পারে যখন আখেরাত তার সামনে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। যেমন হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বিবৃত হয়েছে। জান্নাত, জাহান্নামের প্রতি তাদের এমন প্রত্যয় জন্মেছিল যে, চাক্ষুষ অবলোকন করলেও আশ্চর্যিত হতেন না।

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে আপনার কথা সত্য। মাশাআল্লাহ! এক সপ্তাহে আপনার অনুভব-উপলব্ধি অনেক বেড়ে গেছে।

উত্তর : অনুভব উপলব্ধির জন্য এক মিনিটই যথেষ্ট। আর বুঝতে না চাইলে সহস্র বর্ষও অর্থহীন। গরু-মহিষের মতো জীবন কাটিয়ে চলে যাবেন প্রকৃত নিবাসের কথা চিন্তায়ও আসবে না।

প্রশ্ন : আপনি সত্য কথাটিই উচ্চারণ করেছেন। এখন অনুগ্রহপূর্বক আপনার পরিচয় বলুন!

উত্তর : প্রকৃত পরিচয় তো কুরআনই বলে দিয়েছে– পঁচা কাদামাটি থেকে গঠিত, নাপাক বীর্য থেকে সৃষ্ট এক মানুষ। সাতাশতম পারায় তিলাওয়াত করছিলাম। আল্লাহ তায়ালা কেমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাতৃগর্ভ হতেই জানেন। কেন নিজের সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছো। মাতৃগর্ভে আমরা তো ঋতুস্রাব পান করে লালিত হয়েছি, কাল মরে গিয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হবো, আর বর্তমানে দুই কিলো মল পেটে নিয়ে ঘুরছি। ঘামে দুর্গন্ধ, মলে দুর্গন্ধ, মূলে দুর্গন্ধ। দুদিন দাঁত না মাজলে মুখের ভেতরও মলের দুর্গন্ধ। ব্যস এটাই এক নাপাক মানুষের পরিচয়। এই নিয়েই প্রত্যেকে বগল বাজায়- আমি অমুক, আমি তমুক।

প্রশ্ন : এটা তো উঁচু মাপের দার্শনিক পরিচয়। আমি আসলে আপনার পারিবারিক পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম।

উত্তর : মীরাঠ জেলার এক জাট পরিবারে ২রা অক্টোবর ১৯৫৪ সালে আমার জন্ম। পিতাজী কৃষিকাজের পাশাপাশি একটি সরকারী চাকুরীও করতেন। জ্যাঠা মশাই ডি. এস. পি থেকে রিটায়ার হয়েছেন। এক ফুফাও পুলিশে ছিলেন। বড়োত থেকে ইন্টারমডিয়েট ও গ্রাজুয়েশন করেছি। সাব পুলিশ ইন্সপেক্টরের চাকুরী পেয়ে যাই। পাঁচ বছর পূর্বে প্রমোশন পেয়ে ইন্সপেক্টর হয়ে যাই। কিছু দিন সাহারানপুরে ছিলাম। দুই বছর ছিলাম মুজাফফার নগর আর মীরাঠে। জুলাইয়ের শুরুতে মুজাফফরনগর সি,আই,ডিতে ছিলাম। একমাস পূর্বে মুরাদাবাদ ট্রান্সফার হয়েছি। এখন আবার প্রমোশন পেয়ে লক্ষ্ণৌ যেতে হচ্ছে। দুটি রুটি যা আল্লাহ তাআলা পূর্বেই ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তার জন্য কেমন ঠোকর খেতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দুঃখে মন বিষিয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন!

উত্তর : জানেন নিশ্চয়ই হযরত গত মে মাসে কান্ধালায় সপ্তাহব্যাপী দাওয়াতী ট্রেনিং ক্যাম্প বসিয়েছিলেন?

প্রশ্ন : হ্যাঁ, আসলে দিল্লীতে তখন তিন মাসের ক্যাম্পেইন চলছিল। তারই প্রাকটিক্যাল হিসেবে কান্ধালায় এক সপ্তাহর ক্যাম্পটি বসেছিল।

উত্তর : জ্বী, সেই ক্যাম্পের কথাই বলছি। কান্ধালার অবস্থা তখন ক্যাম্পের অনুকূল ছিল না। দুদিন আগেই এক মুসলমান একজন হিন্দুকে হত্যা করেছিল। তাছাড়া একটি মেয়ের ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের বাঁধা-বাঁধি চলছিল। এদিকে দুটি হিন্দু ছেলে মুসলমান হয়ে গ্রাম ছেড়েছিল। তাদের পরিবার উগ্র হিন্দু সংগঠন নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছিল। এমনই নাযুক সময়ে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। পরিবেশ বাহ্যত, ক্যাম্পের উপযোগী ছিল না। কিন্তু পূর্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত ছিল। কোনো কোনো দায়িত্বশীল মানাও করলেন। কিন্তু হযরত বললেন, প্রতিকূল পরিবেশে ক্যাম্পের ফায়দা অধিক হয়ে থাকে। তাছাড়া এটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সত্যের প্রচারক, প্রেম ভালোবাসার বার্তাবাহক ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্য কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়।

প্রথম দিন কর্মীরা যখন ফিল্ড ওয়ার্কে (অমুসলিম ভাইদের দাওয়াত দিতে) গেলেন, অশান্তিকামীরা ক্ষেপে উঠল। পরদনি দৈনিক জাগরণ সংবাদ ছাপল, "সৌদি আরব থেকে লোক এসেছে। ধর্মপ্রচার করে পরিবেশ নষ্ট করছে। আপত্তিকর বইপুস্তক বিতরণ করছে।" এতে বিরাট একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। মুসলমানারও ঘাবড়ে গেল। কান্ধালার এক দায়িত্বশীল ও পৃষ্ঠপোষক হযরতকে এবং তাঁর লোকদের বলল, আপতত ক্যাম্প গুটিয়ে নিন। কান্ধালা থানা ইনচার্জ স্থানীয় ক্যাম্পের আহ্বায়ক দায়িত্বশীল মৌলভী উসামা কান্ধালবীকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্প বন্ধ করার চাপ দিল। তিনি হযরত মাওলানার সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করে ক্যাম্পটি কেরানা অথবা শামেলী স্থানান্তরের খেয়াল ব্যক্ত করলেন। হযরত বললেন, আপনি দারোগাকে বলুন, এটা আমাদের আইনী অধিকার। আমাদের কারণে পরিবেশ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন বলবেন। ক্যাম্পের দায়িত্বশীল মাওলানা উওয়াইস নানুতবী থানা ইনচার্জের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে নিশ্চিন্ত করলেন। কিন্তু স্থানীয় জনগণের মধ্যে ভীতি রয়ে গিয়েছিল। এক যিম্মাদার তো দাঙ্গার ভয়ে কান্ধালা ছেড়ে চলেই গিয়েছিল।

পত্রিকার সংবাদের প্রেক্ষিতে আমাকে এবং আমার এক সাথীকে কান্ধালা পাঠানো হয়। আমরা প্রথমে কান্ধালা থানায় যাই। একজন পুলিশকে সাথে

নিয়ে জামে মসজিদ পৌঁছি। লোকজন বলল, দায়িত্বশীল কোথাও গিয়েছেন। আমরা বললাম, আসলে তাকে আমাদের কাছে যেতে বলবেন। আমরা মসজিদ থেকে চলে যাচ্ছিলাম পথে দুজন মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাত হল। একজন মাওলানা উসামা যিনি স্থানীয় আহ্বায়ক ছিলেন। আপরজন মৌলভী উওয়াইস যিনি ক্যাম্পের আমীর ছিলেন। দুজনই আমাদের থামিয়ে দিলেন যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে থানায় গিয়েছিলাম। জরুরী কথা আছে। মৌলভী উসামার বাড়িতে গিয়ে বসলাম। মৌলভী উওয়াইস আমাদের বললেন, আমি আপনি এক পিতা মাতার সন্তান। রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। মৃত্যুর পরে এক চিরস্থায়ী জীবন রয়েছে। যে মালিক আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের আপনাদের একক মালিক। দুনিয়ার এই জীবনে তিনি আমাদের কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

যখন জানতে পেলাম আপনারা মুজাফফর নগর থেকে এসেছেন, ভাবলাম মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই আমরা থানায় গিয়েছিলাম। তারপর তিনি কুরআন পাঠ করে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, মৃত্যুপরবর্তী হিসাব-কিতাব সম্পর্কে বলে যাচ্ছিলেন। মাওলানা সাহেবের মুখে আরবী কুরআন শুনে আমরা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী আগুন থেকে মুক্তিলাভের জন্য কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে যেতে বললেন এবং হযরতের কিতাব আপকি আমানত 'আপকি সেবা মে' উপহার দিলেন। আমি কিতাবটি নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটাই কি সেই কিতাব যা ফুলাতের এক ভদ্রলোক লিখেছেন? বললেন, হ্যাঁ, এটাই সেই কিতাব। বললাম, এই কিতবাটিরই কি মহারাষ্ট্রে সত্যায়ন হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, এই কিতবাটিই। আমরা ফুলাতের সেই ভদ্রলোকের পক্ষ থেকেই এসেছি। জানতে চাইলাম, সৌদী আরব থেকে এসেছে এবং আপত্তিজনক পুস্তক বিতরণ করছে তারা কারা? মাওলানা উওয়াইস বললেন, জনাব! সৌদী আরব থেকে কেউ আসেনি। আমরাই সেই লোক।

আমরা শুধু এই কাজই করি যার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আর বইপুস্তক বলতে শুধু এই কিতাবটিই বিতরণ করি। তার দরদপূর্ণ কথাগুলো আমাদের মর্মমূল স্পর্শ করল। বললাম, এখন আমরা দৈনিক জাগরণের রিপোর্টারের কাছে যাবো। তাকে স্বাগতম জানাতে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে যাবো। কারণ, সে যদি দয়া করে এই খবর না ছাপত

তাহলে এমন ভালো মানুষের সঙ্গেও আমাদের দেখা হতো না, এমন ভালো ভালো কথাও শোনা হতো না আর এই কিতাবেরও দেখা পেতাম না।

প্রশ্ন : উওয়াইস ভাই আপনাকে কালিমা পড়তে বলেছিলেন। আপনি কালিমা পড়েন নি?

উত্তর : না, আমি ভেবে-চিন্তে দেখার সুযোগ চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি কিতাবটি এক-দুই বার পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : বাড়হানায় আরেকটি ইনকোয়ারি ছিল। আমরা বাড়হানা হয়ে মুজাফফর নগর চলে যাই। রাতের বেলা 'আপকি আমানত' নিয়ে বসলাম। কিতাবটি আমার মনমস্তিষ্কের সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে দিল। ইসলামের জন্য হৃদয়ে জায়গা প্রস্তুত হল। বছরখানেক আগে একটা কেসের ব্যাপারে ডক্টর কমরজানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল। আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু কিতাব সংগ্রহ করে দিতে বলি। তিনি বললেন, ভালো কথা, চলুন আমরা ফুলাত চলে যাই। সেখান থেকে এ ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। এক রবিবারে আমরা ফুলাত গেলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেবকে পেলাম না। তবে সেখান থেকে কিতাব সংগ্রহ করা গেল। 'ইসলাম এক পরিচয়', মরণে'কে বাদ কিয়া হোগা' এবং কুরআন মাজীদ হিন্দী অনুবাদ সংগ্রহ করে চলে আসলাম। এই কিতাবগুলো বিশেষ করে কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলাম আমার কাছে ভালো লেগে যায়। কিন্তু গোটা সমাজের সঙ্গে টক্কর দেয়াটা আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার হিম্মত করতে পারছিলাম না। সে সময় মুরাদাবাদ আমার ট্রান্সফার হয়ে যায়। কিন্তু সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার খাতিরে তখনও বাসা বদল করিনি। স্কুলে একটি ফাংশান ছিল। সেজন্য দুদিনের ছুটি নিয়ে মুজাফফর নগর এসেছিলাম।

রমজানের চারদিন আগের কথা। আমি কুরআন পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি, এক মসজিদে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বসে আছেন। আহা! সেকি নূরানী মুখাবয়ব। শ্বেত-শুভ্র পাগড়ি পরিহিত। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বৎস! তুমি কি ইসলাম বুঝতে পেরেছো? বললাম জী! পুরোপুরি বুঝে এসেছে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপকি আমানত পড়ো নি? বললাম জ্বী, পড়েছি। বললেন, বুঝে এসেছে? বললাম, হ্যাঁ, বিলকুল বুঝে এসেছে। বললেন, যখন বুঝেই এসেছে তাহলে ইসলাম গ্রহণ করছো না কেন? বিলম্বে

ক্ষতিগ্রস্ত হবে জলদি করো। আরেকবার আপকি আমানত পড়ো। স্বপ্নের পরিবেশ বদলে গেল। আমি সেখান থেকে ফিরে আসলাম। স্বপ্নেই ডক্টর কমর জান সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞেস করলেন, সাক্ষাত হয়ে গেল? বললাম, কার সঙ্গে? বললেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে? আমি ডাক্তার সাহেবেকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, তিনি বাস্তব কথাটিই বলেছেন। তাঁর চেয়ে সত্য আর কে হবে। তিনি সকলের সেরা সত্যবাদী। তিনি এমনই সত্যবাদী যে, তার জান-ঈমানের শত্রুও তাকে সত্যবাদী বিশ্বাসী বলে ডাকতো। আমার চোখ খুলে গেল। রাত তিনটা বাজছে। পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমাতে চাইলাম কিন্তু কোথায় ঘুম! বাচ্চারা শুয়ে আছে। আমি বাথরুমে গিয়ে গোসল করলাম। ড্রয়িং রুমে গিয়ে আরেকবার আপকি আমানত পড়লাম।

সিদ্ধান্ত নিলাম সকালেই ফুলাত যেতে হবে। মোটর সাইকেল নিয়ে ডাক্তার কমরের ওখানে গেলাম। ঘটনাক্রমে তিনি মঙ্গলো গিয়েছিলে। সকালে বাচ্চাদের স্কুলের ফাংশানে যাওয়ার কথা ছিল। ডক্টর সুরেন্দ্র একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালাতেন। CBSE বোর্ডের প্রথম শ্রেণীর স্কুল। কয়েকটি সায়েন্স এক্সিবিশনও তারা দিয়েছিল। ইউপি সরকারের অ্যাওয়ার্ড ছিল তাদের দখলে। স্কুলে পৌঁছলাম। সিআইডিতে থাকার কারণে ডক্টর সাহেব আমাকে যথেষ্ট খাতির করতেন। প্রোগ্রাম শেষে তার সঙ্গে সাক্ষাত হল। আমার হাতে ছিল আপকি আমানত। দেখে বললেন, এটা কোথায় পেয়েছেন, এটা তো আমাদের ফুলাতের হযরতওয়ালার কিতাব? আমি ডক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাকে জানেন? ডক্টর সাহেব বললেন, আমার স্কুলের উদ্বোধন তো তিনিই করেছেন।

এক মৌলভী বন্ধু আমাকে ফুলাত নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরদী মানুষ। আমাকেও এই কিতাব হাদিয়া দিয়েছিলেন। তার আশীর্বাদেই আমার স্কুল এতো উন্নতি করছে। এই স্কুলে তিনি তিনবার এসেছেন। তিনি ছিলেন সায়েন্সের তুখোড় ছাত্র। জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টর সাহেব আপনি কিতাবটি পড়েছেন? বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। বললাম, কোনো কিছু বুঝে এসেছে? বললেন, কিতাবটিই এমন যে, পাঠকের একথা বলার অবকাশ নেই, কিছু বুঝে আসেনি! জিজ্ঞেস করলাম, তা কী সিদ্ধান্ত নিলেন? ডক্টর সাহেব বললেন, সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে কিন্তু সমাজের সঙ্গে লড়াই করার হিম্মত পাই না। রাতের বেলা মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়ি, হায়! আজ যদি মারা

যাই তাহলে তো নরকের আগুনে জ্বলতে হবে। চিন্তা করি সকালেই ফুলাত গিয়ে দ্বীন গ্রহণ করি, কিন্তু সকালে উঠে আর হিম্মত পাই না। গত সপ্তাহয় তো হযরত তিন তিন বার স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। বলেছেন, ডক্টর সাহেব! আমাদের ভালোবাসা উপেক্ষা করে মুক্তি পাওয়া যাবে না। গত পরশু বলছিলেন, ডক্টর সাহেব! মুসলমান তো হতেই হবে। এবার আমিও ডক্টর সাহেবকে নিজের অবস্থা খুলে বলি এবং প্রস্তাব করি, চলুন, দুজন একসঙ্গেই রওয়ানা দেই। ডক্টর সাহেব বললেন, হযরতকে পাওয়া তো কঠিন ব্যাপার। আমি বললাম, ডাক্তার কমর সাহেবকে ধরে সময় ঠিক করে নেবো।

আমি স্বস্তিবোধ করলাম যে, যাক জরুরী অথচ সুকঠিন সফরে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। ডাক্তার কমর সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি পরবর্তী রবিবার সময় নির্ধারণ করলেন। আমি মুরাদাবাদ চলে গেলাম। রবিবার পর্যন্ত সময়টা আমার বড় কষ্টে কাটল। বার বার মনে পড়তো আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিলম্ব করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। না জানি আবার কিছু হয়ে যায়। আল্লাহ আল্লাহ করে রবিবার আসল। আমি শনিবারেই মুজাফফর নগর চলে গেলাম। পরদিন সকাল নয়টার সময় ডক্টর সুরেন্দ্র ডক্টর কমরকে নিয়ে ফুলাত পৌঁছলাম। লোকজন বলল, সকাল দশটায় হযরত মাসজিদে যাবেন। সেখানে দেখা করতে পারবেন।

আমি যেহেতু লক্ষ্ণৌ বদলী হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলাম। এজন্য চাচ্ছিলাম, সেদিনই মুরাদাবাদ ফিরে যাবো। কাজেই তাড়াহুড়োও ছিল। আমি একটা বাচ্চাকে বলে পাঠালাম, মুজাফফার নগর থেকে সি আই ডি এসেছে, জরুরী ভিত্তিতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হযরত বলে পাঠালেন, একটু অপেক্ষা করুন নামায পড়ে আসছি। সঙ্গে আবার পানিও পাঠিয়ে দিলেন। হযরত সাহেব আসলেন। বললাম, হযরত মাফ করবেন। আমার আসলে তাড়াহুড়া আছে এজন্য সি আইডির কথা বলে পাঠিয়েছি। এমনিতে আমি সিআইডি ইন্সপেক্টর তবে এসেছি নিজের গরজে। হযরত বললেন, আমি এজন্য তাড়াতাড়ি এসেছি যে, আপনারা আমার মেহমান।। কোনো কারণে হয়তো তাড়া আছে। আপনি যদি কোনো সরকারের সিআইডি হয়ে থাকেন, তাহলে মালিকের দয়া, আমরা এক বড় সরকারের রাষ্ট্রদূত ও অফিসার। ডক্টর কমর সাহেবকে হযরত ভালো করেই চিনতেন। ডক্টর সুরেন্দ্রকেও জানতেন। স্কুল এবং বাড়ির খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করলেন। ডক্টর কমর সাহেব বললেন, ইনি রবীন্দ্র মালিক সিআইডি ইন্সপেক্টর। আর এই যে ডক্টর সুরেন্দ্র- আপনার

পুরনো মুরীদ। এঁরা কালিমা পড়তে এসেছেন। হযরত বললেন, এত দেরী করলেন কেন, আপনারই উচিত ছিল এঁদেরকে কালিমা পড়িয়ে দেয়া। এদের কারো ইন্তেকাল হয়ে গেলে তো সবার জন্যই জবাবদিহির আশংকা ছিল। হযরত সাহেব কালিমা পড়িয়ে দিলেন। বললেন, নাম পরিবর্তন করা জরুরী নয় তবে বদলে নিলে ভালো। মানুষের ওপর নাম পরিবর্তনের বেশ প্রভাব পড়ে যে, কুফর শিরক তো ছেড়েছেই সেই সঙ্গে কুফুর-শিরকের সঙ্গে সম্পৃক্ত নামও ছেড়ে দিয়েছে। আপনি আপনার নাম মুহাম্মাদ হাসান আর ডক্টর সুরেন্দ্র সাহেব তার নাম মুহাম্মদ হুসাইন রেখে দিন। এরা দুজন ছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় দৌহিত্র, হযরত আমাদেরকে আমৃত্যু ঈমান হেফাজত করার জোর তাগিদ দিলেন। বললেন, ঈমান হেফাজতের নিয়ম হল, আপনি ঈমানের এই সত্যতার প্রতি সবাইকে বিশেষত পরিবারের লোকজনকে নম্রতা ও মহব্বতের সাথে দাওয়াত দিতে থাকুন। তিনি আরও বললেন, পরিবারের সঙ্গে দরদপূর্ণ কোমল আচরণ করবেন যেন তারা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কিছু একটা তাকে এভাবে বদলে দিয়েছে। ফলে তারা ইসলামকে এই পরিবর্তনের কারণ মনে করে তা গ্রহণ করে নিবে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আপনি অতঃপর পড়া শুরু করেছেন?

উত্তর : আমি প্রথমে মুরাদাবাদ চলে যাই। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পথে ট্রেনে দুই ব্যক্তিকে দাওয়াত দিই। আলহামদুলিল্লাহ দুজনেই মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরতের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনেই তাদের কালিমা পড়িয়ে দেই। আমি অনুভব করি যখনই আমি কাউকে ঈমানের দাওয়াত দিই ইসলামের প্রতি আমার একীন আরও মজবুত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : নামায ইত্যাদি পড়া শুরু করেছেন?

উত্তর : আল্লাহর শোকর! নামায শিখে নিয়েছি। বর্তমানে আদায়ও করছি। রোযাগুলোও সব রেখেছি।

প্রশ্ন : পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি....

উত্তর : আমি গতকাল রাতে আমার মিসেসের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি। আসলে আমি গত কয়েক মাস যাবত ইসলাম অধ্যয়ন করছিলাম। সে আমাকে বলতো মনে হচ্ছে আপনি মোল্লাদের চক্করে পড়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যাবেন। রাতের বেলা আমি তাকে আপকি আমানত শোনাই। তার খুবই ভালো লাগে। বলে, আমি তো

ভাবছিলাম হঠাৎ আবার চৌধুরী সাহেবের কী হল? এখন বুঝেছি এই কিতাবের মিষ্টতা ও ভালোবাসা আপনাকে বশ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ! সেও কালিমা পড়ে নিয়েছে এবং সহযাত্রী হওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমরা বাচ্চা দুটিকেও কালিমা পড়িয়েছি। ইনশাআল্লাহ! তারা যখন ইসলাম অধ্যয়ন করবে ইসলামই স্বয়ং তাদের মনের জঞ্জাল সাফ করে দিবে।

প্রশ্ন : এখন কি সপরিবারে লক্ষ্ণৌ শিফট হচ্ছেন?

উত্তর : স্পষ্ট কথা, বেশি দিন পৃথক থাকতে পারব না। হযরত সাহেব বলেছেন, লক্ষ্ণৌতেই আমার জন্য বেশী সুবিধা হবে। ও দিকে আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলা নেই। তাছাড়া দ্বীন অধ্যয়ন ও পালনের জন্যও সেখানে উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া হাসান সাহেব! আল্লাহ তাআলা বরকতময় করুন। আপনিও মুবারক হোন, আমরাও মুবারক হই। আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : দুআ করুন! আল্লাহ তাআলা যেন ঈমানের ওপর জামিয়ে রাখেন। মানুষ আজ ইসলামের ওপর চলার মুকাবিলায় আগুনে দগ্ধ হওয়াকে সহজ মনে করছে। তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আমি মাত্র আট দিনের মুসলমান। আমি আর কী পয়গাম দেবো। তবে গত এক মাস আমি ইসলাম সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা হল, ঈমান রক্ষা করা এবং বৃদ্ধি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ঈমানকেই অন্যদের নিকট সাফ সাফ পৌঁছে দেয়া।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া! বাস্তবিকই অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, অক্টোবর- ২০০৯

ডাক্তার আসমা আলী (কল্পনা)-এর সাক্ষাৎকার

প্রথম আবেদন হল, আমার পরিবারের হেদায়াতের জন্য দুআ করবেন। দ্বিতীয় আবেদন হল, ইসলাম কোনো সম্প্রদায় অথবা জাতির নাম নয় যে, গোজরের ঘরে জন্ম নিলে গোজর হবে। কৃষকের ঘরে হলে কৃষক হবে আর মুসলমানের ঘরে হলে মুসলমান। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও বিধানাবলীকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তার সামনে নিজেকে অর্পণ করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোর পূর্বে এই অনুভূতি নসীব হতে পারে না।

আসমা আমাতুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ডাক্তার আসমা আলী : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বোন আসমা! কেমন আছেন? কতদিন দিন ধরে আপানার কথা শুনে আসছি আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আজ সাক্ষাত করিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন : আমার কথা আপনি কোথায় শুনলেন?

উত্তর : ডাক্তার আসিফের কাছে। তিনি হযরতের অত্যন্ত প্রিয় মুরীদ। তিনিই আমাকে বলেছেন, আপনি হযরতের কন্যা আসমার সঙ্গে সাক্ষাত করুন, আপনার দাওয়াতী কাজে অনেক উপকার হবে। খোদ আমাদের হযরত বলেছেন, আসমা আমাকে দাওয়াত শিখিয়েছে।

প্রশ্ন : আসতাগফিরুল্লাহ ! আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে আবার কারও উপকার হয়। আমিও কারও উপকার করতে পারি। আপনি দিল্লীতে কবে এসেছেন?

উত্তর : আমরা এক সপ্তাহ হল দিল্লী এসেছি। সি.সি.আই. এমের পক্ষ থেকে একটি মেডিকেল ওয়ার্কশপ ছিল। আমার স্বামী ডাক্তার ইউসুফ আলী আর আমি দুজনে সেখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলাম। ডাক্তার সাহেব হযরতকে ফোন করতে থাকেন কিন্তু হযরত ক্রমাগত সফর করে যাচ্ছিলেন। গতকাল তিনি রাজস্থানের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর আমরা আজ হাজির হয়েছি। আমার স্বামীর সঙ্গে তার দুজন অমুসলিম সঙ্গীও বাইরে আছেন।

প্রশ্ন : আব্বাজী সম্ভবত আপনাকে বলে থাকবেন, আরমুগানের পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলবো?

উত্তর : জী হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, আমি এদের সঙ্গে বাইরে কথা বলছি ইতোমধ্যে আপনি আসমাকে ইন্টারভিউ দিয়ে আসেন। নভেম্বরে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরুন!

আমার খুবই খুশী লাগছে। এই প্রথমবার আরমুগানের জন্য আমার নামের কোনো বোনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি।

উত্তর : আমারও খুশী লাগছে। ডাক্তার আসিফ আমার নাম আপনার নামে এবং আপনারই কারণে রেখেছেন।

প্রশ্ন : জী, আপনি আপনার খান্দানী পরিচয় দিচ্ছিলেন।

উত্তর : রাজস্থানের গঙ্গানগরের এক জমিদার পরিবারে ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে আমার জন্ম। আমার দাদা রাজস্থানের বিজেপির এক বড় নেতা। রাজস্থান সরকারে তিনি কয়েকবার মন্ত্রীও ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই এম.এল.এ. আর একবার এম.পি হয়েছিলেন। গত নির্বাচনেই প্রথমবারের মত পরাজিত হয়েছেন। আমার পিতাও শুরু থেকে দাদার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এম.বি.বি.এস করেছিলেন। কিছুদিন প্রাকটিস করার পর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনিও একবার এম.এল. এ হয়েছেন। পিতাজী আমার নাম রেখেছিলেন কল্পনা। আমার দুটি ভাই, একটি আমার চেয়ে বড় আরেকটি ছোট।

বায়োকেমিস্ট্রিতে দ্বাদশ শ্রেণীর এম.বি.বি এসের কয়েকটি ভর্তি পরীক্ষায়ও পাস করতে পারিনি। পিতাজী আমাকে আর্মেনিয়ায় এম.বি.বি.এসে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখান থেকেই আমি এম.বি.বি.এস করি। আর ওখানেই ডাক্তার ইউসুফ আলীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। সে বছরই আমি ইসলাম গ্রহণ করি। বর্তমানে আমরা হিমাচলের একটি হসপিটালে কর্মরত আছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি তখন আর্মেনিয়ায় অধ্যয়নরত। আমার ক্লাস ফেলো ডাক্তার ইউসুফ আলীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়ে যায়। তার পরিবার ছিল বেশ দ্বীনদার। আমার পরিবারও হিন্দুয়ানী রেওয়াজ-রসমে কট্টর। কিন্তু দেখা গেছে ছেলে-মেয়ে যতই প্রাচ্য মনোভাব এবং ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালিত হোক বিদেশ বিভূইয়ে গিয়ে বংশীয় রেওয়াজ-নীতি বিলকুল বিস্মৃত হয়ে বসে। বরং বাস্তবতা হল, প্রাচ্য-মনোভাবাপন্ন লোকজন কেন যেন সেখানে গিয়ে ইউরোপীয়দের চেয়েও বেশী খোলামেলা হয়ে পশ্চিমা কালচারে গা

ভাসিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যেও এ ব্যাপারটি ঘটে যায়। আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের বিবাহ করে নিতে হবে। আমাদের চিন্তাও আসেনি যে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরতীমুখী দুটি ধর্ম ও চিন্তাধারার পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন : আব্বু বলে থাকেন, এই ধারণা ভুল যে, হিন্দু ও ইসলাম দুটি বিপরীত ধর্ম। তিনি বলেন, আসলে হিন্দু ধর্ম যেটাকে পরিভাষায় সনাতন ধর্ম বলা হয় দ্বীনুল কায়্যিম ইসলামেরই পুরনো বরং প্রথম সংস্করণ। আর ইসলাম হল তার সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ সংস্করণ। বেদ যদি আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীর প্রথম সংস্করণ হয় তাহলে কুরআন তার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সংস্করণ। তবে সনাতন ধর্ম তার অনুসারীদের কর্মকান্ডেন্ড বিকৃতির শিকার হয়ে গেছে। দ্বীন-ধর্ম তো পৃথিবীতে সর্বদা একটাই ছিল এবং একটাই থাকবে। এক আল্লাহর আইন গোটা পৃথিবীতে একটাই হতে পারে, একাধিক নয়।

উত্তর : কথা তো একেবারেই সত্য। তবে পৃথিবীতে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তো হিন্দু-মুসলিম দুটিকে সম্পূর্ণ উল্টো ধর্ম বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এটাও সত্য কথা। বলুন তারপর কী হল?

উত্তর : ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে বললেন, ধর্ম তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিবাহের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? এগুলো তো পুরনো যুগের কথা। পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমরা এখন ডাক্তার হতে যাচ্ছি। তুমি তোমার ধর্ম ফলো করবে। আমি আমার ধর্ম মেনে চলবো। আমরা হিন্দুস্তান গিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে নেবো। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

ডাক্তার ইউসুফী আলীর এক খালাতো ভাই ডাক্তার আবেদ আর্মেনিয়ায় থাকতো। ডাক্তার ইউসুফ আলী তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল। সে ছিল খুবই দ্বীনদার ও নামাযী তরুণ। সে ডাক্তার ইউসুফ আলীকে অনেক বোঝাল। বলল, তুমি দ্বীনদার ঘরের সন্তান। তোমার জ্যাঠা তো অনেক বড় মাপের আলেম। কাফের-মুশরিকের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ হতে পারে না। কুরআন স্পষ্ট একথা ঘোষণা করেছে। এতে সারা জীবন ব্যভিচার চলতে থাকবে। সন্তানরাও হারামজাদা হবে। কিন্তু তার বুঝে আসল না। ডাক্তার আবেদ দুতিন মাস ধরে তাকে বুঝানের চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে অপারগ হয়ে ডাক্তার ইউসুফ আলীর বাড়িতে জানিয়ে দেয়। হিন্দুস্তান থেকে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে। ডাক্তার সাহেবের জ্যাঠা মাওলানা হামেদ আলীরও কয়েকটি ফোন আসে। একবার প্রায় এক ঘন্টা কথাবার্তা হয় কিন্তু ডাক্তার ইউসুফ আলীর মাথায় ধরল না। আমাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করাটা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। তার এই খেয়ালও ছিল যে, আমি

বিজেপির জাতীয় নেতার মেয়ে। আমি কিছুতেই মুসলমান হতে রাজী হবো না। তার ভয় ছিল আমাকে মুসলমান হতে বললে না জানি আমি বিবাহের ইচ্ছাই ত্যাগ করে বসি। মূলত সে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। আমারও তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। তবে মানুষের মেযাজ তো বিচিত্র হয়ে থাকে। একেকজনের একেক স্বভাব। কোনো কোনো লোক তো প্রচন্ডন্ড আবেগপ্রবণ হয়। আমার স্বভাবে আল্লাহ তাআলা সবসময়ই স্থিরতা দিয়েছিলেন। আমার চোহারা দেখে সে মনে করতো তার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই।

তার এই আশংকাও ছিল, এমন বড় মাপের নেতার মেয়েকে মুসলমান বানালে একটা বড় লবি তার এবং তার পরিবারের বিরোধী হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যাপারটা দাঙ্গায়ও রূপ নিবে। ডাক্তার আবেদ চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে মুসলমান করে বিবাহ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার মেহেরবান খোদা তো এই তুচ্ছের প্রতি দয়া করার এরাদা করেছিলেন। (কাঁদতে কাঁদতে) আমার প্রিয় অনুগ্রহশীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম, তাঁর পরিবারের প্রতি, তাঁর সাহাবীদের প্রতি, তাঁর পবিত্র শহরের ধূলোমাটির প্রতিও সশ্রদ্ধ সালাম। কেমন সত্য কথাই না তিনি বলেছেন– কিছু লোক এমনও আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড় ধরে জবরদস্তি জান্নাতে দাখেল করবেন। বোন আসমা! আমার অবস্থাও অনেকটা এই রকম। আল্লাহ তাআলা জোর করে আমাকে ঈমানদারদের দলে শামিল করেছেন।

অবশ্য আমার এ অনুভূতিও রয়েছে যে, এখনও আমি নামকাওয়াস্তের মুসলমান। তবে যিনি আমাকে কল্পনা থেকে আসমা বানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দয়ার কাছে আশা করতে দোষ কী– আমার সমস্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সত্যিকার মুমিন বানিয়ে দিবেন। আমার আল্লাহ আমার দয়ালু খোদা তো মায়ের চেয়েও সত্তর গুণ বেশী মায়া-মমতাশীল। আমার রহমান-রহীম-হাদী প্রতিপালক অতি অবশ্যই আমাকে কামেল মুমিন না হলেও কোনো প্রকারে ঈমানের হাকীকত দান করে তার ঘরে ডেকে নিবেন। আল্লাহর ভান্ডারে অভাব কিসের? ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই (কাঁদতে কাঁদতে) তিনি আমাকে কামেল মুমিনা বানিয়ে ডাক দিবেন।

প্রশ্ন : বলছিলেন, আপনি আবেগপ্রবণ নন?

উত্তর : বোন আসমা! আপন আল্লাহ ও আল্লাহর পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই যদি মানুষের ভক্তিপূর্ণ ও আবেঘন সম্পর্ক না

হয় তাহলে সেটা মানুষের দিল নয় ; পাষাণমূর্তি তার চেয়ে বরং পাথরই শ্রেয়। বোন আসমা! মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া ও প্রতিপালিত হওয়া আপনি এই আবেগ অনুভব করতে পারবেন না। বিজেপির জাতীয় নেতার ঘরে জন্ম নেয়া মেয়ের জন্য এভাবে ইসলাম গ্রহণ করা কতটা বিস্ময়কর তা ভাবতেও লোম দাঁড়িয়ে যায়। উপরন্তু বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে বোন আমার! আমি স্বপ্নেও সত্যাসুন্ধানের কল্পনা করতাম না। এই ধারণাই ছিল না যে, সত্য অনুসন্ধান করে তা অবলম্বন করা আমার প্রথম জিম্মাদারী। এমন রেওয়াজ আর পরিবেশই সেখানে ছিল না। আর্মেনিয়ায় আমার সঙ্গে ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং আরবের বহুসংখ্যক মুসলমান ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করতো। কিন্তু তাদের কারও মধ্যে দাওয়াতের অনূভূতি ছিল না। জানামতে শুধু ডাক্তার আবেদই ছিলেন। যার আকাঙ্ক্ষা ছিল ডাক্তার ইউসুফ যেন হিন্দু অথবা হিন্দুদের মত না হয়ে যায়। এমন এক পরিস্থিতিতে আমার আল্লাহ আমাকে জোরপূর্বক কুফর ও শিরকের আগুনে জ্বলন্ত বন্দিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ঠেলে দিয়েছেন। এই দয়া ও অনুগ্রহের অনুভূতি আপনি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারবেন না।

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে আপনার কথা সত্য। এই অনুভূতি লাভ করাটাও আল্লাহ তাআলার বিরাট দান। যা হোক আপনি আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

উত্তর : হল কি, ডাক্তার আবেদ যখন ডাক্তার ইউসুফকে বুঝাতে অক্ষম হয়ে পড়ল আর সে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলার সাহস পেলো না তখন ডাক্তার আবেগে আমার কাছে আসল। কথাবার্তা বলার জন্য আমার থেকে একদিন সময় চেয়ে নিল। বলল, বলুন তো আপনি কি ডাক্তার ইউসুফ আলীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক? তাহলে আপনাকে আমি কিছু জরুরী কথা বলতে চাই। মানুষ সামাজিক জীব। সব সময়ই তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন পড়ে। আপনি তো বিজেপির এক জাতীয় নেতার কন্যা। আপনি যদি একজন মুসলমানের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ করে নেন, তাহলে আপনার পরিবার আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ডাক্তার ইউসুফ আলী সাহেবের পরিবারও আপনাকে মেনে নিবে না। তবে আপনি যদি মুসলমান হয়ে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ করতে রাজী হন তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, যেন ইউসুফ আলীর পরিবার আপনাকে বধু হিসেবে মেনে নেয়। আশা করি আমি তাদের রাজী করাতে পারবো। এতে এক পরিবার হারালেও আপনি আরেকটি পরিবার পেয়ে যাবেন। যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাবটি আমার

মনে ধরে যায়। ডাক্তার ইউসুফ আলীকে বলি, আমি মুসলমান হয়ে ইসলামী তারীকায় আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই। ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু ডাক্তার আবেদের কথাটি আমার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। আমি সেটাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করি। ডাক্তার ইউসুফকে পরিষ্কার জানিয়ে দেই, আমি কেবল এই শর্তেই আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত যে, আপনি আমাকে মুসলমান বানাবেন, তারপর ইসলামী নিয়মানুযায়ী আপনার পিতামাতা আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। কাজটি তার কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। ডাক্তার আবেদ এ ব্যাপারে প্রসংশনীয় ভূমিকা রাখে। সে ডাক্তার ইউসুফ আলীর পরিবারকে বোঝায় আপনারা যদি কল্পনার সাথে ইউসুফের বিবাহের ব্যবস্থা না করেন তাহলে তারা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলবে। বরং তারা কোর্ট ম্যারেজ করেই ফেলছিল, আমি কয়েক মাস চেষ্টা করে বংশের সম্মান বিশেষত মাওলানা হামেদ আলী সাহেবের নামের ইজ্জত রক্ষার্থে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। এখন আপনারা কী করবেন করেন। ব্যস, তারা রাজী হয়ে গেল।

চতুর্থ বর্ষের ছুটি চলছিল। একটা অজুহাত দেখিয়ে পরিবারকে জানিয়ে দিলাম যে, এই ছুটিতে আমি দেশে আসছি না। তারপর আমরা কোয়েটা চলে যাই। ডাক্তার ইউসুফের আসিফ নামে এক বন্ধু ছিল। তিনি ঐ বছর মাওলানা আযাদ মেডিকেল দিল্লী থেকে এম.বি.বি. এস কমপিণ্টট করেছিলেন। মাওলানা কালিম সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। হযরতের একেবারে দিউয়ানা মুরীদ ছিলেন। তিনি সাক্ষাত করতে আসলেন। ডাক্তার ইউসুফ তাকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ে নিতে বললেন। বললেন, বিবাহ যখন হওয়ার তখন তো হবেই, আপনি এক্ষুণি কালিমা পড়ে নিন। কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। আমি বললাম, যখন বিবাহ হবে তখনই কালিমা পড়ে নেবো। আমরা জোর দিয়ে বললাম, এম.বি.বি.এস শেষ করতে আরও এক বছর লাগবে। ওটা কমপিণ্টট হওয়ার পর আমরা বিবাহ করবো। কিন্তু তিনি জিদ করতে লাগলেন, কলিমাও এক্ষুণি পড়ুন আর বিবাহও এখনই সেরে নিন। কারণ, বিধানদাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। যতক্ষণ না আপনারা বিবাহ করছেন, তার বিধানে দুজনের এভাবে মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাত করার অধিকার নেই। আপনাদের ব্যভিচারের গোনাহ হতে থাকবে। ডাক্তার আসিফ মাশাআল্লাহ অত্যন্ত দ্বীনদার। দেখতে মাওলানা মাওলানা মনে হয়। আমার স্বামী তার সঙ্গে বেশ সম্পর্ক রাখতো। তিনি জোর দেয়াতে ইউসুফ ও তার পরিবার রাজী হয়ে গেল। আমি কালিমা পড়ে

নিলাম। ডাক্তার আসিফ পরিবারের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে মোহরে ফাতেমীতে আমার বিবাহ পড়িয়ে দিল। আর আমার নাম আসমা আলী রেখে বলল, আমাদের হযরতের কন্যার নামও অসমা। হযরতের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হযরতের দাওয়াতের উস্তাদ। তার নামে আপনার নাম রাখলাম। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা অনেক কাজ নেবেন। পরবর্তীতে মাওলানা হামেদ আলী সাহেব জানতে পেরে তিনি পুনরায় বিবাহ পড়ান এবং আদালতে রেজিস্ট্রেশন ও আইনী কাগজপত্র প্রস্তুত করে দেন।

বিবাহের এক সপ্তাহ পর ডাক্তার আসিফের নিমন্ত্রণ ও পীড়াপীড়িতে দিল্লিতে তাদের বাড়ি আসি। ডাক্তার আসিফের বোন এক গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তার কাছে নিয়মতি আরমুগান আসতো। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে হযরতের কিতাব 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' পড়তে দেন। জোর দিয়ে বলেন, কিতাবটি আপনি কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবেন। আপনার বুঝে আসবে, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কী পরিমাণ দয়ার আচরণ করেছেন। ডাক্তার আসিফের বোন সাফিয়্যা বুবু খুবই নির্ভরশীল ও দরদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রথম সাক্ষাতেই আমি তার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হই। তার কথামত আপকি আমানত তিন তিনবার পড়ি। ছোট সেই কিতাবটি তিনবার পড়ার পর ইসলাম আমার নিকট সবচেয়ে জরুরী ও পছন্দনীয় হয়ে যায়। মুসলমান আমি ঘটনাক্রমে হয়ে ছিলাম কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ! জেনে বুঝে সজ্ঞানে মুসলমান হলাম। আমি ডাক্তার আসিফকে বলি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে দিয়েছেন। আমি চাই আমার স্বামী যিনি আমার জীবনসঙ্গী, যার ছায়ায় আমাকে বাকী জীবন পার করতে হবে তিনিও যেন মুসলমান হয়ে যান। অবশ্যই তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু মুসলমান হননি। তিনি তো অনৈসলামী রীতিতে আমার সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ করতে চেয়েছিলেন। মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের নাম নয়। আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের সামনে মাথা নত করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা আমার স্বামীও যেন মুসলমান হয়ে যান। তিনি ছুটিতে তাকে এক চিল্লার জন্য জামাআতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। প্রথমদিকে ডাক্তার ইউসুফ আলীর জন্য ব্যাপারটি বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমিও গো ধরি, ডাক্তার আসিফও জেদ ধরেন। তিনি চাপে পড়ে রাজী হয়ে যান। কিন্তু যাওয়ার সময় তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, জামাআতে যাওয়ার পূর্বে ডাক্তার আসিফ যখন আমাকে মাওলানা কালিম সাহেবের কাছে নিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল আমাকে গ্রেফতার

করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাবছিলাম, চল্লিশটি দিন কিভাবে পার করবো। উখলা গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত হল। হযরত কয়েক মিনিট কথা বললেন। ব্যস, সে খুশি খুশি জামাআতে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুম্বাইয়ের এক জামাআতের সঙ্গে মথুরায় সময় লাগাল। চিল্লা শেষে সে দাড়ি-টুপি শোভিত হয়ে বরং যদি বলি, আমার স্বামী মুসলমান হয়ে ফিরে আসল– তাহলে সেটাও বাস্তব কথা হবে।

প্রশ্ন : তারপর আপনি আর্মেনিয়া ফিরে গিয়েছিলেন?

উত্তর : এম.বি.বি এস কমপিণ্টট করার জন্য আমাদের আর্মেনিয়া যেতে হচ্ছিল। যাওয়ার পূর্বে আমরা হযরতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। হযরত বললেন, ইসলাম গ্রহণ করে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। এখন আপনি মুসলমান শুধুই মুসলমান। উপরন্তু শ্রেষ্ঠ উম্মতের সদস্য হওয়ার কারণে একজন দাঈও বটে। মুসলমানকে কোথাও পাঠানো হলে দাওয়াতের জন্যই পাঠানো হয়। এখন আপনি এম.বি.বি. এস কমপিণ্টট করার নিয়ত নয় বরং দাওয়াতের নিয়তে যান। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা দুজনই নিয়ত ঠিক করে নিলাম। বিদায়ের সময় হযরতের কাছে দুআর আবেদন করলাম। এবং ডাক্তার আসিফের পরামর্শ অনুযায়ী হযরতের হাতে বাইয়াত হলাম। হযরত আমাদের নিকট থেকে বর্তমান সফরটি দাওয়াতের নিয়তে করার অঙ্গীকার নিলেন। আলহামদুলিল্লাহ সেই নিয়তের বরকত স্বচক্ষে দর্শন করেছি। বোন আসমা! আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এই এক বছরে এক আরবা মেয়ের কাছে আমি কুরআন পড়া শিখেছি। উর্দু শিখেছি, আরবী ভাষাও মাঝারী মানের আলেমার মত বলতে পারি। অধিকাংশ দুআয়ে মাসূরা মুখস্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে আনিয়ে প্রায় এক হাজারের মত কিতাব অধ্যয়ন করেছি।

প্রশ্ন : আপনার এম.বি.বি.এস এর কী হল?

উত্তর : দ্বীনকে বরং দাওয়াতকে মাকসাদ বানানোর বরকতে ফাইনাল ইয়ারে আমি গত চার বছরের চেয়ে অধিক নম্বর পেয়েছি।

প্রশ্ন : দাওয়াতের নিয়তের কী হল?

উত্তর : সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আসলে দাওয়াত আমাদের জীবনের ধ্যান হয়ে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ! আর্মেনিয়ায় বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের **১২১** (একশত একুশ) জন ছেলে মেয়ে এবং আমাদের কলেজের ছয়জন শিক্ষক মুসলমান হয়েছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তান বাংলাদেশের অমুসলিমরা কোত্থেকে আসল?

উত্তর : বাংলাদেশের দুজন ব্রাহ্মণ আর পাকিস্তানের সিন্ধের চারজন হিন্দু আলহামদুলিল্লাহ খুব বড়ো ও ভালো ডাক্তার হয়ে দাওয়াতের নিয়তে দেশে ফিরে গেছে। এখন হিন্দুস্তানে এসে মনে হচ্ছে, আর্মেনিয়ায় কাজ করা বেশী সহজ। তবে দাওয়াত যদি কারও ধ্যানে পরিণত হয় তাহলে এখানে কাজ করাও সহজ। তবে তুলনামূলক সেখানে সহজ।

প্রশ্ন : হিন্দুস্তানে এসেছেন কতদিন হল? এখানে এসে দাওয়াতের কাজ করেন নি? সম্ভবত আপনাদের হজ্জও হয়ে গেছে?

উত্তর : চার বছর হল দেশে ফিরেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যেখানেই থাকি আমি নিজে মেয়েদেরকে নিয়ে আর আমার স্বামী পুরুষদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায পড়ার এহতেমাম করে থাকে। দুই বছর আমরা দিল্লীতে ছিলাম। সফদর জং এবং রাম মনোহর হাসপাতালে কাজ করেছি। বর্তমানে হিমাচলে দুবছর হতে চলল। আলহামদুলিল্লাহ! আমার দাওয়াতে ২৮ (আটাশ) জন ডাক্তার মুসলমান হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন মেয়ের মুসলমানের সঙ্গে বিবাহও হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন এমনও আছে, যারা ঘোষণা দেয় নি। আমার স্বামী এবং আমার বদৌলতে হিন্দুস্তানে একশরও অধিক লোককে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দিয়েছেন। তাদের একজন অল ইন্ডিয়ার অনেক বড় অফিসার। বর্তমানে রিটিয়ার্ড হয়েছেন। এখনও সংখ্যা অনেক কম। সামনে অনেক কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের কী হল ?

উত্তর : আমি আর্মেনিয়া থেকে ফোন করে তাদের বিবাহের সংবাদ জানিয়েছিলাম। আমার পিতা এবং দাদা ফোনেই বলে দিয়েছেন, তুমি আমাদের থেকে মরে গিয়েছো। আমাদের আর ফোন করবে না। এরপর থেকে তারা আমার ফোন রিসিভ করে না। কণ্ঠ শুনেই কেটে দেয়। তারা এলাকার লোকজনের কাছে বলেছে, কল্পনা আর্মেনিয়া গিয়ে মারা গেছে।

প্রশ্ন : আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় করেন নি?

উত্তর : আমি অনেক চিঠি লিখেছি। তারা উত্তর দেয়নি। আমার পরিবার রাজনৈতিকভাবে এক কট্টর দলের সঙ্গে জড়িত। তবে ব্যক্তিগত জীবনে অধিকাংশ লোকই ভালো মানুষ। জানি না আমার পরিবারের কী হবে। যখনই হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করি খুব জ্বালাতন করি। গতবার গরমের সময় যখন এসেছিলাম, হযরতের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, হযরত! আমার পরিবারের কী হবে? হযরত! আমার দাদা-দাদী, আমার পিতা-মাতা, আমার ভাই-বাবা যদি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে কীভাবে তারা দোযখের আগুন

সহ্য করবে, হযরতও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বুঝতে দেননি। আমার কিছুটা হুশ হলে হযরত আমাকে বুঝিয়েছেন, শরীয়তের প্রতিটি নির্দেশই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি আমার না মাহরাম। বোরকা পরিধান করলেই শরীয়তের বিধি-নিষেধ উঠে যায় না। আবেগের সময় আপনি যদি শরীয়তের বিধানাবলী রক্ষা করার অভ্যাস গড়তে না পারেন তাহলে শয়তান আপনাকে বরবাদ করে ছাড়বে।

প্রশ্ন : বোরকা আপনি কবে থেকে পরতে শুরু করেছেন? হাসপাতালে কোনো সমস্যা হয় না।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এ তিন বছর হল বোরকা পরা শুরু করেছি। কিছু কিছু লোক উদ্ভট মনে করে তবে অধিকাংশই প্রভাবিত হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : প্রথম আবেদন হল, আমার পরিবারের হেদায়াতের জন্য দুআ করবেন। দ্বিতীয় আবেদন হল, ইসলাম কোনো সম্প্রাদয় অথবা জাতির নাম নয় যে, গোজরের ঘরে জন্ম নিলে গোজর হবে। কৃষকের ঘরে হলে কৃষক হবে আর মুসলমানের ঘরে হলে মুসলমান। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও বিধানাবলীকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তার সামনে নিজেকে অর্পণ করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোর পূর্বে এই অনুভূতি নসীব হতে পারে না।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া ডাক্তার আসমা আলী! আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! শোকরিয়া তো আপনার এবং হযরতের প্রাপ্য যে, আরমুগানের দাওয়াতী জলসায় আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা আমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, নভেম্বর - ২০০৯

একজন নিরক্ষর একনিষ্ঠ দা'য়ী ফাতেমার সাক্ষাৎকার

চতুর দিকে মানুষ ঈমান ছাড়াই আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, এ ব্যাপারে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। আমি যখন জানতে পারি কোনো হিন্দু মারা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। এমন লাগে আমি মরে গিয়েছি আর আগুনে জ্বলছি। এই পরিমান কষ্ট আমি অনুভব করি। আসল দাওয়াত তো হলো মানুষকে প্রিয় নবীর দস্তরখানে মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ তাআলা এই অধমকে জোরপূর্বক এই কামে লাগিয়েছেন।

আসমা যাতুল ফাউযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ফাতেমা : ওয়াআলাইকুমুস সালাম।

প্রশ্ন : আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

উত্তর : আমার বাপের বাড়ী কান্ধালার পাশে, আইলাম নামক এক কৃষকপল্লীতে আমার জন্ম। আমার পিতার নাম আব্দুর রশীদ। তিনি খদ্দর বিক্রি করতেন।

প্রশ্ন : আপনার বিবাহ কোথায় হয়েছে?

উত্তর : আমার প্রথম বিবাহ বড়হানার পাশে সুলতানপুর গ্রামে হয়েছিল। আমার স্বামী হঠাৎ করেই রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার টি.বি হয়েছিল। তারপর মুহাম্মদপুর গ্রামে আমার বিবাহ হয়। স্বামীর নাম আইনুদ্দীন। তিনি খুবই সহজ সরল মানুষ। পানিপথে খদ্দরের ব্যবসা। দুটি ব্যাপারে তিনি খুব খেয়াল রাখেন। একশত টাকা লাভ হলে তার অর্ধেক অবশ্যই তুলে রাখেন। আর কাপড় বেচেন খুব ঈমানদারীর সাথে। ধোঁকা-প্রতারণা তার স্বভাবে নেই।

প্রশ্ন : মুহাম্মাপুরে কতজন মুসলমান বাস করেন?

উত্তর : মুহাম্মদপুর আসলে হিন্দুদের গ্রাম। মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম।। তাও নামকা ওয়াস্তে। ছোট্ট একটা মসজিদ আছে।

প্রশ্ন : দ্বীনের কাজের প্রতি আপনি কিভাবে আগ্রহী হলেন?

উত্তর : আমি তো অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। দ্বীন থেকে দূরে অকেজো এক মুসলমান ছিলাম। আমাদের গ্রামে জাট পরিবারের একটা মহিলা মারা যায়। স্বামী তার আরেকটি মহিলাকে ঘরে তোলে। প্রথম পক্ষের দুটি যুবতী মেয়ে

ছিল। তারা আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো। আমি চুড়ি বিক্রি করতাম। ওরা আমাকে আম্মী বলে ডাকতো। গ্রামের অধিকাংশ ছেলে পেলেই আমাকে আম্মী বলতো। সবাই আমাকে বিশ্বাস করতো। কারো কিছুর প্রয়োজন হলে, জিনিসপত্রের দরকার হলে আমি বাজার থেকে এনে দিতাম। কেউ অসুস্থ হলে বড়হানা নিয়ে ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করতাম।

জাট সম্প্রদায় এবং অন্যান্য লোকজনও নিজেদের কিশোরী ও তরুণী মেয়েদেরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতো। ওই মেয়ে দুটিকে তার পিতা আর সৎমা অনেক জ্বালাতন করতো। একবার মেয়ে দুটি আমাকে বলল, আম্মী! ইসলাম ধর্ম আমাদের খুব ভালো লাগে। আমাদের তুমি কোনওভাবে মুসলমান বানিয়ে দাও। আমি চিন্তা করলাম, এতে পেরেশানহাল মেয়ে দুটি পেরেশানী থেকে বেঁচে যাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পাবে। আমি তাদের নিয়ে নেযামুদ্দীন মারকাযে গেলাম। সেখানকার আপাজী তাদের কালিমা পড়ালেন। একজনের নাম রাখলেন আওয়ারী অপরজনের সারওয়ারী। হিন্দি কিতাব পড়ে পড়ে তারা নামায শিখতে লাগল। পাবন্দীর সাথে নিয়মিত নামায পড়তে লাগল। তাদের দেখে আমারও লজ্জা লাগল যে, দুদিনের মুসলমান নামাযের এমন পাবন্দী করছে আর আমি পুরনো মুসলমান জামাত থেকে কত দূর! আমিও নামায পড়া শুরু করে দিলাম। চিন্তা করলাম, মাটির সৃষ্টি এই মেয়ে দুটির লজ্জায় তুমি নামায পড়লে আর আল্লাহর বিধানকে লজ্জা করলে না! একথা মনে করে নামাযে খুব কাঁদলাম। দুআ করলাম আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। এখন থেকে আমি তোমার আদেশ মনে করে তোমাকে ভালোবেসে নামায পড়বো।

এরপর আমি মেয়ে দুটির জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলাম। পানিপথের দুজন ভালো মুসলমান প্রস্তুত হয়ে গেল। দুজনকে বিবাহ দিয়ে দিলাম। আল্লাহর শোকর! সুখে-শান্তিতেই তাদের দিন কাটছে। তারপর আমি মুহাম্মদপুর চলে আসি। আমাদের ওখানকার জাট পরিবারের অনেক বড় এক বদমাশ বড় হানার কসাইদের সঙ্গে ফুলাত এসে মুসলমান হয়েছিল। হযরতজী তার নাম রেখেছিল আসলাম। সে এখন নামাযী হয়ে গিয়েছে। পূর্বের সমস্ত বদমাশী ছেড়ে দিয়েছে। চিন্তা করলাম এমন বড় মাপের দুশমন যদি মুসলমান হয়ে এতটা শুধরে যেতে পারে তাহলে এই যে সহজ-সরল লোকজন যারা আমাকে ভালোবাসে এরা দ্বীন গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলে কতইনা ভালো হবে।

আমি আমার কাছে আসা মহিলা ও তরুণীদের বোঝাতে শুরু করে দিলাম। আমি তো আর কিছু জানি না। আল্লাহ যা বলাতে চান দু' চার কথা বলি। প্রথম মেয়ে দু'টির ছয়মাস পর আরেকটি মেয়ে তৈরী হয়ে যায়। আমি তাকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে মুসলমান বানিয়ে দিই। আল্লাহ তাআলা তার জন্যও পাত্রের ব্যবস্থা করে দেন।

প্রশ্ন : এরকম যুবতী মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনার ভয় লাগেনি?

উত্তর : প্রথমবার ভয় লেগেছিল। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, গাঁয়ের লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করে। কেউ দেখে ফেললে বলে দেবো, চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাচ্ছি। আর এটা সত্য কথাই ছিল। কারণ, আমি তো তাদের কুফুরের চিকিৎসা করাতেই নিয়ে যাচ্ছি। পরবর্তীতে এই ভয় ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা জমে যায়। ভাবতাম, যদি কেউ কিছু বলে তাহলে স্পষ্ট বলে দেবো নরক থেকে বাঁচানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি এবং কোনরকম সন্দেহও করেনি।

প্রশ্ন : এরপর আর কারও ওপর কাজ করেছেন কি?

উত্তর : এক জমিদার পুত্র আমার বাড়ির দোকানে ঔষধ স্টক করতো। সে ছিল ডাক্তার। আমাকে সে নামায পড়তে দেখতো। একদিন আমাকে বলতে লাগল, আরে আম্মা! আপনি নামায পড়েন কেন? সামনে মোমবাতি রাখা ছিল। বললাম, ভাইয়া! তোমার আঙ্গুলগুলো একটু মোমবাতির ওপর রাখো তো। সে বলল, কেন তাহলে তো আঙ্গুল জ্বলে যাবে। বললাম, বেটা! সামান্য মোমবাতির আগুনেই যখন তোমার আঙ্গুলগুলো জ্বালাতে পারছো না তাহলে দোযখের আগুন কিভাবে সহ্য করবে? তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোনো হিন্দুকে মরতে দেখেছো? বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। বললাম, তাকে জ্বলতে দেখেছো! বলল, দেখেছি। বললাম, না তুমি দেখোনি, দেখলে আর হিন্দু থাকতে না। দুদিন পর একটি হিন্দু মহিলা মারা গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। চিতায় উঠিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। সমস্ত কাপড় জ্বলে গেল। লাশ উলঙ্গ হয়ে পড়ল। অতঃপর লাঠি দিয়ে তার মাথা ফুঁড়ে দেয়া হল। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে ভস্ম করা হল।

ঘটনাক্রমে পরদিন এক মুসলমান ধোপা মারা গেল। ছেলেটি তাকে দেখতে গেল। মুর্দাকে খুব ভালোভাবে গোসল করানো হল। যত্ন করে কাফন

পরানো হল। খুশবু লাগানো হল এবং অত্যন্ত নম্রভাবে কবরে নামানো হল। লোকেরা যখন মাটি দিতে লাগল, সে বলল, আমিও কি মাটি দিতে পারি? লোকেরা বলল, তুমি যদি গোসল করে পাকসাফ হয়ে থাকো তাহলে দিতে পারো। অন্যথায় হাত লাগিয়ো না। দাফন শেষ হওয়ার পর সে ফিরে আসল। এখন সে আর আগের মানুষটি নেই। একেবারেই শান্ত নীরব। আমি একদিন বড়হানা গেলাম। তার জন্য একটি হাদীসের কিতাব নিয়ে আসলাম। কিতাব পড়ে সে চুপি চুপি নামায পড়তে লাগল। সে তার স্ত্রীকে নামায পড়ার কথা বলল। স্ত্রী গিয়ে ঘরের লোকজনকে বলে দিল। লোকজন তার ওপর অত্যাচার শুরু করল। মুসীবতের বড় বড় পাহাড় তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। তার অবস্থা দৃষ্টে আমরা সবাই কাঁদতাম। তাকে নিয়মিত পিটানো হতো, অসহ্য হয়ে সে বলতো, তোমরা আমার গলা কেটে ফেলো, আমি অন্তত খোদার কাছে গিয়ে বলতে পারব, তোমার জন্য আমি গলা কাটিয়ে দিয়েছি। তাকে কামরায় আবদ্ধ করে মরিচের ধূনি দেয়া হল।

একদিন সে জান বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল– আমার এটা জানা ছিল না। তার পরিবারের লোকজন আমার পেছন পেছন বাড়িতে চলে আসে। আমার ঘরে তল্লাশী চালাতে থাকে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে আমার ঘরে নেই। আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে লাগলাম, উপরে গিয়ে মাচায়ও খুঁজে দেখো। তারা মাঁচায় চড়ে খুঁজতে লাগল। সেখানে কাঠের বড় বড় তিনটি বাক্সে সর্ষে বোঝাই করা ছিল। আমি বললাম, বাক্সের পেছনেও খোঁজ করে দেখো, সেখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা বাক্স সরিয়ে দেখল এবং না পেয়ে চলে গেল। আমি কপাট বন্ধ করে উপরে গেলাম, আর সে বাক্সের পেছনে থেকে বেরিয়ে এল। বলতে লাগল, আম্মী! আমার আল্লাহ যদি এখানে তাদের অন্ধ না করে দিতেন তাহলে ওরা আজ আমাকে মেরে ফেলতো। তারা যখন আমাকে খোঁজ করছিল? আমি তো বাক্সের পেছনেই ছিলাম। উপর দিয়ে আমার মাথা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের কেউ তা দেখতে পায়নি। এই ঘটনায় আমার সাচ্চা ঈমান নসীব হল। আমার ছেলে ইন্তেজারও পরদিন চিল্লায় চলে গেল। আমার মেয়েরাও নামায পড়তে লাগল। আমার দুটি ভাইও আইলাম থেকে এই ঘটনা শুনে জামাআতে চলে গেল।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : হুসাইনপুরের মাওলানা মুআয এবং হাফেজ নওয়াব সাহেব তাকে নিয়ে ফুলাত আসল। হযরতজী তাকে কালিমা পড়ালেন। নাম রাখলেন সুহাইব। তারপর তাকে জামাআতে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর তার পরিবার আমাকে জ্বালাতন শুরু করল। প্রতিদিনই এসে বলতো, হয় তার সন্ধান দাও, অন্যথায় তোমাদের সবাই পুড়িয়ে মারবো। একদিন যখন তারা একেবারে মারামারির প্রস্তুতি নিল তখন আমি ঘরে তালা দিয়ে সন্তানদের নিয়ে বড়হানা চলে আসলাম। ভেবেছিলাম, ঘরদোর ভেঙ্গে অন্যেরা দখল করে নিবে। কিন্তু সেখানকার জাট সম্প্রদায় একটি জিনিসও কাউকে বের করতে দেয়নি। বড় হানায় প্রতিদিনই পুলিশ আসতো। এখানেও যখন জ্বালাতন শুরু হল, আমি সঠেরী চলে আসলাম। তারপর ফুলাত এসে হযরতজীর মুরীদ হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন : আপনি ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে এসেছেন দুঃখ লাগেনি?

উত্তর : সত্য বলছি, প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগতো। পরে চিন্তা করলাম, দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর মহব্বতেই তো ছেড়েছি। এতে মন ভালো হয়ে গেল।

আমার স্বামী এতে খুবই দুঃখিত হয়। সে বলেও যে, তুমি আমাদের বরবাদ করে দিয়েছো। আমি তাকে সাফ বলে দিয়েছি, নিজের দ্বীনের জন্য, আল্লাহর ভালোবাসার জন্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে চলার কারণে যদি তুমিও চাও আমাকে ছেড়ে দিতে পারো– আসলে এ জাতীয় কথা মুখে আনাও পাপ- কিন্তু একদিন সে বলেছিল, তুমি আমাকে মেরে ফেলেছো, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিবো– এরই প্রেক্ষিতে আমি ওকথা মুখে এনেছিলাম।

প্রশ্ন : এমতাবস্থায় আপনার সন্তানদের কী মনোভাব?

উত্তর : ছেলে-মেয়েদের কোনো দুঃখ নেই। ছেলে ইন্তেজারের বয়স চৌদ্দ বৎসর। সে বলে, আম্মী! আমরা তো কেবল বাড়ি ছেড়েছি, আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ভূখাও ছিলেন। এখনতো আমাদের ভূখা থাকা বাকী আছে। আমার দুই মেয়ে শায়েস্তা আর গুলিস্তাও খুব খুশি। ওরা বলে, মা! আসবাবপত্র কোনো কাজের জিনিস? মরে গেলে তো এমনিই তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, নবীর অনুসরণে ঘরবাড়ি ছাড়তে পেরেছি।

প্রশ্ন : এ অবস্থায় আপনার পিত্রালয়ের কী অভিব্যক্তি?

উত্তর : আমার বাপের বাড়ির লোকজন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা যেন কেমন প্রজাতির লোক। তাদের বাড়িতে গেলে ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে, তুমি তো আমাদেরও মারার অবস্থা করবে! পিতাজী বলেন, কেউ তোমাকেও মেরে ফেলবে, তোমার ছেলে পেলেগুলোকেও তুলে নিয়ে খুন করবে। আমি

বলেছি, কেউ আমাকে হত্যা করলে করুক, মরতে তো এমনিতেই হবে– ব্যাস, শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হবে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মৃত্যু কামনা করতেন। আমি বাড়ির সবাইকে বলে দিয়েছি, আমি বর্তমানে ফুলাত আছি। আমার সন্তানেরা আছে কান্ধালায়। কেউ আর তাদের মারবে কি তোমরাই সবাই মিলে ওদের মেরে ফেলো। এতে আমি খুশী আছি। আর যাই হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে তো বলতে পারবো, তোমার দ্বীনের জন্য আমি আমার সন্তানদেরও কুরবান করেছি।

প্রশ্ন : বর্তমানে সাঠেরী অবস্থানকালীন কাউকে দাওয়াত দিয়েছেন?

উত্তর : প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানকার মহিলাদের আপনাদের এখানকার ইজতিমায় নিয়ে আসি। কয়েকজন মহিলা তো সবার নিকট দ্বীন পৌঁছে দেয়ার পাক্কা এরাদা করে নিয়েছে। এক কামারের ছেলে মুসলমান হতে প্রস্তুত। সামনের জুমআয় সে হযরতজীর নিকট মুসলমান হতে আসবে। আমি যেখানেই যাই সবাইকে দ্বীনের কথা বলি। হরিয়ানায় যখন আত্মীয়-স্বজনের ওখানে যাই যেখানে মুসলমান নেই বললেও বলে। এমনকি ওখানকার মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী সেখানেও মহিলাদের খুব বুঝাতে থাকি। হিন্দু মহিলারাও জড়ো হয়। জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা উঠলেই আমার চোখে পানি এসে যায়। কেঁদে কেঁদে তাদের বোঝাই, বোনেরা! শীঘ্রই পাক্কা মুসলমান হয়ে যাও। দ্বীন কবুল করে নাও। ঈমান নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যাবে।। আমার চোখের পানি দেখে মহিলাদের মন মোম হয়ে যায়। চলে আসার সময়ও হিন্দু মেয়েরা টেনে ধরে, আরও শোনাও আরও শোনাও!

আমি কত লোককে যে হযরতজীর 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' হাদিয়া দিয়েছি। দশজন এই কিতাব পড়ে শিবাজীর মাথাই ফুঁড়ে দিয়েছে। সুহাইবের তিন বন্ধু এসেছিলেন হযরতজীর নিকট কালিমা পড়তে। হযরতজীকে পায় নি, আবার আসবে। হায় আমি যদি কিছু পড়তে পারতাম, কুরআন শরীফ পড়তে পারতাম। (কাঁদতে কাঁদতে) তাহলে আরও কত লোককে বুঝাতে পারতাম! আমার এই একটাই দুঃখ।

প্রশ্ন : এখন পড়ায় লেগে যান, এখনও পড়তে পারবেন।

উত্তর : একদিন স্বপ্নে দেখি, মুখ নেকাবে ঢাকা এক বুযুর্গ ব্যক্তি। আমার কাছে কিছুটা মনে হল, ইনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকে একটি কুরআন শরীফ দিয়ে বলছেন, পড়ে নাও। (কাঁদতে কাঁদতে) হায়! যদি আমি লেখাপড়া জানতাম!

শিক্ষিত লোকেরাই জানে কেন তারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পথে চলে না। চারদিকে কত মানুষ ঈমান ছাড়া আগুনে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। আমি যখন কোনো হিন্দুর মৃত্যু সংবাদ শুনি তখন বহুরাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। যেন আমিই মৃত্যুবরণ করে আগুনে জ্বলছি। এতটাই কষ্ট হয় তখন।

প্রশ্ন : দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করার পূর্বে ও বর্তমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করেন?

উত্তর : মাঝে মাঝে কাউকে পেয়ে গেলে তাকে দাওয়াত করি। এখনতো আমার ঘরদোর নেই– কোথায় দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করব? আমি কিছুটা সামলে উঠি, আল্লাহর ইচ্ছায় একটা ঠিকানার ব্যবস্থা হোক তখন দ্বীনের পথে আনার জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করব। দাওয়াতের বাহানায় লোকেরা ঈমান গ্রহণ করবে। শশী নামে আমার এক বান্ধবী আছে। আমি তাকে হযরতজীর কিতাব 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' দিয়েছিলাম। সে তার ঘরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। আমাকে বলে, আমি তো আর্যসমাজী হয়ে গিয়েছি। আমি কোনো রকম ভনিতা না করে সহজ কথায় তাকে বোঝাই, পয়নালা থেকে সরে কুয়োয় এসে পড়েছো। আর্যসমাজী হয়ে কী লাভ? যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সমাজে চলে এসো। মুসলমান হয়ে যাও! আমার ইচ্ছা তাকে দাওয়াত করব।

প্রশ্ন : আপনি যে মানুষকে ঈমান কবুল করে নেয়ার কথা বলেন– আরবীতে তাকে দাওয়াত বলে। এটাই হল আসল দাওয়াত। তো এই কাজে লাগার আগের আর পরের অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারেন?

উত্তর : (কাঁদতে শুরু করেন) এজন্যই বলি, হায়! আমি যদি শিক্ষিত হতাম! আপনি সত্যই বলেছেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানের প্রতি লোকদের আহবান করাই হচ্ছে আসল দাওয়াত।

সত্যকথা হল, এই কাজে লাগার পূর্বে, আরে আমি কি লেগেছি? মূলত এই নাপাক বান্দার প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন– তিনি আমাকে জোরপূর্বক

কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি যতদিন নিজেকে একাজে লাগাইনি, বর্তমানে আমি তখনকার আমিকে মুসলমানই মনে করি না। ঈমানের স্বাদ তো আমি মুহাম্মাদপুরের ঘরবাড়ি ছাড়ার পর বুঝতে পেরেছি। আমি একথা মানতেই পারি না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ না করেও মানুষ মুসলমান হতে পারে। যতদিন দ্বীনের কাজে, ঈমানের পথে আনার কাজে কিছুটা কুরবানী না দেয়া হবে, ঈমানের পরিচয়ই মানুষ বুঝতে পারবে না। অথচ নাম রেখেই সবাই নিজেকে মুসলমান ভাবতে থাকে। গত পরশু কান্ধালার হযরতজী (হযরত মাওলানা ইফতিখারুল হাসান কান্ধালবী) বলছিলেন, শুধু আল্লাহ আল্লাহ বললেই দিল সাফ হয় না। আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় কিছু করলে কিছু কুরবানী পেশ করলে তবেই কিছু পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক অনেক শোকরিয়া! আপনি আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করুন, তিনি আপনাকে এত বড় কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের জন্যও দুআ করবেন।

উত্তর : দুআতো আপনি করবেন। আমার তো দোআর যোগ্যতা নেই। আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা যাতুল ফাউযাইন

মাসিক আরমুগান, আগস্ট– ২০০৬

মুহাম্মুদ মহিব্বুল্লাহ (স্বামী আনন্দ)
এক সময়ের খোদা এখন মানুষ

বুদ্ধভিক্ষু স্বামী আনন্দের (মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ) হেদায়াত প্রাপ্তির ঈমানদীপ্ত আত্মকাহিনী।

বুদ্ধ খোদার অবতার হয়ে আমি পঁয়তাল্লিশ বছর এক মজাদার জীবন কাটিয়েছি। লোকেরা আমার পায়ে সিজদা করতো। একসময় তারা আমার খোদা হওয়ার একীন করে নেয়। আমার ভেতরেও ধীরে ধীরে খোদাত্বের একীন হতে থাকে। জীবনের দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বছর খোদাত্বের জোব্বা পরে কাটিয়েছি। প্রচার করেছি আমি বুদ্ধের অবতার। বুদ্ধের সাতবার পুনর্জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে আমিও একজন। দাবী করতাম, আমি যা বলি সব খোদার কালাম। এ ব্যাপারে আমার প্রত্যয়ও ছিল। কেবল আমারই নয় গেরুয়া বসনধারী প্রতিটি বুদ্ধ ভিক্ষুই একথার একীন করতো। 'বুদ্ধমত পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম' এই মতবাদ আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। ফলে শত শত দেশে আমার শাগরেদ-সহযোগী তৈরী হয়েছে।

আমার আপন ভাই বর্তমানে বিশ্বপ্রসিদ্ধ বুদ্ধ সন্ন্যাসী। সে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে থাকে। আমি যখন খোদাত্বের জোববা পরে জীবন কাটাচ্ছি সে সময় এক মুসলমান ভাই আর আমার এক শাগরেদ মাদ্রাজ নিবাসী ডক্টর চৈপানের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হই। আমাকে ইসলাম সম্পর্কিত কয়েকটি পুস্তক দেয়া হয়। আমি অমনোযোগিতার সঙ্গে সেগুলো পাঠ করি। কিন্তু পরবর্তিতে কুরআন মাজীদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকথা ও জীবন চরিত নিয়মিত অধ্যয়ন করি। সে সময়ই আমার হৃদয় গভীরে স্বীয় অপরাধের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ফলে খোদাত্বের ভেক ধরে জীবন-যাপনকারী আমি একজনের স্বামী হয়ে যাই। একক দেহধারী আমি পিতৃত্বের গৌরব লাভ করি। ধীরে ধীরে মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করি। অপরকে শান্তির পথ প্রদর্শনকারী নিজেই শান্তির অন্বেষী হই। বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের খোদা জ্ঞানকারী আমি এক একক আল্লাহকে মাবূদ বলে স্বীকার করে নেই।

সারকথা হল, আগে খোদা ছিলাম এখন মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমার জীবনের আদ্যোপান্ত কাহিনী আপনাদের নিকট সংক্ষেপে পেশ করছি।

আমার অবস্থা

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংগং শরণং গচ্ছামি

এই মূলনীতির ওপর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আমার মুখে সবসময়ই লেগে থাকতো। আমি বোধিবৃক্ষের নীচে বসে জ্ঞান লাভ করেছি।

বুদ্ধ সন্ন্যাসী : পৃথিবীতে বুদ্ধমতের প্রচারক।

গৌতম বুদ্ধ : মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিদানকারী, অজ্ঞতা দূরীভূতকারী। আর্যসমাজের অত্যাচার বিনাশকারী, মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শনকারী।

ব্রহ্মচারী : বুদ্ধের আকিদা-বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রচারকারী। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ। রাজকীয় ভঙ্গিতে বুদ্ধবিহারগুলোতে প্রফুল্ল জীবন-যাপনকারী। আর্য, আশ্রম ধর্ম (জাতপাতের নীতি)-এর বিরুদ্ধে তরবারী হাতে বেরিয়ে পড়া লোক।

মানুষ কে?

মানুষ কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, না কোনো খোদা তাকে সৃষ্টি করেছেন? মৃত্যু কেন আসে, মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি কী? আমার মন আমাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করে ফিরতো। প্রশ্নগুলো সবসময় আমাকে খুঁচিয়ে ফিরতো। আমি হারানো বস্তুর মতো এগুলোর উত্তর খুঁজে ফিরতাম। ফলে ধীরে ধীরে আমার মধ্যে পাশবপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মাতে থাকে। আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম। ফলে আমার অন্তরে মহাসত্যের সামান্য আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সম্পদের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় না সেই দয়া-ভালোবাসা আর বিনয় আমার হৃদয়ে জন্ম নেয়। যে পথের আমি পথিক তা সঠিক না ভুল এটা জানার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি। এভাবে অন্যান্য ধর্মগুলো যাচাই করে নেয়ার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে তাড়া করে। পৌঢ়ত্বে এসে চিন্তা-ভাবনা আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। অতীতের যাপিত জীবন নিয়েও আমাকে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ করে দিল। আমি স্বামী আনন্দ সাহেব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলাম। রেশমের কুরসিতে দরবারী খাদেম আমাকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যেতো। এই হল আমার অতীত অবস্থা।

আমার পরিবার তামিলনাড়ুর রামনাথপুর জেলার প্রেমকাদির নিকটে বসবাস করতো। আমি সিদ্ধার কোতায়ীর বন্দরগাহ থেকে বাদবানী নৌবাদ ব্রহ্মার পথ ধরি। সেখানে আমার দাদা তার পরিবার নিয়ে আরাম-আয়েশে

জীবন-যাপন করতেন। আমি যাদব বংশে জন্মগ্রহণ করি। বংশীয় পেশা ছিল পশুচারণ। কিন্তু আজ আমাকে বুদ্ধগুরু স্বামী আনন্দ বলা হয়। জীবিকার সন্ধানে বার্মা চলে যাই। কিন্তু মাতৃভাষা হিসেবে তামিলকে আমি সবময়ই ধারণ করে রেখেছি। আমার পিতা বাল্যকাল থেকেই একজন গোঁড়া বুদ্ধ ছিলেন। এজন্য বুদ্ধধর্ম অনুযায়ী আমাকে লালন-পালন করেন। বিভিন্ন বুদ্ধমন্দিরে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতাজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাকে বুদ্ধ ভিক্ষু বানাবেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় শাস্ত্র তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। রেঙ্গুন, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, কম্বোডিয়া, জাপান এই সব দেশের বুদ্ধগুরুদের থেকে আমি শিক্ষা অর্জন করেছি। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে আমি জ্ঞান অর্জন পূর্ণ করি।

তারপর একদিন বার্মার দ্বিতীয় রাজধানী ম্যান্ডেলায় আমাকে বুদ্ধমতের গুরু চ্যানেসরা এশিয়ার পাঁচ বুদ্ধগুরুর একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমাকে গেরুয়া বসন পরানো হয়। এভাবে বুদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে আমি বিশেষ মর্যাদা লাভ করি। তারপর জাপানের টোকিও শহরে বুদ্ধমতের গুরু 'বুদ্ধ দাসু ওয়াসু' আমাকে নাগাসাকিতে বসিয়ে দেন এবং গোটা পৃথিবীতে বুদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি ছিলাম একশত একজন গুরুর প্রধান। এরপর আমি গোটা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে বুদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার শুরু করে দিই। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার ১৭ টি দেশ যেখানে কম-বেশী বুদ্ধরা বসবাস করে। এগুলো ছাড়াও ইউরোপে বুদ্ধমত প্রচারের চেষ্টা চলতে থাকে। বুদ্ধমতের পৃথিবীতে আমার এমন মর্যাদা অর্জিত হয় যার কোনো পরিসীমা নেই। গোটা পৃথিবী ভ্রমণের জন্য সরকারীভাবে আমাকে গ্রীনকার্ড দেয়া হয়। ফলে আরব দেশগুলো ছাড়া সারা দুনিয়ার ঘুরে ঘুরে আমি এই ধর্মের প্রচার-প্রসার করতাম। আমার আপন ভাই স্বামী আনন্দ আচার্য আজও আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে সাতষট্টি তলাবিশিষ্ট বিশাল বুদ্ধ আশ্রমে মঠপতির পদে অধিষ্ঠিত। আমিও সেখানে সাড়ে তিন বছর মঠপতি ছিলাম।

ঝাড়-ফুঁক ও কেরামতি

চীন, তিব্বত, জাপান ইত্যাদি দেশে ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আমি বড় বড় কেরামতি দেখিয়েছিলাম। এতে আমার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল। ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আত্মাসমূহকে ডেকে আনা এবং তাদের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করানো ছিল আমার আমল। কালীকাড়ি, কলকাত্তাকালী, কেরলা দেবীর (স্থানীয় দেব-দেবীর নাম) পূজা করে তামার পাতে এবং সুতায় ফুঁক দিয়ে

লোকদের দিতাম। দেবতাদের একশত একটি রূপার পেয়ালায় বন্দী করতাম। সময় না কাটলে সেই পেয়ালাবন্দী দেবতাদের বের করে অন্ধকারে তাদের সঙ্গে কথা বলতাম।

এভাবে আমি আগত লোকজনের নিকট সারা দুনিয়ার বুদ্ধদের মধ্যে দেবতাদের ভাষা ও ভবিষ্যৎবাণীর পন্ডিত এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথনকারী মহাগুরু আনন্দজী নামে প্রসিদ্ধ হলাম। বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও শাসকগণ তাদের মাথায় আমার পা রেখে আশীর্বাদ নিতে পারাকে অত্যন্ত শুভলক্ষণ মনে করতো। সিঙ্গাপুরের প্রথম রাজার মাথায় পা রেখে আমি তাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলাম। অনুরূপ থাইল্যান্ডের রাজা বার্সা পুজু চ্যানসুইনকেও তার মাথায় পা রেখে আশীর্বাদ দিয়েছি। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রজীব গান্ধী ও জাপানের নির্বাহী রাষ্ট্রপ্রধানকেও একই কায়দায় আশীর্বাদ দিয়েছিলাম। শুক্র ও মঙ্গলবারে স্বর্ণের আসনে বসে এক মটকা পানি দিয়ে আমার পা ধোয়ানো হতো। পাঁচ ব্যক্তির পানযোগ্য পরিমাণ সে পানির মূল্য হতো একলাখ রুপি। কারণ আমি যে খোদার অবতার!

বুদ্ধের পুনর্জন্ম

দেবতাদের প্রধান খোদার সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম আমি সারা দুনিয়ায় সফর করতাম। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকেরা আমার প্রস্রাব পান করতো। এতে তারা আরোগ্য লাভ করতো। আমি যেহেতু তাদের খোদা ছিলাম তাই আমার প্রস্রাব পান করা তো দোষণীয় ছিল না।

আমি বোধিবৃক্ষের নিচে রূপার আসনে উপবেশন করতাম। স্বর্ণরূপা সামনে রেখে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়া ভক্তদের আশীর্বাদ করতাম। আশীর্বাদ নেয়ার জন্য তারা আমার খোঁজ করে ফিরতো। এক ব্যক্তি এসে আমার কাছে নিবেদন করল, গুরুজী! আমি তো খোদাকে দেখতে পারি না। আপনিই সেই মহান জীবিত খোদা। দুনিয়ার সব নেয়ামতই আমি লাভ করেছি। কিন্তু শাদী করেছি পাঁচ বছর হতে চলল, এখনও সন্তানের মুখ দেখি নি। গুরুজী! আপনি আমাকে বিশেষ আশীর্বাদ দান করুন, যাতে আমি সন্তান লাভ করতে পারি। একথা বলেই সে আমার গায়ে হাত রেখে হাতটি তার চোখে মুছে নিল।

আমার এই ভক্ত ছিল অনেক বড় কোটিপতি। তাকে আমার জালে ফাঁসানোর ইচ্ছা করলাম। তাকে বললাম, আজ সান্ধপূজার পর তোমাকে তাবীজ দেবো। শোয়ার সময় সেটাকে বালিশের নিচে রেখে দিবে। আজ

রাতে খোদা তোমার সঙ্গে কথা বলবে। আগামীকাল এসে শোনাবে খোদা তোমাকে কী বলেছেন। ঘটনাক্রমে পরদিন সে এসে আমার দরজায় আওয়াজ দেয়। আমার শাগরেদ দ্রুত এসে আমাকে জানায়, গুরুজী! সেই কোটিপতি এসেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কোন কোটিপতি? সে বলল, যে লোকটি সন্তান লাভের আশীর্বাদ নিতে এসেছিল এবং তাবীজ নিয়ে গিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ গেরুয়া বসন গায়ে মুড়িয়ে রেশমী পাখা হাতে নিয়ে, ভিক্ষুর পাত্র ধারণ করে এমন ভঙ্গিমায় তার সামনে উপস্থিত হলাম যেন সাক্ষাত বুদ্ধ ধরায় অবতরণ করেছে। লোকটি সাথে সাথে আমার পায়ে পড়ে গেল। বলতে লাগল, খোদা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। খুশীতে সে কাঁদতে শুরু করল। আমি তো খোদাকে দেখিনি কিন্তু আমার ভুয়া তাবীজ ধারণ করে এই নির্বোধ বলছে, খোদা তার সাথে কথা বলেছে। তার কথা শুনে আমি হতভম্ব ও পেরেশান হয়ে গেলাম। আমি একি শুনছি! পঁয়তাল্লিশ বছর মাথা ন্যাড়া করে তাবীয আর গেরুয়া বসন ধারণ করে ব্রহ্মচারী জীবন-যাপন করে সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দুপায়ে দলে সন্ন্যাসমত অবলম্বন করে বোধিবৃক্ষের নীচে জনমভর বুদ্ধ! বুদ্ধ! বলে চিৎকার করলাম, আর আমাকে পেছনে ফেলে এক ভুয়া তাবীযধারী খোদার সঙ্গে কথা বলে নিল। এটা কোনো ন্যায়-বিচারের কথা? কথা বলতে হলে তিনি আমার সঙ্গেই বলে নিতেন। পঁয়তাল্লিশ বছরেও আমার বুদ্ধ আমার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু আমার এক শাগরেদ তোমাকে তাবীজ দিয়ে দিল আর তিনি তোমার সঙ্গে কথা বললেন!

স্বামীদের প্রকৃত অবস্থা হল, গেরুয়া বসনে পবিত্রতার ভেকধারী এই মহান সত্তাদের যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকের মহাপাপী রূপটাই প্রকাশিত হবে। এদের অন্যতম হল, ব্রহ্মনন্দ স্বামী, চন্দ্রাস্বামী, মার্তণ্ডতম, জন জোসেফ ইত্যাদি।

আমার মুরুব্বীরা আমার মস্তিষ্কে একথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে থাকে। এরা বংশের সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট ছিলেন। পশুপালন ছিল তাদের বংশীয় পেশা। গরুকে তারা খোদাও মনে করতো। ছোটবেলা থেকেই আমি বুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলাম। এরপরও আমার পিতা-মাতা গরুকে খোদা স্বীকার করতো। তারা আমাকেও একথা বলে উত্তেজিত করতো যে, দেখো! এমন মহা খোদাকেও (গরুকে) মুসলমানরা কেটেকুটে ভুনা করে খায়। যা হোক, গুরু হওয়ার কারণে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করা আমার জন্য সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে কিছু মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইসলাম আমাকে ঘিরে নিল

কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মজবুত হতে থাকে। সেই সাথে ইসলামকে সঠিক পন্থায় জানারও একটা সহজ পথ বের হয়ে যায়। ছোট ছোট পুস্তিকা অধ্যয়ন করা হচ্ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত অধ্যয়নের পর আমার মধ্যে কুরআন পাঠ করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। তারপর কুরআন অধ্যয়ন শুরু করি। এক ও একক সত্তাই পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। কুরআন পড়ে একথা আমার বুঝে আসে। জানতে পারি, প্রভাতে সুর্যের উদিত হওয়া ও সন্ধ্যায় অস্ত যাওয়া তারই নির্দেশে হয়ে থাকে। এসব জানার পর তাঁর মহা সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ধীরে ধীরে আমার ভেতর ইসলামী চিন্তা প্রবিষ্ট হতে থাকে। তারপর এই চিন্তা-ভাবনা আমার চেতনায় ঝড় তুলে দেয়। আমার ভেতরে এক আন্দোলন শুরু হয় যে, আমাকে ইসলাম বুঝতে হবে, মুসলমান হয়ে যেতে হবে। ভাবলাম আরেকটু বাজিয়ে দেখি আরেকবার কুরআন পড়ে নেই। আমি একাগ্রচিত্তে কুরআনুল কারীম অধ্যয়নে ডুবে যাই। আশ্রমের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের প্রতি আমার অনীহা বাড়তে থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি আর মোম জ্বালিয়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে 'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি'-এর জপও বন্ধ হয়ে যায়।

যেভাবে ঘুরে গেল জীবনের বাঁক

দুই দুইবার কুরআন অধ্যয়নের পর আমার মনের তালাটি খুলে গেল। জানতে পারলাম, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার ভেতর ছিলাম। সবকিছু আল্লাহ তাআলারই কর্তৃত্বাধীন একথা জানার পরও আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত স্বামী আয়েশী জীবন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হল না। আমার শরীরও এ ব্যাপারে সায় দিল না। ইতোমধ্যে এক দলিত নেতা আমার কাছে আশীর্বাদ নিতে আসল। আমি তার মাথায় পা রেখে আশীর্বাদ করলাম, আপনি ১২০ বৎসর জীবিত থাকবেন। কিন্তু আমার আশীর্বাদ নেয়ার ৯০ দিন পর সে মারা গেল। এই ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেল আমাকে ডাক দিয়ে গেল, সতর্ক করে দিল। আমার জীবনের পট পরিবর্তনের এই ছিল সূত্রপাত। এ সময় অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটল। ১৯৯১ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনকালীন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রজীবগান্ধী, কাঞ্চীর শংকর আচার্যের কাছে আশীর্বাদ নিতে যান। শংকর আচার্য তাকে বলেন, আপনি একশত এক বছর বেঁচে থাকবেন। তিনি আরও আশীর্বাদ দিলেন যে, ভারতে আপনিই সবসময়

প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। শংকর আচার্যের আশীর্বাদের সাতাশতম দিনে রাজীব গান্ধী সাহেব শ্রীপুরে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। এই উভয় ঘটনা আমার মনের মধ্যে গভীর অস্বস্তির সৃষ্টি করল। আমাকে ধিক্কার দিতে লাগল যে, আমি এক বুদ্ধ স্বামী আমি যাকে আশীর্বাদ দিলাম সে ৯০ দিনের মাথায় মারা গেল। ও দিকে হিন্দুগুরু শংকর আচার্য যাকে আশীর্বাদ দিল সে মাত্র সাতাশ দিনের মাথায় নিহত হল। আমি জেনে গেলাম, আশীর্বাদদাতা এই আচার্য এবং আমি বুদ্ধভিক্ষু দুজনেই ভুয়া খোদা। খোদার জন্য এরচেয়ে অবমাননাকর আর কী হতে পারে।

এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ কোনো ক্ষমতার মালিক নয়। পৃথিবীতে কেবল আল্লাহ তাআলারই রাজত্ব চলে। এই বাস্তবতা আমার হৃদয়ে প্রত্যয় এনে দিল এবং আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিল যে, আমার মতো তুচ্ছ ও অপদার্থের আশীর্বাদ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। এই জাগরণ আমাকে দেবতা থেকে মানুষের কাতারে এনে দিল। দীর্ঘজীবনের গেরুয়া বসনটি শরীর থেকে খুলে ছুঁড়ে দিলাম। আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই।

মানুষ কি দেবতা?

আমি কি খোদা? ইসলাম আমাকে এ ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করল। মানুষের জন্য মানুষ হয়ে জীবন-যাপন করাই শ্রেয়। মানুষ সবকিছু থেকে মুক্ত থাকতে পারে কিন্তু বৈবাহিক জীবন থেকে নিবৃত থাকলে সে পঁচে-গলে যায়। ইসলামে একজন পুরুষকে (শর্ত সাপেক্ষে) চারজন স্ত্রী নিয়ে জীবন-যাপনের অধিকার দেয়া হয়েছে। বৈবাহিক জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে শত শত মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে তাদের জীবনকে ধ্বংস করার মহা অপরাধ ও অত্যাচার থেকে ইসলাম আমাকে রক্ষা করেছে। যা হোক আমি আমার মাথা থেকে গেরুয়া বসন খুলে ছুঁড়ে দিলাম এবং মানুষে পরিণত হলাম।

গুরুর অভিশাপ

আমার মুসলমান হওয়ার সংবাদ বুদ্ধ দুনিয়ায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন মহাগুরু তিব্বতের স্বামীজীর কাছেও এই সংবাদ পৌঁছল। তিনি সবসময়ই আমার প্রশংসা করতেন। সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে তলব করলেন। তিনি শুধু একজন স্বামীই ছিলেন না; ছিলেন এক মহা জাদুকরও। আমিও খুশি খুশি তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। তাকে আমার সার্বিক অবস্থা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আপনার ইসলাম গ্রহণে

শুধু বুদ্ধমতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধমত প্রসারে যে একটা আশা ছিল সেটাও ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। কাজেই আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। আমি বললাম, এই সিদ্ধান্তে পূর্নবিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। এ জাতীয় উত্তর স্বয়ং আমারও কল্পনায় ছিল না। ভাবতেই পারিনি এমনতরো উত্তর আমার মুখ থেকে বের হবে। একটা সময় ছিল, গুরু যদি বলতো, খরগোশ তিন পেয়ে প্রাণী, আমি চোখ বন্ধ করে তার সত্যায়ন করে বলতাম, হ্যাঁ, খরগোশ আদিকাল থেকেই তিনপেয়ে প্রাণী। সেই আমার মুখ থেকেই এমন উত্তর শুনে তিনি তো হতভম্ব। পারেন তো গোস্বায় ফেটে পড়েন আর কি। রাগে ক্ষোভে তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন। ইতোপূর্বে তার অভিশাপের নাম শুনলেও আমি চমকে উঠতাম। গায়ে কাঁপন ধরে যেতো। তার অভিশাপ ছিল এই– আমার কথা অমান্য করে 'ইসলাম পরিত্যাগ করব না' বলেছিস, তুই দূর হয়ে যা। একশ পঞ্চাশ দিনের মধ্যে তোর এক হাত আর এক পা অবশ হয়ে যাবে।

এ জাতীয় বাজে কথার ইসলামে কোনো স্থান নেই তা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দিতো, হয়তো অভিশাপের কোনো অশুভ ক্রিয়া প্রকাশ পাবে। কিন্তু এই সব কুমন্ত্রণা থেকে দৃষ্টি হটিয়ে আমি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে সেখান থেকে ফিরে আসলাম। এরপর থেকে প্রতিটি ক্ষণ আমার এই অস্থিরতায় কাটে যে, না জানি কাল কোনো বিপদ ঘটে যায় আর লোকেরা এটাকে অভিশাপের ফল বলে প্রচার করে বেড়ায়। এসব ভেবে আমি ঘাবড়ে যেতাম শংকিত হতাম। আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এই একশত পঞ্চাশ দিন কোনো বিপদাপদে ফেলেন নি। দিনগুলো আমি নিরাপদেই কাটিয়ে দেই। একশ পঞ্চাশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আমার মক্কা মুকাররামা যাওয়ারও সুযোগ হয়। আলহামদুলিল্লাহ! গুরুর অভিশাপের পর আমার জীবনে অনেক কারামাত অনুভব করেছি। এমনতরো অভিশাপের পর সাধারণত মানুষ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে নিজের অবস্থা বিগড়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলার দয়া যে, এই শংকাজনক সময়ে তিনি আমাকে পূর্ণ হেফাজত করেছেন। শুধু এতটুকুই নয় বরং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা মানব জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। তার মধ্যে একটি হল প্রতারণা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। গত পয়তাল্লিশ বছরে বুদ্ধভিক্ষুর আকৃতিতে আমি হাজারো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছি। কিন্তু আজ ধোঁকা দেয়ার ঘৃণিত কর্ম বিলকুল বিস্মৃত হয়েছি। অনুরূপ আমার উর্ধ্বতন গুরুদের থেকেও অনেক ধোঁকা পেয়েছি। আমার নতুন জীবনে এই

উভয় মন্দ কাজই নিঃশেষ হয়ে গেছে। গেরুয়া বসন আমার স্বভাব কঠোর করে ফেলেছিল, তাওহীদের কালিমার স্বীকারোক্তির পর আমি এক কোমল-হৃদয় মানুষে পরিণত হয়েছি। ইসলামের বদৌলতে আমার জীবনে নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকারোক্তি

আমি তেসরা অক্টোবর ১৯৯৩ সালে মাদ্রাজের মসজিদে মামুরে তাওহীদের কালিমা স্বীকার করে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করেছি। স্বামী আনন্দ থেকে মুহিব্বুল্লাহ (খোদাপ্রেমিক) হয়ে গিয়েছি। আমি নবজাতক শিশুর মত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহর নিকট সকল মানুষ সমান এই নীতির স্বাদ নিজের ভেতরে অনুভব করছিলাম। ভাবছিলাম, আজ থেকে পৃথিবীর সকল মসজিদে আমারও আছে সমঅধিকার। আমারও আছে সকল মুসলমানের সাথে এক কাতারে নামায পড়ার হক। ইনশাআল্লাহ আজকের পর পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতে চাইলে কারো শক্তি নেই আমাকে রুখে দাঁড়ায়।

ইসলাম গ্রহণ করে আমার খেয়াল হল, মানুষের সাথে সৌহার্দ ও ভালোবাসাময় সম্পর্ক রাখবো। ঘোষণা দেবো ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের। এই ভাবনায় ইসলাম সম্পর্কে আরো জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের এলাকা চিদমবরনা জেলার কয়েল পটনমের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে ইসলাম সম্পর্কে আরও জানা শোনার পর আমি জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। এখন আমার জীবনের লক্ষ্য হল, নিজের ঈমানকে মজবুত করা। ইসলাম প্রচার করা এবং মানুষের মধ্যে সাম্যের সঠিক রুপটি তুলে ধরা।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছিল। এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝির শিকার মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। তারা ইসলামের মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এমন নাজুক সময়ে তাদের ইসলামের সৌন্দর্য ও ইসলামের সাম্যের পায়গাম পৌঁছে দিয়ে ইসলাম ও পুণ্যের পথে তুলে দেয়া ইসলামের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, ভুল বোঝাবুঝি দূর করা সর্বোপরি তাদের ইসলামের প্রতি আহবান করা এই উম্মতের গুরু দায়িত্ব।

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত। তোমাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজে আদেশ করো ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করো আর ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি।" –সূরা আলে ইমরান : ১১০

অভিন্ন উদ্দেশ্যে একাত্ম হয়ে উম্মত যদি এই আয়াতে কারীমার ওপর আমল করে এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করে তাহলে হাজারো জনগণ ইসলামের ছায়ায় চলে আসবে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত

মানবেতিহাসে যদি অনন্য ও অবিস্মরণীয় কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে থাকে তাহলে তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র জীবন চরিত জানার অভিলাষে আমি দশ দশটি কিতাব অধ্যয়ন করেছি। এতে আমার জীবনে পরিবর্তন এসে গেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচশত একাত্তর খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। গভীরভাবে নবীজীবন অধ্যয়ন করলে পাঠকের সামনে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মেনে নিতে হয় পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের জন্মই হয় নি। এমন আরও অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে তাঁর জীবন ভরপুর। তাঁর ঈমানী শক্তি ও ঈমানী জযবা, তাঁর ইখলাস ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক তাঁর লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য, পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও সদাচার, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, আতিথেয়তার প্রেরণা, অন্যের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতার অনুভূতি এই সকল সদগুণের ভিত্তিতে আজকের আধুনিক বিশ্বও তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে। মানুষ হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য তার জীবন এক সহজ-সরল নমুনা। তিনি ব্যতিত আর কাউকে অনুসৃত নমুনা হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। নবীজীর মাহাত্ম্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে অন্যান্য জাতির ইতিহাস পাঠ করে দেখুন, কীভাবে তারা মানবজাতির ওপর জুলুম অত্যাচারের বৈধতা দান করেছিল। তারা অন্যায় ও পাপাচারের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। দেখুন তাদের জীবন কেমন ছিল আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কেমন ছিল। শুধু এটুকুই নয় কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্যও তার জীবন চূড়ান্ত নমুনা। এমন কীর্তিময় জীবন ও সর্বজনীন মুজিযা কেবল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই আমরা দেখতে পাই। অন্যদের জীবনে তা পরিলক্ষিত হয় না।

মানবতার ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব কীভাবে জীবন-যাপন করেছেন অন্যদের সঙ্গে তার আচরণ কী ছিল– আমি দলীল প্রমাণসহ তা অধ্যয়ন করেছি। তাঁর নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশটি বছরও এক শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ জীবন ছিল। সে সময়েও তিনি সমাজের আদর্শ মানব ছিলেন। প্রতিটি মানুষই কিছু গুণাবলী ধারণ করে

কিন্তু একই সময়ে সমস্ত সৎগুণের ধারক কেবলই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযোগ, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেছে। এটা মারাত্মক এক অভিযোগ। এর খন্ডনে মিস সরোজিনী নাইডু তার লন্ডনের এক ভাষণে বলেছিলেন, ইসলামের মাহাত্ম্য অন্যান্য ধর্মগুরুদের সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করেনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গীগণ ও তাদের অনুসারীগণ সিসিলি পর্যন্ত রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। আটশত বছর পর্যন্ত খৃস্টানদের ভুখন্ড স্পেনে দাপটের সাথে হুকুমত পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কখনও তারা পরধর্মের অনুসারীদের পূজাপাটে কোনো প্রকারে সামান্যতম হস্তক্ষেপও করেনি। খৃস্টানদের বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে সৎব্যবহার করেছেন, তাদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দেখিয়েছেন। সর্বোপরি তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, কুরআনে কারীম মুসলমানদের ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছে।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সম্পর্কে ফ্রান্সের রাজা মন্তব্য করেছিলেন সালাহুদ্দীনকে নিয়ে আমি আশ্চর্যবোধ করি, তিনি কিভাবে এতো ভালো মানুষ হয়েছেন। অথচ এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো প্রকার চাপ ছিল না। আমার মন আমাকে বলছে তুমিও মুসলমান হয়ে যাও। থমাস আর্নল্ড বলেছেন, ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রকার সদগুণের ধারক। সাধারণ মানুষের কথায়-কাজে, আচার-ব্যবহারে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে দ্বীনের কাজ করেছে, টাকা-কড়ির লোভে প্রচার কাজ চালিয়েছে এমন লোক ইসলাম প্রসারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং হাজার হাজার বণিক ব্যবসায়ী স্বপ্রণোদিত হয়ে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে। আফ্রিকা, চীনে ইসলাম প্রসারের মূল কারণ কুরআনের জ্ঞানের আলো। এই আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সেখানকার মুসলিম বণিকগণ।

পন্ডিত সুন্দরলাল বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় এমন একটি কর্ম সম্পাদন করেছিলেন যা ইতিহাস কখনো ভুলতে পারবে না। সারাটা জীবন যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, জ্বালাতন করেছে, জুলুম, অত্যাচার অবিচার করেছে, অপমান অসম্মান করেছে তাদে সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ভারতের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ লালা ঈশ্বর প্রসাদ বলেন, মুসলমানগণ উদার মনোভাবের লোক ছিলেন। বাস্তবিকই তারা অত্যাচারী হলে এতো দীর্ঘ

শতাব্দী ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব করা সম্ভব হতো না। গোটা পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে আপন বিশ্বাস মোতাবেক তারা মানুষের হিতকামনাই করে গেছেন। ভারতবর্ষে ধর্মীয় বিষয়ে তারা কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। ধর্মগ্রহণের ব্যাপারেও তারা কখনও হিন্দুদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন নি। অমুসলিমদের সঙ্গে তারা দয়া ও মানবিকতার আচরণই করে গেছেন।

কুরআন আমাকে বদলে দিয়েছে

আমি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেছি। এতে আমার আত্মা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কুরআন এমন এক গ্রন্থ যাতে মানবজীবনের সর্ববিষয়ের ন্যায়সঙ্গত দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি আমাকে আশাবাদী করে তোলে। সন্ন্যাসী হওয়ার কারণে এই অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে জায়গা করে নিয়েছে। এখন আমি আমার পুরনো দাস্তান অর্থাৎ, বহুবছর ধরে যে ধর্মকে আমি আকড়ে ধরেছিলাম তার প্রকৃত অবস্থা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

গৌতম বুদ্ধ ও বুদ্ধমত

গৌতমবুদ্ধের মতো পাঁচজন সমাজ সংস্কারক এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১) শিবরাষ্ট্র : তিন হাজার বছর পূর্বে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) লোগাস : দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ বছর পূর্বে চীনে জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) কনফুসিয়াস : দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ বছর পূর্বে চীনে জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) গৌতম বুদ্ধ : দুই হাজার ছয়শত বছর পূর্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।

(৫) ঈসা মসীহ : দুই হাজার বছর পূর্বে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর খৃস্টপূর্ব ৫৭৩ সালে গৌতম বুদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধ ২৯ বছর বয়সে দরবার ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন এবং সন্ন্যাসী হয়ে যান। ৩৫ বছর বয়সে বোধিবৃক্ষের নীচে জ্ঞান লাভ করেন। ৩৬ বছর বয়সে কাশী নদীর তীরে নদী থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে শরানাথ নামক স্থানে আর্যসভ্যতার বর্ণ আশ্রম ধর্মের (জাতপাত নীতির) অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার শিষ্যদের সামনে সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। ৪৫ বছর বয়সে উত্তর ভারতে মূর্তিপূজা ও খোদার নামে বেড়িক পশু বলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে বিপণ্ডব করেন।

বুদ্ধমতের কতিপয় মূলনীতি

মিথ্যা বলবে না, ব্যভিচার করবে না, নেশাদ্রব্য ব্যবহার করবে না, অহিংসা পরমধর্ম জ্ঞান করবে, পাপাচার থেকে দূরে থাকবে, মূর্তিপূজার বিরোধিতা করবে। এগুলোর পেছনে বুদ্ধ জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। অযোধ্যা থেকে দুইশত পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কাশী নগরে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার ভাষা ছিল পালি। পরবর্তীতে বুদ্ধের নামে একটি গ্রন্থ লেখা হয়।

গৌতম বুদ্ধ মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন। বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন এবং ন্যায়ের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তার তিরোধানের পর লোকেরা তাকে খোদা বানিয়ে বসে। বুদ্ধ ছিলেন এক দরবারী সন্ন্যাসী। তিনি অরিয়ন জাতির শাস্ত্র ও পুরাণ মানতেন না। দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নিজ বুদ্ধি মতে পরামর্শ দিয়েছেন। বুদ্ধ সারা জীবন আর্যসমাজের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই ধর্মে অরিয়ন সভ্যতা সংমিশ্রণ করা হয়েছে। ফলে মহায়ান (দার্শনিক নাগার্জুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ)ও হিনয়ান (পালিত শাস্ত্রে বর্ণিত বুদ্ধমত) উদ্ভূত হয়েছে। আর্য সম্প্রদায়ের চতুরতা ও ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষ হতে বুদ্ধমত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে সময় দক্ষিণ ভারতের নাগাপটনম এলাকার হাজার হাজার বুদ্ধভিক্ষুকে আর্য ব্রাহ্মণেরা ফাঁসিতে ঝুলায়। বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পন্থায় লোকেরা এই ধর্ম পালন করছে।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই : মহায়ান তিব্বতে, হিনয়ান বার্মা সিলোন ও থাইল্যান্ডে, জামবুত জাপানে, করিনবুত উত্তর বার্মায়।

ভারতের বাইরে এশিয়ার দেশগুলোতে বুদ্ধমত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ভারতে বর্ণআশ্রমের মিশ্রণে তা টিকে আছে। সিলোন বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দেশ। কিন্তু সেখানেও নীচু জাতের লোকের জন্য বুদ্ধবিহার বানানো হয়েছে গ্রামাঞ্চলে আর উঁচ জাতের জন্য সংগরাজ বুদ্ধবিহার বানানো হয়েছে শহরে। অনুরূপ দ্রাবিড় ও বিভিন্ন জাতের লোকজন স্বাধীনতার জন্য 'বুদ্ধং শরণং' শেষে বুদ্ধমত আমাদের, বুদ্ধমত আমাদের বলে হইচই করছে। এমনতরো বুদ্ধমত কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে?

মুক্তির পথ

মুক্তিকামী বন্ধুগণ! কিভাবে তোমরা মুক্তি লাভ করবে, তোমরা তো ভ্রান্ত পথে ভ্রষ্টমতে ছুটে বেড়াচ্ছো। ছুটো আরও ছুটো, যেখানে ইচ্ছা ছুটে বেড়াও

কিন্তু বুদ্ধদের জাল থেকে মুক্ত হতে চাইলে আপন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নাও। আমার দলিত ভাইয়েরা! তোমরা পরিয়া বুদ্ধও নও, পল বুদ্ধও নও (বুদ্ধজাত বিশেষ) তোমরা পৃথিবীতে এসেছো মানুষ হয়ে আর মানুষের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন তোমরা ইসলামেই পেতে পারো। ' চলো তোম ইসলাম কি তরফ' কিতাবের লেখক কমিউনিস্ট নেতা কোডিক্যাল চাল্লাপা ইসলাম গ্রহণের পর লিখেছে– অচ্ছুৎ গান্ধীজীর পূর্বেও ছিল, গান্ধীর পরেও থাকবে, বর্তমানেও আছে। কাজেই দ্রাবিড় জাতের লোকেরা! তোমরা ইসলামের দিকে চলো। স্বাধীনতা কেবল ইসলামে এবং একমাত্র ইসলামেই নিহিত। অল ইন্ডিয়া দলিত ওয়ার্কাস পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, চেপ্পান (M B B S) শ্রীলংকার বুদ্ধবিহারে পূজার জন্য নিয়মিত যাতায়াত করতেন। একবার তিনি ওখানের হলরূমে আম্বেদকর জয়ন্তীর প্রোগ্রামের জন্য অনুমতির আবেদন করলেন। সেখানকার বুদ্ধগুরু স্বামী নন্দশাস্ত্র বললেন, আপনাদের সকল পরিয়া বুদ্ধদের শুধুমাত্র জাতপাত ভুলে থাকার জন্যই 'বুদ্ধং শরণং' মন্ত্র জপা উচিত। এভাবে তিনি খোলাখুলি জাতের কথা তুলে ধরে আবেদন নাকচ করে দিলেন। ডাক্তার চেপ্পান বুদ্ধবিহার থেকে বের হয়ে সংক্ষুদ্ধ এক আহ উচ্চারণ করে বলেছিলেন, আমার মতো নেতার সঙ্গেই যখন যাচ্ছেতাই ব্যবহার তাহলে আমার জাতের জনসাধারণের সঙ্গে এদের কী আচরণ হবে!

তারপর তিনি 'পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে কেবলই ইসলাম' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন।

ইসলামের স্বাধীনতা, সাম্য ভ্রাতৃত্ব আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এতদসংক্রান্ত আমার হজ্জ সফরের কিছু অনুভূতি পেশ করছি।

হজ্জের সফর

আপনাদের নিকট হজ্জের অভিব্যক্তি তুলে ধরতে আমার খুব আনন্দ লাগছে। এ বছর বিভিন্ন দেশ থেকে কাবাতুল্লাহ তাওয়াফ করতে বিশ লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে সৌদী আরবের বিশ লক্ষ লোকও একই সঙ্গে অভিন্ন আওয়াজে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলছিল। আমার জন্য এটা ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। কাবার চারপাশে সমবেত এই যে চল্লিশ লক্ষ মানুষ এদের কারও মধ্যে অচ্ছুৎ এবং হিংসা গৌরবের কোনো বিষয় নজরে পড়েনি। আমি জীবনের সুদীর্ঘ সময় জাতপাতের নিয়মানুবর্তী হয়ে কাটিয়েছি। সেদিন এই দৃশ্য আমার হৃদয়ের গভীরতম অঞ্চলে আসন করে নিল। সাদা ফর্সা আরবী, কৃষ্ণবর্ণ জাপানী, শ্বেতবর্ণ জাপানী, গোধূমবর্ণ ভারতীয়, কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয়– যেন

গোটা পৃথিবীর মানুষকে একই সূঁতোয় জুড়ে দেয়া হয়েছে। কাবার চারপাশে সারি বেঁধে নামায পড়ার দৃশ্যও ছিল বড় চিত্তাকর্ষক। শুধু মানবজাতির ইতিহাসেই নয় আজকের এই নতুন পৃথিবীতেও এ এক বিস্ময়কর সমাবেশ। ইসলামের ভালোবাসা ও সৌহার্দের শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, সাম্যের ঘোষণা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি হজ্জের সফরে অর্জন করেছি। তা আমার মন-মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গেছে।

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমার পয়গাম

মুসলমানগণ! আপনারা হাদীসের বাণী "তোমাদের উপস্থিত যেন অনুপস্থিতকে এই পয়গাম পৌঁছে দেয়"– এর নমুনা হয়ে যান। আপনারা যদি এই অন্তিম উপদেশ অনুসরণ করেন তাহলে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়া আপনাদের "আর আপনি লোকদের দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখেল হতে দেখবেন"–এর দৃশ্য পেশ করবে ইশআল্লাহ! তবে শর্ত হল আপনারা আল্লাহর দ্বীনের নমুনা হয়ে যান। পৃথিবীবাসীর সামনে বাস্তবে প্রমাণ করুন, ইসলামই মুক্তির একমাত্র পথ। হে জগৎসমূহের প্রতিপালক! আমাকে ও এই উম্মতকে এই মহান আমানত অপরকে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের আখেরাতের আযাব থেকে নাজাত দান করুন। আমীন!

এখন আমি জীবনের বাকি অংশটুকু এই পয়গামকে অপরের নিকট পৌঁছানোর কাজে ওয়াকফ করবো এবং ইনশাআল্লাহ শেষ নিঃশাষ পর্যন্ত এ পথে অবিচল থাকবো। ওয়াস সালাম। আপনার ইসলামী ভাই মুহিব্বুল্লাহ মাদ্রাজী।

সৌজন্যে : মাসিক আরমুগান,
জুলাই-আগস্ট– ২০০৭ ইং

মৌলবী মুহাম্মদ ইউনুস (সুভাষ শংকরলাল)-এর সাক্ষাৎকার

অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম থেকে উত্তমতর আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দেখা-সাক্ষাত চালু রাখতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি-সন্দেহ সুন্দর ও মার্জিতভাবে নিরসন করতে হবে। ইসলামের বিধিবিধানগুলো আকর্ষণীয় পন্থায় অমুসলিমদের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও অনুপম আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অনুধাবন করতে হবে, কীভাবে তিনি প্রাণের শত্রুর সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করেছেন। ফলে ইসলামের শত্রুরা দলে দলে ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করেছে। অনুরূপ সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা সবক হাসিল করব ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা কী কী বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিলেন আর আল্লাহ তাআলার ওপর অবিচল আস্থা রেখে কীভাবে সেগুলোর সমাধান করেছিলেন।

আমার বর্তমান নাম মৌলবী মুহাম্মদ ইউনুস। সৌরবর্ষ হিসেবে আমার বয়স প্রায় ৫১ বছর। কিন্তু ইসলামী জীবনে আমার প্রকৃত বয়স ২৮ বছর। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালের সেই ঐতিহাসিক দিনটি আমার জীবনে বিপণ্ঢবের মর্যাদা রাখে যেদিন জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে ঈমান ও হেদায়াতের নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন। আমার জন্মতারিখ ৩১ শে জুন ১৯৫৫ ইংরেজী। আমার পৈতৃক নিবাস মহারাষ্ট্রের মান্ডিওয়াল কসবায়। এটা নন্দ গাঁওর নিকটবর্তী মিনমাড় রেলওয়ে জংশনের কাছাকাছি অবস্থিত। জালনার মহারাষ্ট্র নাইট স্কুলে হিন্দি মিডিয়ামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করি।

১৯৪৭ সালে মেট্রিক পাশ করি। মেট্রিকের পর থেকেই মাথায় বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ভীড় জমায়। ভাবতে থাকি এর কোনটি সত্য ও সঠিক। হাজারো রকমের প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে– আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো কেউ একজন আছেনই। এই জগৎ সংসারেও তো একজন পালনকর্তা আছে। এসব ভাবতে ভাবতে পূজাপাট থেকে মন উঠে যায়। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। মেট্রিকের পর শুধুমাত্র এই কারণে আমি কলেজে ভর্তি হই নি যে, সেখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমানদের সভ্যতায় পর্দার গুরুত্ব দেখে ইসলামের প্রতি আমার ঝোঁক

আরও বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে পর্দার গুরুত্ব ও উপকারিতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। ইতোমধ্যে জনৈক মাওলানা সাহেবের কতিপয় কিতাবের হিন্দী অনুবাদ আমার হস্তগত হয়। কিতাবগুলো আমাকে খুবই প্রভাবিত করে। আমার এক প্রতিবেশী মুহাম্মদ ইউনুসের আখলাক চরিত্রে আমি আগে থেকেই মুগ্ধ ছিলাম। অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ক কথাবার্তা বলতেন। ইতোমধ্যে আমাদের শহর জালনায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সেহগাল সাহেব আগমন করলেন।

তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার নতুন নাম ছিল ইউসুফ। তিনি মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ তাবলীগী যিম্মাদার মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ.-এর সঙ্গে জালনার ইজতিমায় আগমন করেছিলেন। সেহগাল সাহেব তার বয়ানে বার বার একটি কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন, ভাইয়েরা! আখেরাতের সফর অনেক দীর্ঘ। কাজেই পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নাও। কথাটি আমার মনে ধরে যায়। আমার মন আগে থেকেই ইসলামের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ছিল। অপেক্ষা ছিল কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে হেদায়াতের পয়গাম আসার। জালনার তিনদিনের ইজতিমায় আমি বিশেষভাবে ঐসব দ্বীনী ভাইদের ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করি। ১৯৭৮ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর এই তিনটি দিন আমার জীবনে পরিবর্তন আনতে থাকে। অবশেষে ইজতিমায় তৃতীয় দিন ১৬ই ডিসেম্বর আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিই।

জালনার মোতি মসজিদে জামাআতের তাশকীল হচ্ছিল। আমিও সেখানে নিজের নাম লিখিয়ে দিই। আমার পুরনো নাম সুভাষ শংকরলাল সাম্বর পরিবর্তন করে মুহাম্মদ ইউনুস রাখা হয়েছিল। এরপর আমি আমার তাবলীগী সফর অব্যাহত রাখি। উর্দু ও আরবী ভাষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শিখতে শুরু করি। আল্লাহর ফজলে এই সফর 'আলিম' সনদ লাভের পর শেষ হয়। বুখারী শরীফের মতো হাদীসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবও আল্লাহ রব্বুল ইযযত পড়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। সুভাষ সংকরলাল সাম্বর থেকে মৌলবী মুহাম্মদ ইউনুস পর্যন্ত। এই সফরে বেশ কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়েছি। বহু পরীক্ষারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি কারাগারেও বরকতময় স্মরণীয় কিছু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সত্তার ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা করায় আমার পা অটল ছিল। সে সময় কুরআনে কারীমের এই আয়াত আমার পথের মশাল হিসেবে

কাজ করেছিল। "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ তাআলা (দ্বীনের) সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।" –সূরা মুহাম্মদ : ৭

ঘটনা হল, আয়াতে কারীমা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তেলাওয়াত করতে থাকায় আমার সাহস সব সময় বেড়েই চলেছে। আমার আপন বড় ভাই বসন্ত, ছোট ভাই ধনরাজ। আমার মাতা হরকুবাঈ, বোন হীরাবাঈ এখনও বেঁচে আছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে মা ও ভাই-বোনের হেদায়েতের জন্য আমি নিয়মিত দুআ করি। ভাইদের সাথে এখনও দেখা-সাক্ষাত হয়। কিন্তু তারা আমাকে দ্বীনে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অনুমতি দেয় না। তারা বলে, আপনার যে ধর্ম ভালো লাগে পালন করুন কিন্তু আমাদের ওপর কোনো জবরদস্তি করবেন না। দ্বীন গ্রহণে জবরদস্তি নেই। এই আয়াতের প্রতি লক্ষ করে ধৈর্য্যের সঙ্গে সামনে এগোচ্ছি। সেই সাথে দুআও করছি আল্লাহ তাআলা তাদেরও হেদায়াতের আলোকে আলোকিত করুন।

আমার স্ত্রী আয়েশাও নওমুসলিমা। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের দ্বীনের মূলনীতি ও নিয়মকানুনের ওপর সে মজবুতভাবে আমল করছে। আমার ছেলেরা হল হানযালা, হুযাইফা ও আবু বকর আর মেয়ে উম্মে হানী। দুই ছেলে বর্তমানে কুরআনে কারীম হিফয করছে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তারা খতমও করে ফেলবে। আমার আকাঙ্ক্ষা তারা দ্বীনের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করুক। দ্বীনের খিদমতে নিজেদের উৎসর্গ করে দিক।

এই হলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব যিনি অনুলিখকের সঙ্গে হরম শরীফের ক্লিনিকে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর মুরীদ মুহাতারাম মাওলানা আবদুল্লাহ হাসানীর নিকট থেকে একটি পরিচিতিমূলক পত্রও সঙ্গে এনেছিলেন। অনুলিখক মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত খুশি হয়েছে। হরম শরীফে একজন নওমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে তার সঙ্গে পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয়াদী জানার পর অধম অনুলিখক খুবই প্রভাবিত হয়েছি।

মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সেই ইলমী সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছে– ১৯৭৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর কয়েকমাস হায়দারাবাদের মাওলানা হামীদুদ্দিন আকেল

হুসামীর প্রসিদ্ধ মাদরাসা দারুল উলুম হায়দারাবাদে কাটিয়েছেন। তারপর উত্তর প্রদেশে আজমগড়ের বলরিয়াগঞ্জের জামিআতুল ফালাহ অভিমুখে রওয়ানা হন। এখানেও তিনি কয়েকমাস ইলম অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তারপর ভেলোরে মরহুম জামিল সাহেব প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টারে ছয় মাসের কোর্স সমাপ্ত করেন। কোর্সটি বিশেষভাবে নওমুসলিমদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতঃপর তামিলনাড়ুর উমরাবাদে জামিআ দারুল উলুম উমরাবাদে (JDS Arabic collage) পাঁচ বছর কাটিয়েছেন। এখান থেকে ফারেগ হয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতেও এক বছর সময় ইলম অর্জন করেছেন। এখানে এসে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আল নদভী রহ.-এর সঙ্গেও মোলাকাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। অবশেষে মালিগাঁওয়ের দরগাহ বাইতুল উলুম থেকে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ অর্জন করেছেন। দীর্ঘ এই ইলমী সফরে ইলম অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার যিকির ফিকিরের সঙ্গেও তিনি লেগে ছিলেন। কবি বলেন,

‘কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনে সুখ লাভ হয় কী মহীতে’

তারপর সুভাষ শংকরলাল সাম্বর একজন আলেমে দ্বীন হয়ে মৌলবী মুহাম্মদ ইউনুস হিসেবে দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। উপরন্তু আল্লাহর ফজলে আরও পনেরোজন লোকের ইসলামগ্রহণের উপলক্ষ হন।

ইসলামের ছায়াতলে আসার পর আপনি কিভাবে আপনার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি দ্বীনে ইসলামকে একটি মহামূল্য নেয়ামত ব্যক্ত করে কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দেন–

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম।” –সূরা মায়িদা : ৩

মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস বর্তমানে মুসলমানগণ যে সব সমস্যায় নিপতিত রয়েছে সেগুলোর আলোচনা করে বলেন, অবস্থা বাহ্যত কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে কিন্তু একাগ্রতা ও দৃঢ়তার মাধ্যমে আমাদের তা মুকাবিলা করতে হবে। আখেরাতের সফলতাকে লক্ষ্য বানিয়ে দুনিয়ার অস্থায়ী লাভ–ক্ষতির পরওয়া না করে ধৈর্য, তুষ্টি এবং সহ্যের দ্বারা কাজ নিতে হবে।

মৌলভী সাহেব চলমান সমাজে মুসলমানদের কঠোরভাবে তাওহীদ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, তাওহীদ হল আমাদের ধর্ম ইসলামের মূলভিত্তি ও বুনিয়াদ। এ ব্যাপারে আমাদের সোসাইটির ব্যাপক সংশোধন প্রয়োজন। আকীদা দুরস্ত হলে অন্যান্য বিধিবিধানও উত্তম থেকে উত্তমভাবে পালিত হবে। পক্ষান্তরে তাওহীদ ও আকায়েদে ত্রুটি এবং দুর্বলতা থাকলে জীবনের সমস্ত মেহনত পন্ড হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এই দিকটি নিয়ে আমাদের প্রচুর ফিকির করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের মধ্যে কীভাবে দাওয়াতের কাজ চলবে? আলোচনার ফাঁকে এ বিষয়েও তিনি নির্দেশনামূলক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম থেকে উত্তমতর আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দেখা-সাক্ষাত চালু রাখতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি-সন্দেহ সুন্দর ও মার্জিতভাবে নিরসন করতে হবে। ইসলামের বিধিবিধানগুলো আকর্ষণীয় পন্থায় অমুসলিমদের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও অনুপম আদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। অনুধাবন করতে হবে, কীভাবে তিনি প্রাণের শত্রুর সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করেছেন। ফলে ইসলামের শত্রুরা দলে দলে ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করেছে। অনুরূপ সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা সবক হাসিল করব ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা কী কী বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিলেন আর আল্লাহ তাআলার ওপর অবিচল আস্থা রেখে কীভাবে সেগুলোর সমাধান করেছিলেন।

মুসলমানদের প্রতি আপনার কী পয়গাম? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি কুরআন কারীমের এই আয়াত তিলওয়াত করলেন– অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখেল হও। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। সূরা বাকারা।

তিনি আরও বলেন, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রত্যেককে জীবনের হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে। আমরা বাস্তবিকই ইসলামের দিকনির্দেশনার উপর বিশুদ্ধভাবে আমল করছি কি না। না করে থাকলে এটা আমাদের পতিত মানসিকতা ও অনুতাপের জীবন বিবেচিত হবে।

অতঃপর মৌলভী সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম একটি বিষয়ে আলোকপাত করেন। বলেন, মানুষ যখন কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষী হয়, তার প্রয়োজন পড়ে তখন সেটা লাভ করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা-সাধ্য সে করে

থাকে। তখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও গায়বী সমর্থনও তার সঙ্গী হয়ে যায়। হযরত বেলাল হাবশা থেকে, হযরত সালমান ফারেসী ইরান থেকে আগমন করে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যপ্রাপ্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের কাতারে শামিল হয়েছেন। আর ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও মর্ম জানা না থাকার কারণে আবু জাহল, আবু লাহাব নবীজীর আত্মীয় হয়েও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হল। অনুরূপ হযরত নূহ আ.-এর পুত্র, হযরত লুত আ.-এর স্ত্রী, হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতাকে দেখুন তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের পথ অনুকূল হয়নি। ব্যাপারটি বড়ই শিক্ষণীয়। কাজেই সব কথার সারকথা হল, ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য আগ্রহ ও মর্মজ্বালা থাকতে হয়। ঈমানের প্রকৃত উষ্ণতা ও স্বাদ যেন আমাদের নসীব হয়। কবি বলেন–

'যুবাঁ ছে কাহ্‌ভী দিয়া লা ইলাহা তো কিয়া হাসিল
দিল ও নেগাহ মুসলমান নেহী তো কুছভী নেহী'

ভাবার্থ– মুখে মুখে যতই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু জপো দিল; আর দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমান না হলে কোনো লাভ নেই।

মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের জিদ্দা থেকে সানআ হয়ে মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ছিল। অনুলিখক তাঁকে জিদ্দার বিমান বন্দর টার্মিনালে আল বিদা জানাচ্ছিল আর দৃষ্টিতে ভেসে উঠছিল সূরা বাকারার এই আয়াত– আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান আঁকড়ে ধরা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার গযব থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষাণলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর বিধিবিধান মানতো না।" –সূরা বাকারা : ৬১

আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে ইসলামের সত্যিকার দরদ ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করে দিন। ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি, আমাদের এই জীবন আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এক আমানত। এর প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। জীবনের মুহূর্তগুলো কায়েনাতের খালিক ও মালিকের পায়গাম তার মাখলুককে পৌঁছে দেয়ার কাজে লাগলে তবেই জীবন সার্থক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। তার বিধিবিধানের প্রতি অনুগত করে দিন।

সৌজন্যে : মাসিক আরগুমান, নভেম্বর : ২০০৭ ইং

মুহাম্মদ ত্বহা (জনি)-এর সাক্ষাৎকার

আমার অস্বস্তি বেড়ে চলল। সেই বিকৃত শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুভূতি আমার মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করল। উপরন্তু এই ধর্মের শিক্ষায় মানব-কল্পনায় যেভাবে ঘোড়া দৌড়েছে এবং বিকৃতি সাধন করেছে তাতে সংশয় আর অবিশ্বাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা স্বহস্তে লিখিত কিতাবকে আল্লাহর বলে প্রচার করে। এভাবে তারা দুনিয়া উপার্জন করে। দুর্ভোগ তাদের লিখিত বস্তুর ওপর, দুর্ভোগ তাদের উপার্জনের উপর। –সূরা বাকারা : ৭৯

আমি আমার ধর্ম এবং তার ঠিকাদারদের কার্যকালাপের প্রতি মনোযোগ দিলাম। প্রতিটি দিককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। অনুমিত হল, এই সম্প্রদায়ের যেসব পবিত্র ব্যক্তিত্ব, পাদ্রী ও ধর্মীয় অন্যান্য পথপ্রদর্শক রয়েছেন যাদের খুব নিকট থেকে দেখার এবং যাদের সঙ্গে জীবন-যাপনের আমি সুযোগ পেয়েছি তাদের এবং তাদের ভালবাসা ও একনিষ্ঠতার এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে যথেষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। এরা শরীরে বৈরাগ্যের পোশাক ধারণ করেছে কিন্তু বাস্তব জীবনের পথে উল্টো দিকে ধাবমান।

সৌদি আরবে বিভিন্ন পদ্ধতি জাতি-গোষ্ঠির লোকদের মধ্যে দাওয়াতী ও দ্বীনী জাগরণ সৃষ্টিকারী সংস্থায় শ্যামল রঙা এক ব্যক্তি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সব সময় তিনি তন্ময় হয়ে অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। কোনো কিতাব হাতে পেলেই গভীর অভিনিবেশে তার ওপর ঝুঁকে পড়তেন। তাঁর মুখমন্ডলে কখনও ক্লান্তি কিংবা বিরক্তির ছাপ লক্ষ করিনি। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন ছিল তার সবচেয়ে আগ্রহের বিষয়। একদিন আমি তার কাছাকাছি হই। তিনি আনারবী ভঙ্গিমায় আমাকে থেকে থেকে সূরা ফাতিহা পাঠ করে শোনান। বলেন, নামায পড়ার জন্য ছোট ছোট আরও কয়েকটি সূরাও মুখস্ত করে নিয়েছি। বুঝতে পারি, তিনি একজন নও মুসলিম। তখন ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করি তিনি হাসিমুখে প্রশান্তিতে সেগুলোর উত্তর দেন। এক্ষণে পাঠকদের সামনে প্রশ্নোত্তর পর্বটি তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় জানতে পেলে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তর : এখন আমার নাম ত্ব-হা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাকে জনি নামে ডাকা হতো।

প্রশ্ন : আপনি কোন্ দেশের বাসিন্দা। বর্তমানে আপনার বয়স কত?

উত্তর : আমি আফ্রিকার দেশ উগান্ডার জাসেম শহরের অধিবাসী। বর্তমানে আমার বয়স ত্রিশ বছর।

প্রশ্ন : আগে আপনি কোনো ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি ক্যাথলিক খৃস্টান ছিলাম। শুধু অনুসারীই নয়; আমি ছিলাম সেই ধর্মের একজন আহ্বায়ক, প্রচারক সক্রিয় সদস্য। এজন্য তারা আমাকে চার্চের লাইব্রেরী ইনচার্জ নিয়োগ করেছিল।

প্রশ্ন : কীভাবে আপন ধর্মের প্রতি অনীহা আর ইসলামের প্রতি অনুরাগী হলেন?

উত্তর : আমার মধ্যে ধর্মপালন ও দ্বীনদারী অন্যান্য খৃস্টানদের চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিল না। অর্থাৎ, এই ধর্মের অনুসারীরা সাধারণত যেমন অন্ধ অনুকরণ করে থাকে আমিও তেমন মুখ চলতি কথাগুলো বিশ্বাস করতাম ও মেনে চলতাম। কিন্তু চার্চের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমি নিঃসংশয় ছিলাম না। তবে সংশয় সত্ত্বেও আমি তা হুবহু মেনে নিতাম এবং পালন করতাম। কারণ, বহুবছর ধরে চার্চ আমাকে এগুলোতে অভ্যস্ত করে তুলেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কখনও এর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন?

উত্তর : আমার অস্বস্তি বেড়ে চলল। সেই বিকৃত শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতির অনুভূতি আমার মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করল। উপরন্তু এই ধর্মের শিক্ষায় মানব কল্পনা যেভাবে ঘোড়া দৌড়েছে এবং বিকৃতি সাধন করেছে তাতে সংশয় আর অবিশ্বাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা স্বহস্তে লিখিত কিতাবকে আল্লাহর বলে প্রচার করে। এভাবে তারা দুনিয়া উপার্জন করে। দুর্ভোগ তাদের লিখিত বস্তুর ওপর, দুর্ভোগ তাদের উপাজনের ওপর। –সূরা বাকারা : ৭৯

আমি আমার ধর্ম এবং তার ঠিকাদারদের কার্যকালাপের প্রতি মনোযোগ দিলাম। প্রতিটি দিককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। অনুমিত হল, এই সম্প্রদায়ের যেসব পবিত্র ব্যক্তিত্ব, পাদ্রী ও ধর্মীয় অন্যান্য পথপ্রদর্শক রয়েছেন যাদেরকে খুব নিকট থেকে দেখার এবং যাদের সঙ্গে জীবন-যাপনের আমি সুযোগ পেয়েছি তাদের এবং তাদের ভালবাসা ও একনিষ্ঠতার এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে যথেষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। এরা শরীরে বৈরাগ্যের পোশাক ধারণ করেছে কিন্তু বাস্তব জীবনের পথে উল্টোদিকে ধাবমান।

প্রশ্ন : আপনি কুরআনে কিছু পেয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, কুরআনে একটি সূক্ষ্ম কথা পেয়েছি। এর গুরুত্ব আমি পরে অনুধাবন করেছি। আমি সূরা মারয়ামের ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। বুঝতে পেরেছি, ইসলাম এবং এই বিকৃত ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। খৃষ্টধর্মে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ এটা এমন একটা অপবাদ যে, এতে সপ্ত আকাশ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আল্লাহ তাআলার বাণী- তারা বলে, রাহমান পুত্র গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমরা এক জঘন্য ও কঠিন কথা বলছো। এই কথার কারণে আসমান ফেটে পড়ার, জমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড় ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়।তারা রাহমানের জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেছে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা রহমানের শান নয়। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবাই তার নিকট গোলাম হয়ে আসবে। –সূরা মারয়াম : ৮৮-৯৩

প্রশ্ন : আপনি আপনার পূর্বের ধর্ম আর ইসলামের মধ্যে এ ছাড়া আর কী পার্থক্য পেয়েছেন?

উত্তর : আরেকটি বিষয়ও আমি পূর্বের ধর্মে পেয়েছি। এর গুরুত্ব আমি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অনুধাবন করেছি। আমি আমার সম্প্রদায়কে দেখেছি তারা পবিত্রতা বলতে কোনো কিছু জানে না। এমনকি স্ত্রী সহবাসের পরও তারা পরিচ্ছন্ন হওয়াকে জরুরী মনে করে না। একবার দেখি, মুসলমানদের এক শায়খ এক দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন। খৃস্টানরা তার সঙ্গে পবিত্রতা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। তারা শায়খকে একটি কুকুর দেখিয়ে বলল, কুকুরটির স্বপ্নদোষ হলে তার ওপরও কি গোসল ফরয হবে? শায়খ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, কুকুরটি আসলে তোমাদেরই মতো যে কিনা পবিত্রতা অর্জন করে না।

প্রশ্ন : এছাড়াও হয়তো আরও কোনো বিষয় লক্ষ করেছেন?

উত্তর : এ জাতীয় আরও বহু বিষয় আমি আমার সম্প্রাদয়ের মধ্যে দেখেছি। তারা নিজেদের ধর্মের শিক্ষাকে বিগড়ে ফেলেছে। তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। নিজেদের অনুসারীদের ধর্মের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে। তারা লোকদেরকে ক্ষমা ও গুনাহ মাফের ওয়াদা দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য হল, বনী ইসলাঈলের লোকেরা যা ইচ্ছা করুক, কেননা মানুষের পরিত্রাণের জন্য খোদা আপন পুত্রকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কাজেই পাপের ভয় করার প্রয়োজন নেই। এসব বিষয় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আধ্যাত্মিক ফাদার আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে উপদেশ দিতেন– মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে না। তারা আমাদের শত্রু।

প্রশ্ন : আপনি কিভাবে আপনার জীবনের গতিমুখ বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : ত্ব-হা নামে আমার এক বন্ধু ছিল। চার বছর পূর্বে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে ছিল ইসলামের পাকা অনুসারী। ইসলামী দাওয়াতের সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক ছিল। সে আমাকে কুরআনে কারীমের একটি তরজমা উপহার দেয় এবং কুরআন অধ্যয়নের বিশেষভাবে সূরা মারয়াম পড়ার তাগিদ দেয়। অনেকবার সে আমাকে তার বাসায়ও নিয়ে গেছে। একবার সে আমাকে একটি ভিডিও ক্যাসেট দেয় যার মধ্যে হরম শরীফে নামায আদায়ের দৃশ্য ছিল। আমি লক্ষ্য করি নামাযের কাতারে সব মুসলমানই এক সমান। পরস্পরে মিলেমিশে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা কিংবা উঁচু নিচুর ঝলক দেখা যায় না। এটা চার্চের শ্রেণী পার্থক্য, বংশীয় বিভেদ এবং উঁচু-নীচুর জঘন্যতার একেবারে বিপরীত ছিল। এবার আমার অনুসন্ধিৎসা সোচ্চার হল। ধীরে ধীরে ত্ব-হার কাছাকাছি চলে আসলাম।

প্রশ্ন : তারপর কীভাবে আপনার ইসলাম প্রকাশ করলেন?

উত্তর : ত্বহার নিকটবর্তী হওয়ার পর খুব কাছ থেকে ইসলামকে জানা ও পড়ার সুযোগ লাভ করি। আমি তার নিকট আমার ইসলামপ্রিয়তা প্রকাশ করি। সে আমাকে যুবকদের সংগঠন 'আল ক্বামার দাওয়াতে ইসলামী' নামক সংস্থায় নিয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণে আমাকে সহযোগিতা করে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার জীবনে কোনো উত্থান-পতন এসেছে কি?

উত্তর : ইসলামকে বুকে ধারণের পর তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাসের ছায়াতলে আমি প্রশান্তিময় জীবন-যাপনের পথে যাত্রা করলাম। আজ আমার কাঁধ থেকে ত্রিত্ববাদের বোঝা নেমে গেছে। আমি এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছি। যে কিনা আল্লাহ তাআলার রব হওয়ার, ইসলামের সত্যদ্বীন হওয়ার, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হওয়ার এবং সকল নবী রাসূলের এক পয়গামবাহী হওয়ার ওপর ঈমান রাখে। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– অর্থ: তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখো। সেই আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও। –সূরা হজ্ব : ৭৮

এরপর থেকে আমার এক নতুন জীবন শুরু হয়। এক নতুন পথে আমি পদচারণা শুরু করি। এই পথ ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ প্রদান ও বিজ্ঞজনোচিত পন্থায়– আল্লাহর দিকে আহ্বানের এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের পথ ছিল।

প্রশ্ন : আপনি দাওয়াতী কাজ কোথা হতে শুরু করেছেন?

উত্তর : পিতামাতাকে দিয়ে আমি আমার দাওয়াতী কাজ শুরু করি। আমার ইসলাম গ্রহণ ও নতুন নামের কথা জানানোর উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করতে ও বোঝাতে আমি তাদের নিকট যাই।

প্রশ্ন : পিতামাতার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উত্তর : আমার পিতা হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলেন– অবশেষে কেন, কিসের জন্য নিজের বাপ-দাদার ও মুরুব্বীদের ধর্ম ত্যাগ করলে? আজ থেকে তুমি আমাদের সন্তান নও। আজকের পর তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তবে মাকে আমি স্থির চিত্ত ও বিবেচক মানুষ হিসেবে পেয়েছি। তিনি বললেন, আমার ছেলে এক জন বুদ্ধিমান। ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে সেটা তার নিজের ইচ্ছা। এই জবাব শুনে পিতাজী আমাদের লক্ষ করে বললেন, ওর সঙ্গে থাকতে চাইলে তুমিও চলে যাও। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

তারপর আমি আমার জীবন সঙ্গিনীর কাছে গেলাম। আমাদের দুটি সন্তানও ছিল। তাকে বললাম, একটা দারুণ খবর আছে? সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করল, কী সেটা? বললাম, আমার নাম এখন ত্ব-হা। আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। সে বলল, আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলাম। তোমার যদি ঘরে মুসলমান দেখতে ইচ্ছে না হয়, তুমি চলে যেতে পারো। সে তার পিত্রালয়ে চলে গেল। আমি এ জাতীয় অসংখ্য প্রতিকূলতা ও বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। পিতা সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করেছে। তবে মা সবসময়ই ছিল সহানুভূতিশীল।

প্রশ্ন : চার্চের লোকজনের আচরণ কী ছিল?

উত্তর : চার্চের দায়িত্বশীলগণ প্রথমে পাঁচজন লোককে আমাকে চার্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠাল। এখান থেকেই আমার বিপদের কাল শুরু হল। তারা আমাকে লোভ দেখায়। সবুজ উদ্যানের টোপ ফেলে। নানা রকম সুযোগ সুবিধার স্বপ্ন দেখায়। বলে, জন! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তোমাকে কি পাগলাগারদে নিতে হবে? তুমি কিসের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছো? তুমি বিত্তশীল আর ওরা নিঃস্ব। তোমার কী চাই? বাংলো, গাড়ী, অন্য কিছু? তারপর বলে, জন! ওরা হযরত ঈসা আলাইহিসস সালাম সম্পর্কে নেহায়েত মিথ্যা ও অপমানকর বিশ্বাস রাখে। তারপর সেই দায়িত্বশীল কুরআনের একটি কপি বের করে এবং সূরা মারয়াম খুলে বলে, দেখো এরা ঈসার ব্যাপারে বলে। তিনি নাকি মানুষ এবং পয়গম্বর ছিলেন? অথচ আমাদের

বিশ্বাস হল, তিনি ছিলেন খোদী। এখন বল, তোমার কী বিশ্বাস? এসব কিছুর পরও তুমি ইসলামের ওপর বহাল থাকতে চাও? আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তারা আমাকে ধমকি দিতে থাকে। বলে, এ অবস্থায় আমরা কোনমূল্যেই শহরে তোমার অবস্থানকে সহ্য করবো না। জবাবে আমি শুধু এটুকুই বলি, আমাকে হত্যা করে ফেললেও কোনো পরওয়া করি না।। আমি মুসলমান আছি মুসলমানই থাকবো।

এই স্তর আতিক্রম করার পর আমি আমার বাড়ির একাংশকে মসজিদ বানিয়ে নিই। লোকদের মধ্যে দ্বীনে হকের দাওয়াতকে ব্যাপক করার কাজে আত্মনিয়োগ করি। সর্বপ্রথম আমার দাওয়াত কবুলকারী ছিল আমারই প্রাক্তন জীবনসঙ্গিনী। সে এক অমুসলিমকে বিবাহ করার পর তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমার কাছে চলে আসে। বলে, আমি মুসলমান হতে চাই, চাই তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো বা না রাখো। আমি চুমু খেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিই এবং নতুন স্ত্রীর সঙ্গে তাকেও স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করি। এখন আমার দুজন স্ত্রী। বর্তমানে দাওয়াতের কাজের জন্য আমি সব ঝামেলা থেকে অবসর হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার দাওয়াতের ফলাফল সামনে এসেছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এখন পর্যন্ত এই শহরের ত্রিশজন তরুণ আমার দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে এসে হিদায়াত লাভ করেছে।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে চার্চওয়ালাদের আচরণ কী ছিল?

উত্তর : তরুণদের এভাবে ইসলাম দাখেল হতে দেখে এবং আমার কর্মকান্ডে দুঃখে-ক্ষোভে চার্চের সেই দায়িত্বশীল আমার বাড়িটি গুড়িয়ে দেয়। অথচ আমি সেটাকে মসজিদ বানিয়ে ছিলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ও সকল ইসলাম গ্রহণকারীকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন। সর্বোপরি আমাদের দ্বীনের একনিষ্ঠ দা'য়ী বানিয়ে দিন। আমীন!

সৌজন্যে মাসিক আরমুগান : জানুযারী– ২০০৭ ইং

ইকবাল আহমদের সাক্ষাৎকার

দুনিয়ার সমস্ত রঙ-রূপ ধোঁকা। হৃদয় সঁপে দেয়ার উপযুক্ত কেবল সেই সত্তা যিনি সকল সুন্দর ও সৌন্দর্যের স্রষ্টা। তার কাছে হৃদয় সঁপে দিলে সব অস্বস্তি স্বস্তিতে বদলে যায়। আমার জন্য এবং সকল মানুষের জন্য এটাই আমার পয়গাম।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুস ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

ইকবাল আহমদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

প্রশ্ন : আব্বু আমাকে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, বাটালা হাউজ মসজিদে ইকবাল সাহেব বসে আছেন। আরমুগানের জন্য তার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে এসো। আপনি জানেন হয়তো, আমাদের এখানে ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দু ম্যাগাজিন বের হয়। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের জীবনকাহিনী ও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য দাওয়াতের কর্মীদের সাহস বাড়ানো ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এজন্য আপনাকেও একটু কষ্ট দেবো!

উত্তর : জ্বী, হযরত সাহেব এইমাত্র বলে গিয়েছেন, আহমদ আসছে, আরমুগানের জন্য আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবে। আমিও আরমুগান পড়িয়ে পড়িয়ে শুনি। দু'মাস ধরে শুধু আরমুগান পড়ার জন্যই উর্দু শেখা শুরু করেছি। অন্যের দিকে আর কতদিন তাকিয়ে থাকবো। এক বছর তো প্রতীক্ষাতেই কাটল। আল্লাহ তাআলা সম্ভবত আমাকে উর্দু পড়ানোর এরাদা করেছেন এজন্য আরমুগানের হিন্দী সংস্করণ বেরোতে বিলম্ব হচ্ছে।

প্রশ্ন : বাস্তবিকই আল্লাহ তাআলার রহমতে সবকিছুর ফায়সালা হয়। নইলে কবে থেকেই তো আরমুগানের হিন্দী সংস্করণ বের হওয়ার কথা ছিল। আল্লাহ তাআলা এর পথ সহজ করে দিন। এর জন্য বেশ তাগাদা আসছে। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যেও বর্তমানে উর্দুর রেওয়াজ কমে আসছে।

উত্তর : আহমদ ভাই! আমার ধারণা এখন হিন্দুদের মধ্যে উর্দু পড়ার ঝোঁক বাড়ছে। আমাদের এলাকার দেশীয় হিন্দুরা খুব আগ্রহ নিয়ে উর্দু ভাষায় শায়েরী করছে। হযরত বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য পথ মসৃণ করছেন।

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে। আপনি আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন?

উত্তর : হরিয়ানার এক যাদব পরিবারে ২৫ শে মার্চ ১৯৭৫ সালে আমার জন্ম। হাইস্কুল পাশের পর ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায়। প্রথমে জেলা টিমে তারপর স্টেট টিমে নির্বাচিত হই। ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট খেলে রঞ্জি ট্রফিতে হরিয়ানার পক্ষ থেকে রেকর্ড সংখ্যক রান করি। দ্বাদশ শ্রেণী শেষ করতেই চাকুরী হয়ে যায়। খেলার বদৌলতে রেলওয়েতে চাকুরী পেয়ে যাই। এখনও রেলওয়েতে চাকুরী করি এবং রেলওয়ে দলের পক্ষ থেকে খেলি। কয়েকবার জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক জিঘাংসার শিকার হয়ে সেটা হয়ে ওঠেনি। আমার পিতা সরকারী স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ছোট একটি ভাই আছে ডাক্তার। বংশের লোকজন আগ থেকেই জমিদার।

প্রশ্ন : ক্রিকেটে আপনি মূলত বোলার না ব্যাটসম্যান ?

উত্তর : এমনিতে আমি অলরাউন্ডার। আমি রানের রেকর্ডস গড়েছি। রঞ্জি ট্রফির এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেয়ার রেকর্ডটি এখনও আমার দখলে। বোলিংও খুব ভালো করি। তবে ব্যাটিংয়ের প্রতি বেশী আগ্রহ।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি বলুন!

উত্তর : উর্দুতে একটি কবিতা আছে–

'খুদা কে দ্বীনকা মুসা সে পুছিয়ে আহওয়াল,
কে আগ লেনেকো জায়েঁ আওর পায়াম্বরী মিল জায়ে।'

ভাবানুবাদ : হেদায়াতের বণ্টন রহস্য জানতে চাও মূসা কালীমের কাছে, আগুনের সন্ধানে ছুটে পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

আমার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হেদায়াতের এমনই মুআমেলা হয়েছে। ২০০৪ সালে আমরা চন্ডিগড়ে এক টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে রেলওয়ে টিমে গ্রমিত সিং নামে একটি ছেলেও খেলতো। তার পিতা প্রমিত সিং রেলওয়ের অফিসার ছিল। গ্রমিতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তার ইচ্ছাতেই আমি তাদের বাড়িতে থাকতে থাকি। গ্রমিতের আশা নামে একটি ছোট বোন ছিল। বেপর্দাভাবে একসঙ্গে থাকার কুফল দেখা দিল। মাত্র পনোরো দিনে আমরা একে অপরের খুব নিকটে চলে আসি। একজন অপরজনের জন্য বিলকুল পাগল হয়ে যাই। সেই টুর্নামেন্টে আমার প্রাপ্তিও ছিল শূন্য। কোথাও আমার মন বসতো না। আমরা দুজনে বিবাহের প্রোগ্রাম করলাম। দুজনেই অঙ্গীকার করলাম, পরিবার বিয়েতে রাজী না হলে আমরা আত্মহত্যা করবো। আশা কোর আর আমার কারও পরিবারই এতে রাজী হওয়ার ছিল না। উভয় পরিবারই পুরনো নিয়ম-প্রথার ধারক ছিল। আমার পরিবার বরং একটু বেশিই গোঁড়া ছিল।

চন্ডিগড় থেকে ফেরার পরও আমার চিন্তায় আশা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দুজনের পরিবারই দুজনকে নিয়ে পেরেশান ছিল। দুই পরিবারই অনেক তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছে। তাবীয-তুমারকারী মৌলভীদের কাছে ধর্ণা দিয়েছে। আমার চাচা কান্ধালার হযরতজীর নিকট থেকেও তাবীয নিয়ে আসে। আমি আর আশা জানতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। না-জানি তাবীজের প্রভাবে আমাদের মন বিগড়ে যায়। এজন্য কেউ পরামর্শ দিল, তাবীজের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে মৌলভীদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে। তান্ত্রিক আবদুল্লাহ এক পাহাড়ে থাকতো। আমি তার কাছেও যাই। বুড়িয়ার পীর সাহেবের কাছেও গিয়েছি। সাহারানপুরেও এক পীরের দরবারে গিয়েছি।

একজন আমাকে ফুলাতের সন্ধান দেয় যে, ফুলাতের এক হযরতজী এ ব্যাপারে খুব প্রসিদ্ধ। তার ওখানে গেলে তিনি আমাকে তাবীয ইত্যাদি দিয়ে দেন। আমাকে যিনি ফুলাত নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, এখানে আরেকজন হযরতজী আছেন। তিনি তাবীয দেননা তবে দুআ করেন, চলো তার সঙ্গেও দেখা করে আসি। সেখানে গিয়ে জানা গেল হযরত সাহেব সফরে আছেন। এক তরুণ মৌলভীর সঙ্গে দেখা হল। হালকা পাতলা গড়ন। মৌলভী উমর নাম। হযরত সাহেব তার নানা হন। সে আমাকে বলল, হযরত সাহেবের ফিরতে এখনও এক সপ্তাহ দেরী। আমাদের হযরত আগত ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং মালিকের কাছে আবেদনের পদ্ধতি বলে দেন। এজন্য একটা জপও বাতলে দেন।

ভোরে গোসল করে 'মালিকের স্মরণ করছি' একথার ধ্যান করে একশত বার 'ইয়া হাদী' আর একশত বার 'ইয়া রাহীম' পড়ে নিবেন। তিনি আমাকে রাহীম ও হাদীর হিন্দী অর্থও বলে দেন। আর বলেন এই জপ শেষে সরাসরি মালিকের কাছে নিজের পেরেশানীর কথা বলবেন। সেই সাথে হযরত সাহেবের একটি কিতাবও দিয়ে দিলেন। ওটার নাম ছিল 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ'

আমি কিতাবটি গাড়িতে রেখে দেই। সকাল সকাল উঠে স্নান করে একশত বার 'ইয়া হাদী' আর একশত বার 'ইয়া রাহীম' জপ করি। এতে অনেক শান্তি অনুভব করি। সন্ধ্যায়ও এই জপ জপতে থাকি। যে অস্থিরতা আর পাগলামীভাবের বরং পাগলামীর শিকার হয়েছিলাম, তা অনেকটা হালকা মনে হল। এক সপ্তাহর পর মালিকের সাথে আমার এক আশ্চর্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল। আমার মনে হল যখন বাতানো জপেই এমন শান্তি পাচ্ছি তাহলে তার

কিতাবটিও তো পড়ে দেখা দরকার। সেখানে আরও কোনো জপও লেখা থাকতে পারে। আমি আপকি আমানত পড়লাম। একবার শেষ করে আবার পড়লাম। ছোট এই কিতাবটি ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে দিল।

মুক্তি আর শান্তির জন্য এখন আমি ইসলামের মধ্যে একটি পথ দেখতে পেলাম। মাওলানা উমর সাহেবকে ফোন করলাম– আমাকে ইসলাম সম্পর্কীয় আরও কিতাবের সন্ধান দিন। তিনি 'ইসলাম কিয়া হ্যায়' এবং 'মরণেকে বাদ কিয়া হোগা'–র কথা বললেন। আমি দিল্লী থেকে কিতাব দুটি আনিয়ে নিলাম। তারপর আমি কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করাকে জরুরী মনে করলাম এবং কুরআন মাজীদ পড়তে শুরু করলাম। ইতোমধ্যে একটি টুর্নামেন্ট খেলতে জয়পুর যাই। একদিন আমরা জয়পুর দেখতে বেরুলাম। মার্কেটে শপিং করতে গিয়েছি।

ইতোমধ্যে এক তাবলীগী জামাত এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে যাচ্ছিল। আমার তাদের সঙ্গে দেখা করতে মন চাইল। গাড়ী থামালাম। তারা মসজিদে প্রবেশ করলে আমিও সঙ্গীদের কিছুটা দূরে থামিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তাদের বললাম, আমি নামায পড়তে চাই। তারা আমাকে আমীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিল। আমীর সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন নামায পড়তে চাচ্ছেন? বললাম, আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। ইসলামকেই আমি মুক্তি ও শান্তির একমাত্র পথ মনে করি। এজন্য ধীরে ধীরে ইসলামকে ফলো করতে চাচ্ছি। তিনি ব্যাগ থেকে 'আপকি আমানত' বের করে আমাকে দিতে চাইলেন। আমি বললাম কিতাবটি আমি তিনবার পড়েছি। লেখকের গ্রামেও গিয়েছি।

আমীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করেননি? বললাম, তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। জানতে চাইলেন, আমি কালিমা পড়েছি কিনা– বললাম, না, এখনও পড়িনি। ফুলাতে মাওলানা উমর সাহেব পড়তে বলেছিলেন কিন্তু কিতাব পড়ার পর পড়বো বলে কথা দিয়েছিলাম। আমীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মাওলানা কালিম সাহেবকে জানেন? বললেন, আমি মাওলানা সাহেবের মুরীদ। মেওয়াতে থাকি। আমাদের জামাতে কয়েকদিন পূর্বে মুসলমান হয়েছেন এমন চারজন লোকও আছেন। তাদের একজন ছিলেন মন্দিরের বড় পূজারী। কয়েকদিন আগেই তিনি টিকি ইত্যাদি কেটে ফেলেছেন। আমীর সাহেব সেই চারজনের সঙ্গে আমাকে সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে কালিমা পড়তে বললেন। কিছুক্ষণ ভাবার পর আমি তৈরী হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে কালিমা পড়িয়ে হযরতের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিলেন।

আল্লাহর শোকর! ফোনেই কথা হয়ে গেল। আমীর সাহেব হযরতকে বলে আমাকে আবার কালিমা পাড়ালেন এবং জামাতে সময় লাগানোর পরামর্শ দিলেন। টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি সেখান থেকেই ডাকযোগে ছুটির আবেদন করলাম এবং ছুটি পেয়ে সেই জামাআতেই পঁয়ত্রিশ দিন সময় লাগালাম। তাদের পাঁচ দিন হয়ে গিয়েছিল। আমীর সাহেব তার সঙ্গীদের তাশকীল করলেন– ভাই ইকবাল সাহেবের পাঁচ দিন কম হয়েছে, আমরা তাঁর চিল্লাটা পুরা করে দেই। তার খাতিরে পাঁচটি দিন বেশী থেকে যাই! তিনজন সাথীর জরুরী কাজ ছিল। তারা চলে গেলেন। বাকী সাথীরা চিল্লা পুরা হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে সময় লাগাল।

প্রশ্ন : জামাআত থেকে এসে আপনি ঘরের লোজকনকে এসব বলে দিলেন?

উত্তর : বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকজনকে আমি সব বলে দিই। তারা ক্ষেপে গেল। সবাই মনে করল, এসব আশাকে বিবাহ করার ছল চাতুরী। তারা আমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ শুরু করল। আমার বাড়ি ছাড়তে হল। ফুলাত পৌঁছলাম। ফুলাত পৌঁছার চতুর্থ দিন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত হল। হযরত আমাকে বাড়ি গিয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন এবং নীরবে পরিবারের ওপর কাজ করতে বললেন। আমার ডাক্তার ছোট ভাইটি অনেক চেষ্টাসাধ্যির পর ফুলাত এসে হযরতের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল। আমি তাকে নিয়ে ফুলাত গেলাম। হযরত সাহেব মাওলানা উমর সাহেবকে ডেকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ও আলাপ করতে বললেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে নিলেন। আমার আবদারে হযরত তাকে আবারও কালিমা পড়ালেন। আর তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ আফজাল।

ভাইয়ের মুসলমান হওয়ার পর আমার জন্য বাড়ির পরিবেশ অনুকূল হয়ে গেল। হযরত যখন আমাকে বাড়ি যাওয়ার কথা বলেছিলেন আমার খুব আশ্চর্য লাগছিল। ভাবছিলাম, ইনি আমাকে গ্রহণ না করে বোঝা মনে করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ভেতরে ভেতরে অন্য রকম কুধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভাইয়ের মুসলমান হওয়ার পর মনে হল তিনি খুব ভেবেচিন্তেই ফায়সালা করেছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ, আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। অথচ আমি বাড়ির লোকজনকে বলেও এসেছিলাম, আমি তোমাদের মুখ পর্যন্ত দেখাবো না।

আমার ডাক্তার ভাইটি আমাকে লজ্জাও দিয়েছিল যে, আশাকে আর মুসলমানরা জায়গা দিল না। বললাম, পরিবার আসলে পরিবারই। আমি লজ্জা ঢাকার জন্য বলেছিলাম বাড়ির কথা মনে করে আর থাকতে পারলাম না। বিশেষ করে তোমাকে ছাড়া ভাই, থাকাটা খুবই কঠিন।

প্রশ্ন : তারপর কী হল? পরিবারের অন্যান্যদের কী অবস্থা?

উত্তর : আমার ভাই ডাক্তার আফজালও চিল্লা লাগিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টায় মা-ও মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এখনও আমি সরকারীভাবে চাকুরীস্থলে নাম পরিবর্তন করিনি। তবে অধিকাংশ লোকই জানে আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। ডিউটিতে থাকাকালীন নামায পড়ি।

প্রশ্ন : আশার কী হল?

উত্তর : আমি ইসলাম অধ্যয়ন করতে লাগলাম, আমার প্রেমও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে লাগল। আশা কিছুদিন ফোন করতো। পরে সেও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। দু'মাস পূর্বে জানতে পেরেছি– তার বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার কখনও মনে হয়নি যার কারণে আপনি মুসলমান হয়েছেন তার ঈমানের জন্যও আপনাকে ভাবা উচিত?

উত্তর : শুরুর দিকে মনে হতো কিন্তু হযরত তার ঠিকানা নিয়ে বললেন, আপনি তার চিন্তা ছেড়ে দিন। চন্ডিগড়ে আমাদের সঙ্গীরা আছে তারাই তাকে দাওয়াত দেয়ার ফিকির করবে। হযরতের নির্দেশের পর আমি তার ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কোনো পয়গাম?

উত্তর : দুনিয়ার সমস্ত রঙরূপ ধোঁকা। হৃদয় সঁপে দেয়ার উপযুক্ত কেবল সেই সত্তা যিনি সকল সুন্দর ও সৌন্দর্যের স্রষ্টা। তার কাছে হৃদয় সঁপে দিলে সব অস্বস্তি স্বস্তিতে বদলে যায়। আমার জন্য এবং সকল মানুষের জন্য এটাই আমার পয়গাম।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আপনাকেও অনেক অনেক শোকরিয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান,

মুহতারামা কমলা সুরাইয়া (কমলা দাস)-এর সাক্ষাৎকার

> একে অপরকে ভালোবাসুন। ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় শান্তি আছে উন্নতি আছে, নিরাপত্তা আছে। আমি বলি, যেখানে ভালোবাসা নেই সেটা দোযখ। আর যেখানে পরস্পরে হৃদ্যতা আছে, সেটা জান্নাত। জান্নাতে সুকূন আছে শান্তি আছে।

ফরিদা রাহমাতুল্লাহ : সুরাইয়া সাহেবা! আপনি হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানেই লালিত পালিত হয়েছেন। কোন জিনিস আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেছে?

ডক্টর কমলা সুরাইয়া : ফরিদা! আমি হিন্দুধর্মের কোনো রসম-রেওয়াজে কখনই প্রভাবিত হইনি। আর তার পাবন্দিও করি নি। ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে আমি ইসলামকে শেখার, দেখার ও পড়ার সুযোগ পেয়েছি। ইসলামের প্রতি সবসময়ই আমি আগ্রহী ছিলাম। ইসলামী সভ্যতা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন 'প্রভাবিত করেছে' সেটা কিভাবে?

উত্তর : আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে আমার জীবনে দুটি ছেলে এসেছিল। দুজনেই ছিল মুসলমান। আমি দুটি ছেলেকেই আমার সঙ্গে রেখেছি। তারা আমার আপন ছেলের মতোই ছিল। আমি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেছি। দুজনেরই কিছুটা দৃষ্টিদূর্বলতা ছিল। এই ছেলে দুটি- যাদের আমি ছেলে মেনেছি- আমার জীবনে পরিবর্তন আনার কারিগর। নিঃসন্দেহে আমি ইসলামের শিক্ষায় সীমাহীন প্রভাবিত।

প্রশ্ন : আপনি আপনার পালকপুত্রের আলোচনা করেছেন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? বর্তমানে তারা কোথায় আছে, কী করছে?

উত্তর : এক ছেলের নাম ইনায়েত। সে পড়ালেখা করে ব্যারিস্টার হয়েছে। বর্তমানে কোলকাতা থাকে। অপরজন এরশাদ। সে ইংরেজীর প্রফেসর। দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে প্রফেসরী করে।

প্রশ্ন : হিন্দুধর্মে নারীদের (Symbol of Godess) 'ঈশ্বরের প্রতীক' বলা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীরা বলে, হিন্দুধর্মে নারীদের অতিশয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাহলে কেন এমন সম্মানজনক মর্যাদা পরিত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করলেন?

উত্তর : আমার পূজনীয় হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার কেবল একজন ভালো মানুষ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি চাই না মূর্তি হয়ে বসে থাকি আর লোকেরা আমার পূজা করুক। আমি শুধু এক আল্লাহর দাসী হয়ে জীবন পার করতে চাই।

প্রশ্ন : মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চলছে যে, ইসলামে নারীদের কোনো মর্যাদা নেই। এখানে নারীরা স্বাধীন নয়। ইসলাম পুরুষশাসিত ধর্ম। এ ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?

উত্তর : আমি এতসব বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে, ইসলামে আমি স্বাধীনতা ভোগ করছি। আমি আমার মেযাজ-মর্জির একমাত্র মালিক। আপনি যদি সাঁতারের পোশাকে জনসম্মুখে গোসল করা, ঘোরাফেরা করা, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদের উলঙ্গ করা, শরীর প্রদর্শন করা, নারীর দেহের মাপঝোঁক যাচাই করাকে স্বাধীনতা বলতে চান তাহলে এমন স্বাধীনতার উপর আমি অভিশাপ দিই। ইসলামে নারীরা অনেক মর্যাদাশীল ও নিরাপদ।

প্রশ্ন : আপনি সবসময় পর্দার সাথে থাকেন। এতে আপনার কী সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়?

উত্তর : পর্দাকে আমি নারীদের জন্য নিরাপত্তাবলয় মনে করি। বোরকা পরিহিতাকে সাধারণত উত্যক্ত করা হয় না। আমি ত্রিশ বছর আগ থেকেই বোরকা ব্যবহার করি। যে নারী পর্দায় থাকে সমাজ তাকে সম্মান দেয়। ইজ্জত করে। তবে বোরকার ভুল ব্যবহারও না হওয়া দরকার।

প্রশ্ন : পর্দা নারীর সম্মান বৃদ্ধি করে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে। আমি যখনই সফরে বের হই। পুরোপুরি পর্দা অবলম্বন করি। এতে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়। মূলত পর্দায় নারীর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন : বহুবিবাহ পরিবার ও সমাজের জন্য করুণা, না অভিশাপ? সাধারণত এর ভুল চিত্রই উপাস্থপন করা হয়। মিডিয়াও এর বিপক্ষে সোচ্চার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর দ্বারা গলদ ফায়দা লুট হয়। এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

উত্তর : এটা শরীয়ত অনুমোদিত বিধায় অবশ্যই তা সঠিক। কার সাধ্য শরীয়তের বিরোধিতা করে? আমার বক্তব্য হল, একজন পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রীর দেখভাল করতে সক্ষম হয় তাদের নিরাপত্তা দিতে সামর্থ্য হয়, তাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করতে পারে, সমাজে তাকে সম্মান দিতে পারে তাহলে এতে সমস্যা কোথায়?

বিবাহ মানে তো কেবল একজন অপরজনকে ভোগ করা নয়। কোনো অসহায় নারীর যদি কিনারা হয়ে যায় তাহলে এটাকে খারাপ বলব কেন? সুতরাং বহু বিবাহকে যৌনলালসা ও ভোগবাদিতা বলার কোনই কারণ নেই।

অন্যান্য ধর্মে বিধবাকে অপয়া মনে করা হয়। তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। বিধবা নারীকে বিবাহ করে মর্যাদা দেয়া হলে এটাকে কিভাবে যৌনলালসা চরিতার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন : প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুবই ভালো মানুষ। বাইরের কিছু লোক আর মিডিয়াই অধিকাংশ সময় প্রোপাগান্ডা করে দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি উস্কে দেয়। কেউ বলে পাকিস্তানীরা আমাদের শত্রু। কোনো না কোনো বাহানায় তারা জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। এটা অন্যায়, দুদিক থেকে হৃদ্যতা ও সৌহার্দমূলক আলোচনা হওয়ার দরকার। যাতে দু' দেশেই শান্তি ও স্থিতি বজায় থাকে, বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয় এবং দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন : হিন্দু-মুসলমান কি পরস্পরের বিরোধী?

উত্তর : একটুও নয়। এদের দুই শ্রেণীর মতো ভালো বন্ধু আর হতেই পারে না। বিদ্বেষের এই আগুন ইংরেজরা লাগিয়ে দিয়েছে। এটা ভুল চিন্তা-ভাবনা। ইংরেজরাই এই অপপ্রচার চালিয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলে আপনার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উত্তর : পিতা জীবিত ছিলেন না। মা-ও জীবনের সেই প্রান্তে চলে গেছেন যেখানে কোনো ব্যাপারে তার অনুভূতি নেই।

আমার সন্তানেরা বেশ বুদ্ধিমান। তবে আত্মীয়-স্বজনেরা খুব ধাক্কা খেয়েছেন। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল না, কারণ ছিল আমার পর্দা মেনে চলা। ব্যাপারটি তাদের কাছে কিছুটা ভিন্ন রকম লাগতো। পর্দার ব্যাপারটি তাদের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতো। এছাড়া আমার পরিবার থেকে কোনো বিরোধিতা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি সবসময়ই পর্দায় থাকেন?

উত্তর : আমি মনে করি, যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তো এর সবটাই মেনে চলবো। অনুগত বান্দা হয়েই জীবন-যাপন করবো। 'আধা মানব, আধা দানব' নীতি আমার পছন্দ নয়। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ এক। দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তারই নিয়ন্ত্রণে। তিনিই একক, লা শরীক প্রভু।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার কী অনুভূতি?

উত্তর : নিজেকে একেবারে হালকা ও নির্ভার মনে হয়। আমি পূর্বে যেন দৃষ্টিহীন ছিলাম। আলোকবঞ্চিত ছিলাম। সম্ভবত আমার দিব্যচক্ষু বন্ধ ছিল।

মনে হয় এখন আমি আলো পেয়ে গেছি। আমার চিন্তার জানালা যা এতদিন বন্ধ ছিল উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন আমি তৃপ্ত-সন্তুষ্ট। আমার সন্তুষ্টি এখন ইতিবাচক। আমি প্রত্যয়ী এক মুসলিম নারী।

প্রশ্ন : ইসলামে তালাক খোলা-র যে সহজ পন্থা রয়েছে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

উত্তর : এগুলো সবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যখন স্বামী-স্ত্রীতে নিয়মিত ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। বনিবনা হয় না। একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে। দুজনের এক ছাদের নীচে থাকা সম্ভব হয় না এমতাবস্থায় খোলা বা তালাকের মাধ্যমে জটিলতা সহজে নিরসন করা যায়। আমি বলতে চাই, মেয়েরাও অধিকাংশ পুরুষদের ওপর তাদের সামর্থ্যের অধিক অপ্রয়োজনীয় দাবী-দাওয়ার চাপ প্রয়োগ করে অশান্তির দরজা খুলে দেয়। বহুলোক তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমাকে এ অভিযোগ করেছে। স্বামীর আয় দেখে স্ত্রীর বায়না ধরা উচিত নয়। দুজনে মিলেমিশে পেয়ার মহব্বতের সঙ্গে জীবন-যাপনের চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন : আপনি পশ্চিমা অনেক দেশ সফর করেছেন। সেসব দেশে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনা করে দেখেছেন– তো তাদের কেমন হয়েছে?

উত্তর : জার্মানীতে পরিস্থিতি বেশ মজবুত। এমনিতেও সারা পৃথিবীতে ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার প্রসারের বেশ প্রভাব রয়েছে। লোকজন ইসলাম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ও প্রতীক্ষমাণ।

আমি যখন ধর্ম পরিবর্তন করিনি আমার তখন অনেকগুলো খোদা ছিল। (আল্লাহ মাফ করুন) সন্তান অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি দুআও করতে হতো। আমার জানা ছিল না, এজন্য আমি কোনো খোদার কাছে ধর্ণা দেবো। কেননা প্রত্যেক ব্যাপারেই সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভগবান ছিল। ফলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। ইসলামে সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তাআলা। যিনি এক ও একক। সবার সব আকাঙ্ক্ষা আবদার তিনি একাই শোনেন। তার কোনো শরীক নেই। ব্যস, যা চাওয়ার তারই নিকট চাও।

প্রশ্ন : আপনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও লেখিকা। বলা যেতে পারে নোবেল প্রাইজ আপনি পেতে পেতেও পাননি। এর কারণ কী ছিল? ১৯৮৪ সালে আপনার সঙ্গে টারগেট বোরসি, জোরিসালিসিং, নন্দএনগার্ডসিজও ছিল।

উত্তর : আমার দুর্ভাগ্য! দ্বিতীয়ত সে সময় আরেকজন ভালো কবিও আপনি যাদের নাম উচ্চারণ করেছেন– ছিলেন। তার তখন ক্যান্সার হয়েছিল।

এ কারণে, নোবেল প্রাইজ তখন তাকে দেয়া হয়েছিল। প্রাইজ পাওয়ার কয়েকদিন পরেই সে মারা যায়। এজন্যই সাধারণত একাধিকবার নোমিনেট হতে হয়।

প্রশ্ন : ইসলামই একমাত্র ধর্ম, আপনার মধ্যে কিভাবে একথার প্রত্যয় জন্মালো?

উত্তর : আমি বছরের পর বছর ধর্মসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকি। আমার মনে হয়েছে অন্যান্য ধর্মের কয়েকটি বুনিয়াদী বিষয় একেবারে অন্তঃসারশূন্য। ইসলামের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত। এতে নিরাপত্তা, সততা ও স্বস্তির ভরপুর উপাদান রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি ঠিকই বলেছেন, ইসলাম এক সার্বজনীন ধর্ম, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দুর্বলদের মুহাফিজ আর মজলুমের সমব্যাথী। শেষে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই– হিন্দু-মুসলিম বোনদের উদ্দেশ্যে আপনার আহবান...।

উত্তর : একে অপরকে ভালোবাসুন। ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় শান্তি আছে উন্নতি আছে, নিরাপত্তা আছে। আমি বলি, যেখানে ভালোবাসা নেই সেটা দোযখ। আর যেখানে পরস্পরে হৃদ্যতা আছে, সেটা জান্নাত। জান্নাতে সুকূন আছে শান্তি আছে।

প্রশ্ন : শেষ কথা– লোকেরা বলে আপনার ইসলাম গ্রহণের পিছনে একজন 'পুরুষ' মানুষের অবদান আছে। কথা সত্য হলে এবং কিছু মনে না করলে তাঁর পরিচয় জানতে চাই?

উত্তর : সত্যকথাই শুনেছেন। নিঃসন্দেহে এতে 'মানুষ' এর হাত রয়েছে। আর তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। তাঁর কারণেই আমি ঈমান গ্রহণ করেছি। এই এক ব্যক্তির 'শিক্ষা' আমার জীবনের গতি পাল্টে দিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, ত্রিশ বছর ধরে ইসলামের দ্বারা এবং ইসলামী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু প্রকাশ এতোটা বিলম্বে হল কেন? কোনো ভয় বা অন্য কোনো কারণ?

উত্তর : আমি এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ভয় করি না। আমি আল্লাহর বান্দী। সম্ভবত উপযুক্ত সময়টির প্রতীক্ষায় ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি নামায-রোযার পাবন্দী করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, নামায রোযার খুব পাবন্দী করি। রাত তিনটায় বিছানা ত্যাগ করি। তাহাজ্জুদসহ পাঁচওয়াক্ত নামাযই পাবন্দীর সাথে আদায় করি। সকাল বেলা ইমাম সাহেব আমাদের বাড়িতে পড়াতে আসেন। তার কাছ থেকে আমি ইসলামী শিক্ষা

অর্জন করি। (সকালে তার সঙ্গে আমাদের সুরাইয়া সাহেবের ঘরে সাক্ষাত হয়।) কুরআনে পাক পড়া শিখেছি। এখন বিশেষ সুরে তিলাওয়াত শিখছি।

প্রশ্ন : কেরালা, মুসলমান এবং রাজনীতি- এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য?

উত্তর : কেরালার উন্নয়নের ৮৫% ভাগেই মুসলমানদের হাত ও সহযোগিতা রয়েছে। এর উন্নতিকল্পে মুসলমানরা পানির মতো পয়সা ব্যয় করেছে। এখানে সর্বদা মুসলিম লীগই বিজয়ী হয়ে আসছে। কিন্তু এরা কখনও মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং কিছু করেও না। আমি চাই, কেরালার অধিবাসীরা মুসলমানদের নিয়ে ভাববে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করুক। আমি জোর দাবী জানাব– এখন সময় এসেছে ইনসাফের দাবী নিয়ে আওয়াজ তোলার। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানই হওয়া চাই। এটা তাদের অধিকার। এখানকার অর্থনীতি মুসলমানদের কারণেই টিকে আছে। মুসলমানদের অগ্রসর হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করে তা অর্জন করে নিতে হবে।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতের কোনো আকাঙ্ক্ষা?

উত্তর : কেরালার রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে হবে। আমার ইচ্ছা বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবো। সেখানে ইবাদতের বন্দোবস্ত থাকবে। একটি মসজিদ আর মাদরাসাও নির্মাণ করবো। এই সব বয়স্কাদের খিদমত করবো। তাদের এমন ভালোবাসবো যা তাদের প্রিয়জনেরাও কখনও বাসেনি। বাইরে বের হলে দেখি, কতো নিরাশ্রয় নারী রাস্তার ধারে ফুটপাথে দরদী ও বান্ধবহীন পড়ে আছে– তাদের জন্য কাজ করবো। তাদের নিজের ঘরে স্থান দেবো। আমার ধারণা, মুসলিম নারীরা সামাজিক কাজগুলো ভালোভাবেই আঞ্জাম দিতে পারে। জীবনের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যয় করবো এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
ফরিদা রাহমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, এপ্রিল– ২০০৩

মাইকেল জ্যাকসনের ভাই জর্মন জ্যাকসনের সাক্ষাৎকার

ইসলাম গ্রহণের পর নিজেকে আমার নবজাতক শিশু মনে হতে থাকে। ইসলামে আমি সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই যেগুলো খৃস্টধর্মে পাইনি। বিশেষত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে ইসলাম আমাকে প্রশান্তিদায়ক উত্তর দিয়েছে। ধর্মের মধ্যে এই প্রথমবারের মত আমি নির্ভরতা খুঁজে পাই। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি, আমার পরিবার যেন এই সত্য সম্পর্কে অবগত হয়। আমার পরিবার খৃস্টধর্মের (Avedance of jehova) মতাবলম্বী। এই বিশ্বাস মতে মাত্র এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক জান্নাতে দাখেল হবে। এটা কিভাবে মেনে নেয়া সম্ভব? আকিদাটি আমাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরতো। যখন জানতে পারলাম বাইবেল আসলে বিভিন্ন লোকের সংকলন তখন আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বিশেষত জেমস সংকলিত কপিটির ব্যাপারে আমার ঘোর সংশয় সৃষ্টি হল। কারণ, ভদ্রলোক সরাসরি নিজেই বাইবেল লিখেন আর খোদাকে এর কারণ মনে করেন। উপরন্তু তিনি নিজেও এর পুরোপুরি অনুসরণ করেন না। সৌদী আরব অবস্থানকালে আমি প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পপশিল্পী মুসলিম মুবাল্লিগ ইউছুফ ইসলামের (Cat stenvens) একটি অডিও ক্যাসেট ক্রয় করি। এর দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানতে পারি।

প্রশ্ন : কবে এবং কিভাবে আপনার ইসলামী সফর শুরু হয়েছে?

উত্তর : ১৯৮৯ সালে আমিও আমার বোন যখন মধ্যপ্রাচ্য সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করি, বাহরাইনে অবস্থানকালীন আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখানে কিছু শিশুর সঙ্গে দেখা হয়। তাদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করি, তারা নিষ্পাপ মনে সেগুলোর উত্তর দেয়। আলাপকালে তারা আমার ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায়, 'আমি খৃস্টান' এই ছিল আমার উত্তর। আমি তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, সকলে একবাক্যে বলে ওঠে 'ইসলাম' তাদের জড়তাহীন প্রত্যয়দীপ্ত উত্তর আমাকে নাড়া দিয়ে যায়। তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করে। কণ্ঠের চড়াই-উতরাই বলে দিচ্ছিল ইসলাম নিয়ে তারা গর্বিত। এভাবে আমি ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হই।

শিশুদের সঙ্গে এই সাধারণ বাক্যালাপ আমাকে মুসলিম আলেমদের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগ করে দেয়। তাদের সেই আবেগ মাখা

স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর আমাকে দোলা দিয়ে যায়। আমার এতটুকু সাধ্য ও মনোবল ছিল না, আমি এই ঘটনাকে ভুলে যাই। শেষ পর্যন্ত আমাদের পারিবারিক বন্ধু কমার আলীর নিকট ঘটনাটি আলোচনা করি। কমার আলী আমাকে সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে নিয়ে যায়। সেখান থেকে এক সৌদী পরিবারের সঙ্গে আমি ওমরা আদায় করি এবং প্রথমবারের মতো নিজের মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিই।

প্রশ্ন : মুসলমান হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কী ছিল?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের পর নিজেকে আমার নবজাতক শিশু মনে হতে থাকে। ইসলামে আমি সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই যেগুলো খৃস্টধর্মে পাইনি। বিশেষত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে ইসলাম আমাকে প্রশান্তিদায়ক উত্তর দিয়েছে। ধর্মের মধ্যে এই প্রথমবারের মত আমি নির্ভরতা খুঁজে পাই। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি, আমার পরিবার যেন এই সত্য সম্পর্কে অবগত হয়। আমার পরিবার খৃস্টধর্মের (Avedance of jehova) মতাবলম্বী। এই বিশ্বাস মতে মাত্র এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক জান্নাতে দাখেল হবে। এটা কিভাবে মেনে নেয়া সম্ভব? আকিদাটি আমাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরতো। যখন জানতে পারলাম বাইবেল আসলে বিভিন্ন লোকের সংকলন তখন আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বিশেষত জেমস সংকলিত কপিটির ব্যাপারে আমার ঘোর সংশয় সৃষ্টি হল। কারণ ভদ্রলোক সরাসরি নিজেই বাইবেল লিখেন আর খোদাকে এর কারণ মনে করেন। উপরন্তু তিনি নিজেও এর পুরোপুরি অনুসরণ করেন না। সৌদী আরব অবস্থানকালে আমি প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পপশিল্পী মুসিলম মুবাল্লিগ ইউছুফ ইসলামের (Cat stenvens) একটি অডিও ক্যাসেট ক্রয় করি। এর দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানতে পারি।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করে আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পর কী প্রতিক্রিয়া হল?

উত্তর : আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পর আমেরিকান মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রোপাগান্ডা শুরু করল। গুজবের ছাড়াছড়িতে আমি বিব্রতবোধ করলাম। মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছিল। যদিও বহু বিষয়ে ইসলাম ও খৃস্টধর্ম ঐক্যমত পোষণ করে। যেমন : কুরআন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পবিত্র পয়গম্বর বলে থাকে। এতদসত্ত্বেও আমার আশ্চর্য লাগল, খৃস্টান আমেরিকা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বিষোদগার করছে।

হতাশার সেই দিনগুলোতে আমি মানসিকভাবে আমেরিকান মিডিয়ার উপস্থাপিত মুসলমনাদের ভুল ইমেজ সংশোধনের শপথ নিলাম। আমার ধারণা ছিল না আমেরিকার প্রচার মাধ্যম আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ হজম করবে না। তারা আদাজল খেয়ে বিরোধিতায় নামবে। এরা স্বাধীন মতামত ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করল। আমেরিকান সমাজের কপট চেহারা আমার সামনে প্রকাশিত হল। ইসলাম গ্রহণের পর আমার জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসল। প্রকৃত প্রস্তাবে এরপর থেকেই আমি মানবতাকে বুঝতে শিখেছি। আমি নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করলাম। এতে পরিবারের লোকজন অসন্তুষ্ট হল। আমার ছোট্ট পরিবারটি দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। হুমকিসংবলিত পত্র আসতে লাগল। এতে পারিবারিক সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেল।

প্রশ্ন : কী ধরনের হুমকি?

উত্তর : উদাহরণত তারা বলতো, আমি নাকি আমেরিকান সভ্যতা ও সমাজের সম্মানকে আহত করেছি। বলতো, ইসলামের কোলে চড়ে তুমি অন্যদের প্রাপ্য অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছো। আমরা তোমার জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবো। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার পরিবার উদার মানসিকতার। আমরা এমন পরিবেশে চোখ খুলেছি যেখানে সকল ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হতো। আমাদের পিতামাতা আমাদের এই ধাঁচেই গড়ে তুলেছেন। এজন্য আমি বলতে পারি, জ্যাকসন পরিবারের সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আমার সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে তা উদার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গত নয়।

প্রশ্ন : আপনার ভাই মাইকেল জ্যাকসনের কী প্রতিক্রিয়া ছিল?

উত্তর : আমেরিকায় ফেরার সময় সৌদী আরব থেকে বহু কিতাবাদি নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলো থেকে মাইকেলও কিছু অধ্যয়ন করতে নেয়। ইতোপূর্বে আমেরিকান মিডিয়ার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী অপপ্রচারের ফলে সে কিছুটা প্রভাবিত ছিল। তবে না সে ইসলামকে ঘৃণা করতো, না পছন্দ করতো। এই কিতাবাদী অধ্যয়নের পর থেকে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত হল। কিতাব পাঠের প্রভাবে সে মুসলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি করল। বর্তমানে সে সৌদি বিলিয়নার যুবরাজ ওলীদ ইবনে তালালের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর সমান অংশীদার।

প্রশ্ন : মাইকেলের ব্যাপারে সংবাদ বেরিয়েছে সে নাকি মুসলমান হয়ে গেছে। প্রকৃত ঘটনা কী?

উত্তর : আমার জানা মতে মাইকেল তার জীবনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। তার সঙ্গীত মানুষের সঙ্গে মহব্বতের পয়গাম দেয়। আমরা পিতামাতা থেকে অন্যকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেই যখন এতো হইচই হতে পারে তাহলে মাইকেলের বিরুদ্ধে কীভাবে হবে না? তবে এখনও পর্যন্ত মিডিয়া তাকে গালাগালির পাত্র বানায়নি। যদিও ইসলামের নিকবর্তী হওয়ার কারণে তাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা জানে আজ না হয় কাল মাইকেল ইসলাম গ্রহণ করবেই।

প্রশ্ন : আপনার ব্যাপারে আপনার পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

উত্তর : আমেরিকা ফেরার পর মা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেন। আমার মা খুবই ধার্মিক মহিলা। বাড়িতে যাওয়ার পর আমাকে শুধু একটি প্রশ্নই করেন– "তোমার এই সিদ্ধান্ত সাময়িক নাকি ভেবে চিন্তে পা বাড়িয়েছো?" বললাম, "আগাগোড়া ভেবেই পা বাড়িয়েছি" আমাদের পরিবারকে সবাই ধার্মিক পরিবার হিসেবেই মানে। আমরা যাকিছু করি তা আল্লাহর দয়াতেই করি, এর জন্য আমরা কেন কৃতজ্ঞ হবো না। এর একটি কারণ এ-ও যে, আমরা চ্যারিটি ইন্সটিটিউটে অংশগ্রহণ করি। স্পেশাল বিমানে করে দরিদ্র আফ্রিকান দেশগুলোতে ওষুধ পাঠাই। বসনিয়া যুদ্ধের সময় আমাদের এয়ার ক্রাফট যুদ্ধকবলিতদের ত্রাণ সরবরাহ করতে গিয়ে ক্রাশ করেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনও আপনার পপস্টার বোন জায়ান্ট জ্যাকসনের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলেছেন?

উত্তর : পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতো আমার ইসলাম গ্রহণ তার কাছেও আশ্চর্যজনক ছিল। প্রথমদিকে সে খুব দুঃখ পেয়েছিল। তার জানা ছিল মুসলমান প্রবৃত্তিপূজারী জাতি। উদাহরণত তারা চার চারটি করে স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে দেয়ার পর এবং ইসলামী আইনকে আমেরিকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখার পর তার সে ভুল ভেঙ্গে যায়। এটা বাস্তবতা, পশ্চিমা সমাজে অশ-ীলতা ও অবিশ্বস্ততা সাধারণ ব্যাপার। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা পুরুষ কয়েকজন নারীর সঙ্গে যৌন

সম্পর্ক রাখে। এটা সামাজিক চরিত্রকে ধ্বসিয়ে দেয়। ইসলাম সমাজকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। ইসলামী শিক্ষা হল, কোনো ব্যক্তি যদি আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয় তাহলে তার উচিত সম্মানজনক পন্থায় নিজেদের সম্পর্ককে আইনী প্রক্রিয়ায় ঢেলে নেয়া। তাছাড়া ইসলাম একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাবলী আরোপ করেছে একজন সাধারণ মুসলমান অর্থনৈতিকভাবে সেগুলো পূর্ণ করতে অক্ষম। মুসলিম বিশ্বে সর্বোচ্চ ১% লোকও হয়তো পাওয়া যাবে না যারা একাধিক বিবাহ করেছে। আমার মতে ইসলাম ধর্মে নারীর অবস্থান সেই ফুলের মতো যা কাটার নিরাপদ বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকে। সুন্দর মনোলোভা মনোহর। কিন্তু পশ্চিমা সমাজ এই বোধ ও দর্শন থেকে বঞ্চিত।

প্রশ্ন : মুসলিম সমাজের ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : পৃথিবীতে মানবতার প্রতি সর্বাধিক সহমর্মিতা মুসলিম সমাজেই রয়েছে। আমার বিশ্বাস সেই সময় খুবই নিকটে যখন পৃথিবী এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হবে, ইনশাআল্লাহ।

সৌজন্যে : মাসিক আরমুগান,

জানুয়ারী– ২০০৪ ইং

ভাই উবাইদুল্লাহ (বিনোদ কুমার গোয়েল)-এর সাক্ষাৎকার

প্রত্যেক জিনিসে দৃঢ়তার জন্য চাই ইস্তিকামাত। সমস্ত সৃষ্টিকে অস্বীকার করে একক সত্তার হয়ে যাওয়ার স্বাদ এই পৃথিবীর বরং যদি বলি গোটা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং সর্বাধিক স্বাদের জিনিস তাহলে তা সঠিকই হবে। মানুষ দুর্বল। আল্লাহ তাআলা তার নিয়ত আর সংকল্প দেখেন। তার কাছে অসহায় হয়ে দাঁড়ালে তিনি সাহস যোগান। তৌফিক দিয়ে দেন। তার করুণার প্রতি কুরবান হই তিনি স্বাদ ও লযযত দান করেন। আর আখেরাতের মহা পুরস্কার তো সেনায় সোহাগা। এমন দয়ালু দাতা পরওয়ারদেগার ছাড়া আর কে আছে হৃদয় সঁপে দেয়ার লায়েক? উৎসর্গিত হওয়ার উপযুক্ত? তবে তার হতে হলে অন্য সবাইকে অস্বীকার করা জরুরী। لا اله الا الله -এর মধ্যে আগে অস্বীকার তারপর স্বীকারোক্তি। সবাইকে দূরে ঠেলে সকলকে বাই বাই বলবে, ব্যস তাঁর হয়ে যাবে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

উবাইদুল্লাহ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : উবাইদুল্লাহ ভাই! খুব খুশী হয়েছি। আপনি নিজেই আগমন করেছেন। আজই আব্বু বলছিলেন, কাল তোমাকে নাবীডায় গিয়ে আরমুগানের জন্য উবাইদুল্লাহ সাহেবের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করতে হবে। হঠাৎ জানতে পেলাম আপনিই স্বয়ং এখানে এসেছেন।

উত্তর : হযরতের সঙ্গে আমার কিছু জরুরী পরামর্শ ছিল। হঠাৎ হযরতের ফোন আসল, আহমদ আরমুগানের ব্যাপারে কথা বলতে আসছে, আমি হযরতের নিকট দরখাস্ত করলাম আপনার সময় হলে বরং আমিই আপনার খেদমতে হাজির হব। হযরত অনুমতি দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ সাক্ষাত হয়েছে। সাক্ষাত ও পরামর্শের পর খুব প্রশান্তি অনুভব করছি। এখন বলুন, আমার প্রতি কী নির্দেশ?

প্রশ্ন : আব্বু যেমন বলেছেন আরমুগানের জন্য আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবো।

উত্তর : জ্বী, জ্বী, এজন্যই জিজ্ঞেস করেছি।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন!

উত্তর : ১৯৭০ সালের ৬ই ডিসেম্বর জালালপুর গ্রামের এক গোয়েল পরিবারে আমার জন্ম। পিতাজী বিদ্যুৎ বোর্ডে চাকরী করতেন। তিনি আমার নাম

রেখেছিলেন বিনোদ কুমার গোয়েল। প্রাইমারী গ্রামের স্কুলেই শেষ করেছি। তারপর দিল্লী পাবলিক স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করি। কম্পিউটার সায়েন্স থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি। পরবর্তীতে নাবীডাতেই এক আমেরিকান কোম্পানীতে চাকুরীতে লেগে যাই। এখনও সেখানেই কাজ করছি। আমার ছোট্ট একটা ভাই আছে– প্রমোদ কুমার নাম। একটা বোনও আছে। পিতাজী বর্তমানে রিটায়ার্ড করেছেন। তিনি প্রপার্টি ডিলিংয়ের কাজ করেন। এই ব্যবসায় আল্লাহ তাকে অনেক উন্নতি দান করেছেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন!

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আল্লাহ তাআলা কিছু লোককে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় ধরে জান্নাতে নিয়ে যান আর তারা বার বার দোযখের দিকে ধাবিত হয়। আমি সম্ভবত ঐ নালায়েক সৌভাগ্যবানদের একজন।

প্রশ্ন : আপনি দারুণ বলেছেন 'নালায়েক সৌভাগ্যবান' তো সেই নালায়েকী আর সৌভাগ্যের কথাটি খুলে বলুন?

উত্তর : চার বছর পূর্বে আমি সেই কোম্পানীতে চাকুরী নেই। সহকর্মীদের মধ্যে কানপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি ছেলেও ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে নিজের নাম রেখেছিল মুহাম্মদ ইউসুফ। সে ছিল খুবই ধার্মিক মুসলমান। দাড়ি রেখে দিয়েছিল। প্যান্টশার্ট ছেড়ে কোর্তা-পাজামা-শেরোওয়ানী পরতো। তার ধর্মান্তরিত হওয়াটা আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। আমি তার সঙ্গে তার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনেক তর্ক-বিতর্ক করতাম। তাকে হিন্দুধর্মে ফিরে আসার কথা বলতাম। এ নিয়ে তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা চলতো। তর্ক চলাকালীন অধিকাংশ সময়ই সে বলতো, বিনোদ ভাই! আপনি আমাকে হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে বলেন আমি তো আল্লাহর কাছে দুআ করছি আপনাকেই বরং মুসলমান হয়ে যেতে হবে। আলোচনাকালে যতবারই সে একথা বলতো, আমি ভেতরে ভেতরে চমকে উঠতাম। না– জানি আমাকেই আবার মুসলমান হয়ে যেতে হয়! ভয়ে আমি তর্ক বন্ধ করে দিতাম। প্রায় চারমাস ধরে দীর্ঘ সময় নিয়ে আমাদের মধ্যে ধর্মতর্ক চলতে থাকে।

একদিন ইউসুফ সকাল সকাল অফিসে আসে। আমাকে বলে, আজ আমরা দুজন ছুটি নিয়ে কোনো পার্কে চলে যাই। সেখানে বসে নিরিবিলিতে কিছু কথাবার্তা বলবো। প্রথমে তো আমি না-ই করে দিলাম যে, কথা বলার জন্য আবার ছুটি নেয়ার কী দরকার? কিন্তু ইউসুফ জিদ ধরলে অগত্যা ছুটি

নিয়ে পার্কে চলে গেলাম। সে খুব মহব্বতের সাথে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে এবং কালিমা পড়তে আহ্বান জানাল। আমাকে এমন দরদ নিয়ে বোঝাল, শেষ পর্যন্ত তার কথা মেনে নিতে হয়। আমি কালিমা পড়ে নিই। সে বলে, রাতে আমাকে স্বপ্নে তোমার নাম উবাইদুল্লাহ বলে দেয়া হয়েছে। তোমার নাম আমি উবাইদুল্লাহ রাখতে চাই। আমরা চা ইত্যাদি পান করে বাড়ি চলে যাই। পরদিন সে আমাকে কিছু বইপত্র দিয়ে পড়তে বলে। আমাদের অফিসে জাভেদ নামের একটি ছেলে কাজ করতো। ইউসুফ আমাকে তার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে আমার ইসলাম গ্রহণ ও নতুন নামের পরিচয় করিয়ে দেয়।

এক সপ্তাহ পর ইউসুফ অফিসে এসে বলল, পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আমাকে চাকুরী ছেড়ে দিতে হচ্ছে। দুবাইতে চাকুরী ঠিক করেছি। পরশু আমার ফ্লাইট। যাওয়ার আগে আমাকে বলল, তোমাকে ঈমানের ওপর জমে থাকতে হবে। ঈমান হল জগতের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। তামা কিনতে হলেও কিছু দাম দিতে হয়। রূপা পেতে হলে আরেকটু বেশী পরিশোধ করতে হয়। আর স্বর্ণ কিনতে চাইলে বহুমূল্যে তা খরীদ করতে হয়। ঈমান তো অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। তার জন্য মূল্যও দিতে হয় খুব চড়া। যে কোনো মূল্যে তুমি তা সংরক্ষণ করে রাখবে। তারপর সে দুবাই চলে গেল। এদিকে জাভেদ খুব একটা ধার্মিক ছিল না। আমি চাইলেও সে আমাকে খুব একটা সময় দিতো না। আমি এক মাওলানা সাহেবের নিকট গিয়ে নামায ইত্যাদি শিখতে লাগলাম। আমার বাড়িতে ছোট্ট একটা পারিবারিক মন্দির ছিল। সেখানে অনেকগুলো মূর্তি ছিল। একদিন আমি সেখান থেকে গনেশের মূর্তিটি উঠিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিই। মূর্তি নদীতে ফেলতে দেরী শয়তানেরা যেন ক্ষেপে উঠল। আমাদের বাড়িতে বিপদাপদ আসা শুরু হল।

আমার মোটর সাইকেল হঠাৎ পায়ের ওপর পড়ে গেল। আমার পা ভেঙ্গে গেল। পণ্ডাস্টিক জুড়ে দিয়েও হাড় জোড়া লাগাল না। অপারেশন করতে হল। আমি তখনও সুস্থ হইনি আমাদের ছোট ভাই সিঁড়ি থেকে পিছলে গুরুতর আহত হল। পিতাজী অসুখে পড়লেন। বোন হাসপাতালে গেল। মোটকথা বিপদ যেন হামলে পড়ল। পিতাজী অনেক জ্যোতিষী ও ঝাড়-ফুঁককারীর শরণাপন্ন হল। সবাই বলল, কোনো কারণে দেবতা হয়তো বা রুষ্ট হয়েছেন কিন্তু চিকিৎসা কেউ করতে পারল না। দাদরীতে এক দেবতা পীর সাহেব থাকতেন।। তার ওখানে সিরিয়াল পেতে অনেক সময় লাগতো।

পিতাজী নিরুপায় হয়ে তার কাছে গেলেন। আমিও তার সঙ্গে গেলাম। সে বলল, আপনার সন্তানদের মধ্যে কেউ ধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ কারণেই এই বিপদাপদ। হঠাৎ একথা শুনে আমি তার ভক্ত হয়ে গেলাম। আমি তাকে সব কথা পরিষ্কার বলে দিলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি ইসলাম থেকে তাওবা করে পিতৃধর্মে ফিরে যাচ্ছো বাড়িতে এ জাতীয় বিপদাপদ লেগেই থাকবে।

প্রশ্ন : পীর সাহেব বলেছেন এমন কথা?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, ইয়া লম্বা দাড়ি। অনেক চেলাচামুন্ডাও আছে তার। তিনিই একথা বলেছেন। আমিও তার সামনে স্বীকার করি যে, আমি তিনমাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পিতাজী আমাকে বোঝাতে লাগলেন, আমিও পীর সাহেবের হঠাৎ বলে দেয়াতে তার ভক্ত বনে গিয়েছিলাম। রোজ রোজের পেরেশানীতে আমিও কাবু হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতাজী আর পীর সাহেবের জোর দেয়াতে আমি মুরতাদ হয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। পিতাজী আমাকে একজন পন্ডিতের কাছে নিয়ে গেলেন। পন্ডিতজী আমাকে হনুমান মন্দিরে স্নান করিয়ে শুদ্ধি করলেন। মুরতাদ হয়ে হিন্দু হওয়ার পর বাড়ির পেরেশানীর আগুনে যেন পানি ঢেলে দেয়া হল। ঘরে শান্তি স্বস্তি ফিরে এল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল। কয়েকবার তন্দ্রা অবস্থায় যেন ইউসুফের আওয়াজ আমার কানে বাজছিল– "ঈমানকে যে কোনো মূল্যে হেফাজত করতে হবে। তামা কিনলে দাম দিতে হয়, রূপা কিনলে মূল্য দিতে হয় আর স্বর্ণ কিনতে হয় বহুমূল্যে।

ঈমান হল জগতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। এটাকে যে কোনো মূল্যে আগলে রাখতে হবে।" সাথে সাথে আমার চোখ খুলে যেতো। কয়েকদিন পর্যন্ত অস্থির মতো হয়ে থাকতাম। কোনো মুসলমানকে দেখলে বেচাইন হয়ে উঠতাম। মসজিদের মিনার দেখলে আমি আর আমার মধ্যে থাকতাম না।

প্রশ্ন : এ সময়ে আপনি কি পূজা ইত্যাদি করতেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূজা ইত্যাদি করতাম। তবে এটা ভক্তির কারণে নয়; অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য। যেমন কেউ কোনো বদমাশের ভয়ে অথবা পুলিশের ডরে কোনো কাজ করে বা বর্ণনা দেয়।

প্রশ্ন : তারপর পুনরায় কিভাবে ইসলামে ফিরে আসা নসীব হল?

উত্তর : আমার আল্লাহ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ঈমান ও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়দান করেছেন। হল কি, একদিন অফিস থেকে এসে দেখি

গ্রামে একটি জামাআত এসেছে। জামাআতওয়ালারা গাশত করছিল। আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে জামাআতের সঙ্গে দেখা হয়। আমার মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হল যে, এদের সঙ্গে আমার মসজিদে যাওয়া দরকার, নামায পড়া দরকার। কিন্তু খুব ভয় পেলাম, নামায পড়লে বাড়িতে যদি আবার উৎপাত শুরু হয়। রাত পর্যন্ত এক অস্বস্তির মধ্যে কাটল।

স্বপ্নে দেখি জামাআতের কিছু লোক আমাকে ডাকতে এসেছে, তারা বলল মসজিদে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, তিনি আপনাকে ডাকছেন। আমি আনন্দে বলে উঠি, আমাকে? আমার মতো অপবিত্রকে আমাদের নবী ডাকছেন? আমি অনেক খুশি হলাম। মসজিদে গিয়ে দেখি, অনির্বচনীয় নূরানী অবয়বে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট। আমি সালাম করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে মুআনাকা করলেন। ইরশাদ করলেন, তোমার জানা আছে, আমিই যে তোমার নাম উবাইদুল্লাহ রেখেছি। তোমার জানা আছে, উবাইদুল্লাহ অর্থ হল শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দা। তুমি শয়তানের কারসাজি দেখেই ভয় পেয়ে গেছো। পৃথিবী তো মুমিনের জন্য কয়েদখানা। আর কাফেরের জন্য জান্নাত। এখানকার বিপদাপদ আর কষ্ট দেখেই যদি ভয় পেয়ে যাও তাহলে আখেরাতে জাহান্নামের ভয়াবহ কষ্ট কিভাবে বরদাশত করবে?

আমার চোখ খুলে গেল। সকাল তখন সাড়ে চারটা বাজছিল। শীতকাল ছিল। অস্থির হয়ে গেলাম। গোসল করে সোজা মসজিদে চলে গেলাম। জামাআতের কিছু সাথী বিছানা ত্যাগ করেছিল। তাদের কাছে জানতে চাইলাম, আমীর সাহেব উঠেছেন কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, তিনি নামায পড়ছেন। আমি তার নিকট গিয়ে খোশামুদ করে সময় নিলাম। তারপর তার কাছে স্বপ্ন ও নিজের পুরো বৃত্তান্ত খুলে বললাম। তিনি ছিলেন মেওয়াতের অধিবাসী। আলেমে দ্বীন। মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমাকে পুনরায় কালিমা পড়ালেন। ঈমান নবায়ন করতে বললেন।

আমি কালিমা পড়ে প্রথমে তাহাজ্জুদ তারপর ফজর নামায আদায় করলাম। আমীর সাহেব আমাকে উখলা গিয়ে আপনার ওয়ালিদ সাহেব মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিলেন এবং বার বার জোর দিয়ে আজই তার সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা নিলেন। তারপর ঠিকানা নিয়ে ফোনে যোগাযোগ করব বলে চলে আসলাম। এদিনই দুপুরে প্রথমবারের মত দুবাই থেকে ইউসুফের ফোন আসল। আমার অবস্থা জানতে

চাইলে বললাম, তোমার সঙ্গে দীর্ঘ কথা আছে। সে ফোন কেটে দিল। অফিস থেকে বের হয়ে ইউসুফকে ফোন করে পুরো ঘটনা, রাতের স্বপ্ন এবং ঈমান নবায়নের কথা শোনালাম। ইউসুফ বলল, আপনার নাম আমি স্বপ্নে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে রেখেছি। আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছিল তুমি চলে গেলে তাকে কে দাওয়াত দিবে? যাও তাকে কালিমা পড়াও আর তার নাম উবাইদুল্লাহ রাখো।

ইউসুফ আমাকে হযরতজীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে জোর দিল। বলল, আমি তারই হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েক মাস ঘুরে ঘুরে মরছিলাম। তারপর একজন মাওলানা সাহেবের ঠিকানা দিয়েছিল। তিনি সাক্ষাতমাত্রই আমাকে কালিমা পড়িয়েছিলেন আর আমার নাম রেখেছিলেন মুহাম্মদ ইউসুফ। আইনী কাগজপত্র তিনিই করে দিয়েছিলেন। বিকেলে অনুমতি নিয়ে অফিস থেকে একটু আগেই বের হলাম। উখলা গিয়ে বাটালা হাউজ জামে মসজিদে পৌঁছলাম। ইমাম সাহেব বললেন, হযরত মাগরিবের নামায পড়ে এইমাত্র বের হলেন। তিনি একজনকে দ্রুত খোঁজ নিতে পাঠালেন। হযরত সংবাদ পেয়ে ফিরে আসলেন। মসজিদে বসে সাক্ষাত হল। আমার পুরো ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। উঠে কোলাকুলি করলেন। মুবারকবাদ দিলেন। কয়েকবার আমার কপালে চুমু খেলেন। বললেন, আপনি কেমন খোশ কিসমত, শানে হোদায়াত স্বয়ং আপনাকে কবুল করে নিয়েছে। তাও আবার কেমন অভিনব পন্থায়। তবে দ্বিতীয়বার আর এই সুযোগ পাওয়া যাবে না। যে কোনো মূল্যে এর হেফাজত করতে হবে।

মাওলানা সাহেব বললেন, ইউসুফ সাহেবের আপনাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সম্ভবত একবার তিনি অফিসের এক ইঞ্জিনিয়ারের ইসলাম সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের কথাও আলোচনা করেছিলেন খুব সম্ভব তিনি আপনার কথাই বলেছিলেন। বললাম, জ্বী, হ্যাঁ, কয়েক মাসব্যাপী তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। হযরত বলেছেন, শয়তান জিন্নাত সর্বদা মানুষকে হেদায়াত থেকে হটানোর চেষ্টা করতে থাকে। আপনি অটল থাকলে আল্লাহ তাআলা এই মেঘ কাটিয়ে দিতেন। আপনার আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্ন : এরপর কি পরিবারের লোকজনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন?

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! আমার এবারের ইসলাম পূর্বের ইসলাম

থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল। আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। হিম্মত দিয়েছেন এবার আমি গোটা পৃথিবী বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের বিরোধিতা খরিদ করে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হওয়ার দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হয়েছিলাম। রাতে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে জড়ো করে বলেছিলাম, যে সত্তাকে আমার মন মস্তিষ্ক, আমার চিন্তা-চেতনা সত্য জেনে গ্রহণ করেছে মিথ্যা দেবতাদের ভয়ে আমি তাকে পরিত্যাগ করবো না। পরিবার আমাকে পেছনের বিপদাপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি বললাম, এরচেয়ে হাজারও গুণ বেশী আপদ-বিপদ আসলেও আমি সত্যবিচ্যুত হতে পারি না। আমার ইসলাম তোমাদের পছন্দ না হলে আমি তোমাদের এবং তোমাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত। তারা আমাকে দরদের সাথে বোঝাতে লাগল। আমি যখন কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করলাম আমার ছোট ভাই খুব ক্ষেপে গেল। আমার পিতাও তার পক্ষ নিল। রাতের বেলা আমি বাড়ি ত্যাগ করার এরাদা করলাম। মা আমাকে একটি কামরায় নিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে আমার জন্ম ও লালন-পালনের কষ্ট মুসীবতের কথা শোনালেন।

আমিও কাঁদতে লাগলাম। বার বার মাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, মা! আপনি আমাকে লালন পালন করে সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। এর বিনিময়ে বলছি, এই পৃথিবী দুদিনের পান্থশালা, ধোঁকার আবাস। কালিমা পড়ে নিন। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন বানিয়ে নিন। পরে তিনিও রেগে গেলেন। রাত একটার সময় আমি ঘর ছেড়ে বের হলাম। শীতের রাত। কিছুদূর গিয়ে এক পার্কের ছাউনীর নীচে বসে পড়লাম। পাশের একটি ট্যাংকি থেকে উযূ করলাম। ঘাসের ওপরই আল্লাহর সমীপে নামাযের নিয়ত করলাম। নামায শেষে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলাম। কেঁদে কেঁদে বললাম, আয় আমার আল্লাহ! আপনি আপনার নবীকে দিয়ে আমার নাম উবায়দুল্লাহ রেখেছেন। আয় আল্লাহ! আমি তো কেবল আপনারই বান্দা। আল্লাহ! আপনি যেহেতু আমাকে কেবলমাত্র আপনারই বান্দা বানিয়েছেন এজন্য আপনার অনুগ্রহে প্রাণের দোসর ভাই-বোন, ঘর-বাড়ি, স্নেহশীল পিতা, মমতাময়ী মাকে স্রেফ আপনারই জন্য ছেড়ে এসেছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে শুধু আপনারই বান্দা বানিয়ে রাখুন। আয় আল্লাহ! আমাকে শুধু আপনারই বান্দা বানিয়ে রাখুন। মনে পড়ল, হযরত আমাকে একটি দুআ লিখে দিয়েছিলেন এবং দৈনিক তার যিকির করতে বলেছিলেন।

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

তরজমা : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না– এরপর যে, আপনি আমাদের সুপথ প্রদর্শন করেছেন। আর আমাদের আপনার নিকট হতে (বিশেষ) করুণা প্রদান করুন। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা। –সূরা আলে ইমরান : ৭

বার বার এর হিন্দী অনুবাদ পড়তে থাকি। মৌলভী আহমদ! সে রাতের দুআ আর আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদের স্বাদ ও আস্বাদ বলে বোঝানো যাবে না। মনে হচ্ছিল আল্লাহ তাআলার করুণা আমাকে কোলে টেনে নিচ্ছে। সবকিছু ত্যাগ করে অন্ধকার শীতের রাতে জনশূন্য ময়দানে আসমানের শামিয়ানার নিচে আল্লাহর বান্দা হওয়ার সে কি স্বাদ আমি অনুভব করলাম! হঠাৎ খেয়াল হল, পৃথিবীতেই যদি তাঁর হয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন স্বাদ নিহিত তাহলে জান্নাতে জুমার দিন আল্লাহ তাআলার দীদার হলে কেমন মজাটাই না হবে। এক আশ্চর্য তন্ময়তার ঘোরের মধ্যে শীতের দীর্ঘ রাতটি নিমেষেই শেষ হয়ে গেল।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : সকালে উখলা এসে পরামর্শ করতে মাওলানা সাহেবকে খোঁজ করলাম। কিন্তু তিনি ফজরের পরই সফরে চলে গিয়েছিলেন। একজন আমাকে নেযামুদ্দীন মারকাযে যাওয়ার পরামর্শ দিল। পরদিন মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হল। মাওলানা সাহেব তার এক বন্ধুর ওখানে কয়েকদিনের জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। দুদিন পর্যন্ত পরামর্শ চলল। আমি বার বার ইসলাম সম্পর্কে পাড়াশোনা করে একজন আলেম ও দা'য়ী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করছিলাম। মাওলানা সাহেব আমার কাগজপত্র তৈরী করে দিলেন এবং প্রথমে জামাআতে সময় লাগানোর পরামর্শ দিলেন।

আমি চল্লিশ দিনের জন্য জামাআতে চলে গেলাম। ফিরে আসার পর মাওলানা সাহেবের পরামর্শক্রমে কর্ণাটকের এক মাদরাসায় জামাআতের আমীর সাহেবের সঙ্গে গিয়ে ভর্তি হলাম! দু বছর আগে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তিনি পরিবারের সঙ্গে দাওয়াতী ব্যাপারে যোগাযোগ করতে বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর জন্য ছেড়েছি তো ছেড়েই দিয়েছি। গেলে না আবার তাদের কারণে পিছলে যাই।

মাওলানা সাহেব বললেন, আল্লাহর জন্য ত্যাগ করায় যে মজা, তার জন্য মিলিত হওয়ার এবং তাদের আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া আরও অধিক মজা।

আমি বাড়িতে ফোন করলাম। মা ফোন রিসিভ করে হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলেন। আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন। আমি হুমায়ুনের সমাধির ঠিকানা বললাম। তিনি আমাকে দেখতে আসলেন। বাড়িতে যেসব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কেঁদে কেঁদে তার বিশদ বর্ণনা দিলেন। আমি বললাম, এই যে দেখুন হুমায়ুনের সমাধি। কেমন বড় বড় লোক আর কত কত ছোট লোক সবই মারা গেছে। মা! আমাদেরও মরতে হবে। মা আমি আপনার পুত্র। আপনাকে বাস্তবিকই ভালোবাসি। আপনি কালিমা পড়ে নিন। মা! শোকে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলেন। আমার আল্লাহর দয়া, ঘন্টাখানেক খোশামুদের পর তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমি তাকে হযরতের সঙ্গে দেখা করালাম। হযরত তাকে পুনরায় কালিমা পড়ালেন। তাঁর নাম রাখলেন সালমা। আমার ছোট বোনও সঙ্গে ছিল। হযরত তাকেও বোঝালেন। সেও প্রস্তুত হয়ে গেল। হযরত তার নাম রাখলেন আসমা!

প্রশ্ন : অতঃপর আপনার তালীমের কী হল?

উত্তর : মা বাড়ি যেতে পীড়াপীড়ি করলেন। হযরত সাহেবকে খোশামুদ করতে থাকেন। হযরত আমাকে হুকুম করলেন, মায়ের কথা মেনে নাও। তিনি মাকেও ঈমানের ওপর অটল থাকার উপদেশ দিলেন। আর ওয়াদা করলেন, তিনি নবীডায় একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিবেন যিনি আমাকে ইলম শেখাবেন। আমি বাড়ি চলে গেলাম। শুরুর দিকে পিতাজী খুবই বিরোধিতা করলেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গ দিলেন। আল্লাহ তাআলার দয়ায় আমার পিতা ও ভাই– আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : বংশের লোকজন ও সমাজের পক্ষ থেকে কোনো বিরোধিতা হয় নি?

উত্তর : অনেক হয়েছে, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। বিরোধীদের সঙ্গে দুই দুইটি বছর সহাবস্থানের কাহিনী। হযরতের পরামর্শক্রমে আমরা সেখান থেকে হিজরত করে দিল্লীতে বাস করছি। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ঈমান দান করেছিলেন কাজেই এ সব বিরোধিতা বেশ উপভোগ করেছি।

প্রশ্ন : তার কিছু বলুন!

উত্তর : সে এক দীর্ঘ কাহিনী। অন্য এক সুযোগে শুনিয়ে দেব।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'চার কথা বলুন!

উত্তর : প্রত্যেক জিনিসে দৃঢ়তার জন্য চাই ইস্তিকামাত। সমস্ত সৃষ্টিকে অস্বীকার করে একক সত্তার হয়ে যাওয়ার স্বাদ এই পৃথিবীর বরং যদি বলি

গোটা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং সর্বাধিক স্বাদের জিনিস তাহলে তা সঠিকই হবে। মানুষ দুর্বল। আল্লাহ তাআলা তার নিয়ত আর সংকল্প দেখেন। তার কাছে অসহায় হয়ে দাঁড়ালে তিনি সাহস যোগান। তৌফিক দিয়ে দেন। তার করুণার প্রতি কুরবান হই তিনি স্বাদ ও লযযত দান করেন। আর আখেরাতের মহা পুরস্কার তো সেনায় সোহাগা। এমন দয়ালু দাতা পরওয়ারদেগার ছাড়া আর কে আছে হৃদয় সঁপে দেয়ার লায়েক? উৎসর্গিত হওয়ার উপযুক্ত? তবে তার হতে হলে অন্য সবাইকে অস্বীকার করা জরুরী। لا اله الا الله -এর মধ্যে আগে অস্বীকার তারপর স্বীকারোক্তি। সবাইকে দূরে ঠেলে সকলকে বাই বাই বলবে, ব্যস তাঁর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া উবাইদুল্লাহ ভাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এই অস্বীকার ও স্বীকারোক্তির স্বাদ আস্বাদন করান।

উত্তর : আপনি আমাকে লজ্জিত করছেন।

প্রশ্ন : না, না, বরং সত্য হল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এর গভীর প্রত্যয় দান করেছেন। আপনার বর্ণনায় আমার লোমকূপও দাঁড়িয়ে গেছে।

উত্তর : মৌলভী আহমদ! আল্লাহ তাআলা আপনার কথাকে বরকতময় করুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, জানুয়ারী– ২০১২

অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ ইকবাল (রাজেন্দ্র মালিক)-এর সাক্ষাৎকার

দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন ঈমানের ওপর আমৃত্যু অটল রাখেন এবং দুনিয়ার প্রতিটি কোনে কুরআন পৌঁছানোর এরাদা পূর্ণ করে দেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ ইকবাল : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : উকিল সাহেব! ফুলাত থেকে প্রকাশিত উর্দু ম্যাগাজিন আরমুগানের দস্তরখানে পাঠক ও আরমুগান কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে আপনাকে হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। অনুরোধ করছি, আরমুগানের পাঠকদের নিকট আপনার পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরুন।

উত্তর : আমি হরিয়ানার কর্নাল জেলার এক জাট পরিবারের এক অতি সাধারণ মানুষ। পিতাজী আমার নাম রেখেছিলেন রাজেন্দ্র মালিক। ২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সালে আমার জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের স্কুলেই লাভ করি। তারপর হরিয়ানা বোর্ড থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি। রোহিতক ইউনির্ভাসিটি থেকে এল.এল.বি করি। তার পর পানিপথ কোর্টে ওকালতি শুরু করি। পরবর্তীতে ইউনির্ভাসিটি থেকেই L.L.M করি। দশ বছর পূর্বে কাইথল জেলার এক জমিদার পরিবারে বিবাহ করেছি। আমার স্ত্রীও এল.এল.বি পাশ। মালিক আমাকে দুটি সন্তানের পিতা বানিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : গ্রামে নরেশ নামে আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল। গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত দুজনে একই ক্লাশে পড়াশোনা করেছি। তারপর সে এম.বি.এ করতে থাকে আর আমি এল.এল.বিতে ভর্তি হই। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অনেক গভীর। পানিপথের এক পন্ডিত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। উভয়ে পরস্পরে 'দিউয়ানা' হয়ে যায়। কিন্তু পরিবার তাদের বিয়েতে সম্মত হয় না। দিল্লীতে এক মুসলিম উকীলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে তাদের ধর্মান্তরিত হয়ে বিবাহ করার পরামর্শ দেয়। তারা দুজন মুসলমান হয়ে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কেউ এভাবে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ পড়াতে রাজি হয়নি। নরেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। আমি তার পাগল হয়ে

যাওয়ার আশংকা করি। এজন্য আমি দু'জন উকীলসহ তাদের নিয়ে দিল্লীর জামে মসজিদে যাই। ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমরা তাদের মুসলমান বানাবো কিন্তু শর্ত হল, এলাকার দুজন দায়িত্বশীল মুসলমানকে নিয়ে আসুন যারা এদের দু'জনকে জানে। আমি বলি, দুজনের পরিবর্তে আমরা তিনজন উকীল সাক্ষী হচ্ছি। তিনি বলেন, না দুজন মুসলমানকেই নিয়ে আসুন।

আমরা পানিপথ ফিরে যাই। কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় দুজন লোককে যাগাড় করে দিল্লী পেঁছি। ইমাম সাহেব তাদের দু'জনকে কালিমা পড়ালেন। ছেলের নাম রাখেন নরেশ আবদুল্লাহ আর মেয়ের নাম মারয়াম ফাতিমা। এবার আমরা তাকে দুজনের বিবাহ পড়িয়ে দিতে বলি। তিনি অস্বীকার করে বলেন, বিবাহ কাযীদের দিয়েই পড়াবেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই বিবাহ। আমরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। দিল্লীতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাযী খুঁজতে থাকি কিন্তু পাওয়া গেল না। পানিপথ এসেও কয়েক মসজিদে যাই কিন্তু কেউ তাদের বিবাহ পড়াতে রাজী হয়নি। ইতোমধ্যে কেরানার এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমি তাকে নরেশের অবস্থা খুলে বলি। তিনি বলেন, আপনি ওদের নিয়ে কেরানায় চলে আসুন। আমাদের ওখানকার ইমাম সাহেব ওদের বিবাহ পড়িয়ে দেবেন।

১৫ ই জানুয়ারী আমরা তিন উকীল ওদের দুজনকে নিয়ে কেরানা পৌঁছি। ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, আপনারা ফুলাত চলে যান সেখানেই এর সমাধান হয়ে যাবে। আমরা বলি, জনাব, অনেক জায়গায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এখানে এসেছি। আপনি সঙ্গে চলুন। ফুলাত কেন কলকাতায় যেতেও রাজী আছি। তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। আমরা ফুলাত পৌঁছলাম। প্রচন্ড শীত পড়েছিল। ফুলাত এসে মাওলানা কালিম সাহেবের (আপনার পিতার) বাড়ি গেলাম। জানতে পেলাম, হযরত বাড়িতেই আছেন। ইমাম সাহেব বললেন, আপনাদের সৌভাগ্য হযরতকে পেয়ে গেছেন। নইলে অধিকাংশ সময়ই তিনি সফরে থাকেন। বহুলোক তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী ছিল। লোকজনের ভীড় লেগেছিল। অনেক কষ্টে সময় পাওয়া গেল। পৃথক একটি কক্ষে কথাবার্তা হল। ইমাম সাহেব বললেন, এরা দুজন মুসলমান হতে চায় এবং মুসলমান হয়ে বিবাহ করতে চায়। মাওলানা সাহেব বললেন, মুসলমান হওয়া এবং ঈমান কবুল করার প্রশ্নে প্রত্যেকেরই তাড়াতাড়ি করা চাই। আর

প্রত্যেক মুসলমানেরই তার রক্তসম্পর্কীয় ভাই বোনদের চিরস্থায়ী নরকযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলমান বানানোর এবং কুফর-শিরক থেকে তওবা করানোর চেষ্টা করা উচিত। এজন্য আপনার উচিত ছিল কেরানাতেই তাদের কালিমা পড়িয়ে দেয়া। আর বিবাহের ব্যাপারটি তো উকীলদের মাধ্যমেই হতে পারে। ভালো হবে যদি বাড়ি গিয়ে মাতা-পিতাকে রাজী করানো যায়। মাতা-পিতা সন্তানকে অত্যন্ত মহব্বত করেন। তাদের সঙ্গে বিদ্রোহের পথ অবলম্বনের পরিবর্তে তাদের খোশামুদ করা হলে তারা সন্তানের সুখের জন্য সমাজবিরুদ্ধ ব্যাপারেও রাজি হয়ে যান।

আমার পরামর্শ হল, আপনারা বাড়ি চলে যান। বরং আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনারা এদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এদের পিতা-মাতাকে রাজী করিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করুন। এভাবেই তাদের বিবাহের ব্যবস্থা হতে পারে। আমি বললাম, তারা রাজি নয়। অনেক চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। তারা কিছুতেই রাজী হবে না। হযরত বললেন, তাহলে তো বিবাহটা আদালতেই হওয়া দরকার। আমরা এ জাতীয় চক্করে পড়তে চাই না।

অবৈধ সম্পর্ককে আল্লাহ তাআলার আইন মোতাবেক বৈধ করার জন্য আমরা যদি তাদের বিবাহ করিয়েও দিই সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে তো কোনো কাগজপত্র থাকে না। যারা বিবাহ পড়ায় কাগজপত্র তারাই দিতে পারে। আমরা বললাম, আপনি তাদের মুসলমান করে বিবাহ পড়িয়ে দিন। যখন এরা মুসলমান হয়ে যাবে তখন তো আপনাকেই এ কাজটি করে দিতে হবে। যেমন এরা হিন্দু হলে মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিতো আর পুরোহিত ঠাকুর তার ব্যবস্থা করে দিতো। হযরত সাহেব বললেন, ঠিক আছে আমি এদের কালিমা পড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা মিরাঠ চলে যান। সেখানে উকীল আছে। তারা কাউকে দিয়ে বিবাহ পড়িয়ে কাগজপত্র করে দিবেন।

আমরা বললাম, আপনি মুসলমান করে বিবাহ পড়িয়ে দিন। আইনী কাগজপত্র আমরা নিজেরাই করে দেবো। আমরা তিনজনই উকীল। মাওলানা সাহেব বললেন, আসলে আপনাদের তো নিকাহনামাও প্রয়োজন পড়বে। আমি তাদের কালিমা পড়িয়ে দিই। আমাদের এখানে হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেব আছেন তিনি এলাকায় বিবাহ পড়ান। আপনারা তার ওখানে গিয়ে বিবাহ পড়িয়ে নিন। তিনি নিকাহনামাও বানিয়ে দিবেন। আপনারা সেটাকে আদালতে রেজিস্ট্রি করে নিবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি কালিমা পড়িয়ে দিন।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন তারা দিল্লী জামে মসজিদেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল...

উত্তর : মৌলভী আহমদ আহেব! আমার ভয় হচ্ছিল, ইমাম সাহেব এদের বিবাহ পড়াননি একথা জানতে পেলে তিনি না ভেবে বসেন "ডাল মে কুছ কালা হ্যায়" এজন্য ব্যাপারটা চেপে গেছি।

প্রশ্ন : তারপর কী হল বলুন?

উত্তর : মাওলানা সাহেবের তাড়া ছিল। দ্রুত তিনি তাদের দুজনকে সামনে বসিয়ে এবং আমাদের তিন উকীলকেও লক্ষ্য করে বললেন, আপনারাও শুনুন, মানুষ যে দেশে বসবাস করে সে দেশের বিচারক ও কর্তাকে না মানলে বিদ্রোহী সাব্যস্ত হয়। বিদ্রোহীকে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হয় না। রাষ্ট্রের কোনো সুবিধা লাভ করার তার অধিকার থাকে না। ধরা পড়লে তার শাস্তি আজীবন জেল অথবা ফাঁসির রজ্জু।

এই গোটা সৃষ্টিজগতের মালিক ও হাকিম একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তার ফাইনাল ও আপটুডেট বর্তমান সংবিধান কনস্টিটিউশন কুরআন মাজীদ। বেদও মালিকের পক্ষ থেকে প্রেরিত আইন ছিল। সেটা ছিল সংবিধানের প্রথম সংস্করণ ও আদিগ্রন্থ। ফাইনাল পরিপূর্ণ সংস্করণ হল কুরআন। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানবে না, তাকে একক মানবে না তার ফাইনাল আইন কুরআন মানবে না সে বিদ্রোহী, গাদ্দার বিবেচিত হবে। আল্লাহর জমীনে তার বসবাস করা, এখানের আলো-বাতাস ভোগ করার তার অধিকার নেই। এজন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে অথবা কোনো পদাধিকার গ্রহণ করতে হলে তাকে সংবিধানের ওপর শপথ গ্রহণ করানো হয়। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে বসবাসের অধিকার পেতে হলে তার ফাইনাল সংবিধান কুরআন মুতাবেক জীবন-যাপনের শপথ নিতে হবে। এটাকেই বলে কালিমা পড়ানো। একেই বলে ঈমান গ্রহণ করা। মৃত্যুর চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন স্টাফ আল্লাহর ফেরেশতারা এটা চেকিং করে দেখবেন। ঈমান না থাকলে চিরস্থায়ী নরকে নিক্ষেপ করবে। এজন্য সত্যমনে মালিককে হাজির নাজির জেনে দু'লাইন আরবী কালিমা পড়ুন। ভাবুন, আমি মুসলমান হওয়ার জন্য এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করার জন্য শপথ গ্রহণ করছি। হযরত বললেন, আসুন আমরা সবাই কালিমা পড়ে নিই। আমাদের লক্ষ করে বললেন, উকীল সাহেব! আপনারা আইনবিদ, এদের দু'জনের চেয়ে বরং আপনাদের শপথগ্রহণ বেশী জরুরী।

মাওলানা সাহেব আমাদের তিনজনকেও কালিমা পড়ালেন। তারপর হিন্দিতে কিছুটা ব্যাখ্যা করে এর মর্মও বলে দিলেন। তারপর বললেন, এখন আপনারা হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেবের ওখানে চলে যান। তাকে দিয়ে বিবাহ পড়িয়ে নিন। তবে একটি কথা স্মরণ রাখুন। এমনিতে যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে না সে কুকুরেরও অধম। কেননা কুকুরও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার মালিকের কাছে পড়ে থাকে, দুয়ার ছাড়ে না তাহলে মানুষ যদি দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরে সে তো কুকুরেরও অধম হল। কিন্তু ঈমানের প্রকৃত প্রয়োজন হবে মৃত্যুর সময়। কাজেই এই শপথের ওপর আমৃত্যু অটল থাকা চাই। সেই ঈমানই ধর্তব্য হবে যেটা অন্তর্যামী মালিক কবুল করবেন। এজন্য শপথটা সাচ্চা দিলে অন্তরাত্মা থেকে হওয়া চাই।

হযরত মাওলানা সাহেব আমাদের পাঁচজনকেই তাঁর কিতাব 'আপকি আমানত, আপকি সেবা মে' আনিয়ে দিলেন। মাস্টার আকরাম সাহেবকে ডেকে আমাদের ভালো করে গরম চা আর নাস্তা করাতে বললেন। আরেক ব্যক্তিকে আমাদের হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেবের ওখানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তারপর তাঁর দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের ইসলাম ও ঈমান সম্বন্ধে বোঝালেন। চা নাস্তা শেষ হলে আমরা হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেবের ওখানে গেলাম। তিনি বিবাহ পড়াতে অস্বীকার করে বললেন, প্রথমে আপনারা ইসলাম গ্রহণের এফিডেভিট বানান, তার একটা কপি আমার কাছেও থাকা দরকার। আমি বললাম, আমাদের কাছে ইমাম বুখারীর সার্টিফিকেট আছে। হাফেজ সাহেব হযরতজীকে ফোন করলেন। হযরত বললেন, ঐ সার্টিফিকেটের এক কপি নিয়ে বিবাহ পড়িয়ে দাও।

প্রশ্ন : আপনি কি তখন সত্যমনেই তাদের সঙ্গে কালিমা পড়েছিলেন?

উত্তর : না, আসলে হযরত বিবাহ পড়াতে অস্বীকার করে দেন কিনা এই আশংকায় পড়ে নিয়েছিলাম। তবে মাওলানা সাহেব যে বিষয়গুলো বলেছিলেন তা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। মন-ও বলছিল, কথা একেবারে ষোল আনাই সঠিক। হযরত এ–ও বলেছিলেন, কুরআন সম্পর্কে ধারণা করা হয়, এটা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ অথচ কুরআন মাজীদ হল মালিকের পক্ষ হতে প্রেরিত গোটা জগতবাসীর জন্য পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ সম্বোধন।। এটা জানা ও মানা যেমনভাবে আবদুল্লাহ আর মুহাম্মদ উমরের জন্য জরুরী অনুরূপ নরেশ আর রাজেন্দ্রর জন্যও জরুরী।

প্রশ্ন : আব্বুকে আপনি আপনার নাম বলে দিয়েছিলেন?

উত্তর : না, বলিনি। তিনি উদাহরণ হিসেবে নাম বলেছিলেন কিন্তু মনে হচ্ছিল তিনি শুধু আমাকেই বলছিলেন। হযরত একথাও বলেছিলেন, এটা ঠিক যে, মুসলমানদের দায়িত্ব ছিল তাদের রক্তসম্পর্কীয় অমুসলিম ভাই-বোনদের নিকট ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়া। আর এ ব্যাপারে অবহেলার কারণে তারা হাশরের ময়দানের পাকড়াও হবে কিন্তু আপনারও 'আমাদের পৌছানো হয়নি' বলে বাঁচতে পারবেন না। কারণ, পৃথিবীর সকল আইন অনুযায়ীই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সর্বাপেক্ষা বড় আইনী অপরাধ। আমার মনে হল, তিনি খাঁটি কথাই বলেছেন। আমি কুরআন পড়ার ইচ্ছা করলাম। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন আমার এক মুসলিম উকীল বন্ধুর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ চাইলাম। তিনি বললেন, এনে দিবেন। কয়েকদিন তাগাদা দেয়ার পর তিনি হিন্দি অনুবাদ সম্বলিত একখানা ছোট সাইজের কুরআন এনে দিলেন। আমি পড়া আরম্ভ করলাম।

মাওলানা আহমদ! যেই আমি পড়া শুরু করলাম আমার ভেতরে কী যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হল, বলার ভাষা নেই। মনে হল, সারা জীবন আমি আসলে কিছুই পড়িনি। গোটা জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছি। দুদিন পর্যন্ত কাছারীতেও গেলাম না। মুন্সীকে বলে দিলাম তারিখ পাল্টে দাও। অথচ বড় বড় মোকাদ্দমারও তারিখ চলছিল। কুরআন মাজীদ শেষ করে আবারও পড়া আরম্ভ করলাম। 'আপকি আমানত'-ও খোঁজ করলাম। মালিকের দয়ায় পেয়ে গেলাম। পড়ে অনুমান করলাম, একেবারে মোটা মাথার লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত সাহেব ভালোবাসার মধু দিয়ে কুরআন মাজীদের চিকিৎসাপত্রের সারাংশ পাঠককে পান করিয়েছেন। হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ও সত্যিকারভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কেরানার ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। ইমাম সাহেব হযরতকে ফোন করলেন, রিং হতেই ওপাশ থেকে লাইন কেটে দেয়া হল। কয়েকবারই এমন হল, ইমাম সাহেব বললেন, হযরত হয়তো সফরে গিয়েছেন। ফুলাত ফোন করে জানা গেল হযরত রাজস্থানের সফরে আছেন।

হতাশা অস্থিরতার এক পর্যায়ে হঠাৎ ইমাম সাহেবের ফোন বেজে উঠল। হযরত সাহেব তাকে ফোন করেছিলেন। ইমাম সাহেব হযরতকে একথা বলে– পানিপথ থেকে যে উকীল সাহেব আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন আপনার

সঙ্গে কথা বলতে চান- আমাকে ফোন ধরিয়ে দিলেন। হযরত বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম। বার বার কেটে দেয়া সত্ত্বেও ফোন করা হচ্ছিল। বিরক্ত হচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, কোনো পেরেশানহাল দুঃখী ব্যক্তি তো নয়, যে সান্ত্বনা পেতে চায়! হয়তো আমার কথায় সে সান্ত্বনা লাভ করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করুন– একারণেই আমি মন না চাইতেও কলব্যাক করলাম। বললাম, হযরত! বাস্তবিকই আমি দুঃখী মানুষ। সান্ত্বনাপ্রার্থী। আমি এল.এল.এম করেছি, এল.ডি করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আপনি যে সংবিধান পড়ালেন তা আমার নিদ্রা উড়িয়ে দিয়েছে। কত বড় মোকাদ্দমা আমাকে সামলাতে হবে, কত বড় আদালতের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে আমার বুঝে এসেছে। হযরত! আপনি তো আমাকে অসুস্থ করে দিলেন এখন চিকিৎসা কে করবে। হযরত বললেন, উকীল সাহেব! আপনি শুধু উকীল হিসেবে কুরআন পড়েছেন।

আমি বললাম, হযরত আমি অভিযোগী হিসেবে কুরআন পড়েছি। পড়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আসলে অভিযোগী নই আমি তো অপরাধী। আর আমার জন্য নরকের শাস্তি নির্ধারণ করেছি। এই শাস্তি ইনসাফপূর্ণ, এটা সঠিক জাজমেন্ট। এখন আমাকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিন। হযরত সাহেব বললেন, আসলে আপনি উকীল হেতু উকীল হিসেবে কিংবা অভিযোগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পড়েছেন এবার আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পাঠ করুন যে, মায়ের চেয়ে সত্তরগুণ বেশী মমতাময় সৌন্দর্যসমূহকে আপন সৌন্দর্যের আধার থেকে সৌন্দর্যদানকারী, প্রিয়তম মালিকের 'মহব্বতনামা' পাঠ করছি। আমি বলি, আমি অবশ্যই পড়বো হাজার বার কুরআন পড়বো বরং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়বো। কিন্তু আগে তো গর্ত থেকে উদ্ধার করবেন। বললেন, আপনি অন্তরাত্মা থেকে কালিমা পড়েন নি? বললাম, আমি তো নরেশের বিবাহ পড়ানোর জন্য কালিমা পড়েছিলাম। এখন সত্যমনে পড়তে চাই। হযরত ফোনেই আমাকে আবার কালিমা পড়িয়ে দিলেন। আমার নাম রাখলেন মুহাম্মদ ইকবাল। তারপর জানতে চাইলেন, ওদের দুজনের কী অবস্থা? বললাম, চন্ডিগড় হাইকোর্টে কাগজপত্র তৈরী করতে গিয়েছে। হযরত বললেন, এদেরও সাচ্চা মুসলমান বানানোর ফিকির করবেন। তাদের বাধ্য করবেন তারা যেন পরিবারের লোকজনের ওপর কাজ করে, তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়। হযরত আরও বললেন, আপনার দুই

উকীল বন্ধুকেও কুরআন পড়াবেন। আমি বললাম, কুরআন অধ্যয়নের সময় তারাও আমার সঙ্গে ছিল।

প্রশ্ন : এটা কোনো সময়ের কথা?

উত্তর : এটা গতকালের ঘটনা । হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য মনটা বেচাইন হয়ে উঠল। দিল্লীর ঠিকানা জানা ছিল না। ফুলাত ফোন করেও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তবে জানতে পেলাম, তিনি রাজস্থান থেকে ফুলাত আসছেন। আর থাকতে পারলাম না। আজই ফুলাত চলে এসেছি। আকরাম ভাই জানালেন আজকে দিল্লী থাকলে খলীলুল্লাহ মসজিদে যোহর নামাজ পড়বেন। আপনি চেষ্টা করে দেখুন। আলহামদুলিল্লাহ যোহরের একটু আগেই পৌঁছে যাই। আমার আল্লাহ তখনই সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। হযরত আমার বাকী দুই উকীল সঙ্গীকেও পুনরায় কালিমা পড়িয়েছেন। আমরা এখন তিনজন জীবন-মরণের সাথী। মালিকের কৃতজ্ঞতা, এই বন্ধুত্ব আমাদের খুব কাজে লেগেছে। হযরত বললেন, এই বন্ধুত্ব ঈমানের পর এখন মৃত্যুপরবর্তীর জন্যও পাকা হয়ে গেল। হযরত বললেন, আপনি আরমুগানের জন্য একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে দিন। বলেও ছিলাম যে, মুসলমান হয়েছি একদিনও পুরো হয়নি আমি কী বলবো? কিন্তু হযরতকে যখন পীর মেনেছি কথাও তো শুনতেই হবে। এজন্যই আপনাকে এই দাস্তান শোনালাম।

প্রশ্ন : আগামীতে কী করার ইচ্ছা?

উত্তর : আমার ইচ্ছা কুরআন মাজীদ কুরআনের বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবো। আমি লক্ষ করেছি, লোকেরা কেমনভাবে অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে। চৌরাস্তায় বড় বড় বোর্ড লগিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ দাওয়াই বিক্রি করছে। আর যেটা সত্য ও নির্ভুল পয়গাম লোকেরা তার খবরও জানে না। সত্য বলছি, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে এতটুকুই জানতাম যে, কুরআন এমন এক কিতাব যার মধ্যে বিধর্মী কাফেরদের হত্যা করার ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ করে কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর : মাওলানা সাহেব! কালকুঠরীতে আবদ্ধ বন্দীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়ে গেছে। হঠাৎ এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে গলা থেকে দড়ি খুলে তাকে মুক্তি দেয়া হলে তার যে অনুভূতি হবে– সত্য দিলে ইসলাম গ্রহণ করে গতকাল থেকে আমার সেই অনুভূতি হচ্ছে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলার এক নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর নামক এক পর্বতে আগুনের সন্ধানে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা সেখানেই তাকে নবী বানিয়ে নিয়েছিলেন। তো আনতে গেলেন আগুন আর পেয়ে গেলেন নবুওয়াত– আপনার সঙ্গেও এমনটিই হয়েছে।

উত্তর : আপনি যথার্থই বলেছেন। আসলে মানুষের উপকার করাকে মালিক অত্যন্ত পছন্দ করেন। নরেশের প্রতি আমার করুণা হয়েছিল। ভেবেছিলাম এভাবে পাগল হয়ে যাওয়া অথবা আত্মহত্যা করে মারা যাওয়ার চেয়ে বিবাহ হয়ে যাওয়াই ভালো। অধর্ম হয়। হোক জানটাতো বাঁচল! আমি করুণা ও সমবেদনা নিয়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছি। দ্বারে দ্বারে ঘোরাফেরা করেছি। আমার মালিকের করুণা জাগল যে, আমার বান্দার ওপর সে করুণা করছে– হোক সে গুনাহগার– ব্যাস, আল্লাহ তাআলা আমার মতো কমীনাকে ঈমানের জন্য কবুল করে নিলেন।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'-এক কথা।

উত্তর : দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন ঈমানের ওপর আমৃত্যু অটল রাখেন এবং দুনিয়ার প্রতিটি কোণে কুরআন পৌঁছানোর এরাদা পূর্ণ করে দেন।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! মুবারক হোক, মুবারক হোক। অনেক অনেক শোকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, *ফেরুয়ারী ২০১০*

ভাই মুহাম্মদ রঈস (রমেশ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

আমার জন্য দুআ করবেন– আল্লাহ তাআলা আমাকে বংশগত মুসলমানের মতো দোযখের ব্যাপারে অনুভূতিহীন না করুন। আমি যেন আমার পিতার দুঃখকে বুকে ধারণ করে মানবতাকে আগুণ থেকে রক্ষা করার ফিকির করতে পারি। আর মুসলমানরাও এই ঘটনাকে নভেল-নাটক মনে না করে ঈমান ও একীনের সঙ্গে সত্য মনে করে দোযখের পথে রওয়ানাকারীদের জন্য ফিকির করে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মুহাম্মদ রঈস সাহেব : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : রঈস সাহেব! আপনি ভালো আছেন? কবে এসেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভালো আছি। দশ দিন হল দিল্লী এসেছি। হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করার পাক্কা এরাদা করে এসেছিলাম। ১০ ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী এসেছি। শুনলাম হযরত সাহেব মুম্বাই সফরে আছেন। ফিরতে চার পাঁচ দিন দেরী হবে। ভাবলাম, বাড়িতে গেলে কারখানা ইত্যাদিতে ফেঁসে যাবো। কাজেই দেখা করেই ফিরবো। নেযামুদ্দীন চলে গিয়েছিলাম। ১৭ তারিখ সকালে এসে জানতে পেলাম, হযরত এখনো ফিরেন নি। আজকেই চলে আসবেন। আবার চলে গেলাম। ১৮ তারিখ এসে শুনলাম, হযরত ফজর নামায পড়ে বের হয়ে গিয়েছেন, আগামীকাল আসবেন। গতকাল এখানেই থেকে গিয়েছি যে, যখনই আসবেন দেখা করবো। সত্যকথা হল, খোঁজ করলে মানুষ পেয়ে যায়। নেক নিয়তে চেষ্টাকারীকে আল্লাহ তাআলা নিরাশ করেন না। অবশ্য কখনও কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের সঙ্গে ভালোভাবে সাক্ষাত হয়েছে। খুব সান্ত্বনা পেয়েছি।

প্রশ্ন : আব্বু বলেছেন হয়তো, ফুলাত থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন আরমুগানের জন্য আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবো?

উত্তর : জ্বী, হ্যাঁ, হযরত আমাকে মসজিদে বসিয়ে গিয়েছেন যে, আহমদ মিয়া আসছে। আপনি তাকে আপনার কারগুযারী শোনাবেন। এটা ম্যাগাজিনে ছাপা হবে এবং ইনশাআল্লাহ! লোকদের হেদায়াতের উপলক্ষ হবে।

প্রশ্ন : অনুগ্রহপূর্বক আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন!

উত্তর : প্রসিদ্ধ জেলা ফতেহপুরের সিরুবীর এক রাজপূত পরিবারে ১৯৬২ সালের ৩রা জানুয়ারী আমার জন্ম। পিতাজী আমার নাম রাখেন রমেশ কুমার। দ্বাদশ ক্লাসে দু-দুবার ফেল করায় পড়াশোনা ছেড়ে দেই। আমার চাচার গাড়ি মেরামতের কারখানা ছিল। পিতাজী আমাকে তার নিকট কারের কাজ শেখার জন্য সোর্পদ করেন। আমি কার মেকানিক হয়ে যাই। ১৯৮৭ সালে বিবাহ করি। দিল্লীর জয়পুর হাইওয়েতে একটা ওয়ার্কশপ দিয়েছি। আমার পিতা নায়েবে তহশিলদার থেকে রিটায়ার্ড হয়েছেন। আমার এক বড় ভাই কানুন গো। ছোট ভাই পুলিশ ইন্সপেক্টর। আমার স্ত্রীও ভালো পরিবারের মেয়ে- গ্রাজুয়েট। স্ত্রী, দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে আমার সংসার।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন!

উত্তর : আহমদ ভাই! আমার মনে হয় সকল কর্মের কর্তা পৃথিবীতে তার প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা ইচ্ছা করে যাবেন। গোটা জগত সংসার বরং সমগ্র সৃষ্টি যেন কাঠের পুতুল। তারই আঙ্গুলের ইশারায় সবাই নাচে। তিনি যার প্রতি প্রসন্ন হন সে বেড়া পার হয়ে যায়। না জানি কিভাবে যেন আমার প্রতি মালিকের করুণা হল। তিনি আমার জন্য হেদায়াতের ব্যবস্থা করে দিলেন। হতে পারে হযরত মাওলানাজী আমাকে খুঁজছিলেন, আমার জন্য দুআ করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার দুআ মঞ্জুর করেছেন এবং আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। বরং ঘাড় ধরে হযরতের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : সেই বিবরণই তো আমরা জানতে চাচ্ছি!

উত্তর : জ্বী, বলছি। আমার ছোট ভাই আইজিতে ইন্সপেক্টর। আগ্রায় পোস্টেড ছিল। দু'বছর পূর্বে আগ্রায় এক তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার বাসা থেকে যেসব মালপত্র ক্রোক করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ব্রিফকেসও ছিল। ব্রিফকেসের মধ্যে আমার ভাই 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' নামক একটি পুস্তিকা পায়। ওটি ছাপা হয়েছিল রাজস্থানের আজমীর থেকে। আমার ভাই সুরেশ কুমার পুস্তিকাটি পড়ে। কিতাবটি এমন প্রেমপূর্ণ ভাষায় লেখা হয়েছিল যে, পুস্তকের আবেদন সুরেশের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু যেহেতু অফিসারদের সামনে সামানপত্র খুলে তার তালিকা করা হয়েছিল এ জন্য কিতাবটি তাকে মহাফেজখানায় জমা দিতে হয়। আমার ভাই পুস্তিকাটির নাম এবং প্রকাশকের ঠিকানা লিখে নেয়। হযরত আজই বলেছেন, সেই কিতাবের কারণে সাহারানপুরের ডিআইজি হযরত সাহেবের এনকোয়ারী করিয়েছেন। আর মুজাফফর নগরের সিআইডি ডিপার্টমেন্টেও হযরত এই কিতাবটি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার শোকর মুজাফফর নগরে একজন

মুসলমান ইন্সপেক্টর ছিল। আমার ভাই সুরেশ কিতাবে মুদ্রিত ঠিকানায় তাকে চিঠি লিখল, যে কোনো মূল্যে কিতাবটি যেন তাকে পাঠানো হয়। কিন্তু চিঠির কোনো জবাব আসল না। আমি যখনই ফতেহপুর সিকরী যেতাম আর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হতো সে আমার কাছে আবদার জানাতো যে, আপনি রাজস্থানে ওয়ার্কশপ চালান। কোনোভাবে কিতাবটি আমাকে সংগ্রহ করে দিন। আমি তাকে বলতাম, কী এমন কিতাব যে, যখন দেখা হয় 'আপকি আমানত' বলে বলে মুখে ফেনা তোলো! সুরেশ বলল, ভাইয়া! আপনি কিতাবটি পড়লে বুঝতে পারবেন লেখক কী পরিমাণ মহব্বতের মধু তাতে ঢেলেছেন।

আমার ওয়ার্কশপটি হাইওয়েতে হওয়ায় গাড়ী নষ্ট হলে লোকজন আমার এখানে চলে আসতো। রাজস্থানের লোকজনও মাঝে মাঝে আসতো। আমাদের পিতা ছোটবেলা থেকেই আমাদের পথিক ও বিপদগ্রস্ত লোকের সেবা করাকে পরমধর্ম বলে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি যখন ওয়ার্কশপ দেই পিতাজী আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যখন রাস্তার ধারে ওয়ার্কশপ খুলছো, সেখানে পথিক মুসাফিররাই বেশী আসবে। অন্ততপক্ষে তাদের বিপদ থেকে ফায়দা লুটবে না। রাতে কেউ এসে জাগালে উঠতে অলসতা করবে না। রাতের বেলা যে গাড়ী ঠিক করে দিবে তার মজুরী নিবে না। এটাকে পুঁজা মনে করবে। এর বিনিময় উপরওয়ালাই দিবেন।

গত ডিসেম্বরে বায়াওর আজমীর থেকে একটি গাড়ী আসল। গাড়ী ঠিকঠাক করে দেয়ার পর জানতে পরলাম, মালিক বায়াওরের লোক। চারদিন আগে আমি ফতেহপুর সিকরী গিয়েছিলাম। পিতাজীর শরীর ভালো ছিল না। সুরেশও এসেছিল। সে কিতাবটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। আমি ভদ্রলোককে বললাম, আপনার থেকে পারিশ্রমিক নেবো না। আপনি আমার একটি কাজ করে দিবেন। আমাকে 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' নামক কিতাবটি পাঠিয়ে দিবেন। তিনি বললেন, আগে পারিশ্রমিক তো নিন, ওয়াদা করছি, আপনাকে আমি কিতবাটি এনে দেবো। পয়সা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললাম, ব্যস, এটাই আমার পারিশ্রমিক। পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে আপনার ওপর চাপ থাকবে না। এতে কমপক্ষে এই চিন্তা করবেন যে, পারিশ্রমিক তো দেনা রয়েছি। তিনি মজুরী গ্রহণ করতে জেদ ধরলেন। সর্বশেষ আমি বললাম, ঠিক আছে কিতাবটি এনে দিলে তখন দুটোই নেবো। তিনি বললেন, কিতাবের লেখক আমাদের এখানে বায়াওরে আসেন। সেখানকার প্রোগ্রামে আমাকে কিতাবটি দেয়া হয়েছে। এবার 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' এই টপিকের ওপরই আলোচনা হয়েছিল। অনেক

লোকজন বরং শহরের সব দায়িত্বশীল বিশেষতঃ হিন্দু সংস্থাসমূহ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আর্যসমাজ, আর.এস.এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সকল নেতা সেই প্রোগ্রামে শরীক হয়েছিল। বায়াওরকে হিন্দুদের বিশেষত আর্যসমাজের কারণে অনেক ঐতিহাসিক শহর মনে করা হয়। সবাই এই সভায় শরীক হয়েছিল। প্রত্যেকেই বলছিল, এই যদি হয় ইসলাম তাহলে এই ইসলাম তো মুসলমানদেরও অজানা। এখন হিন্দুরা যদি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয় তাহলে তাদের কী দোষ? লোকজন বলছিল, শহরে এই প্রেমবাণীর গুঞ্জরণ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি সেই গাড়ী মালিকের হাত ধরে খোশামুদ করে বললাম, ভুলে যাবেন না যেন! তার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমার মনে কিতাবটি পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী শনিবারে দিল্লী যাওয়ার পথে সে আমার এখানে আসে। বলে, এক পত্রিকার মুখপাত্র যিনি প্রোগ্রামটি করেছিলেন তিনি তার সঙ্গী লালা ভাই ও শর্মাজীর সঙ্গে মিলে সেই প্রোগ্রামের রূপ বানিয়ে ছিলেন। তাদের আমি কিতাবের কথা বলেছি। তারা বলেছেন, কিতাবের সবগুলো কপিই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তারা আজমীর থেকে এনে দিবেন। তাছাড়া দিল্লীর উখলায় একটি অফিস আছে। সেখান থেকে কিতাব পাওয়া যেতে পারে। আমি দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে ফেরার পথে আপনাকে দিয়ে যাবো।

বেচারা দিল্লী গিয়ে উর্দু বাজার গেলেন। সেখান থেকে কেউ তাকে উখলার ঠিকানা দিল। তিনি নওকর পাঠিয়ে উখলা থেকে দশটি কিতাব আনালেন। ফেরার পথে মঙ্গলবার আমাকে কিতাব দিয়ে গেলেন। আমার মঙ্গলের দুয়ার খুলে গেল। দুজন বড় মিস্ত্রীকে গাড়ীর কাজে লাগিয়ে আমি হাত ধুয়ে কিতাব পড়তে লেগে গেলাম। কিতাব শেষ হতে হতেই আমি হিন্দু ধর্ম– বর্তমানে যেটা কোনো ধর্মই নয়; বরং দ্বীনে ইসলামেরই বিকৃতরূপ– পরিত্যাগ করে ফেলেছিলাম। আমি স্নান করে কিতাব খুলে সাচ্চা দিলে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নিলাম। রাতে এক মাওলানা সাহেবের নিকট গেলাম। তাঁকে পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলাম। তিনি মেওয়াতের মানুষ ছিলেন। আমাকে কিতাবের লেখক মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ও জামাআতে সময় লাগানোর পরামর্শ দিলেন। একটি কিতাব রেখে বাকীগুলো আমি কারখানার এক চাকুরীজীবির মারফত আগ্রায় সুরেশের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং সুযোগ করে চল্লিশ দিনের জামাআতে বেরিয়ে পড়ার প্রোগ্রাম বানালাম। আমি দিল্লী গিয়ে মাওলানা সাহেবের দফতর খুঁজে বের করলাম। মাওলানা সাহেব সফরে

ছিলেন। সেখানে জুনায়েদ নামক একজন হাফেজ সাহেব আমার এফিডেভিট বানিয়ে দিলেন। এবং মারকাজে গিয়ে জামাআতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

মারকাযে গিয়ে এত লোকের ভীড়ে আমি কোনো উপায় পাচ্ছিলাম না। কিছুটা নিরাশ হয়ে বের হচ্ছিলাম। হঠাৎ মারকাযের বড় মাওলানা সাদ সাহেবের ড্রাইভারকে পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে দারে আরকাম যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাকে বললাম, আমি সেখান থেকেই এসেছি। আমার কাগজপত্র হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে ভূপালের এক জামাআতে জুড়ে দিলেন। জামাআত লক্ষ্ণৌতে সময় লাগাল। সাথীরা সবাই ছিল শিক্ষিত সজ্জন। জামাআত থেকে জানুয়ারীতে ফিরে আসলাম। উখলা গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব আবারও সফরে গিয়েছিলেন। এক রাত থেকে বাহরাওয়াড় চলে আসি। জানতে পেলাম, পিতাজী গুরুতর অসুস্থ। ফতেহপুর গিয়ে দেখি সবাই কাঁদছে। শুনলাম, মাত্র এক ঘন্টা আগে আমার পিতার দেহান্তর ঘটে গেছে। (দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকেন)

প্রশ্ন : রঈস ভাই! আপনার নাম রঈস রাখল কে?

উত্তর : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) উকীল সরফরাজ সাহেব যিনি আমার কাগজপত্র করে দিয়েছেন। তিনিই আমার জন্য 'রমেশ'-এর সঙ্গে মিল রেখে রঈস নাম রেখে দেন। (আবার কাঁদতে থাকেন)

প্রশ্ন : আপনার পিতা কত ভালো মানুষ ছিলেন। আপনাদের কতো ভালো শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতাকে ভালোবাসতেন। আব্বু তো বলেন, এমন লোকদেরকে মালিক তার ফেরেশতা পাঠিয়ে কালিমা পড়িয়ে দেন।

উত্তর : না আহমদ ভাই! তিনি প্রকৃতিগতভাবেই মুসলমান ছিলেন। তাকে কেউ ইসলামের কথা বলেনি। প্রিয় ভাই মাওলানা আহমদ! একটু ভেবে দেখুন, আমার সামনে আমার লালন পালনকারীকে, আমাকে প্রেমিকের মত মহব্বতকারীকে আমার জ্বর-সর্দিতে অস্থিরচিত্ত পিতাকে হায়! আমার আল্লাহ যদি আমার বদলে তাকে ঈমান দান করতেন! মাওলানা আহমদ,আমার জ্বরের কথা শুনে যার জ্বর চলে আসতো সেই পিতাকে আমারই সামনে কোনো শত্রু– নয়– তারই আদরের পুত্ররা সর্বপ্রথম বড় ভাই এবং কানুনগো ছেলে অশীশ চৌধুরী লাকড়িতে ঘি ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। আমি আর আমার ছোট ভাই যে 'আপকি আমানত' পড়ে মুসলমান হয়ে মুহাম্মদ উমর নাম ধারণ করেছিল দুজনেই ভিক্ষা চাইতে থাকি যে, হিন্দু নিয়মানুসারেই তাকে সমাধিস্থ করা হোক– পোড়ানো না হোক। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাওলানা সাহেব! আমার প্রিয় বাবা শুধু এবং শুধু মুসলমানদের অবহিত না করার কারণে চিতায়

জ্বলে ভস্ম হলেন। আর যদি... কাঁদতে কাঁদতে... যদি সেখানে জাহান্নামের আগুনে... না আহমদ ভাই! আমার দ্বারা ওকথা বলাবেন না, তাহলে এই সমস্ত জালেম মুসলমানকে দয়াবান ন্যায়নিষ্ঠ খোদা কখনও ক্ষমা করবেন না। যাদের দায়িত্বহীনতার কারণে আমার এমন প্রিয় পিতা নরকে চলে গেছেন, তারা ঈমানওয়ালা নয়, তারা তো সবচেয়ে বড় বে–ঈমান!

প্রশ্ন : না, রঈস ভাই! এমনটি বলবেন না!

উত্তর : মাওলানা সাহেব! আপনি আমার স্থানে হলে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারতেন। আমার পিতাজীর অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল। একজন মাওলানা সাহেব তার সঙ্গে প্রায়ই সময় কাটাতেন। এই হতভাগা পুত্রের দুর্ভাগ্য! আল্লাহ তাআলা তাকে বানিয়েছেন, হেদায়াত দিয়েছেন কিন্তু তার মুহসিন পিতা, তাকে আঙ্গুল ধরে হাঁটাচলা শেখানো পিতা, কোলে করে স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেয়া পিতা, প্রতিদিন রাতে আমাদের জীবন গড়ার ফিকিরে এক একটি শব্দ মুখস্থ করানো পিতা, আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণকারী, আমাদের কল্যাণ ও মানবতার পাঠদানকারী পিতা মায়ের মমতা দিয়ে বুকে আগলে রাখা পিতা– আমার সামনেই জ্বলে ভস্ম হচ্ছিলেন। জ্বলতে জ্বলতে আমার সামনেই তাঁর মাথা ফুঁড়ে দেয়া হয়। জ্বলন্ত অবস্থায় শত্রুর মতো লাঠি মেরে মেরে আগুনে ঠেসে ধরা হয়। আর আমরা দুই ভাই সবকিছু জেনেও তা দেখতে থাকি। মাওলানা সাহেব, আপনি সম্ভবত আমাদের ব্যথা অনুভব করতে পারবেন না। ভেবে দেখুন, এটা কোনো উপন্যাসের কাহিনী নয়, নাটক নয়, একেবারে সত্য সংঘঠিত ঘটনা। আমাদের চাক্ষুষ কাহিনী।

আমি চিন্তা করি, হিন্দুরা তো জানে না তারা অবুঝ, কিন্তু মুসলমানদেরও এই বিশ্বাস যে, বে-ঈমানদের জন্য চিতার বিধান। তাদের রাস্তা সোজা নরক। নইলে মাওলানা সাহেব! একটু ভাবুন আপনার সামনে কেউ আগুনের গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, আর আপনি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। আপনি দোকানের কাজে নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। কাউকে কুয়ো বা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলে মানুষ সবকিছু ছেড়ে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কতলোক ডুবন্তকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আগুনের মধ্যে আমাদের সামনেই কোনো পাথর নয়, লাকড়ী নয়, আমাদেরই সঙ্গী সাথী, আমাদের ওপর অনুগ্রহকারী আমাদের সঙ্গে লেনদেনকারী চিতায় জ্বলছে, এদিকে প্রত্যেক ঈমানদারই তার চির নরকী হওয়ার একীন করেছে– তবুও তারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ঘর-বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। চিন্তার সামান্য রেখাও কপালে ভাঁজ ফেলছে না। এটা কিভাবে সম্ভব! এই মুসলমান কেমন

মুসলমান? এ-তো মানুষও নয়, হিংস্র জানোয়ার। যে কিনা তার সঙ্গীর অগ্নিদগ্ধ হওয়া মেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন : আসলেই এটা আপনার জন্য আবেগঘন ব্যাপার। আপনার এভাবেই চিন্তা করা উচিত।

উত্তর : মাওলানা আহমদ সাহেব! শুধু আমারই নয় আপনাকেও এভাবে ভাবতে হবে। অন্তত যে মুসলমানের জান্নাত-জাহান্নামের একীন আছে তাকে এভাবে ভাবা উচিত। বলুন! এভাবে ভাবা দরকার কিনা?

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে এভাবেই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আপনি সত্যই বলেছেন, আব্বু বলেন, আমাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে। আমরা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাকে হালকা নজরে দেখি। গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না। আপনি বলেছিলেন, সুরেশ ভাইও মুহাম্মদ উমর হয়ে গিয়েছেন। এটা কিভাবে হল?

উত্তর : তার কাছে কিতাব পৌঁছল; সে বার বার কিতাবটি পড়ে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করে। আগ্রায় এক তাবলীগী আমীর সাহেব আছেন, ডাক্তারী করেন– আমার ভাই তার কাছে গিয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মদ উমর। সে বাড়িতে যায়। তখন পিতাজী খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি একটা সময় একেবারে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। ভাই মুহাম্মদ উমর বাড়ির লোকজনকে বলে গিয়েছিল, পিতাজীর হুশ ফিরলে তাকে অবশ্যই যেন আপকি আমানত পড়তে দেয়া হয়। একদিন তার হুঁশ ফিরলে তাকে 'আপকি আমানত' পড়তে দেয়া হয়। তিনি শুয়ে শুয়ে কিতাব পড়া শুরু করেন। বলেন, কেমন সত্য আর ভালো বই! তারপর আবার বেঁহুশ হয়ে পড়েন। ইন্তেকাল পর্যন্ত আর তার হুঁশ ফিরেনি।

প্রশ্ন : আল্লাহর শোকর তাহলে আর ভাবনার কিছু নেই। শুরুর কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে নিয়েছেন তো তাওহীদ স্বীকারই করে নিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এতটুকুও যথেষ্ট।

উত্তর : মন ভোলানের জন্য এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্যকথা তো হল ইসলাম ও ঈমান বুঝে স্বীকার করা ব্যতীত পূর্ণ হতে পারে না। হায়! আমার দুঃখ.. এর কোনো উপশম নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবন্ধু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. কেমন সত্যই না উচ্চারণ করেছেন, হায়! আমি যদি পাখি হতাম, খড়কুটা হতাম। হায়! আমার মা আমাকে জন্মই না দিতো।

এই দুঃখ আমার পিতাকে চিতায় জ্বালানোর দুঃখ। অতঃপর দোযখের

আগুনে জ্বালানোর দুঃখ যা মৃত্যুর পরও শেষ হবে না বরং সেখানে আরও বেশী কষ্ট পেতে থাকবো। হায়! সদা সর্বদা ভস্মীভূত হওয়ার একীন, দোযখের প্রতি একীন প্রিয় পিতার ঈমান বঞ্চিত হয়ে চিরতরে জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার একীনকারী রঈসের বিষাদক্লিষ্ট অন্তর্জালাকে বুঝতে পারবে! (দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকেন। পানি পান করানো হয়।)

প্রশ্ন : (প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে) আব্বু অনেকবার জয়পুর হাইওয়ের এক মিস্ত্রীর কথা আলোচনা করেছেন। একবার রাতে তাঁর গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিস্ত্রি সাহেব তাকে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। আব্বু এই কারণে রাজস্থানের লোকদের ভদ্রতা ও মানবতাবোধের প্রশংসা করে থাকেন।

উত্তর : আহমদ ভাই! সেই সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা মিস্ত্রি আমিই ছিলাম। আজই মাওলানা সাহেব বলেছেন, জানুয়ারীর শেষ দিকে তিনি ফতেহপুর শিখবাটি গিয়েছিলেন। বহরাওয়াড় অতিক্রম করার পর আমার মনে পড়ল একবার এক শীতের রাতে আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের অ্যাম্বেসেডর গাড়ির প্যান বেলেট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক মিস্ত্রি সাহেবকে বাড়ি থেকে ডাকা হল, সে গাড়ি মেরমত করে বের করে দিল এবং পয়সা নিতে অস্বীকার করল। বলল, আমি কয়টা পয়সার জন্য রাত বিরাতে ধাক্কা খাওয়ার লোক নই। আমি তো এজন্য ঘুম নষ্ট করেছি যে, আপনারা আমার মেহমান। মানবতার সম্পর্কের কারণে আমি আপনাদের সেবা করেছি। মাওলানা সাহেব বলছিলেন, আমাদের সঙ্গে আব্দুর রশীদ নামে একজন দা'য়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন হরিদুয়ারের অধিবাসী। আমরা প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম, আব্দুর রশীদকে সেখানে রেখে যাবো। তিনি সেখানকার সমস্ত গাড়ী কারখানায় দাওয়াত দিবেন যাতে সেই অনুগ্রহকারীর নিকটও দাওয়াত পৌঁছে যায়।। আমি বললাম, সেই শীতের রাতে আপনি যখন জুসওয়ালার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসলেন আমিই স্পায়ার পার্টসওয়ালার বাড়িতে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। হযরত সাহেব আমিই আপনার সেই চোর ছিলাম। আমার মালিক আপনার সঙ্গে কিভাবে দেখা করিয়ে দিলেন। মাওলানা সাহেব বলেছেন, সেই রাতে দিল্লী ফিরে তাহাজ্জুদ নামাযে আমি খুব দুআ করেছি। আয় খোদা! আমার প্রতি এই অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ রয়েছে। কোনওভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিন এবং তাকে হেদায়াত দান করুন। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনার সেই দুআর কারণেই আমি আপনার প্রেমে বন্দী হয়ে দশদিন ধরে ঘর, পরিবার, ওয়ার্কশপ ছেড়ে দিল্লীতে পড়ে আছি। আর দিল্লীতে আমার পরিচিতও কেউ নেই। ব্যস, নিয়ত করেছিলাম,

এক বছরও যদি পড়ে থাকতে হয় থাকবো। প্রয়োজনে কোনো ওয়ার্কশপে কাজ জুটিয়ে নেবো তবুও মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত না করে যাবো না। হযরত সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই রাকাআত নামায পড়ে দীর্ঘক্ষণ দুআ করলেন।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! তাহলে আব্বজী যে মিস্ত্রীর আলোচনা করেন আপনিই তিনি। বাস্তবিকই আল্লাহ তাআলার কী শান! কিভাবে তিনি দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। এখন আপনার কী এরাদা?

উত্তর : প্রথমে আমার ছোট ভাই আইজি উমরকে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করাবো। তারপর হযরতওয়ালা আমাকে সেই জুসওয়ালাকে দাওয়াত দেয়ার যিম্মাদারী দিয়েছেন যিনি হযরতকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তারপর পরিবারের উপর কাজ করবো। আমার স্ত্রী সন্তানেরা তো আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান হয়ে গিয়েছে। মুহাম্মদ উমরের স্ত্রী কিছুটা শক্ত ধাতের। বর্তমানে তাদের ঘরে ইসলাম নিয়ে ঝগড়াঝাটি চলছে। হযরতের কাছে দুআ চেয়েছি। এখন ইনশাআল্লাহ হযরতের পরামর্শ অনুযায়ী দাওয়াতের কাজে জীবন কাটানোর চেষ্টা করবো, এবং মেহনত করবো, যেন আমার পিতার মতো স্বয়ং পরিবারের লোকজনকে ভস্ম করার ব্যাপারে লোকজন চিন্তিত হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : আমার জন্য দুআ করবেন– আল্লাহ তাআলা আমাকে বংশগত মুসলমানের মতো দোযখের ব্যাপারে অনুভূতিহীন না করুন। আমি যেন আমার পিতার দুঃখকে বুকে ধারণ করে মানবতাকে আগুণ থেকে রক্ষা করার ফিকির করতে পারি। আর মুসলমানরাও এই ঘটনাকে নভেল-নাটক মনে না করে ঈমান ও একীনের সঙ্গে সত্য মনে করে দোযখের পথে রওয়ানাকারীদের জন্য ফিকির করে।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। অনেক অনেক শোকরিয়া! জাযাকুমুল্লাহ খাইরাল জাযা। আসসালামু আলাইকুম।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **মার্চ– ২০১০**

সালমান সিদ্দিকী (অরুণ কুমার)-এর সাক্ষাৎকার

কেবল মুসলমানদেরই নয় সকল মানুষের প্রতি আমার পয়গাম, যে ব্যক্তিই সাচ্চা দিলে সত্য খুঁজে বেড়ায় সে পেয়েই যায়। কতো সত্যসন্ধানী পথে বিপথে ঘুরতে থাকে, মুসলমানদের কর্তব্য তাদেরকে ভুল পথে চলতে দেখে ঘৃণা না করে নম্রতা কোমলতার সাথে রাহনুমায়ী করা।

আহমাদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

সালমান সিদ্দিকী : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : জনাব সালমান সাহেব! আপনি এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি। আব্বু বলছিলেন, আরমুগানের এবারের সাক্ষাৎকারটা একেবারে নবীন কারও হওয়া চাই। কয়েকবার বলেছেন আমি যেন আপানার সাথে দেখা করতে হরিদুয়ারে যাই। আসলে এমনিতেও আমার হরিদুয়ার যেতে হতো। কিছুদিন ধরে গায়ত্রী সমাজের কেন্দ্র শান্তিকুঞ্জ থেকে লোকজন যোগাযোগ করছিল। তারা আব্বুকে ওখানে দাওয়াত করতে চায়। কয়েকদিন আগে আব্বু রামপুরা স্টেটের একটি প্রোগ্রামে গিয়ে ছিলেন। তারপর থেকে তো ওরা ফোন করেই যাচ্ছে। আব্বু বলছিলেন, তুমি কয়েকবার আসা-যাওয়া করো তারপর দেখা যাক। যা হোক, আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর : হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আমি উদগ্রীব ছিলাম। গত সপ্তাহে আমরা এসেছিলাম কিন্তু পথে গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত আমাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল এজন্য সাক্ষাত হয়নি। আজকে নিয়ত করে এসেছি, সাক্ষাত করে তবেই ফিরবো। প্রয়োজনে কয়েক বছর এখানে পড়ে থাকবো। আল্লাহ তাআলার শোকর এসেই সাক্ষাত পেয়ে গেছি।

প্রশ্ন : আব্বু সম্ভবত আপনাকে বলেই দিয়েছেন, আমাদের ফুলাত হকে আরমুগান নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়। এজন্য আপনার সঙ্গেও কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : জ্বী, হ্যাঁ, হযরতও এইমাত্র বলে গেলেন, কিন্তু ভাবছি, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এক মাস হয়নি। আমিই কী আর আমার কাহিনীই বা কী? হযরত সাহেব বলেছেন, না, না, আপনি অবশ্যই আপনার অবস্থা বয়ান

করবেন। এটা অন্যদের হেদায়াতের উপলক্ষ্য হলে আপনারও সাওয়াব হবে।

প্রশ্ন : জ্বী, হ্যাঁ, আব্বু ঠিকই বলেছেন, আপনি আপনার পারিবারিক পরিচয় দিন?

উত্তর : আমি বেরেলী জেলার ছোট্ট এক গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছি। আব্বু আমার নাম রেখেছিলেন অরুণ কুমার মিশরা। তিনি ছিলেন জুনিয়ার হাইস্কুলের হেডমাস্টার। স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করি। কিছু দিন নিঃসন্তান চাচার ওখানে মহারাষ্টের আহমদ নগরে ছিলাম। সেখান থেকেই গ্রাজুয়েশন করি। সাইকোলোজিতে এম.এম এবং পিএইচডি করেছি। তার পর রোহিলাখ ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হই। পরে রিডার এবং প্রফেসর হই। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এক পরিবারে বিবাহ করি। আমার শ্বশুর সাহেব ইউপির অনেক বড় রাজনৈতিক নেতা। বরং নেতাদেরও গুরু। তিনি আমাকে রাজনীতিতে আনতে চাইতেন। এজন্য দুজনের মধ্যে মিল ছিল না। ফলে পারিবারিক জীবনেও অশান্তি লেগে থাকতো। এই ব্যাপারটিই আমার সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের উপলক্ষ্য হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন!

উত্তর : ২০০২ খৃস্টাব্দে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করি এবং হরিদুয়ার চলে যাই। একের পর এক আশ্রমে ঘুরে ঘুরে শান্তি অন্বেষণ করতে থাকি। কঠিন তপস্যায় লিপ্ত হই। বড় বড় জপ-জপান্ত শেষ করি। কিন্তু শান্তি যে জিনিস তার কোথাও দেখা পাইনি। যেখানেই গিয়েছি, কাছাকাছি হওয়ার পর মনে হয়েছে ধর্ম একটা প্রফেশন একটা ব্যবসা, একটা ধান্ধা। আমার নিজের অবস্থা ছিল লবণের খনিতে পড়ে লবণে পরিণত হওয়ার দশা। আমিও 'শান্তিবান আশ্রম' নামে একটি আশ্রম খুলে বসি। কিন্তু পথ উল্টো হলে মঞ্জিলে কিভাবে পৌঁছা যায়? মঞ্জিল পেতে হলে পথ সঠিক হওয়া জরুরী। অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে চলল। কখনও কখনও মনে হতো পারিবারিক জীবনে ফিরে যাই। কিন্তু আমি তখন আশ্রমের বন্ধনে জড়িয়ে গেছি। কয়েকবার আশ্রম বেঁচে দেয়ার কথাও উঠেছে। কয়েকমাস পূর্বে তো বিক্রি হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গীরা পরামর্শ দিল, মহাকুম্ভ চলে যাক, তারপর না হয় বেঁচে দিবেন। মহাকুম্ভের পূর্বে লক্ষ্য করি, গোটা হরিদুয়ার আর ঋষিকেশ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যেন সামনে ব্যবসা মৌসুম।

কাস্টমারকে আকর্ষণ করার হাজারও রকম প্রস্তুতি চলছে। এই দৃশ্য আমি সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করি। মহাকুম্ভের জন্য আশ্রমগুলোকে প্রস্তুত করতে অনেক অনেক টাকা ব্যয় করা হল। কিন্তু পুলিশ ভীড় কমানোর লক্ষে সন্ত্রাসী হামলার গুজব ছাড়িয়ে দিল। ভয়ে লোকজন আসল না। পুলিশ বার বার ব্যাগ নিক্ষেপ

করে, কোথাও কোনো জিনিস রেখে দিয়ে গুজবকে সত্যে পরিণত করল। আশ্রমওয়ালা আর ধর্মগুরুরা অনেক সাফাই গাইল যে, এসব পুলিশী প্রোপাগান্ডা। কিন্তু কে শোনে কার কথা– যা আশা করা হয়েছিল তার এক-দশমাংশ লোকও আসল না। এই পরিমাণ ফোর্স নিয়োগ করা হল যে, দর্শনার্থীরা দেখেই ঘাবড়ে যেতো, অবশ্যই কোনো না কোনো সমস্যা আছে। আশ্রমগুলোতে নিরাশা ছড়িয়ে পড়ল। এত ব্যয় করা হল কিন্তু নৈবেদ্য নেই। সাইকোলোজি আমার সাবজেক্ট ছিল আমি পুরো ব্যাপারটিকে সেই আলোকে পর্যাবেক্ষণ করি। আমি আঁৎকে উঠি। উপলব্ধি করলাম ধর্মের নামে এগুলো সব প্রতারণা। কখনও আমি আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে বুঝতে থাকি। ভাবতে থাকি, একদিন সবকিছু ফেলে চলে যাবো।

মহা শিবরাত্রির একদিন পূর্বে বড় এক আশ্রমের মহাধর্মগুরুর কাছে যাই। সেখানে যে বাণিজ্যিক হালচাল দেখি, তাতে এই ধান্ধা থেকে আমার মন একেবারেই উঠে যায়। ধোঁকা যদি দিতেই হয় তাহলে নেতা হয়েই দেয়া উচিত। ধর্মের নামে ধান্ধাবাজি তো লজ্জার কথা! নিজের ওপর আমার লজ্জা হতে থাকে। পরিবারের সঙ্গে থাকা এরচেয়ে বহুগুণে ভালো ছিল। সন্তানাদি আর পরিবারের সেবা করলে সম্ভবত মালিককে পেয়ে যেতাম। রাতের বেলা বহু সময় ধরে মালিকের কাছে অনুযোগ করতে থাকি। বার বার চোখ ভিজতে থাকে। মালিক! তোমার সন্ধানে সবকিছু ত্যাগ করে এসেছি কিন্তু তুমি সম্ভবত আরও বেশী আড়ালে থাকো। এই সব স্থানে তোমার সন্ধান করা সম্ভবত ছাদের ওপর হারানো উট খোঁজার শামিল।

বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসল না। দুটোর সময় চোখ লেগে এল। স্বপ্নে দেখি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। শ্বেত-শ্রভ্র বসন। কান্তিময় মুখাবয়ব। আলোই আলো। মুখমন্ডলের চারপাশে যেন চাঁদের দীপ্তি। আমি আশীর্বাদ নিতে মাথানত করি। তিনি আমার কোমরে হাত রেখে বলেন, পন্ডিতজী ! সত্য পেতে চাইলে জাওয়ালাপুর গিয়ে মুফতী ইউসুফের সঙ্গে দেখা করুন।

চোখ খুলে দেখি, পাঁচটা বাজছে। উঠে স্নান ইত্যাদি সারলাম, নাস্তা করলাম। তারপর পরিষ্কার কাপড় পরে আশ্রমের সাধুদের কাছে জাওয়ালাপুরের রাস্তা জানতে চাইলাম। জানতে পেলাম জায়গাটি আমাদের একেবারে কাছে। সকাল নয়টায় বাসস্ট্যান্ড পৌঁছি। দেখি চার পাঁচজন মাওলানা বাস থেকে নামছে। তাদের একজনকে বড় মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোত্থেকে আসছেন? বললেন, জাওয়ালপুর থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে মুফতী ইউসুফ সাহেব নামের কেউ আছেন? তিনি চমকে

উঠে বললেন, আপনি তাকে কিভাবে চেনেন? আমি আমার পরিচয় দিয়ে রাতের সব অবস্থা এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত বললাম। তিনি বললেন, আমার নামই মুহাম্মদ ইউসুফ। আমি মুফতী। কিন্তু আমি জাওয়ালপুরের কাছে এক গ্রামে বাস করি। আমি ছাড়া এলাকায় মুফতী ইউসুফ নামে আর কোনো লোক নেই।

গত রাতে আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম। আমাদের হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব বলেন, সত্যসন্ধানী কত নিষ্ঠাবান মানুষ আল্লাহর পথ খুঁজে ফিরছে। আমরা তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দেই– এটা তাদের অধিকার। কাজেই আমাদের মহাকুম্ভে যেতে হবে। এরা চারজন আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়েছে। সকালে কিতাবাদি নিয়ে এখানে চলে এসেছি। বাস্তবিকই আপনি সত্যানুসন্ধানী হলে আমাদের হযরতজীর কিতাব পড়ুন। তারপর তাঁরা আমাকে 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' পুস্তিকটি পড়তে দেন। বলেন, এটা পড়ুন আপনি আমাদের সঙ্গেই সাক্ষাত করতে যাচ্ছিলেন। মালিক স্বয়ং আমাদেরই আপনার নিকট সত্যসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি কিতাবটি নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসে পড়া শুরু করি। সহজ-সরল প্রাঞ্জলভাবে দরদমাখা ভাষায় লেখা কিতাবটি পড়ে মনে হল, মালিক আমার অনুযোগ শ্রবণ করেছেন। আর আমি যে সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তা পেয়ে গেছি।

আমি মুফতী সাহেবকে বললাম, আমাকে মাওলানা সাহেবের নিকট নিয়ে চলুন। মুফতী সাহেব তাঁকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু পাওয়া গেল না। আমি তাঁদের আমার আশ্রমে যেতে বললাম। তাঁরা বললেন, আধঘন্টা পর আমরা নিজেরাই হাজির হবো। আমি তাদের ঠিকানা বলে আমার এক সঙ্গীকে তাদের সঙ্গে রেখে গেলাম। আর নিজে গিয়ে নাস্তা তৈরী করতে লেগে গেলাম। আধ ঘন্টা পর তারা বললেন, হযরতজী মুম্বাই সফরে আছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। ফোন করা হল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হল। বললাম, আপনার কিতাব পড়েই এতটা আনন্দিত হয়েছি, সাক্ষাতে না জানি কতটা মজা পাবো। হযরত সাহেব বললেন, না আমার কিতাবে সেই স্বাদ আছে, আর না আমার সাক্ষাতে; প্রকৃত স্বাদ তো পাবেন মালিকের স্বর্গদর্শন করে। আর সেটা পন্ডিতজী! বিদ্রোহ থেকে তওবা করে মালিকের সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ বিধানের শপথ নেয়া ছাড়া সম্ভব নয়।

তারপর মাওলানা সাহেব ঈমান আনা এবং কালিমা পড়া ব্যতীত মানুষ কতটা শংকাজনক পরিস্থিতিতে থাকে তার বিবরণ দিয়ে আমাকে তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে নিতে বললেন। আমি বললাম, আমরা ফুলাত আসতে চাচ্ছি আপনি একটু সময় দিন। মাওলানা সাহেব তার সফরের দীর্ঘতার কথা বলে আমাকে এক্ষুণি মুফতী ইউসুফ সাহেবের নিকট কালিমা পড়ে নিতে বললেন।

শুরুতে তো আমি ফুলাত গিয়েই কালিমা পড়ার কথা বলছিলাম কিন্তু পরে নগদ নগদ পড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

মুফতী সাহেব আমাকে কালিমা পড়াতে লাগলেন। আমার মনে হল, তাঁর পীর সাহেবের নিকটই কালিমা পড়া দরকার। মুফতী সাহেবকে একথা বললে তিনি মাওলানা সাহেবকে ফোন করে জানালেন। হযরত বললেন, তাকে ফোন দিন। আমি হযরতের সাথে কথা বলি। তিনি ফোনেই কালিমা পড়ে নিতে জোর দিলেন। আমি রাজী হলে তিনি ফোনের মধ্যেই আমাকে কালিমা পড়িয়ে দেন। তারপর হিন্দিতে তার অনুবাদ করে বরং কিছুটা ব্যাখ্যাসহ আমাকে অঙ্গিকার করান। বলেন, নাম পরিবর্তন জরুরী নয়। তবে কোনো ইসলামী নাম পছন্দ করলে ভালো হবে। আমি মুফতী সাহেবেকে বললাম, নামটা হযরতই রাখলে ভালো হবে। হযরত সাহেব ফোনেই বললেন, পুরনো ধর্মীয় কিতাবের আলেম ছিলেন হযরত সালমান ফারেসী। এই নামের বরকত অর্জন করতে চাইলে আপনার নাম সালমান মিশরা রাখতে পারেন। আমি বললাম, মিশরা বিশরা বাদ দিন, পুরো সালমান ফারেসীই রেখে দিন। হযরত সাহেব বললেন, ফারেসী আসলে ইরানের অধিবাসী হওয়ার কারণে বলা হয়। আপনি সালমান বেরেলভী রেখে দিন। বললাম, কালিম সিদ্দিকীর মতো যদি সালমান সিদ্দিকী রাখি তাহলে কেমন হয়? বললেন, আপনি সাচ্চা দিলে ইসলামের সত্যায়ন করেছেন। আপনি সিদ্দিক নাম রাখতে পারেন। বললাম ব্যস, সালমান সিদ্দিকীই বেশ সুন্দর।

প্রশ্ন : বেশ বেশ! তারপর কী হল?

উত্তর : হযরত সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা হতে থাকে। মুফতী সাহেব আমাদের আশ্রমেই অবস্থান করছিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে জামাআতেই নামায আদায় হচ্ছিল। একে একে সব মূর্তি বের করে ফেলা হল। আমি হযরতের সাথে দেখা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। এক সপ্তাহ আগেও এসেছিলাম। আজ সাক্ষাত হয়েছে। হযরত সাহেব পরিবারকে হরিদুয়ার নিয়ে আসতে কিংবা নিজেই বেরেলী চলে যেতে বলেছেন। কিছুদিন ফুলাত এসে যিকির ইত্যাদি করারও পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত সাহেবের পরামর্শে ফুলাতে তার পীর সাহেবের এলাকা রায়পুরে গিয়ে কয়েক মাস থাকবো। এখন আমরা মহাকুম্ভেই থাকবো। যেন সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো লোকদেরকে খুঁজে বের করে জুলুম থেকে উদ্ধার করতে পারি।

প্রশ্ন : এখনও পর্যন্ত অন্য কারও ওপর কাজ করেছেন কি?

উত্তর : আল্লাহ তাআলার শোকর! বর্তমানে আমরা আশ্রমেই অবস্থান

করছি এবং কাজ করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : আব্বু বলছিলেন, আপনি নাকি ভালো ভালো স্বপ্ন দেখেছেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমি সাতবার আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। একবার আমি একশত লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে গিয়ে স্বপ্নের মধ্যে কালিমা পড়িয়েছি। এদের মধ্যে গায়ত্রী সমাজের তিনজন বিশিষ্ট লোকও ছিল। আল্লাহ তাআলা অতিদ্রুত এর ব্যাখ্যা বাস্তব করে দিন।

প্রশ্ন : আপনি আপনার বাড়িতে এসব বলেছেন?

উত্তর : জ্বী, হ্যাঁ, হযরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আমার স্ত্রীকে ফোন করেছি। সে খুব কাঁদছিল। যখন তাকে বললাম, সুফী-সুন্নতীদের এক মহান বস্তি ফুলাতে এক বড় ধর্মগুরু সুফী সাহেব বাস করেন। তিনি আমাকে আশ্রম ছেড়ে ছেলে-সন্তানদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি শীঘ্রই বাড়ি ফিরছি। আট বছর পর সে একথা শুনে পাগলের মতো হয়ে গেছে। বলেছে, আমাকে অবশ্যই ধর্মগুরু সুফী সাহেবের ঠিকানা দিতে হবে যেন আমিও তার শরণ নিতে পারি এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারি। আমি অবশ্যই আমার তিন সন্তানকে নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হবো।

প্রশ্ন : মাশাআল্লাহ! মনে হচ্ছে আপনার সমস্যার সামাধান হয়েই গেছে।

উত্তর : জ্বী, আমারও এমনই মনে হচ্ছে। সে তো হযরতজীর প্রতি এতটাই আবেগপ্রবণ, মনে হল প্রথমবার বললেই কালিমা পড়ে নিবে।

প্রশ্ন : মুসলমানদের কোনো পয়গাম দিতে চান?

উত্তর : কেবল মুসলমানদেরই নয় সকল মানুষের প্রতি আমার পয়গাম, যে ব্যক্তিই সাচ্চা দিলে সত্য খুঁজে বেড়ায় সে পেয়েই যায়। কতো সত্যসন্ধানী পথে বিপথে ঘুরতে থাকে, মুসলমানদের কর্তব্য তাদের ভুল পথে চলতে দেখে ঘৃণা না করে নম্রতা কোমলতার সাথে রাহনুমায়ী করা।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া সালমান সিদ্দিকী সাহেব! আল্লাহ তাআলা আপনার প্রকৃত সিদ্দিকিয়্যাতের কিছু অংশ আমাদের মতো নাম সর্বস্ব বংশীয় সিদ্দিকদেরও নসীব করুন।

উত্তর : আপনি আমাকে শরমিন্দা করছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, **এপ্রিল– ২০১০**

সমাপ্ত